প্রথম অধ্যায়

ভগবদ্-উপলব্ধির প্রথম স্তর

মঙ্গলাচরণ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

ওঁ—হে ভগবান্; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

হে বসুদেব-তনয়, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

তাৎপর্য

বাসুদেবায় অর্থে "বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে"। যেহেতু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণের ফলে দান, কৃচ্ছ্রসাধন এবং তপস্যার সমস্ত সুফল লাভ হয়, তাই *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রণেতা বা বক্তা অথবা কোন পাঠক সমস্ত আনন্দের উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তাই প্রথম স্কন্ধকে "সৃষ্টি" নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তেমনই, দ্বিতীয় স্কন্ধে সৃষ্টির পর জগতের প্রকাশ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে বিভিন্ন গ্রহ লোককে ভগবানের দেহের বিভিন্ন অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, দ্বিতীয় স্কন্ধকে "জগতের প্রকাশ" বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় স্কন্ধে দশটি অধ্যায় রয়েছে, এবং সেই দশটি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যগুলির বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভগবানের মহিমা কীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তরা কিভাবে ভগবানের বিশ্বরূপের ধ্যান করতে পারে, সেই প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের 'মৃত্যু পথগামী মানুষের কর্তব্য' সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। শুকদেব গোস্বামীর দর্শন লাভ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং নিজে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা অর্জুনের

বংশধর হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য গর্ববোধ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী, কিন্তু তাঁর পিতামহ পাণ্ডবদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর পিতামহ অর্জুনের প্রতি, সেজন্য তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের বংশের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন, এবং তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যুর সময় তিনি শুকদেব গোস্বামীকে প্রেরণ করেছিলেন আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তাঁকে সাহায্য করতে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর শৈশব থেকেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। শুকদেব গোস্বামী তাঁর কৃষ্ণভক্তির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, তিনি পরীক্ষিৎ মহারাজের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্নগুলিকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন। যেহেতু মহারাজ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই সমস্ত জীবের পরম কর্তব্য, তাই শুকদেব গোস্বামী সেই মন্তব্যকে ঐকান্তিক সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, "আপনি যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, তাই আপনার প্রশ্নগুলি মহা মহিমান্বিত।" এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির অনুবাদ নিম্নে বর্ণিত হল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বরীয়ান্**—মহিমান্বিত; **এষঃ**— এই; **তে**—আপনার; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **কৃতঃ**—কৃত; **লোকহিতম্**—সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য; **নৃপ**—হে রাজন্; **আত্মবিৎ**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; **সম্মতঃ**—অনুমোদিত; **পুংসাম্**—সমস্ত মানুষের; **শ্রোতব্যাদিষু**—সমস্ত শ্রোতব্য বিষয়ের মধ্যে; **যঃ**—যা; **পরঃ**—পরম।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেনঃ হে রাজন্, আপনার প্রশ্ন যথার্থই মহিমান্বিত, কেননা তা সমস্ত মানুষের পরম হিতকর। এই বিষয়টি সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তকুল কর্তৃক অনুমোদিত।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এত সুন্দর ছিল যে, তা সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কেবল এই প্রশ্ন এবং উত্তর শ্রবণ করার মাধ্যমেই জীবনের পরম স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাই তাঁর সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নই সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মঙ্গলময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে

কৃষ্ণভক্তি লাভ করা। যেহেতু কৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে দিব্য স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মহারাজ পরীক্ষিতকৃত প্রশ্নগুলির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ চেয়েছিলেন তাঁর মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন করতে। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্যকলাপ শ্রবণ করার ফলেই কেবল এইভাবে মগ্ন হওয়া যায়। যেমন, ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপের দিব্য প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় এবং সেখান থেকে আর কখনই এই দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথা সর্বদা শ্রবণ করা পরম মঙ্গলপ্রদ। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করছেন শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বর্ণনা করতে, যাতে তিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। যতক্ষণ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণে মগ্ন থাকেন, ততক্ষণ তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় এতই মঙ্গলময় যে, তা বক্তা, শ্রোতা এবং প্রশ্নকর্তা সকলেরই পরম মঙ্গলসাধন করে। তাই কৃষ্ণকথাকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত গঙ্গার জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গঙ্গার জল যেখানেই যায় সেই স্থান এবং তার জলে অবগাহনকারী মানুষদের পবিত্র করে। তেমনই, কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আলোচনা, এতই পবিত্র যে, যেখানেই তা আলোচিত হোক না কেন, সেই স্থান, বক্তা, প্রশ্নকর্তা, শ্রোতা আদি সকলেই পবিত্র হয়ে যান।

শ্লোক ২

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥২॥

শ্রোতব্যাদীনি—শ্রবণীয় বিষয় সমূহ; **রাজেন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **নৃণাম্**—মানব সমাজের; **সন্তি**—বর্তমান; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **অপশ্যতাম্**—অন্ধের; **আত্মতত্ত্বম্**—আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান; **গৃহেষু**—গৃহতে; **গৃহমেধিনাম্**—জড় বিষয়াসক্ত গৃহব্রতীদের।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে গৃহীদের *গৃহস্থ* এবং *গৃহমেধী* এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। *গৃহস্থ* হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে অবস্থান করলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য পারমার্থিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে জীবন যাপন করেন। আর *গৃহমেধী* হচ্ছে তারা, যারা তাদের

আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই কেবল মগ্ন থেকে মাৎসর্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। *মেধী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। গৃহমেধীরা কেবল তাদের পরিবারের স্বার্থে মগ্ন থাকায় অবশ্যই অন্যদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ। তাই গৃহমেধীরা পরস্পরের প্রতি সদাশয়পূর্ণ নন, এবং বৃহত্তর ও সামগ্রিক বিবেচনায় এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের প্রতি, এক সমাজ আর এক সমাজের প্রতি অথবা এক দেশ আর এক দেশের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। কলিযুগে গৃহীরা পরস্পরের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ, কেননা তারা পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ বা উদাসীন। তাদের শ্রবণীয় রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বহু বিষয় রয়েছে, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি জীবনের চরম দুঃখ সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রকৃতপক্ষে, জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিজনিত সমস্ত সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান করাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু গৃহমেধীরা, জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। জীবনের সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান হয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) বলা হয়েছে—জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি সর্বতোভাবে উপশম হয়।

ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রবণ করা। মূর্খ মানুষেরা তা জানে না। তারা কেবল অনিত্য বস্তুসমূহের নাম, রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে শুনতে চায়, এবং তাদের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের শ্রবণের প্রবণতাকে কিভাবে নিযুক্ত করতে হয়, তা তারা জানে না। বিপথগামী মানুষেরা পরম তত্ত্বের নাম, রূপ, গুণ আদির সম্বন্ধে অসৎ সাহিত্য রচনা করে। তাই অন্যের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হয়ে গৃহমেধীর জীবন-যাপন করা উচিত নয়; শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আদর্শ গৃহস্থের জীবন-যাপন করাই মানুষের কর্তব্য।

শ্লোক ৩

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥৩॥

নিদ্রয়া—নিদ্রামগ্ন হয়ে; **হ্রিয়তে**—অপব্যয় করে; **নক্তম্**—রাত্রি; **ব্যবায়েন**—রতিক্রিয়া; **চ**—ও; **বা**—অথবা; **বয়ঃ**—আয়ু; **দিবা**—দিন; **চ**—এবং; **অর্থে**—অর্থনৈতিক; **হয়া**—উন্নতি সাধনের জন্য; **রাজন্**—হে রাজন্; **কুটুম্ব**—আত্মীয়স্বজন; **ভরণেন**—প্রতিপালনে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

এই প্রকার মাৎসর্যপরায়ণ গৃহমেধীরা নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতিক্রিয়ায় তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে, এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় দিবাভাগের অপচয় করে।

তাৎপর্য

বর্তমানে মানব-সমাজ প্রধানত রাত্রে নিদ্রায় অথবা রতিক্রিয়ায় এবং দিনের বেলায় পরিবার-পরিজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধরনের মানব-সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে।

যেহেতু মানব জীবন জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার সমন্বয়, তাই বৈদিক জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় কলুষের বন্ধন থেকে চিন্ময় আত্মাকে মুক্ত করা। সেই জ্ঞানকে বলা হয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা সেই জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তারা জড় সুখ উপভোগের চেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সর্বদা ব্যস্ত। এই ধরনের জড়বাদী মানুষদের বলা হয় কর্মী, এবং তাদের নিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের এবং স্ত্রী-সঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের থেকে উন্নত জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্তদের স্ত্রী-সঙ্গ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কর্মীরা সাধারণত আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন, এবং তার ফলে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করে তারা তাদের জীবনের অপচয় করে। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা অথবা কুকুর-বিড়ালের মতো যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাজনিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। তাই কর্মীরা যখন নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতি-ক্রিয়ায় মগ্ন হয়ে তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে, এবং অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দিন যাপন করে তাদের জড়জাগতিক জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা করে, তখন তা দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে সংক্ষেপে জড়বাদীগণের বর্ণনা করা হয়েছে। মূর্খ মানুষেরা কিভাবে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অপচয় করে, তা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥৪॥

দেহ—শরীর; **অপত্য**—পুত্র-কন্যা; **কলত্র**—পত্নী; **আদিষু**—এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু; **আত্ম**—নিজের; **সৈন্যেষু**—সৈন্যরা; **অসৎসু**—অনিত্য বা পতনশীল; **অপি**—সত্ত্বেও; **তেষাম্**—তাদের; **প্রমত্তঃ**—অত্যন্ত আসক্ত; **নিধনম্**—বিনাশ; **পশ্যন্**—অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; **অপি**—সত্ত্বেও; **ন**—করে না; **পশ্যতি**—দর্শন করে।

অনুবাদ

আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা দেহ, পুত্র, পত্নী আদি অনিত্য সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সমাধানের কোন চেষ্টা করে না। এই সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ দর্শন করে না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতকে বলা হয় মৃত্যুলোক। লক্ষকোটি বৎসর আয়ুষ্কাল সমন্বিত ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কয়েক পলকের আয়ু সমন্বিত বীজাণু পর্যন্ত প্রতিটি জীব বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। তাই, এই জীবন হচ্ছে মৃত্যু-প্রদানকারী প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক প্রকার সংগ্রাম। মনুষ্য জীবন পাওয়ার ফলে জীব এই মহা জীবন-সংগ্রামের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করে ; কিন্তু পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সে তার দৈহিক শক্তি, পুত্র, পত্নী, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির সাহায্যে অপরাজেয় জড়া প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। তার পূর্বপুরুষদের দেহাবসান দর্শন করার মাধ্যমে এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করা সত্ত্বেও সে বুঝতে চায় না যে, তার পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, দেশবাসী ইত্যাদি সকলেই এই মহাযুদ্ধে অসহায় সৈনিক মাত্র। সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত যে, তার পিতা অথবা পিতামহ ইতিমধ্যেই হত হয়েছেন এবং সে নিজেও হত হবে, এবং তেমনই তার পুত্র, পৌত্র সকলেই যথাসময়ে মৃত্যু বরণ করবে। জড়া প্রকৃতির এই সংগ্রামে কেউই বাঁচবে না। মানব সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় কিন্তু তবুও মূর্খ মানুষেরা দাবী করে যে, ভবিষ্যতে জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা নিত্য জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। এই ভ্রান্ত-জ্ঞান অবশ্যই মানুষকে বিপথে চালিত করছে এবং তার প্রধান কারণ, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা। এই জড়া প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বপ্নের মতো, এবং তার কারণ হচ্ছে, তার প্রতি আমাদের আসক্তি। জীব তার স্বরূপে সর্বদাই জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। জড়া প্রকৃতির মহাসমুদ্র কালস্রোতে নিয়ত উদ্বেলিত হচ্ছে, এবং সেই সমুদ্রে দেহ, পত্নী, পুত্র, সমাজ, দেশবাসী ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত জীবন বুদ্বুদেরই মতো। আত্মজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আমরা এই জড় জগতে নিত্য জীবন লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় দুর্লভ মানব জীবনের অপচয় করি।

আমাদের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি কেবল অনিত্য বা পতনশীলই নয়, জড়া প্রকৃতির বাহ্যিক চাকচিক্যের দ্বারা বিভ্রান্তও বটে। তারা কখনোই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে আত্মীয়-স্বজন, সমাজ অথবা দেশের গণ্ডীর মধ্যে আমরা নিরাপদে রয়েছি।

মানব-সমাজের জড় প্রগতি মৃতদেহ সাজানোর মতো। সকলেই এক-একটি মৃতদেহ, কেবল কয়েকদিনের জন্য নড়াচড়া করছে ; অথচ সেই দেহটিকে সাজাবার

জন্য মানব জীবনের সমস্ত শক্তির অপচয় করা হচ্ছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভ্রান্ত মানুষদের প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শন করে প্রতিটি মানুষের প্রকৃত কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিহীন মানুষেরা বিপথগামী, কিন্তু যাঁরা ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে যথাযথভাবে পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁরা কখনই বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ৫

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥৫ ॥

তস্মাৎ—এই কারণে; **ভারত**—হে ভরত বংশীয়; **সর্বাত্মা**—পরমাত্মা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান্; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **হরিঃ**—সমস্ত দুঃখ অপনোদনকারী ভগবান; **শ্রোতব্যঃ**—শ্রবণীয়; **কীর্তিতব্যঃ**—কীর্তনীয়; **চ**—ও; **স্মর্তব্যঃ**—স্মরণীয়; **চ**—এবং; **ইচ্ছতা**—ইচ্ছুক; **অভয়ম্**—ভয় থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

হে ভারত, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে যে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে তাকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে মূর্খ ও জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা নিদ্রা, রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জমান আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের চেষ্টায় তাদের দুর্লভ সময় নষ্ট করছে। সমস্ত জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে জীব কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তার ফলে জলচর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, অসভ্য এবং সভ্য মানুষ আদি ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি সমন্বিত জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। অবশেষে মনুষ্য জীবন লাভ করে সে এই কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ পায়। তাই কেউ যদি এই ভয়ঙ্কর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের বাসনা করে, তা হলে তাকে তার সৎ অথবা অসৎ উভয় কর্মেরই ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে। নিজের স্বার্থে সৎ অথবা অসৎ কোন কর্মই করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে সবকিছুর অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই সব কিছু সম্পাদন করা উচিত। এভাবে কর্ম করার নির্দেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সব কিছুই যেন পরমেশ্বর ভগবানের জন্য করা হয়। প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হয়। যথাযথভাবে মনোনিবেশ সহকারে ভগবানের কথা শ্রবণের পর ভগবানের কার্যকলাপ এবং মহিমা কীর্তন করা উচিত, এবং

তা করার ফলে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ নিরন্তরভাবে স্মরণ করা সম্ভব হয়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি থেকে অভিন্ন, এবং তার ফলে সর্বক্ষণ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তার ফলে সমস্ত ভয় থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং এইভাবে শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভগবান সমস্ত জীবকে তার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দিয়েছেন। ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের এই পন্থা সকলেরই পক্ষে গ্রহণীয়, এবং তা যে কোন অবস্থায় যে কোন কার্যে লিপ্ত মানুষকে তার জীবনের চরম সফলতা প্রদান করবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—সকাম কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং শুদ্ধ ভক্ত। ঈপ্সিত সাফল্য লাভের জন্য তারা সকলেই এই শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সকলেই চায় সব রকম ভয় থেকে মুক্ত হতে এবং সর্বতোভাবে আনন্দময় জীবন লাভ করতে। এইখানে এখন তা লাভ করার সর্বাঙ্গসুন্দর পন্থা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনের শ্রীমুখে নির্দেশিত হয়েছে। ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়ত্ব লাভ করে, এবং তার ফলে জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৬

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥৬॥

এতাবান্—এই সমস্ত ; **সাংখ্য**—জড় এবং চেতন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান ; **যোগাভ্যাম্**—যৌগিক ক্রিয়া ; **স্বধর্ম**—বর্ণাশ্রম ধর্ম ; **পরিনিষ্ঠয়া**—পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার ফলে ; **জন্ম**—জন্ম ; **লাভঃ**—লাভ ; **পরঃ**—পরম্ ; **পুংসাম্**—মানুষের ; **অন্তে**—শেষ সময়ে ; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **স্মৃতিঃ**—স্মরণ।

অনুবাদ

জড় এবং চেতন সম্বন্ধীয় যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্য জ্ঞান, যোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন—এই সব কটি পন্থারই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা।

তাৎপর্য

নারায়ণ হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবান। মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের ধর্মসমন্বিত সবকিছুই জড় জগৎ নামে পরিচিত। নারায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবান এই মহত্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নন, এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদিও জড়া প্রকৃতির অতীত। জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণকারী সাংখ্য জ্ঞান অথবা যোগ অনুশীলন, যা চরমে অনুশীলনকারীকে ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন লোকে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যাওয়ার

ক্ষমতা প্রদান করে, অথবা বর্ণাশ্রম অনুশীলনের মাধ্যমে চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়, যদি তিনি নিরন্তর নারায়ণকে স্মরণ করতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, যিনি শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে স্বধর্ম-পরায়ণ জ্ঞানী, যোগী, অথবা কর্মীদের প্রকৃত কার্যকলাপের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সম্পাদন করেন, সনকাদি ঋষি অথবা নবযোগেন্দ্রাদি মহাত্মাদের ভগবদ্ভক্তি লাভের মাধ্যমে পরম সিদ্ধি লাভের বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রয়েছে। জ্ঞানী এবং যোগীরা জ্ঞান এবং যোগের পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু ভগবানের ভক্ত কখনো ভক্তির পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা পরিত্যাগ করেননি। সকলেই তাদের বিশেষ পন্থায় সিদ্ধিলাভে আগ্রহী, এবং এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সেই সিদ্ধি হচ্ছে নারায়ণ-স্মৃতি। সেই সিদ্ধি লাভের জন্যই সকলকে এমনভাবে জীবন-যাপন করতে হবে যাতে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা যায়।

শ্লোক ৭

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥৭॥

প্রায়েণ—প্রধানত; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **রাজন্**—হে রাজন্; **নিবৃত্তঃ**—উর্ধ্বে; **বিধি**—বিধি; **ষেধতঃ**—নিষেধ; **নৈর্গুণ্যস্থাঃ**—নির্গুণ অবস্থা; **রমন্তে**—আনন্দ উপভোগ করেন; **স্ম**—স্পষ্টভাবে; **গুণ-অনুকথনে**—মহিমা কীর্তনে; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সব রকম বিধিনিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্তগণ হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ এবং তাই তাঁরা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নন। পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্র-বিধির মাধ্যমে সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত হন। সেই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রোগীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণত, মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার মাধ্যমে আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন। পূর্বে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ হরি, জড় সৃষ্টির অতীত, তাই তাঁর রূপ এবং বৈশিষ্ট্য জড় নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদী বা মুক্ত পুরুষেরা তাঁদের অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তাই ভগবানের লীলার চিন্ময় গুণাবলী আলোচনা করার মাধ্যমে আনন্দ আস্বাদন

করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৯) পরমেশ্বর ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর জন্ম এবং কর্ম দিব্য। জড়া-প্রকৃতির প্রভাবে মোহিত সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবানও তাদেরই মতো একজন, এবং তাই তারা ভগবানের নাম, রূপ, ইত্যাদির চিন্ময়ত্ব স্বীকার করতে চায় না। সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদীরা জড়-জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন, এবং তাঁরা যখন ভগবানের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন, তার থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে ভগবান আমাদের মতো জড় জগতের কেউ নন। বৈদিক শাস্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান এক, কিন্তু তিনি তাঁর অনন্য ভক্তদের সঙ্গে লীলা-বিলাস করেন, আবার যুগপৎভাবে তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বলদেবের প্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা; তাঁর নির্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া নয়, যা নির্বিশেষবাদী অদ্বৈত পন্থীরাই কামনা করেন। প্রকৃত দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয় ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে, তাঁর নির্বিশেষ রূপে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অনুভূতির মাধ্যমে নয়। একপ্রকার নিকৃষ্ট স্তরের পরমার্থবাদী রয়েছে যারা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার আনন্দ আস্বাদন করার পরিবর্তে তাঁর সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর কথা আলোচনা করে। কিন্তু তারা কখনোই উন্নত স্তরের চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না।

শ্লোক ৮

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥৮॥

ইদম্—এই; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **নাম**—নামক; **পুরাণম্**—পুরাণ; **ব্রহ্ম-সম্মিতম্**—বেদের নির্যাসরূপে সম্মত; **অধীতবান্**—অধ্যয়ন করেছি; **দ্বাপরাদৌ**—দ্বাপর যুগের শেষ সময়ে; **পিতুঃ**—আমার পিতার কাছ থেকে; **দ্বৈপায়নাৎ**—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত নামক সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্যাসস্বরূপ এই পুরাণ আমি দ্বাপর যুগের শেষে আমার পিতৃদেব শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে অধ্যয়ন করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যে বলেছেন যে বিধি-নিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদীদের প্রধান বৃত্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করা, তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর সেই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের জীবনের শেষ সাত দিনের সভায় সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা শুকদেব

গোস্বামীকে মুক্ত পুরুষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবাদীরূপে স্বীকার করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন কিভাবে তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর মহান পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অথবা অন্য কোন বিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্র নিজে নিজে গৃহে অধ্যয়ন করা যায় না। দৈহিক গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত শিক্ষা (Anatomy) অথবা শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত শিক্ষার (Physiology) বিষয়ে চিকিৎসা-গ্রন্থ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই বইগুলি বাড়িতে পড়ে কেউ কখনো উপযুক্ত চিকিৎসক বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। চিকিৎসক হতে হলে চিকিৎসা সংক্রান্ত মহাবিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উপযুক্ত অধ্যাপকদের পরিচালনায় যথাযথভাবে উপযুক্ত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে হয়। তেমনই, ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর স্তরের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করতে হয় শ্রীল ব্যাসদেবের মতো তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে উপবেশন করে। শুকদেব গোস্বামী যদিও তাঁর জন্মের মুহূর্ত থেকেই ছিলেন মুক্ত পুরুষ, তথাপি তিনি শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁর মহান পিতা ব্যাসদেবের কাছে, যিনি আর একজন মহাপুরুষ শ্রীল নারদ মুনির নির্দেশে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক বিদ্বান ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "যাহ ভাগবত পড় ভাগবত স্থানে।" শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রচিত, এবং তা প্রকাশ করেছিলেন ভগবানেরই অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। ভগবান তাঁর শুদ্ধভক্তদের সঙ্গে তাঁর লীলা-বিলাস করেন, এবং তাই এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রীমদ্ভাগবতকে *ব্রহ্ম সম্মিতম* বলা হয়, কেননা তা হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতো শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শব্দরূপে ভগবানের অবতার, কেননা ভগবান নিজে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দান করেছেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবত শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি, কেননা ভগবানের অবতার কর্তৃক ভগবানের কার্যকলাপই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের স্বাভাবিক ভাষ্য। দ্বাপর যুগের শেষে ব্যাসদেব সত্যবতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, এবং তাই এখানে দ্বাপরাদৌ বা "দ্বাপর যুগের শুরুতে" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রসঙ্গে 'কলিযুগ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে'—এই অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামীর মতে গাছের অগ্রভাগটি যেমন গাছের শুরু বলে বর্ণনা করা হয়, সেই যুক্তি অনুসারে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গাছের গোড়াটি হচ্ছে গাছের শুরু কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে যেহেতু গাছের আগাটি সবার আগে চোখে পড়ে, তাই অনেক সময় গাছের অগ্রভাগটিকেই গাছের শুরু বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্লোক ৯

পরিনিষ্ঠিতোঽপিনৈর্গুণ্য উত্তম শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥৯॥

পরিনিষ্ঠিতঃ—যিনি পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করেছেন ; **অপি**—সত্ত্বেও ; **নৈর্গুণ্যে**—চিন্ময় স্তরে ; **উত্তম**—জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ; **শ্লোক**—শ্লোক ; **লীলয়া**—লীলার দ্বারা ; **গৃহীত**—আকৃষ্ট হয়ে ; **চেতাঃ**—চিত্ত ; **রাজর্ষে**—হে রাজর্ষি ; **আখ্যানম্**—বর্ণনা ; **যৎ**—যা ; **অধীতবান্**—আমি অধ্যয়ন করেছি।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি ! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকলেও উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের লীলার দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করেছি।

তাৎপর্য

প্রথমে মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক জ্ঞানের মাধ্যমে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পরম সত্যকে উপলব্ধ হয়, এবং পরে অপ্রাকৃত জ্ঞানের উন্নতি সাধনের ফলে তাঁকে পরমাত্মা রূপে জানা যায়। কিন্তু যদি ভগবানের কৃপায় নির্বিশেষবাদী শ্রীমদ্ভাগবতের উত্তম জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। সীমিত জ্ঞানের দ্বারা আমরা পরম তত্ত্বকে একজন ব্যক্তিরূপে ধারণা করতে পারি না, এবং মূর্খ নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার চিন্ময়ত্ব অস্বীকার করে অপরাধ করে। কিন্তু যুক্তি এবং তর্ক উভয়ই পরম তত্ত্বের সমীপবর্তী হওয়ায় চিন্ময় পন্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গোঁড়া নির্বিশেষবাদীদেরও পরমেশ্বর ভগবানের লীলার প্রতি আকর্ষণ করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো ব্যক্তি কখনো কোন জড় কার্যকলাপের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারেন না, কিন্তু এই প্রকার একজন পরমার্থবাদী যখন উন্নত প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হন, তখন স্বাভাবিকভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার প্রতি আকৃষ্ট হন। ভগবান চিন্ময় এবং তাঁর লীলাও চিন্ময়। তিনি নিষ্ক্রিয় নন অথবা নির্বিশেষ নন।

শ্লোক ১০

তদহং তেহভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥১০॥

তৎ—তা ; **অহম্**—আমি ; **তে**—আপনাকে ; **অভিধাস্যামি**—শোনাব ; **মহাপৌরুষিকঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত ; **ভবান্**—আপনি ; **যস্য**—যার ; **শ্রদ্দধতাম**—যিনি সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা এবং সৌজন্য প্রদর্শন করেন ; **আশু**—

অত্যন্ত শীঘ্র ; **স্যাৎ**—হয় ; **মুকুন্দে**—মুক্তি প্রদাতা পরমেশ্বর ভগবানে ; **মতিঃ**—শ্রদ্ধা ; **সতী**—নিশ্চল।

অনুবাদ

আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবত আপনাকে শোনাব, কেননা আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত। যে ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁর শীঘ্রই মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দে রতি উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত সর্বজনবিদিত বৈদিক জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান লাভ করতে হয় অবরোহ পন্থায় বা গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায়। ভৌতিক জ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং গবেষণার প্রবণতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান লাভে পূর্ণ প্রগতি নির্ভর করে সদ্‌গুরুর কৃপার উপর। শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখনই কেবল আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বিদ্যার্থীর কাছে সেই জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা বলে এই প্রক্রিয়াটিকে কোন রকম যাদু বা ভেল্‌কিবাজি বলে ভুল করা উচিত নয়। এমন নয় যে গুরুদেব একজন যাদুকরের মতো শিষ্যকে তড়িৎ-প্রবাহে আবিষ্ট করার মতো সেই জ্ঞান ঢুকিয়ে দেন। সদ্‌গুরু বৈদিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর শিষ্যের কাছে সবকিছু বিশ্লেষণ করেন। শিষ্য তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করেন না, তা তিনি লাভ করেন বিনম্র প্রশ্ন এবং সেবার মাধ্যমে। অর্থাৎ, গুরুদেব এবং শিষ্য উভয়কেই উপযুক্ত হতে হয়। এখানে, গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর মহান পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা যথাযথভাবে কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন, আর শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক মহান ভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হচ্ছেন তিনি যিনি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করেন যে কৃষ্ণভক্ত হলে পারমার্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত হওয়া যায়। সেই শিক্ষা ভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় প্রদান করেছেন, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে তিনিই (শ্রীকৃষ্ণ) হচ্ছেন সবকিছু, এবং সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে সর্বতোভাবে পবিত্র হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অবিচল শ্রদ্ধা মানুষকে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষালাভের যোগ্যতা প্রদান করে এবং যিনি শুকদেব গোস্বামীর মতো পরম শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন তিনি যে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো অন্তিমকালে মুক্তিলাভ করবেন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। পেশাদারী ভাগবত পাঠক এবং মিছা ভক্ত, যাদের শ্রদ্ধা একসপ্তাহ ব্যাপী শ্রবণের উপর আধারিত, তারা শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ থেকে ভিন্ন। শ্রীল ব্যাসদেব শুকদেব গোস্বামীকে *জন্মাদ্যস্য* শ্লোক থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা দান করেছিলেন, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও সেইভাবে তা মহারাজ পরীক্ষিতের

কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে (একাদশ স্কন্ধে) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তাঁর ভক্তিময় স্বরূপে মহাপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভক্তিভাবে মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই কলিযুগের অত্যন্ত অধঃপতিত জীবদের তাঁর বিশেষ কৃপা দান করার জন্য তিনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মহাপুরুষ স্বরূপের বন্দনা করার উপযুক্ত দু'টি শ্লোক রয়েছে—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

(ভাঃ ১১/৫/৩৩-৩৪)

অর্থাৎ, পুরুষ মানে ভোক্তা, আর মহাপুরুষ মানে পরম ভোক্তা বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী হওয়ার যোগ্য, তাঁকে বলা হয় *মহাপৌরুষিক*। কেউ যখন মনোযোগ সহকারে উপযুক্ত বক্তার কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তখন তিনি অবশ্যই মুক্তিদানে সক্ষম ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শোনার ব্যাপারে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ঐকান্তিক শ্রোতা আর কেউ নেই, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো শ্রীমদ্ভাগবতের সুযোগ্য বক্তা আর কেউ নেই। তাই কেউ যদি আদর্শ বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অথবা আদর্শ শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের মতো মুক্তি লাভ করবেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ মোক্ষ লাভ করেছিলেন কেবল শ্রবণের দ্বারা, আর শুকদেব গোস্বামী মোক্ষ লাভ করেছিলেন কেবল কীর্তনের দ্বারা। শ্রবণ এবং কীর্তন নবধা ভক্তির দুটি প্রধান অঙ্গ, এবং এই ভক্ত্যঙ্গগুলি যদি আংশিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করা হয়, তাহলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই *জন্মাদ্যস্য* শ্লোক থেকে শুরু করে দ্বাদশ স্কন্ধের অন্তিম শ্লোক পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে শুনিয়েছিলেন তাঁর ভববন্ধন মোচনের জন্য। পদ্ম-পুরাণে উল্লেখ আছে যে গৌতম মুনি মহারাজ অম্বরীষকে নিয়মিতভাবে শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক কীর্তিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে মহারাজ অম্বরীষ শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক কীর্তিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করেছিলেন। যিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে **যথার্থই** আগ্রহী, তিনি বিচ্ছিন্নভাবে এখান থেকে কিছু অংশ বা ওখান থেকে কিছু

অংশ—এইভাবে না পড়ে মহারাজ অম্বরীষ বা মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সুযোগ্য প্রতিনিধির কাছ থেকে তা যথাযথভাবে শ্রবণ করবেন।

শ্লোক ১১

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥১১॥

এতৎ—এই ; **নির্বিদ্যমানানাম্**—যারা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত ; **ইচ্ছতাম্**—যারা সর্বপ্রকার জড় সুখভোগে ইচ্ছুক ; **অকুতঃভয়ম্**—সর্বপ্রকার সংশয় এবং ভয় থেকে মুক্ত ; **যোগিনাম্**—আত্মতৃপ্তদের ; **নৃপ**—হে রাজন্ ; **নির্ণীতম্**—নিশ্চিত সত্য ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ; **নাম**—পবিত্র নাম ; **অনু**—সর্বদা অনুসরণ করে ; **কীর্তনম্**—কীর্তন।

অনুবাদ

হে রাজন্ ! মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধি লাভের নিশ্চিত তথা নির্ভীক মার্গ। এমনকি যাঁরা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সবরকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আসক্ত, এবং যাঁরা দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলে আত্ম-তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলের পক্ষেই এইটিই হচ্ছে সিদ্ধিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হওয়ার নিতান্ত আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার মানুষ বিভিন্ন উপায়ে সিদ্ধিলাভের বাসনা করেন। সাধারণত যারা জড়বাদী, তারা পূর্ণরূপে জড় সুখভোগ করতে চায়। তাদের পরবর্তী স্তরে রয়েছেন সেই সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা, যাঁরা জড় সুখভোগের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত হয়েছেন এবং তাই মায়িক জীবন থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা সাধারণত আত্মজ্ঞান লাভ করার ফলে আত্মতৃপ্ত। তাঁদের ঊর্ধ্বে রয়েছেন ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা জড়-জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনাও করেন না। তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করতে চান। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তেরা কখনও তাঁদের নিজেদের জন্য কিছু চান না। ভগবান যদি চান তাহলে ভক্তরা সবরকম জড় সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করতে পারেন, এবং ভগবান যদি তা না চান তাহলে ভগবদ্ভক্তরা সমস্ত সুয়োগ-সুবিধা হেলাভরে পরিত্যাগ করতে পারেন, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত। তাঁরা আত্মারামত্বও পর্যন্ত কামনা করেন না, কেননা তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই সন্তুষ্টি কামনা করেন। এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী

ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন। নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং শ্রবণের ফলে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের সঙ্গে পরিচয় হয়, এবং তারপর ভগবানের গুণ, লীলা আদি দিব্য প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহাজনদের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করার পর নিরন্তর তা কীর্তন করা উচিত। অর্থাৎ, মহাজনদের কাছ থেকে শ্রবণ করা প্রথম কর্তব্য। দিব্য নাম শ্রবণ থেকে ধীরে ধীরে তাঁর রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি শ্রবণের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে উত্তরোত্তর তাঁর মহিমা কীর্তনের আবশ্যকতা উৎপন্ন হয়। এই বিধি কেবল সফলতা সহকারে ভক্তির অনুশীলনের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি যারা জড় বিষয়ে আসক্ত তাদের জন্যও। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতে, সাফল্য লাভের এইটিই যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তা কেবল তাঁরই সিদ্ধান্ত নয়, পূর্ববর্তী আচার্যদেরও। তাই, আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এই পন্থা কেবল বিভিন্ন স্তরের আদর্শবাদীদের সাফল্য লাভের জন্যই কেবল নয়, উপরন্তু কর্মী, জ্ঞানী অথবা ভক্তরূপে ইতিমধ্যেই সাফল্য লাভ যাঁরা করেছেন, তাঁদের জন্যও।

শ্রীল জীব গোস্বামী উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তা অবশ্যই নিরপরাধে করা উচিত। এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে ভগবানের চরণে সমস্ত অপরাধ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের পবিত্র নামের চরণে অপরাধ করে, তাহলে তা থেকে কোন মতেই রক্ষা পাওয়া যায় না। পদ্ম-পুরাণে এই প্রকার দশটি নাম অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অপরাধ হচ্ছে, যে সমস্ত মহান ভক্ত ভগবানের মহিমা প্রচার করেন তাঁদের নিন্দা করা। দ্বিতীয় অপরাধ, জড়-জাগতিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের পবিত্র নামকে দর্শন করা। ভগবান সর্বলোক-মহেশ্বর, তাই বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারেন, কিন্তু তার দ্বারা কোনভাবে ভগবানের পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। ভগবানের যে কোন নাম ভগবানেরই মতো পবিত্র, কেননা তা ভগবানকে ইঙ্গিত করে। ভগবানের এই সমস্ত নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তি-সম্পন্ন, এবং এই জগতের যে কোন স্থানে ভগবানের কোন এক বিশেষ নামের কীর্তন করতে তথা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে কারো কোন বাধা নেই। ভগবানের সমস্ত নামই মঙ্গলময়, এবং সেই নামকে কখনও জড়জাগতিক বস্তু বলে মনে করা উচিত নয়। তৃতীয় অপরাধ হচ্ছে সদ্‌গুরু বা আচার্যদের নির্দেশের অবজ্ঞা করা। চতুর্থ অপরাধ হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করা। পঞ্চম অপরাধ, জড় বিচারের দ্বারা ভগবানের দিব্য নামের অর্থ নিরূপণ করা। ভগবানের নাম এবং ভগবান এক, এবং তাই ভগবানের নামকে ভগবান থেকে অভিন্ন বলে জানা উচিত। ষষ্ঠ অপরাধ হচ্ছে কল্পনার দ্বারা ভগবানের নামকে ব্যাখ্যা করা। ভগবান কাল্পনিক নন, এবং তাঁর পবিত্র নামও কাল্পনিক নয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে ভগবান হচ্ছেন তাঁর উপাসকদের

কল্পনাপ্রসূত এবং তাই তাঁর নামও কল্পনাপ্রসূত। সেই মনোভাব নিয়ে যারা ভগবানের নাম কীর্তন করে, তারা কখনই নাম কীর্তনের বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। সপ্তম অপরাধ হচ্ছে নামের বলে পাপ আচরণ করা। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যারা সেই সুযোগ গ্রহণ করে পাপ আচরণ করতে থাকে এবং মনে করে যে ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে তাদের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে, তারা নাম প্রভুর চরণে সবচাইতে বড় অপরাধী। সেই প্রকার অপরাধীদের কোনভাবেই অপরাধ মোচন হয় না। ভগবানের নাম কীর্তন করতে শুরু করার পূর্বে কেউ পাপী থাকতে পারে, কিন্তু নাম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করার পর সমস্ত পাপ কার্য থেকে নিরস্ত হওয়া উচিত এবং আশা করা উচিত যে নাম কীর্তনের পন্থা তাকে রক্ষা করবে। অষ্টম অপরাধ হচ্ছে ভগবানের নাম কীর্তনকে জড়জাগতিক পুণ্য কর্মের সমতুল্য বলে মনে করা। জাগতিক সুবিধা লাভের জন্য নানাপ্রকার সৎকর্ম রয়েছে, কিন্তু ভগবানের নাম কীর্তন এই ধরনের কোন শুভ কর্ম নয়। ভগবানের নাম কীর্তন নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক, কিন্তু জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কখনও নাম কীর্তনের এই পন্থাকে ব্যবহার করা উচিত নয়। যেহেতু ভগবানের নাম এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন, তাই কখনও তথাকথিত মানব সেবার জন্য ভগবানের নামকে ব্যবহার করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনি কারও ভৃত্য বা আজ্ঞাবহ দাস নন। তেমনই, ভগবানের নামও হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, পরম ভোক্তা এবং পরম প্রভু, তাই ব্যক্তিগত সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে পবিত্র নাম উচ্চারণ করা উচিত নয়।

নবম অপরাধ হচ্ছে নাম কীর্তনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের পবিত্র নামের দিব্য প্রকৃতির বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। অনিচ্ছুক শ্রোতাদের কাছে যদি সেই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সেটি নাম প্রভুর চরণে একটি অপরাধ। দশম অপরাধ হচ্ছে পবিত্র নামের দিব্য প্রভাব সম্বন্ধে শ্রবণ করা সত্ত্বেও ভগবানের নামের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ না হওয়া। ভগবানের পবিত্র নাম প্রভাবে কীর্তনকারী ব্যক্তি মিথ্যা অহংকারের কবল থেকে মুক্ত হয়। নিজেকে জগতের ভোক্তা এবং জগতের সমস্ত বস্তুকে নিজের ভোগের সামগ্রী বলে মনে করাটাই হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। সমগ্র জড় জগৎ আবর্তিত হচ্ছে এই মিথ্যা অহংকার প্রসূত "আমি" এবং "আমার" ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে। কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১২

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥১২॥

কিম্—কি; **প্রমত্তস্য**—প্রমত্ত বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তির; **বহুভিঃ**—বহুর দ্বারা; **পরোক্ষৈঃ**—অনভিজ্ঞ; **হায়নৈঃ**—বর্ষ; **ইহ**—এই জগতে; **বরম্**—শ্রেয়; **মুহূর্তম**—

এক মুহূর্ত ; **বিদিতম্**—চেতন ; **ঘটতে**—চেষ্টা করতে পারে ; **শ্রেয়সে**—পরমার্থের বিষয়ে ; **যতঃ**—যার দ্বারা।

অনুবাদ

বিষয়ভোগে প্রমত্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনে কি লাভ? তার থেকে বরং পূর্ণ চেতনাসম্পন্ন এক মুহূর্তও শ্রেয়, কেননা তার ফলে পরমার্থ সাধনের অন্বেষণ শুরু হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রতিটি প্রগতিশীল ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। মহারাজ পরীক্ষিতকে, যাঁর জীবনের আর কেবল সাতটি মাত্র দিন বাকী ছিল, অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে শত শত বৎসর বেঁচে থাকা নিষ্প্রয়োজন, তার থেকে বরং জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা ভাল। জীবনের পরমার্থ নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। যারা জড়া-প্রকৃতির বহিরঙ্গা রূপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তারা আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনাদি পশুপ্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনের মূল্যবান বছরগুলি অপচয় করে। আমাদের পূর্ণ চেতনা সহকারে অবগত হওয়া উচিত যে বদ্ধ জীব মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয় আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভের জন্য, এবং ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করাই হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের সবচাইতে সহজ পন্থা। পূর্ববর্তী শ্লোকে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেই নাম প্রভুর চরণে বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে আমরা পরে আরও গভীরভাবে আলোকপাত করতে পারি। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বিভিন্ন প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নাম প্রভুর চরণে অপরাধ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। বিষ্ণুযামলতন্ত্র থেকে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রমাণ করেছেন যে কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে জীব সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে ভগবদ্ভক্তের নিন্দা করা উচিত নয় এবং ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তের উচিত সেই নিন্দুকের জিহ্বা কেটে তাকে নিরস্ত করা। আর তা করতে সক্ষম না হলে সেই নিন্দা শ্রবণ করার থেকে আত্মহত্যা করা শ্রেয়। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করা উচিত নয় এবং অন্য কাউকে নিন্দা করতে দেওয়া উচিত নয় বা তা অনুমোদন করা উচিত নয়। ভগবানের পবিত্র নাম থেকে দেবদেবীদের নামের পার্থক্য নিরূপণ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রে *(ভঃ গীঃ ১০/৪১)* উল্লেখ করা হয়েছে যে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সমস্ত জীবেরা হচ্ছেন পরম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন ঈশ্বর আর অন্য সকলেই তাঁর ভৃত্য ; ভগবান থেকে কেউই স্বতন্ত্র নয়। যেহেতু কেউই ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ

অথবা তাঁর সমকক্ষ নয়, তাই কারও নামই ভগবানের নামের মতো শক্তিশালী হতে পারে না। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে ভক্তির সমস্ত উৎস থেকে শক্তি আহরণ করা যায়, তাই অন্য কোন নামকে পরম পবিত্র ভগবানের নামের সমপর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়। ব্রহ্মা, শিব অথবা অন্য কোন শক্তিশালী দেবতারা কখনই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সমকক্ষ হতে পারেন না। শক্তিশালী ভগবানের দিব্য নাম অবশ্যই জীবকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু যদি কেউ ভগবানের দিব্য নামের অপ্রাকৃত বলে পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে সে হচ্ছে সবচাইতে অধঃপতিত মানুষ। ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধিরা কখনই সেই প্রকার মানুষকে ক্ষমা করেন না। তাই নিরপরাধে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার উদ্দেশ্যে জীবনের সবকিছু সর্বতোভাবে ব্যবহার করা উচিত। সেই কার্য যদি এক মুহূর্তের জন্যও সম্পাদিত হয়, তাহলে তা বৃক্ষ আদি জীবদের পারমার্থিক প্রগতিবিহীন শত-সহস্র বর্ষ ব্যাপী জীবনের থেকেও অনেক গুণ শ্রেয়।

শ্লোক ১৩

খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্তাৎসর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥১৩॥

খট্বাঙ্গঃ—মহারাজ খট্বাঙ্গ; **নাম**—নামক; **রাজর্ষিঃ**—ঋষি সদৃশ রাজা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **ইয়ত্তাম্**—স্থিতি; **ইহ**—এই জগতে; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **মুহূর্তাৎ**—মুহূর্তের মধ্যে; **সর্বম্**—সব কিছু; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **গতবান্**—শরণ গ্রহণ করেছিলেন; **অভয়ম্**—অভয়; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

রাজর্ষি খট্বাঙ্গ যখন জানতে পারলেন যে তাঁর আয়ুর আর এক মুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করে শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিচক্ষণ মানুষদের সর্বদা মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। জড়-জাগতিক জীবনের আবশ্যিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য কর্ম করাটাই সবকিছু নয়। পরবর্তী জীবনের সবচাইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা সচেতন থাকা কর্তব্য। সেই পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করাটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এখানে যে মহারাজ খট্বাঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি। কেননা রাজ্য শাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হন নি। মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ

পরীক্ষিৎ আদি অন্যান্য রাজর্ষিরাও ঠিক এরকমই ছিলেন। মানব জীবনের প্রথম কর্তব্য সাধনে তাঁরা সকলেই ছিলেন আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্বর্গের দেবতারা মহারাজ খট্বাঙ্গের কাছে প্রার্থনা করে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং প্রবল বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহারাজ খট্বাঙ্গ স্বর্গের দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বর্গের দেবতারা তাঁকে কোন বর দিতে চান। কিন্তু মহারাজ খট্বাঙ্গ তাঁর জীবনের পরম কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকার ফলে দেবতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি আর কতদিন জীবিত থাকবেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মহারাজ খট্বাঙ্গ জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে বর গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। বরং তিনি পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে তৎপর ছিলেন। দেবতারা তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর আয়ুষ্কালের আর এক মুহূর্ত সময় অবশিষ্ট রয়েছে। মহারাজ খট্বাঙ্গ তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ স্বর্গলোক ত্যাগ করে পৃথিবীতে ফিরে এসে পরমেশ্বর ভগবানের অভয় চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সেই মহান চেষ্টায় তিনি সফল হয়েছিলেন এবং মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই চেষ্টা এক মুহূর্তের জন্য হলেও রাজর্ষি খট্বাঙ্গ সফল হয়েছিলেন, কেন না, তিনি সর্বদা তাঁর জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যদিও মহারাজ পরীক্ষিতের আয়ুর আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তথাপি মহাত্মা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতরূপে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে। ভগবানের ইচ্ছায় মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হয়েছিল, এবং যে পারমার্থিক সম্পদ তিনি প্রদান করেছিলেন তা সুন্দরভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে নিবদ্ধ হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় তৎসর্বং তাবদ্যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥১৪॥

তব—আপনার; **অপি**—ও; **এতর্হি**—অতএব; **কৌরব্য**—হে কুরু-বংশজ; **সপ্তাহম্**—সাতদিন; **জীবিত**—জীবিত; **অবধিঃ**—সীমা; **উপকল্পয়**—সম্পাদন করুন; **তৎ**—তারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **যৎ**—যা; **সাম্পরায়িকম্**—পারলৌকিক অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

হে কুরুবংশ-প্রদীপ মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার আয়ুষ্কালের আর মাত্র সাতদিন অবশিষ্ট আছে। অতএব এই সময়ের মধ্যেই আপনার পারলৌকিক উদ্দেশ্য সাধন করুন।

তাৎপর্য

যিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, সেই মহারাজ খট্টাঙ্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে এই বলে উৎসাহিত করেছিলেন যে তাঁর জীবনের আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং তিনি অনায়াসে সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। পরোক্ষভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে তিনি যেন তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে ভগবানের শব্দরূপী প্রকাশ বা শব্দব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন। অর্থাৎ শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, কেবলমাত্র তা শ্রবণ করার মাধ্যমেই সকলে তাঁদের পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন। এই আচার কেবল আনুষ্ঠানিক নয়, অধিকন্তু সেগুলি অনুকূলভাবে সম্পাদন করতে হয়। এ বিষয়ে এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৫

অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গত সাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গ শস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্ ॥১৫॥

অন্তকালে—জীবনের অন্তিম সময়ে; **তু**—কিন্তু; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **আগতে**—আগমন করে; **গতসাধ্বসঃ**—মৃত্যুভয়হীন; **ছিন্দ্যাৎ**—ছেদন করতে হবে; **অসঙ্গ**—অনাসক্তি; **শস্ত্রেণ**—অস্ত্রের দ্বারা; **স্পৃহাম্**—সমস্ত কামনা-বাসনা; **দেহে**—যে বন্ধনের বিষয়ে; **অনু**—সম্পর্কিত; **যে**—সেসব; **চ**—ও; **তম্**—তারা।

অনুবাদ

জীবনের অন্তিম সময়ে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা দেহ ও দেহ সম্পর্কিত সমস্ত বন্ধন ছেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

স্থূল জড়বাদের মূর্খতা হচ্ছে যে মানুষ জড় জগতে স্থায়িভাবে অবস্থান করতে চায়, যদিও সকলেই জানে যে মূল্যবান মানবীয় শক্তির দ্বারা মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সে সব তাদের একদিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি মূর্খেরা, যাদের আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, মনে করে যে জীবনের কয়েকটি বছরই সবকিছু এবং মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জ্ঞানসম্পন্ন তথাকথিত বিজ্ঞানীমণ্ডলী মানুষের জীবনীশক্তিকে হনন করছে এবং তার ভয়াবহ পরিণাম গভীরভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জড়বাদীরা ভেবে দেখে

না যে তাদের পরবর্তী জীবনে কি হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক উপদেশ হচ্ছে বর্তমান দেহের বিনাশের পরেও যে জীবের স্বরূপের বিনাশ হয় না সে সম্বন্ধে অবগত হওয়া। কেননা এই জড় শরীর তো কেবল আত্মার একটি বহিরাবরণ মাত্র। ঠিক যেমন পুরান বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করা হয়, ঠিক তেমনই জীবেরও দেহের পরিবর্তন হয়, এবং দেহের এই পরিবর্তনকে বলা হয় মৃত্যু। অতএব মৃত্যু হচ্ছে বর্তমান জীবনের শেষে দেহ পরিবর্তনের একটি পন্থা মাত্র। বুদ্ধিমান মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সেজন্য প্রস্তুত হওয়া এবং পরবর্তী জীবনে যাতে এর থেকেও ভাল ধরনের শরীর পাওয়া যায় সেজন্য চেষ্টা করা। সর্বশ্রেষ্ঠ শরীর হচ্ছে চিন্ময় শরীর, যা ভগবদ্ধামে বা চিন্ময় লোকে ফিরে গেলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। তবে শরীরের পরিবর্তনের বিষয়ে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে এখন থেকেই প্রস্তুত করতে শুরু করা। মূর্খ মানুষেরা বর্তমান অনিত্য জীবনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়। তাই মূর্খ নেতারা মানুষের কাছে দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তার ভিত্তিতে আবেদন করে। দেহের সম্পর্ক কেবল এই দেহটির মধ্যেই সীমিত নয়, তা আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, সমাজ, দেশ এবং অন্য অনেক কিছুতে আরোপিত হয়, যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর মানুষ বর্তমান শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর কথা ভুলে যায়। তার কিছুটা অনুভব আমাদের হয় রাত্রে ঘুমবার সময়। যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, তখন দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর কথা আমরা ভুলে যাই, যদিও সেই বিস্মৃতি সাময়িক—কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। মৃত্যু কয়েক মাস ব্যাপী নিদ্রা ছাড়া আর কিছু নয়, যার মাধ্যমে কোন একটি শরীরের বন্ধন সূচিত হয় এবং সেই শরীরটি আমরা লাভ করি আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রকৃতির দানরূপে। তাই এই শরীরের অবস্থানকালে আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা জীবনের যে কোন স্তরে লাভ করতে শুরু করা যায়, এমনকি মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও তা শুরু করা যায়। তবে সাধারণ পন্থা হচ্ছে জীবনের প্রাথমিক স্তরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে তা লাভ করা। এই শিক্ষা যে সমাজে দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম বা সনাতন ধর্ম, যা হচ্ছে মানবজীবনকে সম্পূর্ণরূপে সফল করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই পন্থায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলে সবরকম পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক বন্ধন পরিত্যাগ করতে হয়; আরও ভাল হয় যদি তা তারও আগে করা যায়। বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের শিক্ষা দেওয়া হয় পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির জন্য। মূর্খ জড়বাদীরা জনসাধারণের নেতা সেজে পারিবারিক বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না করে তাদের প্রতি আসক্ত থাকে, এবং এইভাবে তারা প্রকৃতির নিয়মের শিকার হয় ও তাদের কর্ম অনুসারে স্থূল জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার মূর্খ নেতারা তাদের জীবনের শেষে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছু শ্রদ্ধা পেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সকলের হাত পা দৃঢ়ভাবে

বেঁধে রেখেছে প্রকৃতির যে নিয়ম, তার থেকে রেহাই পাবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে স্বেচ্ছায় পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত আসক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রূপান্তরিত করা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত পারিবারিক আসক্তির বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। উন্নততর বাসনা লাভের প্রচেষ্টা করা কর্তব্য, তা না হলে এই প্রকার কুৎসিত বাসনাগুলি পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে না। বাসনা জীবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীব নিত্য এবং তাই তার বাসনাও নিত্য। তাই মানুষ ইচ্ছা করা ছেড়ে দিতে পারে না, তবে ইচ্ছার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা যায়। তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাসনা বিকশিত করা অবশ্য কর্তব্য এবং তার ফলে জড় লাভ, জড় প্রতিষ্ঠা, জড় যশ ইত্যাদির বাসনাগুলি ভগবদ্ভক্তি বিকাশের মাত্রা অনুসারে হ্রাস পেতে থাকবে। জীবের কর্তব্য হচ্ছে সেবা করা, এবং সেই সেবার প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত বাসনা। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে পথের নগণ্য ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেই কারও না কারও সেবা করছে। এই সেবাবৃত্তির পূর্ণতা তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যখন সেই সেবার বাসনা জড় বস্তু থেকে আত্মায়, অথবা শয়তান থেকে পরমেশ্বর ভগবানে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্লোক ১৬

গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎকল্পিতাসনে ॥১৬॥

গৃহাৎ—গৃহ থেকে; **প্রব্রজিতঃ**—নিষ্ক্রান্ত হয়ে; **ধীরঃ**—আত্মসংযত; **পুণ্য**—পুণ্য; **তীর্থ**—তীর্থস্থান; **জলাপ্লুতঃ**—পূর্ণরূপে ধৌত হয়ে; **শুচৌ**—পবিত্র হয়ে; **বিবিক্তে**—নির্জনে; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **বিধিবৎ**—নিয়মানুসারে; **কল্পিত**—সম্পন্ন করে; **আসনে**—আসনে।

অনুবাদ

গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আত্মসংযম অনুশীলন করা মানুষের কর্তব্য। কোন তীর্থস্থানে নিয়মিতভাবে স্নান করে তিনি যথাযথভাবে পবিত্র হবেন এবং নির্জন স্থানে আসন রচনা করে তাতে উপবেশন করবেন।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্রেষ্ঠতর জীবনের প্রস্তুতির জন্য সকলের উচিত তথাকথিত গৃহ ত্যাগ করা। বর্ণাশ্রম ধর্ম বা সনাতন ধর্মের প্রথায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়স হলে যত শীঘ্র সম্ভব পারিবারিক বন্ধন থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত। আধুনিক সভ্যতা পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অতি উন্নত সুযোগ-সুবিধার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাই অবসর গ্রহণের পর সকলেই আসবাবপত্রের দ্বারা সুসজ্জিত এবং সুন্দরী রমণী এবং

শিশুদের দ্বারা পরিবৃত গৃহে অত্যন্ত আরামদায়কভাবে জীবন যাপন করতে চায়। সেই আরামদায়ক গৃহটি থেকে চলে যাওয়ার কোন বাসনা তাদের থাকে না। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং মন্ত্রীরা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পদটি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে এবং স্বপ্নেও তারা তাদের সেই গৃহসুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। সেই মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা অধিকতর আরামদায়ক আরেকটি জীবনের জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনা করে, কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু নির্দয়ভাবে সেই সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনাকারীদের বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করে অন্য আরেকটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের এইভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল অনুসারে চুরাশী লক্ষ বিভিন্ন যোনির মধ্যে একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। যে সমস্ত মানুষ তাদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সাধারণত কর্মের ফল অনুসারে নিম্নস্তরের শরীর দান করা হয়,এবং এই ভাবে মানবজীবনের সমস্ত শক্তির অপচয় হয়। মানবজীবনের অপচয়ের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং অলীক বস্তুর প্রতি আসক্ত না হওয়ার জন্য মানুষকে পঞ্চাশ বছর বয়স হলে সাবধান হওয়া উচিত, আর তার পূর্বেই যদি তা করা হয় তাহলে তো আরও ভাল। সকলের জানা উচিত যে মৃত্যুর ভয় সর্বদাই বর্তমান, এমনকি পঞ্চাশ বছর বয়সের পূর্বেও মৃত্যু আমাদের গ্রাস করতে পারে। তাই জীবনের যে কোন অবস্থায় পরবর্তী শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। সনাতন ধর্ম ব্যবস্থায় মানব জীবনের অপূর্ব সুন্দর সুযোগটি নষ্ট না করে পরবর্তী জীবনটিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য অনুগামীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থস্থানগুলি অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরবর্তী জীবনটি ভালভাবে গড়ে তোলার জন্য। বুদ্ধিমান মানুষদের আবশ্যিক কর্তব্য হচ্ছে জীবনের শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর বয়সের পর পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই সমস্ত তীর্থস্থানগুলিতে গিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা। জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গৃহত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা মৃত্যু পর্যন্ত কেউ যদি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে কোনমতেই জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় বিষয়ে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক মুক্তি বলতে যে কি বোঝায় তা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তা বলে আবার গৃহত্যাগ করার পর অথবা তীর্থস্থানে গিয়ে বৈধ বা অবৈধভাবে আরেকটি গৃহ নির্মাণ করে আত্মতুষ্ট হওয়া উচিত নয়। বহু মানুষ গৃহত্যাগ করে তীর্থস্থানে যায়, কিন্তু অসৎ সঙ্গের প্রভাবে পুনরায় অবৈধভাবে স্ত্রী-সঙ্গ করে সংসারী হয়। মায়ার মোহিনী শক্তি এতই প্রবল যে জীবনের প্রতিটি অবস্থায়, এমনকি সুখী গৃহ পরিত্যাগ করার পরেও মানুষ আবার বিভিন্ন প্রকার মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই যৌনলিপ্সা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মচর্য পালন করে আত্মসংযম অনুশীলন করা উচিত। যে মানুষ তার সত্তার যথার্থ উন্নতি সাধন করতে চায়, তার পক্ষে যৌন-ক্রীড়া আত্মহত্যা করার মতো অথবা তার থেকেও নিকৃষ্ট। তাই সাংসারিক জীবন

থেকে দূরে থাকার অর্থ হচ্ছে সবরকম ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা সম্পর্কে, বিশেষ করে যৌন বাসনা সম্পর্কে সংযত হওয়া। সেই অনুশীলনের বিধি হচ্ছে কুশ এবং কৃষ্ণাজিনের পবিত্র আসনে উপবেশন করে উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করা। এই প্রথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করা। এই সরল বিধিটিই কেবল সর্বোচ্চ স্তরের পারমার্থিক সাফল্য প্রদান করতে পারে।

শ্লোক ১৭

অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরণ্ ॥১৭॥

অভ্যসেৎ—অভ্যাস করা উচিত ; **মনসা**—মনের দ্বারা ; **শুদ্ধম্**—পবিত্র ; **ত্রিবৃৎ**— তিন অক্ষরের দ্বারা রচিত ; **ব্রহ্ম-অক্ষরম্**—চিন্ময় অক্ষর ; **পরম্**—পরম ; **মনঃ**—মন ; **যচ্ছেৎ**—বশীভূত করে ; **জিত-শ্বাসঃ**—শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ; **ব্রহ্ম**— পরম ; **বীজম্**—বীজ ; **অবিস্মরণ**—বিস্মৃত না হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে উপবেশন করে তিনটি চিন্ময় অক্ষর (অ-উ-ম) দ্বারা রচিত বীজমন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করবেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে মনকে বশীভূত করবেন, যাতে কখনও চিন্ময় বীজটির বিস্মরণ না হয়।

তাৎপর্য

ওঁ-কার বা প্রণব হচ্ছে চিন্ময় উপলব্ধির বীজ ; এবং তা অ-উ-ম তিনটি চিন্ময় অক্ষর দ্বারা রচিত। অভিজ্ঞ মহাযোগীদের দ্বারা উপদিষ্ট সমাধি লাভের দিব্য অথচ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রাণায়াম সহকারে মানসে এই প্রণব জপের ফলে বিষয়াসক্ত মনকে বশীভূত করা যায়। মনের অভ্যাস পরিবর্তন করার এইটিই হচ্ছে পন্থা। মনকে হত্যা করতে হয় না। মন অথবা বাসনা রোধ করা যায় না, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভের উদ্দেশ্যে মনের বৃত্তির পরিবর্তন করতে হয়। মন হচ্ছে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলির কেন্দ্রবিন্দু, তাই যদি চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার প্রকৃতি পরিবর্তন করা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মেন্দ্রিয়গুলির কার্যকলাপের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। ওঁ-কার সমস্ত চিন্ময় ধ্বনির বীজ এবং চিন্ময় ধ্বনিই কেবল মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এমনকি উন্মাদ ব্যক্তিকেও চিন্ময় ধ্বনির দ্বারা চিকিৎসা করার ফলে সুস্থ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রণব বা ওঁকারকে পরম সত্যের প্রত্যক্ষ এবং আক্ষরিক অভিব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে। কেউ যদি উপযুক্ত বিধি অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম সরাসরিভাবে উচ্চারণ না করতে পারে, তিনি অনায়াসে প্রণব (ওঁকার) জপ

করতে পারেন। এই ওঁকার হচ্ছে এক সম্বোধন, যথা—'হে ভগবান'। ওঁ হরি। ওঁ মানে হচ্ছে 'হে আমার প্রভু! হে পরমেশ্বর ভগবান।' পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবানের দিব্য নাম ভগবান থেকে অভিন্ন। তেমনই ওঁকারও ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু যারা কনিষ্ঠ স্তরের চেতনাসম্পন্ন, ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হওয়ার ফলে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ অথবা নাম উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের যান্ত্রিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলনের মাধ্যমে মানসে প্রণব (ওঁকার) নিরন্তর উচ্চারণ করার মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধির অনুশীলনের শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি যেহেতু জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা অসম্ভব, তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু মনের মাধ্যমে এই প্রকার দিব্য উপলব্ধির শুরু হয়। ভক্তেরা সরাসরিভাবে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানে তাঁদের মনকে নিবদ্ধ করেন। কিন্তু যারা ব্রহ্মের এই সবিশেষ রূপের ধারণা করতে পারে না, তাদের পারমার্থিক প্রগতির জন্য পরম সত্যের নির্বিশেষ উপলব্ধির মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্লোক ১৮

নিয়চ্ছেদ্বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥১৮॥

নিয়চ্ছেৎ—সংবরণ করে; **বিষয়েভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে; **অক্ষান**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **সারথিঃ**—সারথি; **মনঃ**—মন; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **আক্ষিপ্তম্**—মগ্ন থেকে; **শুভার্থে**—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য; **ধারয়েৎ**—ধারণ করে; **ধিয়া**—পূর্ণ চেতনায়।

অনুবাদ

মন যখন ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থেকে তাকে সংবরণ করা হয়, এবং বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা হয়। মন স্বভাবতই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাই মনকে নিগ্রহ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণরূপে দিব্য চেতনায় মগ্ন হওয়া।

তাৎপর্য

মনকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করার প্রথম প্রক্রিয়াটি হচ্ছে বিধিবদ্ধভাবে প্রণব ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ করা। যোগের এই পন্থাটিকে বলা হয় প্রাণায়াম বা পূর্ণরূপে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রাণায়ামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণরূপে ধ্যানে মগ্ন হওয়া। সেই স্তরকে বলা হয় সমাধি। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সমাধির স্তরেও জড় বিষয়ে আসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যেমন, মহাযোগী বিশ্বামিত্র

মুনি সমাধিস্থ অবস্থাতেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের কবলগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মন বর্তমানে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হলেও অবচেতন স্তরে অতীতের ঘটনাগুলি স্মরণ করে এবং তার ধ্যানস্থ হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই শুকদেব গোস্বামী ধ্যানের পন্থারূপে মনকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৬/৪৭) সেই নির্দেশই দিয়েছেন। এইভাবে চিন্ময় প্রক্রিয়ায় মনকে পবিত্র করার মাধ্যমে শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ভক্তিমূলক কার্যকলাপের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। যথাযথভাবে পরিচালিত হয়ে এই পন্থার অনুশীলন করলে চঞ্চল মনও নিশ্চিতরূপে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ১৯

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎপরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥১৯॥

তত্র—তারপর ; **এক**—একে একে ; **অবয়বম্**—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ; **ধ্যায়েৎ**—মনকে একাগ্রীভূত করা ; **অব্যুচ্ছিন্নেন**—সমগ্র রূপ থেকে বিযুক্ত না হয়ে ; **চেতসা**—মনের দ্বারা ; **মনঃ**—মন ; **নির্বিষয়ম্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের দ্বারা কলুষিত না হয়ে ; **যুক্ত্বা**—যুক্ত হয়ে ; **ততঃ**—তারপর ; **কিঞ্চন**—যা কিছু ; **ন**—না ; **স্মরেৎ**—চিন্তা করার ; **পদম্**—ব্যক্তি ; **তৎ**—তা ; **পরমম্**—পরম ; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর ; **মনঃ**—মন ; **যত্র**—যেখানে ; **প্রসীদতি**—সমন্বয় সাধন করা হয়।

অনুবাদ

তারপর শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণ শরীরের ধারণা থেকে বিচ্যুত না হয়েএকে একে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করবে। তার ফলে মন ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে মুক্ত হবে। অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না। কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম সত্য, অতএব তাতেই কেবল মন সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

তাৎপর্য

বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে মূর্খ মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত হওয়াই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং সুখ অন্বেষণের পরম প্রাপ্তি। বিষ্ণু-তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের অন্তহীন চিন্ময় রূপের একটি প্রকাশ, এবং আদি বিষ্ণু-তত্ত্ব বা পরম বিষ্ণু-তত্ত্ব হচ্ছে সর্বকারণের পরম কারণ গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ। তাই, শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করা বা শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় রূপের ধ্যান করা, বিশেষ করে

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করা হচ্ছে ধ্যানের চরম অবস্থা। এই ধ্যান ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু তা বলে ভগবানের পূর্ণ অবয়বের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। একে একে ভগবানের চিন্ময় দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করার অনুশীলন করা উচিত। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ নন। তিনি সবিশেষ, কিন্তু তাঁর দেহ আমাদের মতো বদ্ধ জীবদের থেকে ভিন্ন। তা না হলে পূর্ণ পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রণব ওঁকার থেকে শুরু করে শ্রীবিষ্ণুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করার নির্দেশ দিতেন না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরে যে বিষ্ণু-বিগ্রহের আরাধনা করার পন্থা বিদ্যমান আছে, তা কখনই পৌত্তলিকতা নয়; যদিও এক শ্রেণীর স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সে কথা প্রচার করে থাকে। এই সমস্ত মন্দিরগুলি হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় রূপের ধ্যান করার কেন্দ্র। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুর অর্চা-বিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করা উচিত। এক স্থানে স্থিরভাবে বসে থাকতে অক্ষম মানুষদের পক্ষে ধ্যান করার এটি একটি সহজ প্রক্রিয়া। এইভাবে তাঁরা তাঁদের মনকে পরে প্রণব ওঁকারে অথবা শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় অবয়বে একাগ্র করতে পারেন, যে বিষয়ে এখানে মহা ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে ওঁকার বা অ-উ-ম এই তিনটি শব্দের অপ্রাকৃত সমন্বয়ে গঠিত বীজমন্ত্রের উপর ধ্যান করার থেকে মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করা অধিকতর সহজ এবং ফলপ্রসূ। ওঁকার এবং শ্রীবিষ্ণুর রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু পারমার্থিক তত্ত্ব-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষেরা শ্রীবিষ্ণু এবং ওঁকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে প্রচার করে বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শ্রীবিষ্ণুর রূপ ধ্যানের চরম লক্ষ্য, এবং তাই শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করা নির্বিশেষ ওঁকারের ধ্যান করা থেকে অধিক শ্রেয়, কেননা পরবর্তী পন্থাটি পূর্ববর্তী পন্থাটির থেকে অধিক কষ্টসাপেক্ষ।

শ্লোক ২০

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ।
যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎকৃতং মলম্ ॥২০॥

রজঃ—রজোগুণ; **তমোভ্যাম্**—তমোগুণের দ্বারা; **আক্ষিপ্তম্**—বিক্ষিপ্ত; **বিমূঢ়ম্**—বিভ্রান্ত; **মনঃ**—মন; **আত্মনঃ**—স্বীয়; **যচ্ছেৎ**—সংশোধন করা; **ধারণয়া**—শ্রীবিষ্ণুর ধারণার দ্বারা; **ধীরঃ**—ধীর ব্যক্তি; **হন্তি**—ধ্বংস করা হয়; **যা**—সেই সমস্ত; **তৎকৃতম্**—তাদের দ্বারা সংঘটিত; **মলম্**—মল।

অনুবাদ

মন সর্বদাই রজোগুণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং তমোগুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় ধারণার দ্বারা মনের এই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি সংশোধন করা কর্তব্য, কেননা শ্রীবিষ্ণুর ধারণাই রজো ও তমোগুণপ্রসূত সমস্ত মল অপনোদন করতে পারে।

তাৎপর্য

রজো ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত নয়। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই কেবল পরম সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। রজো এবং তমোগুণের প্রভাবে মানুষ কামিনী এবং কাঞ্চনের প্রতি লালায়িত হয়। আর যারা কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সেই প্রবণতা কেবল শ্রীবিষ্ণুর নির্বিশেষ রূপের নিরন্তর স্মরণের মাধ্যমেই সংশোধন করা যেতে পারে। সাধারণত নির্বিশেষবাদী বা অদ্বৈতবাদীরা রজো এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে তারা মুক্ত আত্মা, কিন্তু পরম সত্যের চিন্ময় সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার ফলে তাদের হৃদয় কলুষিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, বহু জন্মের পর নির্বিশেষ দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। ভগবানের সবিশেষ রূপের উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জনের জন্য পারমার্থিক মার্গে অনভিজ্ঞ নির্বিশেষবাদীদের সর্বেশ্বরবাদ দর্শনের মাধ্যমে সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

সর্বেশ্বরবাদের সর্বোচ্চ স্তরের অনুশীলনকারীকে পরম সত্যের নির্বিশেষ ধারণা পোষণ করতে দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে জড়া শক্তির মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে অনুভব করার প্রয়াস করা হয়। জীবের সেবা করার স্বাভাবিক প্রবণতার মাধ্যমে জড়া-প্রকৃতিপ্রসূত সবকিছুকেই চিন্ময়ত্ব প্রদান করা যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন কিভাবে সেবাবৃত্তির দ্বারা সবকিছুকেই চিন্ময় অস্তিত্বে রূপান্তরিত করা যায় এবং এই ভক্তির মাধ্যমেই কেবল সর্বেশ্বরবাদকে সার্থক করা সম্ভব।

শ্লোক ২১

যস্যাং সন্ধার্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সম্পদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ ॥২১॥

যস্যাম্—এই প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত স্মরণের দ্বারা; **সন্ধার্যমাণায়াম্**—এই প্রকার অভ্যাসে স্থির হয়ে; **যোগিনঃ**—যোগীগণ; **ভক্তিলক্ষণঃ**—ভগবদ্ভক্তির অভ্যাস করে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **সম্পদ্যতে**—সফলতা লাভ করে; **যোগঃ**—ভক্তির দ্বারা যুক্ত হয়ে; **আশ্রয়ম্**—আশ্রয়ে; **ভদ্রম্**—সর্বপ্রকার কল্যাণ; **ঈক্ষতঃ**—যা দেখে।

অনুবাদ

হে রাজন্! এই প্রকার স্মরণের দ্বারা এবং সর্বমঙ্গলময় ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শনের অভ্যাস করার ফলে অচিরেই সাক্ষাৎ ভগবানের আশ্রয় লাভ করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়। সর্বেশ্বরবাদ বা সর্বত্র সর্বশক্তিমান ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করার পন্থা, মনকে শিক্ষা দেওয়ার এক প্রকার প্রণালী, যার ফলে মন ভগবদ্ভক্তির ধারণায় অভ্যস্ত হয়, এবং যোগীদের এই ভক্তিময়ী প্রবৃত্তির ফলে তাদের যোগসিদ্ধি সম্ভব হয়। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কখনই যোগে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এই প্রকার সর্বেশ্বরবাদ দর্শনের প্রভাবে যে ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা কালক্রমে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পর্যবসিত হয়। নির্বিশেষবাদীদের এই একটি মাত্র লাভ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির নির্বিশেষ পন্থা অধিকতর ক্লেশদায়ক, কেননা তা পরোক্ষভাবে লক্ষ্যে পৌঁছায়; নির্বিশেষবাদীরাও দীর্ঘকাল পরে ভগবানের সবিশেষ রূপের ধারণায় মগ্ন হয়।

শ্লোক ২২

রাজোবাচ

যথা সন্ধার্যতে ব্রহ্মণ্ ধারণা যত্র সম্মতা।
যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলম্ ॥২২॥

রাজা উবাচ—ভাগ্যবান রাজা বললেন; **যথা**—যেমন; **সন্ধার্যতে**—ধারণা সৃষ্টি হয়; **ব্রহ্মণ্**—হে ব্রাহ্মণ; **ধারণা**—ধারণা; **যত্র**—যেখানে এবং যেভাবে; **সম্মতা**—সংক্ষেপে; **যাদৃশী**—যেই প্রকার; **বা**—অথবা; **হরেৎ**—সমূলে বিনাশ করে; **আশু**—অবিলম্বে; **পুরুষস্য**—পুরুষের; **মনঃ**—মনের; **মলম্**—কলুষ।

অনুবাদ

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন মনকে কোথায় এবং কিভাবে একাগ্র করতে হবে এবং কিভাবে ধারণা স্থির করতে হবে, যার ফলে মনের সমস্ত কলুষ দূর করা যায়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের হৃদয়ের কলুষ হচ্ছে তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। বদ্ধ জীব জড় জগতের নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত। কিন্তু যেহেতু সে অজ্ঞানের অন্ধকারে

আচ্ছন্ন, তাই জড় জগতে দীর্ঘ কারাবাসের ফলে সঞ্চিত আবর্জনাজনিত দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারে না। তার প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সেবা করা, কিন্তু তার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ কলুষের প্রভাবে সে তার কামনা-বাসনার সেবা করতে চায়। এই সমস্ত সেবা তাকে যথার্থ শান্তি দেওয়ার পরিবর্তে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বেঁধে রাখে। সকাম কর্ম এবং মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানরূপী কলুষ কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গপ্রভাবেই দূর হতে পারে। সর্বশক্তিমান ভগবান অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর সঙ্গ দান করতে পারেন। তাই যারা ভগবানের সবিশেষ রূপে তাদের বিশ্বাস স্থির করতে অক্ষম, তাদের তিনি তাঁর বিরাট রূপের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ দেন। ভগবানের বিরাট নিরাকার রূপ তাঁর অসীম শক্তির প্রকাশ। যেহেতু শক্তিমান এবং শক্তি অভিন্ন, তাই তাঁর বিরাট রূপের নিরাকার ধারণাও বদ্ধ জীবকে পরোক্ষভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভে সাহায্য করে এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁর সবিশেষ রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে সাহায্য করে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রথম থেকেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই তাঁর পক্ষে কিভাবে মনকে ভগবানের নির্বিশেষ বিরাট রূপের ধারণায় মগ্ন করা যায় সে সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামীর কাছে প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন সবিশেষ রূপের ধারণা করতে অক্ষম ব্যক্তিদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। অভক্তেরা কখনও ভগবানের সবিশেষ রূপের কথা চিন্তা করতে পারে না। যেহেতু তারা অজ্ঞ, তাই রাম, কৃষ্ণ আদি ভগবানের সবিশেষ রূপ তাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে তাদের ধারণা অত্যন্ত অল্প। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১) ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, মূর্খ মানুষেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে। এই সমস্ত মানুষেরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে মানব সমাজে অথবা যে কোন জীব সমাজে প্রকাশিত হতে পারেন; তবুও তিনি সর্ব অবস্থাতেই সর্বশক্তিমান ভগবান থাকেন। তাই, যে সমস্ত মানুষ ভগবানের নিত্য সবিশেষ রূপ স্বীকার করতে পারে না, তাদের মঙ্গলের জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে প্রশ্ন করেছেন যে কিভাবে প্রাথমিক স্তরে সেই সবিশেষ রূপে মনকে নিবদ্ধ করা যায়, এবং শুকদেব গোস্বামী পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিস্তারিতভাবে তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥২৩॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন ; **জিত-আসনঃ**—আসন বা বসার পদ্ধতি যথাযথভাবে আয়ত্ত করে ; **জিত-শ্বাসঃ**—শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সংযত করে ; **জিত-সঙ্গঃ**—দুঃসঙ্গ ত্যাগ করে ; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি দমন করে ; **স্থূলে**—স্থূল পদার্থে ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানে ; **রূপে**—রূপে ; **মনঃ**—মনকে ; **সন্ধারয়েৎ**—প্রয়োগ করা কর্তব্য ; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন, আসন নিয়মাদির দ্বারা জিতাসন, প্রাণায়াম দ্বারা জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্গরহিত হয়ে প্রথমে বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থূলরূপে (বিরাট নামক রূপে) মনকে নিযুক্ত করতে হবে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের জড় বিষয়াসক্ত মন তাকে দেহাত্ম বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করতে দেয় না। তাই স্থূল জড়বাদীদের চরিত্র গঠনের জন্য যোগ প্রক্রিয়ায় ধ্যানের পন্থা (আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানে মনকে নিবদ্ধ করা) নির্দেশিত হয়েছে। এই প্রকার জড়বাদীরা যদি তাদের জড় বিষয়াসক্ত মনকে নির্মল না করতে পারে, তা হলে তাদের পক্ষে পারমার্থিক চিন্তায় মনকে একাগ্র করা অসম্ভব, এবং তার জন্য প্রথমে মনকে ভগবানের স্থূল জড় রূপ বা বহিরঙ্গা রূপে নিবদ্ধ করা যেতে পারে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা যোগের এই প্রকার সংযমের দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ আদি জড় কলুষ দূর করা। যোগী যদি যোগসিদ্ধির পরে ভ্রষ্ট হয়, তাহলে তার যোগ সাধনা ব্যর্থ হয়েছে বলে বুঝতে হবে, কেননা যোগের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদুপলব্ধি তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন তাঁর বিষয়াসক্ত মনকে বিভিন্ন ধারণায় নিবদ্ধ করার মাধ্যমে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি উপলব্ধি করতে পারেন। যখন ভগবানের শক্তিসমূহকে তাঁরই প্রকাশরূপে উপলব্ধ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই পারমার্থিক প্রগতি শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তার পক্ষে ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ২৪

বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥২৪॥

বিশেষঃ—সবিশেষ ; **তস্য**—তার ; **দেহঃ**—দেহ ; **অয়ম্**—এই ; **স্থবিষ্ঠঃ**—স্থূলরূপে জড় ; **চ**—এবং ; **স্থবীয়সাম্**—সমস্ত পদার্থের ; **যত্র**—যেখানে ; **ইদম্**—এই সমস্ত

বিষয়; **ব্যজ্যতে**—অনুভূত হয়; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **ভূতম্**—অতীত; **ভব্যম্**—ভবিষ্যৎ; **ভবৎ**—বর্তমান; **চ**—এবং; **সৎ**—পরিণাম।

অনুবাদ

এই বিস্ময়কর জড় জগতের বিরাট রূপ ভগবানেরই স্বরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কাল সমন্বিত এই সমগ্র বিশ্ব তাতেই প্রকাশিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

জড় অথবা চিন্ময় সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৩/১৩) বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর চিন্ময় চক্ষু, মস্তক এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। তিনি সবকিছু দেখতে পান, শুনতে পান, স্পর্শ করতে পারেন অথবা যে কোন স্থানে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেন। কেননা চিজ্জগতে তাঁর নিত্যধামে অবস্থান করা সত্ত্বেও তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাত্মার পরমাত্মারূপে সর্বত্র বিরাজমান। এই আপেক্ষিক জগতও তাঁর কারণীভূত প্রকাশ, কেননা এটি তাঁর চিন্ময় শক্তিরই প্রকাশ। যদিও তিনি তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, তথাপি তাঁর শক্তি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত, ঠিক যেমন সূর্য এক স্থানে স্থিত থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র তার কিরণ বিতরণের মাধ্যমে সর্বত্রই প্রকাশিত। কেননা সূর্যের কিরণ সূর্যমণ্ডলেরই প্রকাশরূপে সূর্য থেকে অভিন্ন। বিষ্ণুপুরাণে (১/২২/৫২) বলা হয়েছে যে, এক স্থানে অবস্থিত হয়ে অগ্নি যেমন তার কিরণ ছড়ায়, ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান, পরমাত্মা, তাঁর বিচিত্র শক্তি প্রকাশ করে সর্বত্রই নিজেকে বিস্তার করেছেন। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের বিরাট রূপের একটি আংশিক প্রকাশ মাত্র। অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভগবানের পূর্ণ চিন্ময় রূপের ধারণা করতে পারে না, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন শক্তি দর্শন করে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়, ঠিক যেমন একজন আদিবাসী বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে, বিশাল পর্বত অথবা বিশাল বটবৃক্ষ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়। আদিবাসীরা বাঘ অথবা হাতির শক্তির প্রশংসা করে, কেননা তারা অধিক শক্তিসম্পন্ন। সমস্ত শাস্ত্রে ভগবানের অতি উজ্জ্বল বর্ণনা থাকলেও এবং ভগবান স্বয়ং অবতরণ করে তাঁর অলৌকিক শক্তি এবং বীর্য প্রদর্শন করলেও, এবং পুরাকালে ব্যাসদেব, নারদ, অসিত দেবল প্রমুখ তত্ত্বদ্রষ্টা মহাজ্ঞানী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুন এবং আধুনিক যুগে শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ আচার্যেরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করলেও অসুরেরা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না। অসুরেরা শাস্ত্রের প্রমাণ মানে না এবং মহান আচার্যদের অধ্যক্ষতা স্বীকার করতে চায় না। ওরা ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে চায়। তাই বিরাট রূপে ভগবানের বিরাট শরীর তারা দর্শন করতে পারে, যা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জবাব দেয়। একজন আদিবাসী যেমন একটি বাঘ, হাতি, বজ্র ইত্যাদির উন্নততর জড় শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তেমনই তারাও ভগবানের বিরাট রূপের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করতে পারে। অর্জুনের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের জন্য তাঁর বিরাট রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। এই প্রকার জড় রূপ দর্শনে অনভ্যস্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে এই রূপ দর্শন করার জন্য বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিরাট রূপ দর্শন করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দান করেছিলেন। অর্জুনের মঙ্গল সাধনের জন্য ভগবান তাঁর এই বিরাট রূপ প্রকাশ করেননি, তিনি তা করেছিলেন সেই সমস্ত নির্বোধ মানুষদের জন্য যারা যাকে-তাকে ভগবানের অবতার রূপে গ্রহণ করে বিপথগামী হয়। এই বিরাট রূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে ভগবান তাদের শিক্ষা দিলেন যাতে তারা সেই সমস্ত তুচ্ছ অবতারদের অবতার বলে গ্রহণ করার পূর্বে তাদেরকে তাদের বিরাট রূপ প্রদর্শন করতে অনুরোধ করে। বিরাট রূপ প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভগবান নাস্তিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং ভগবানকে যারা বিরাট বলে মনে করে সেই সমস্ত অসুরদের কৃপা করেছেন। তার ফলে তারা তাদের হৃদয়ের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে ভগবানের দিব্য রূপ দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এটি নাস্তিক এবং ঘোর জড়বাদী মানুষদের প্রতি পরম করুণাময় ভগবানের কৃপা।

শ্লোক ২৫

অণ্ডকোশে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে ।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥২৫॥

অণ্ডকোশে—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের ভিতর; **শরীরে**—দেহে; **অস্মিন্**—এই; **সপ্ত**—সাত; **আবরণ**—আবরণ; **সংযুতে**—তা করে; **বৈরাজঃ**—বিরাট; **পুরুষঃ**—ভগবানের রূপ; **যঃ**—যা; **অসৌ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ধারণা**—ধারণা; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ সপ্ত আবরণের দ্বারা আবৃত। তার মধ্যবর্তী বিরাট পুরুষই ধারণার আশ্রয় স্বরূপ।

তাৎপর্য

ভগবানের যুগপৎ অসংখ্য রূপ রয়েছে, এবং সেই সমস্ত রূপই মূল উৎস রূপ শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভগবানের আদি, দিব্য এবং শাশ্বত রূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি তাঁর অচিন্ত্য অন্তরঙ্গা-শক্তি আত্মমায়ার দ্বারা অসংখ্যরূপে এবং অবতারে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর পূর্ণ শক্তি কোন অংশেই হ্রাস পায় না। তিনি পূর্ণ, এবং যদিও অসংখ্য পূর্ণরূপ তাঁর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তথাপি তিনি পূর্ণই থাকেন এবং তাঁর কোন হ্রাস হয় না। এইটিই হচ্ছে

তাঁর চিন্ময় বা অন্তরঙ্গা-শক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তাঁর বিরাট রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বুঝতে পারে না যে ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষের মতো বলে মনে হলেও তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ বা তার থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। পূর্ণ রূপে না হলেও জড়বাদী মানুষেরা সূর্যমণ্ডলের অসংখ্য গ্রহ সমন্বিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুমান করতে পারে। তারা কেবল তাদের মাথার উপর গোলাকার আকাশ দেখতে পায়, তার বেশি আর এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অন্য কোন তথ্য তাদের জানা নেই। এরকম কত শত-সহস্র ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতির সাতটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। একটি ফুটবল যেমন জলে ভাসে, ঠিক তেমনই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড কারণ-সমুদ্রে ভাসমান এবং সেই কারণ-সমুদ্রে মহাবিষ্ণু শয়ন করে আছেন। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস থেকে বীজরূপে ব্রহ্মাণ্ডগুলির উৎপত্তি হচ্ছে। আর এই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্নাংশ। মহাবিষ্ণু যখন তাঁর শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন ব্রহ্মাগণ কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। এইভাবে ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে জড় জগতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে। মূর্খ মানুষেরা কল্পনা করে দেখতে পারে যে কতটা অজ্ঞতার ফলে তারা একজন মরণোন্মুখ মানুষের উক্তির ভিত্তিতে একটি নগণ্য জীবকে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী অবতার বলে উপস্থাপন করছে। বিশেষ করে এই ধরনের মূর্খ মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান তাঁর বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, যাতে তারা যেন শ্রীকৃষ্ণের মতো বিরাটরূপ প্রদর্শন করার পরেই কেবল কাউকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করে। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং শুকদেব গোস্বামীর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করতে পারে, তবে তাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যাতে তারা শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে আত্ম প্রচারকারী প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত না হয়। এই সমস্ত প্রতারকেরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে প্রচার করলেও তাঁর মতো আচরণ করতে পারে না বা তাঁর মতো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বিরাট রূপ প্রদর্শন করতে পারে না।

শ্লোক ২৬

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং
পঠন্তি পার্ষ্ণি প্রপদে রসাতলম্ ।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্ফৌ
তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে ॥২৬॥

পাতালম্—ব্রহ্মাণ্ডের অধঃলোক সমূহ; **এতস্য**—তাঁর; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **পাদমূলম্**—শ্রীপাদপদ্মের নিম্নদেশ; **পঠন্তি**—অধ্যয়ন করে; **পার্ষ্ণি**—শ্রীপাদপদ্মের

পশ্চাদ্দেশ বা গোড়ালী ; **প্রপদে**—শ্রীপাদপদ্মের অগ্রভাগ ; **রসাতলম্**—রসাতল নামক লোক ; **মহাতলম্**—মহাতল নামক লোক ; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার ; **অথ**—এইভাবে ; **গুল্ফৌ**—পদদ্বয়ের গুল্ফপ্রদেশ ; **তলাতলম্**—তল এবং অতল নামক লোকদ্বয় ; **বৈ**—সেগুলি যেমন ; **পুরুষস্য**—বিরাট পুরুষের ; **জঙ্ঘে**—জঙ্ঘাদ্বয়।

অনুবাদ

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অধ্যয়ন করেছেন যে পাতাললোক সেই বিরাট পুরুষের পাদমূল, রসাতল তাঁর পদের অগ্র ও পশ্চাৎভাগ, মহাতল তাঁর পদদ্বয়ের গুল্ফ প্রদেশ এবং তল ও অতল লোক তাঁর জঙ্ঘাদ্বয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের শরীরের অতীত এই দৃশ্যমান জগতের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ব্যক্ত জগতের সব কিছুই তাঁকে আশ্রয় করে বিরাজ করে, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের যা কিছু গোচরীভূত হয় তা সবই পরমেশ্বর ভগবান। ভগবানের বিশ্বরূপের ধারণা জড়বাদীদের ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা করবার সুযোগ দেয়, তবে জড়বাদীদের নিশ্চিতভাবে এটি জেনে রাখা উচিত যে ভোগের দৃষ্টিতে এই জগতের দর্শন কখনই ভগবদুপলব্ধি নয়। ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জড় জগতের সম্পদ ভোগ করার প্রবৃত্তির উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি ভগবানের বিশ্বরূপের ধারণার মাধ্যমে পরম সত্যকে জানতে চান, তাহলে অবশ্যই সেবা-প্রবৃত্তির অনুশীলন করতে হবে। সেবা-প্রবৃত্তি বা ভক্তিভাবের উদয় না হলে বিরাট রূপের উপলব্ধিতে কোন কাজ হবে না। চিন্ময় ভগবান, তাঁর কোনও রূপেই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই সচ্চিদানন্দময় এবং তিনি কখনই জড় জগতের ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কেননা জড় জগতে সবকিছুই কলুষিত। ভগবান সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গা-শক্তিতে বিরাজ করেন।

ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ ভুবনাত্মক। তার সাতটি ঊর্ধ্বলোক, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্য। আর সাতটি অধঃলোক হচ্ছে তল, অতল, বিতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল এবং পাতাল। এই শ্লোকে সর্বনিম্ন স্তর থেকে লোকগুলির বর্ণনা শুরু হয়েছে, কেননা ভক্তিমার্গে ভগবানের শ্রীঅঙ্গের বর্ণনা পা থেকে শুরু করা হয়। শুকদেব গোস্বামী সর্বজনবিদিত ভগবদ্ভক্ত এবং তাঁর বর্ণনা অবশ্যই নির্ভুল।

শ্লোক ২৭

দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্তে
রূরুদ্বয়ং বিতলং চাতলং চ।

মহীতলং তাজ্জঘনং মহীপতে
নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥২৭॥

দ্বে—দুই ; **জানুনী**—জানুদ্বয় ; **সুতলম্**—সুতল লোক ; **বিশ্বমূর্তেঃ**—বিশ্বরূপের ; **উরুদ্বয়ম্**—উরুদয় ; **বিতলম্**—বিতল নামক লোক ; **চ**—ও ; **অতলম্**—অতল নামক লোক ; **চ**—এবং ; **মহীতলম্**—মহীতল নামক লোক ; **তৎ**—তাদের ; **জঘনম্**—কটীদেশ ; **মহীপতে**—রাজা ; **নভস্তলম্**—অন্তরীক্ষ ; **নাভি-সরঃ**—নাভি-সরোবর ; **গৃণন্তি**—স্বীকার করেন।

অনুবাদ

সুতল সেই বিশ্বমূর্তি বিরাট পুরুষের জানুদ্বয় এবং বিতল ও অতল তাঁর উরুদ্বয়, মহীতল তাঁর জঘন দেশ, নভস্তল বা ভুবলোক তাঁর নাভি-সরোবর।

শ্লোক ২৮

উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য
গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।
তপো বরাটীং বিদুরাদি পুংসঃ
সত্যং তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ ॥২৮॥

উরঃ—উচ্চ ; **স্থলম্**—স্থান (বক্ষ) ; **জ্যোতিঃ-অনীকম্**—জ্যোতিষ্ক লোক ; **অস্য**—তাঁর ; **গ্রীবা**—গলদেশ ; **মহঃ**—জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর উপরিস্থিত মহর্লোক ; **বদনম্**—মুখ ; **বৈ**—ঠিক সেই প্রকার ; **জনঃ**—জন নামক লোক ; **অস্য**—তাঁর ; **তপঃ**—জনলোকের উপরিস্থিত তপ নামক লোক ; **বরাটীম্**—ললাট ; **বিদুঃ**—জানা যায় ; **আদি**—মূল ; **পুংসঃ**—পুরুষ ; **সত্যম্**—সর্বোচ্চলোক ; **তু**—কিন্তু ; **শীর্ষাণি**—মস্তক ; **সহস্র**—এক হাজার ; **শীর্ষ্ণঃ**—মস্তকযুক্ত।

অনুবাদ

স্বর্গলোক তাঁর বক্ষস্থল, মহর্লোক তাঁর গ্রীবা, জনলোক তাঁর মুখমণ্ডল, তপলোক তাঁর ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্র শীর্ষ বিরাট পুরুষের শিরদেশ।

তাৎপর্য

সূর্য, চন্দ্র আদি জ্যোতিষ্ক ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত, এবং তাদের বিরাট পুরুষের বক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপরে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালকমণ্ডলীর আবাসস্থল স্বর্গলোক। তার ঊর্ধ্বে রয়েছে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং সর্বোপরি সত্যলোক, যেখানে জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রধান পরিচালক বিষ্ণু, ব্রহ্মা

এবং শিব বিরাজ করেন। এই বিষ্ণুকে বলা হয় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। কারণ-সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভাসছে এবং তাদের প্রত্যেকটিতে অসংখ্য সূর্য, চন্দ্র, দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবসহ ভগবানের বিরাটরূপ বিরাজ করছেন, এবং এই সমগ্র জড় জগৎ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির একটি নগণ্য অংশে অবস্থিত, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ
কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ।
নাসত্যদস্রৌ পরমস্য নাসে
ঘ্রাণোঽস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥২৯॥

ইন্দ্রাদয়ঃ—দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ; **বাহবঃ**—বাহু; **আহুঃ**—বলা হয়; **উস্রাঃ**—দেবতাগণ; **কর্ণৌ**—কর্ণ; **দিশঃ**—চতুর্দিক; **শ্রোত্রম্**—কর্ণপুট; **অমুষ্য**—ভগবানের; **শব্দঃ**—শব্দ; **নাসত্যদস্রৌ**—অশ্বিনীকুমার নামক দেবতাদ্বয়; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **নাসে**—নাসিকা; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **অস্য**—তাঁর; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **মুখম্**—মুখ; **অগ্নিঃ**—আগুন; **ইদ্ধঃ**—জ্বলন্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্রাদি দেবতারা বিরাট পুরুষের বাহু, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, শব্দ তাঁর কর্ণপুট, অশ্বিনীকুমার দ্বয় সেই পরম পুরুষের দুটি নাসারন্ধ্র, দীপ্ত অনল তাঁর মুখ।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপের বিশ্লেষণ শ্রীমদ্ভাগবতের এই পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১১/৩০) বিরাট পুরুষের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "হে বিষ্ণু, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছ এবং সমস্ত জগতকে তোমার তেজরাশির দ্বারা আবৃত করে সন্তপ্ত করছ।" এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ছাত্রদের স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন। এই দুটি গ্রন্থই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, এবং তাই তারা পরস্পরের পরিপূরক।

পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট পুরুষের ধারণায় সমস্ত পরিচালক দেবতাগণ এবং পরিচালিত জীবগণ অন্তর্ভুক্ত। এমনকি জীবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু সমস্ত দেবতারা ভগবানের বিরাট রূপের অন্তর্ভুক্ত, তাই গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিতে জল দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের বিরাট রূপের অথবা তাঁর সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণস্বরূপের

আরাধনা করা হলে সমস্ত দেবদেবীরা এবং বিভিন্ন অংশসদৃশ জীবেরা আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হন। তাই, জড়বাদীদের ক্ষেত্রে, ভগবানের বিরাট রূপের আরাধনা প্রকৃত মার্গেই এগিয়ে নিয়ে চলে। নানারকম জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবদেবীদের পূজা করার মাধ্যমে বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বাস্তব বস্তু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, আর বাকী সবকিছুই অলীক, কেননা সবকিছুই তাঁরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোক ৩০

দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎপতঙ্গঃ
পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।
তদ্‌ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্য-
মাপোঽস্য তালূ রস এব জিহ্বা ॥৩০॥

দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষ; **অক্ষিণী**—নেত্র-গোলক; **চক্ষুঃ**—চক্ষুর (ইন্দ্রিয়সমূহের); **অভূৎ**—হয়েছে; **পতঙ্গঃ**—সূর্য; **পক্ষ্মাণি**—নেত্র-পত্র; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **অহনী**—দিন এবং রাত্রি; **উভে**—উভয়; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **ভ্রূ**—ভ্রূ; **বিজৃম্ভঃ**—গতি; **পরমেষ্ঠি**—পরম জীব (ব্রহ্মা); **ধিষ্ণ্যম্**—পদ; **আপঃ**—জলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা বরুণ; **অস্য**—তাঁর; **তালূ**—তালু; **রসঃ**—রস; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **জিহ্বা**—জিভ।

অনুবাদ

আকাশ তাঁর নেত্রগোলক, সূর্য তাঁর নেত্র, দিন এবং রাত্রি তাঁর দুটি নেত্র-পত্র, ব্রহ্মপদ তাঁর ভ্রূ-ভঙ্গি, জলের নিয়ন্ত্রণকর্তা বরুণ তাঁর তালুদেশ এবং রস তাঁর জিহ্বা।

তাৎপর্য

সাধারণ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকটিতে বর্ণনা পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কেননা সূর্যকে কখনো তাঁর অক্ষিগোলক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কখনো বাহ্য-অন্তরীক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে শাস্ত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের কোন স্থান নেই। শাস্ত্রের বর্ণনা ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে ভগবানের বিরাটরূপে একাগ্রচিত্ত হতে হবে। সাধারণ জ্ঞান সর্বদাই অপূর্ণ, কিন্তু শাস্ত্রের বর্ণনা সর্বদাই পূর্ণ এবং অভ্রান্ত। শাস্ত্রে যদি কোন বৈসাদৃশ্য থেকে থাকে, তাহলে তা আমাদেরই অপূর্ণতাপ্রসূত, শাস্ত্রের নয়। বৈদিক জ্ঞান লাভের এইটিই হচ্ছে বিধি।

শ্লোক ৩১

ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি
দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া
দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥৩১॥

ছন্দাংসি—বৈদিক স্তোত্র; **অনন্তস্য**—পরমেশ্বরের; **শিরঃ**—ব্রহ্মরন্ধ্র; **গৃণন্তি**—কথিত হয়; **দংষ্ট্রা** —দন্তপংক্তি; **যমঃ**—পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজ; **স্নেহ-কলাঃ**—স্নেহ প্রদর্শনের কলা; **দ্বিজানি**—দন্ত সমূহ; **হাসঃ**—হাস্য; **জন-উন্মাদ-করী**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **চ**—ও; **মায়া**—মোহিনী শক্তি; **দুরন্ত**—দুরতিক্রম্য; **সর্গঃ**—জড় সৃষ্টি; **যৎ-অপাঙ্গ**—যার দৃষ্টিপাত; **মোক্ষঃ**—কটাক্ষ।

অনুবাদ

কথিত হয় যে বেদসমূহ সেই অনন্ত বিরাট পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, মৃত্যুর দেবতা যমরাজ হচ্ছেন তাঁর দংষ্ট্রা, স্নেহকলা হচ্ছে তাঁর দন্তপংক্তি এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় মায়াশক্তি তাঁর হাস্য। অপার সংসার সমুদ্র তাঁর কটাক্ষপাত।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা অনুসারে জড়া-প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, যাকে এখানে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মোহিনী শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় সৃষ্টির আকর্ষণে যারা আকৃষ্ট হয়েছে, সেই বদ্ধ জীবদের জেনে রাখা উচিত যে এই অনিত্য জড় সংসার বাস্তব বস্তুর আভাস মাত্র এবং যারা ভগবানের সেই মোহময় ঈক্ষণের দ্বারা মোহিত হয়েছে, তারা পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভগবান যখন স্নেহভরে হাসেন, তখন তাঁর দন্ত-পংক্তি ঈষৎ বিকশিত হয়। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ ভগবান সম্বন্ধীয় এই সকল সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁরাই সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হন।

শ্লোক ৩২

ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো
ধর্মঃ স্তনোঽধর্মপথোঽস্য পৃষ্ঠম্।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌ চ মিত্রৌ
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘাঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রীড়—বিনয়; **উত্তর**—উপরিভাগ; **ওষ্ঠ**—ওষ্ঠ; **অধরঃ**—অধর; **এব**—অবশ্যই; **লোভঃ**—লোভ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **স্তনঃ**—স্তন; **অধর্ম**—অধর্ম; **পথঃ**—মার্গ; **অস্য**—

তাঁর ; **পৃষ্ঠম্**—পৃষ্ঠ ; **কঃ**—ব্রহ্মা ; **তস্য**—তাঁর ; **মেঢ্রম্**—উপস্থ ; **বৃষণৌ**—অণ্ডকোষ ; **চ**—ও ; **মিত্রৌ**—মিত্রা-বরুণ ; **কুক্ষিঃ**—কোমর ; **সমুদ্রাঃ**—সমুদ্রসমূহ ; **গিরয়ঃ**—পর্বতসমূহ ; **অস্থি**—অস্থি ; **সঙ্ঘাঃ**—সমূহ।

অনুবাদ

লজ্জা তাঁর উপরের ওষ্ঠ, লোভ তাঁর অধর, ধর্ম তাঁর স্তন, অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি তাঁর শিশ্ন, মিত্রাবরুণ তাঁর অণ্ডকোষ দ্বয়, সমুদ্র সকল তাঁর কুক্ষি এবং পর্বত সমূহ তাঁর অস্থিরাজি।

তাৎপর্য

অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, যে কথা সমস্ত প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। তবে পুরুষ বা ব্যক্তি বলতে আমাদের যে ধারণা রয়েছে, তিনি তেমন নন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে ব্রহ্মা হচ্ছেন তাঁর শিশ্ন এবং মিত্রাবরুণ হচ্ছেন তাঁর দুটি অণ্ডকোষ। অর্থাৎ, একজন সবিশেষ পুরুষরূপে তিনি দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ পূর্ণ, তবে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ভিন্ন ধরনের এবং তাদের কার্যকলাপও ভিন্ন। তাই ভগবানকে যখন নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের অপূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তিত্বের মতো নয়। গিরি-পর্বত, সমুদ্র অথবা আকাশ ইত্যাদি দর্শনের মাধ্যমে, তাদের বিরাট পুরুষের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, তা অবিশ্বাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানস্বরূপ।

শ্লোক ৩৩

নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি
মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্যঃ শ্বসিতং মাতারিশ্বা
গতির্বয়ঃ কর্ম গুণপ্রবাহঃ ॥৩৩॥

নদ্যঃ—নদীসমূহ ; **অস্য**—তাঁর ; **নাড্যঃ**—নাড়ীসমূহ ; **অথ**—তারপর ; **তনূ-রুহাণি**—শরীরের রোম ; **মহী-রুহাঃ**—বৃক্ষসমূহ ; **বিশ্ব-তনোঃ**—বিশ্বরূপের ; **নৃপেন্দ্র**—হে রাজন্ ; **অনন্ত-বীর্যঃ**—সর্বশক্তিমানের ; **শ্বসিতম্**—শ্বাস ; **মাতরিশ্বা**—বায়ু ; **গতিঃ**—গতি ; **বয়ঃ**—বয়ঃক্রম ; **কর্ম**—কার্যকলাপ ; **গুণপ্রবাহঃ**—প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

হে রাজন্ ! নদীসমূহ সেই বিশ্বতনু বিরাট পুরুষের নাড়ী, বৃক্ষসমূহ তাঁর রোম, অনন্ত বিক্রম বায়ু তাঁর নিঃশ্বাস, কাল তাঁর গমন, এবং প্রকৃতির তিনগুণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাঁর দিব্য কার্যকলাপ।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড় পাথর নন, অথবা তিনি নিষ্ক্রিয় নন, যা কোন কোন সম্প্রদায়ের মূর্খ অনুগামীরা মনে করে থাকে। কালের গতিতে তিনি গমন করেন এবং তাই তিনি তাঁর বর্তমান কার্যকলাপের সাথে সাথে অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও পূর্ণরূপে অবগত। তাঁর অজানা কিছুই নেই। বদ্ধজীবেরা জড়া-প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়, যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভগবানের কার্যকলাপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১২) বলা হয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশনায় কেবল প্রকৃতির গুণসমূহ পরিচালিত হয়, এবং তাই কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়া অন্ধ নয় বা ঘটনাক্রমে ঘটে না। পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বাবধান হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের সংঘটনকারী শক্তি, এবং তাই ভগবান কখনও নিষ্ক্রিয় নন, যে কথা ভ্রান্তিবশত অনেকে মনে করে থাকে। বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের করণীয় কিছু নেই; ঠিক যেমন একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজে কিছু করেন না, তবে সব কিছুই তাঁর পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। তাই বলা হয়েছে যে ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত একটি তৃণও নড়ে না। ব্রহ্ম সংহিতায় (৫/৪৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং তাদের অধীশ্বর ব্রহ্মার স্থিতি হয় কেবল তাঁর একটি নিঃশ্বাসের কাল অবধি। এখানেও সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। যে বায়ুতে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকসমূহ স্থিত, তা কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিরাট পুরুষের নিঃশ্বাসের অংশমাত্র। তাই নদী, বৃক্ষ, বায়ু, কালচক্র ইত্যাদির অধ্যয়নের প্রভাবে ভগবানের নিরাকার ধারণার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা পরম সত্যের অব্যক্ত রূপের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কেবল অধিক থেকে অধিকতর ক্লেশই ভোগ করে; কিন্তু যে সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের সবিশেষ রূপের শরণাগত হন, তাঁদের জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৪

ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্
বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্যভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ
স চন্দ্রমাঃ সর্ববিকারকোশঃ ॥৩৪॥

ঈশস্য—পরম ঈশ্বরের ; **কেশান্**—মাথার চুল ; **বিদুঃ**—আমার কাছ থেকে জেনে রাখ ; **অম্বু-বাহান্**—জলবাহী মেঘ ; **বাসস্তু**—বসন ; **সন্ধ্যাম্**—দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ ; **কুরু-বর্য**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ; **ভূম্নঃ**—সর্বশক্তিমানের ; **অব্যক্তম্**—ভৌতিক সৃষ্টির আদি কারণ ; **আহুঃ**—বলা হয় ; **হৃদয়ম্**—বুদ্ধি ; **মনঃ চ**—এবং মন ; **সঃ**—তিনি ; **চন্দ্রমাঃ**—চন্দ্র ; **সর্ব-বিকার-কোশঃ**—সমস্ত পরিবর্তনের আধার।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জলবাহী মেঘ হচ্ছে তাঁর কেশদাম, সন্ধ্যা তাঁর বসন, জগৎ সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর বুদ্ধি এবং সমস্ত বিকারের আশ্রয়স্বরূপ চন্দ্রমা হচ্ছে তাঁর মন।

শ্লোক ৩৫

বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি
সর্বাত্মনোঽন্তঃকরণং গিরিত্রম্।
আশ্বাশ্বতর্যুষ্ট্রগজা নখানি
সর্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে ॥৩৫॥

বিজ্ঞান-শক্তিম্—চেতনা ; **মহিম্**—মহত্তত্ত্ব ; **আমনন্তি**—কথিত হয় ; **সর্ব-আত্মনঃ**—সর্বব্যাপ্ত ভগবানের ; **অন্তঃকরণম্**—অহঙ্কার ; **গিরিত্রম্**—রুদ্র (শিব) ; **অশ্ব**—ঘোড়া ; **অশ্বতরি**—খচ্চর ; **উষ্ট্র**—উট ; **গজাঃ**—হাতি ; **নখানি**—নখ ; **সর্বে**—অন্য সমস্ত ; **মৃগাঃ**—হরিণ ; **পশবঃ**—চতুষ্পদ ; **শ্রোণিদেশে**—কটিদেশে।

অনুবাদ

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে মহত্তত্ত্ব সেই সর্বব্যাপ্ত বিরাট পুরুষের চেতনা, এবং রুদ্রদেব তাঁর অহঙ্কার। অশ্ব, অশ্বতরি, উষ্ট্র, হস্তি প্রভৃতি তাঁর নখ, এবং সমস্ত চতুষ্পদ পশু তাঁর কটিদেশ।

শ্লোক ৩৬

বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং
মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ।
গন্ধর্ব বিদ্যাধরচারণাপ্সরঃ
স্বর স্মৃতীরসুরানীকবীর্যঃ ॥ ৩৬ ॥

বয়াংসি—বিভিন্ন প্রকার পক্ষী ; **তদ্ব্যাকরণম্**—শব্দাবলী ; **বিচিত্রম্**—শিল্প নৈপুণ্য ; **মনুঃ**—মানব কুলের পিতা ; **মনীষা**—বিচারবুদ্ধি ; **মনুজঃ**—মানবকুল (মনুপুত্রগণ) ; **নিবাসঃ**—আবাস ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব নামক মনুষ্যজাতি ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর ;

চারণ—চারণ ; **অপ্সরঃ**—অপ্সরা ; **স্বর**—সঙ্গীতাত্মক স্বর-লহরী ; **স্মৃতীঃ**—স্মৃতি ; **অসুর-অনীক**—আসুরী সৈনিক ; **বীর্যঃ**—শক্তি।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকার পাখীরা তাঁর বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য। মানবজাতির পিতা মনু তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রকাশ এবং মানবজাতি তাঁর আবাসস্থল। গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, অপ্সরা আদি উচ্চতর লোক নিবাসী মানুষেরা তাঁর সঙ্গীতাত্মক স্বরলহরী এবং আসুরিক সৈনিকেরা তাঁর শক্তি।

তাৎপর্য

ভগবানের সৌন্দর্যবোধ ময়ূর, টিয়া, কোকিল এবং অন্যান্য সমস্ত পাখীদের রঙ-বেরঙের শিল্প নিপুণ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আদি স্বর্গীয় মানবেরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে গান করার মাধ্যমে স্বর্গের দেবতাদের পর্যন্ত মোহিত করতে পারেন। তাঁদের সঙ্গীতের ছন্দ ভগবানের সঙ্গীতবোধ ব্যক্ত করে। তাহলে তিনি নিরাকার বা নির্বিশেষ হন কি করে ? তাঁর সঙ্গীত রুচি, শিল্প-নৈপুণ্য এবং বুদ্ধিমত্তা, যা সর্ব অবস্থাতেই অচ্যুত, তাঁর পরম পুরুষত্বের বিভিন্ন লক্ষণ। মনু-সংহিতা হচ্ছে মানব সমাজের আদর্শ আইনশাস্ত্র ; এবং সামাজিক জ্ঞান সমন্বিত এই মহান গ্রন্থটি অনুসরণ করার নির্দেশ প্রতিটি মানুষকে দেওয়া হয়েছে। মানব সমাজ হচ্ছে ভগবানের আবাসস্থল অর্থাৎ মানুষদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে জানা এবং ভগবানের সঙ্গ করা। মনুষ্য জন্ম পাওয়ার ফলে বদ্ধজীব তার শাশ্বত ভগবচ্চেতনা পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায় এবং তার ফলে তার জীবন সার্থক হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন অসুরকুলে ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি। কোন জীবই ভগবানের বিরাটরূপ থেকে বিচ্যুত নয়। প্রতিটি জীবেরই সেই বিরাটরূপের প্রতি বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। সেই বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন যখন ব্যাহত হয়, তখনই জীবেদের মধ্যে বৈষম্য সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জীবের মধ্যে এমনকি হিংস্র পশু এবং মানব সমাজের মধ্যেও পূর্ণ ঐক্য গড়ে ওঠে। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবদের মধ্যে সেই ঐক্য প্রদর্শন করেছিলেন, যেখানে বাঘ, হাতি এবং অন্যান্য সমস্ত হিংস্র জন্তুরাও পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তনে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করার এটিই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্লোক ৩৭

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা
বিড়ূরুরঙঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।

নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো
দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম বিতানযোগঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণগণ ; **আননম্**—মুখ ; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়গণ ; **ভুজঃ**—বাহু ; **মহাত্মা**—বিরাটপুরুষ ; **বিট্**—বৈশ্য ; **উরুঃ**—উরু ; **অঙ্ঘ্রি-শ্রিত**—তাঁর চরণের আশ্রয় ; **কৃষ্ণ-বর্ণঃ**—শূদ্রগণ ; **নানা**—বিবিধ ; **অভিধা**—নামের দ্বারা ; **অভীজ্য-গণ**—দেবতাগণ ; **উপপন্নঃ**—নিহিত ; **দ্রব্য-আত্মকঃ**—উপযোগী দ্রব্য সহ ; **কর্ম**—কার্যকলাপ ; **বিতান-যোগঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ সেই বিরাটপুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়গণ তাঁর বাহু, বৈশ্যগণ তাঁর উরুযুগল, কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণ তাঁর পদাশ্রিত। সমস্ত পূজনীয় দেবতারাও তাঁর অধস্তন, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে সেই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা।

তাৎপর্য

এখানে একপ্রকারে একেশ্বরবাদের প্রস্তাব করা হয়েছে। যদিও বৈদিকশাস্ত্রে বিভিন্ন নামে বহু দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি এই শ্লোকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে সেই সমস্ত দেব-দেবীরা পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে নিহিত রয়েছেন ; তাঁরা কেবল সেই পরম পূর্ণ পুরুষের বিভিন্ন অংশ। তেমনই মানব সমাজের বিভিন্ন বর্ণ বিভাগ, যথা ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান বর্ণ, ক্ষত্রিয় বা শাসকবর্গ, বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণী, সবই পরম ঈশ্বর ভগবানের দেহের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের সকলের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণত, যজ্ঞে ঘি এবং শস্য আহুতি দেওয়া হয়, কিন্তু কালের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভগবানের জড়া-প্রকৃতিপ্রসূত উপাদানগুলি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করেছে। তাই মানব সমাজকে অবশ্যই শিক্ষালাভ করতে হবে কিভাবে কেবল ঘি আহুতি দেওয়ার মাধ্যমেই নয়, পক্ষান্তরে অন্যান্য সমস্ত সামগ্রীও ভগবানের মহিমা কীর্তনে নিয়োগ করার মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পাদন করতে হয়। তার ফলে মানব সমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা অথবা ব্রাহ্মণেরা পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ অনুসারে এই যজ্ঞের নির্দেশ দিতে পারেন ; পরিচালকবর্গ সকলকে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সবরকম সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন ; বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যারা এই প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করেন, সেই যজ্ঞে নিবেদন করার জন্য এই সমস্ত বস্তু দান করতে পারেন ; এবং শূদ্রশ্রেণী এই প্রকার যজ্ঞের সাফল্যের জন্য তাদের শারীরিক শ্রম প্রদান করতে পারেন। এইভাবে মানব সমাজের সমস্ত বর্ণের সহযোগিতার ফলে এই যুগের উপযোগী

যে যজ্ঞ, ভগবানের নামকীর্তন করার সঙ্কীর্তন যজ্ঞ, সমগ্র জগতের সমস্ত মানুষদের কল্যাণ সাধনের জন্য সম্পাদন করা যেতে পারে।

শ্লোক ৩৮

ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য
যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।
সন্ধার্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥

ইয়ান্—এই সমস্ত; **অসৌ**—তা; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিগ্রহস্য**—রূপের; **যঃ**—যা কিছু; **সন্নিবেশঃ**—যেভাবে তারা অবস্থিত; **কথিতঃ**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; তে—তোমাকে; **সন্ধার্যতে**—একাগ্রতা সহকারে মনোনিবেশ করা যায়; **অস্মিন্**—এতে; **বপুষি**—বিরাটরূপের; **স্থবিষ্ঠে**—স্থূল পদার্থে; **মনঃ**—মন; **স্ব-বুদ্ধ্যা**—স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা; **ন**—না; **যতঃ**—তাঁকে অতিক্রম করে; **অস্তি**—আছে; **কিঞ্চিৎ**—অন্য কিছু।

অনুবাদ

এই বিরাট বিগ্রহের যে সমস্ত অবয়ব সংস্থান, সেসব আমি আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। মুক্তিকামী ব্যক্তিরা তাঁদের বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত স্থূল শরীরে তাঁদের মন একাগ্রী করেন, কেননা এই জড় জগতে তা ছাড়া আর কিছু নেই।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে জড়া-প্রকৃতি হচ্ছেন তাঁর আজ্ঞাপালনকারী দাসী। তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির একটি, এবং তিনি কেবল তাঁরই আদেশ অনুসারে কার্য করেন। পরমেশ্বর ভগবানরূপে তিনি কেবল জড়তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে প্রকৃতিতে বিকার শুরু হয় এবং ক্রমশ ছয় প্রকার পরিবর্তনরূপে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সমস্ত জড় সৃষ্টি এইভাবে কার্যকরী হয় এবং কালচক্রে কখনো তা প্রকট হয় এবং কখনো অপ্রকট হয়।

যে অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একজন মানুষের মতো তাঁর লীলা বিলাস করেন, অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মূঢ় মানুষেরা তা ধারণা করতে পারে না (ভঃ গীঃ ৯/১১)। তিনি যে এই জড় জগতে আমাদের একজনের মতো আবির্ভূত হন, সেটিও তাঁর বদ্ধ জীবদের প্রতি অহৈতুকী কৃপারই প্রকাশ। যদিও তিনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত, তথাপি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অন্তহীন কৃপার প্রভাবে তিনি অবতরণ করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। জড়বাদী দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক শক্তি এবং বিশ্বরূপের বিরাট পরিস্থিতির চিন্তায় অত্যন্ত মগ্ন, এবং চিন্ময়

অস্তিত্বের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত থেকে ভৌতিক জগতের বাহ্যিক ঘটনাবলীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য রূপ এই প্রকার জড় কার্যকলাপের সীমার অতীত, এবং ভগবান যে একস্থানে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বব্যাপ্ত, সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, কেননা জড়বাদী দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা কেবল তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সব কিছু অনুমান করতে চায়। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ স্বীকার করতে অক্ষম, তাই ভগবান কৃপা করে তাঁর অপ্রাকৃত রূপের বিরাট শরীর প্রদর্শন করেন, এবং এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবানের সেই রূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি চরমে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভগবানের এই বিরাট রূপের অতীত আর কিছু নেই। কোন জড়বাদী চিন্তাশীল মানুষই এই বিরাট রূপের ধারণার ঊর্ধ্বে যেতে পারেন না। জড়বাদী মানুষদের মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং তা নিরন্তর এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে পরিবর্তন করতে থাকে। তাই এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে মানুষ যেন তার বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভগবানের বিরাটরূপের কোন অঙ্গের কথা চিন্তা করে। মানুষ জড় জগতের যে কোন প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর কথা চিন্তা করতে পারে; যেমন অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র, মানুষ, পশু, দেবতা, পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি যে কোন রূপে। জড় জগতের প্রতিটি বস্তুই ভগবানের বিরাট রূপের এক-একটি অঙ্গ এবং তা জানার মাধ্যমে চঞ্চল মনকে ভগবানের চিন্তায় নিবদ্ধ করা যায়। ভগবানের শ্রীঅঙ্গের বিভিন্ন অংশের ধ্যান করার এই পন্থা ধীরে ধীরে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নাস্তিক্যভাবের নিরসন করে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ সাধন করবে। সব কিছুই পরম পূর্ণের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে পারমার্থিক মার্গের নবীন জিজ্ঞাসু ধীরে ধীরে ঈশোপনিষদের সেই শ্লোক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তা জানার ফলে ভগবানের শরীরের কোন অঙ্গের প্রতি অপরাধ না করার মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে। এই ভগবদ্ভাবনা মানুষের ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার গর্ব খর্ব করবে। এইভাবে সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অঙ্গের বিভিন্ন অংশ রূপে জানতে পেরে সব কিছুকেই শ্রদ্ধা করার শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ৩৯

স সর্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব
আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-ধী-বৃত্তি**—সবরকম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা উপলব্ধি করার পন্থা; **অনুভূত**—জ্ঞাত; **সর্বে**—সকলে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **যথা**—যতখানি;

স্বপ্ন-জন—স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি ; **ঈক্ষিত**—দর্শন করা হয়েছে ; **একঃ**—এক এবং অভিন্ন ; **তম্**—তাঁকে ; **সত্যম্**—পরম সত্য ; **আনন্দনিধিম্**—আনন্দের সমুদ্র ; **ভজেত**—আরাধ্য ; **ন**—কখনই না ; **অন্যত্র**—অন্যকিছু ; **সজ্জেত**—অনুরক্ত হওয়া ; **যতঃ**—যার দ্বারা ; **আত্মপাতঃ**—নিজের অধঃপতন।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানে মনকে একাগ্র করা, যিনি বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ঠিক যেমন মানুষ স্বপ্নে হাজার হাজার রূপ সৃষ্টি করে। সেই সর্বানন্দময় পরম সত্যেই কেবল মনকে একাগ্র করা উচিত, তা না হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মহান গোস্বামী শ্রীল শুকদেব কর্তৃক, ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণিত হয়েছে। তিনি আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা অনুশীলনের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত না হয়ে কেবল পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রচিত্ত হয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা এবং ভক্তি সহকারে তাঁর আরাধনা করাই একান্ত কর্তব্য। অধ্যাত্ম উপলব্ধির পন্থা নিত্য জীবন লাভের জন্য জড় জীবন-সংগ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো এবং তাই যোগী অথবা ভক্তকে মায়ার মোহিনী শক্তি প্রসূত বহু প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়, যা সেই নিত্য জীবন লাভের প্রয়াসী মহান যোদ্ধাকে পুনরায় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। যোগী তার যোগ অনুশীলনের প্রভাবে অণিমা, লঘিমাদি নানা প্রকার অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, যার দ্বারা তিনি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অথবা লঘু থেকে লঘুতর হতে পারেন, বা সাধারণ বিচারে কামিনী, কাঞ্চনাদি নানা প্রকার জড় ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন। তবে সেই সমস্ত প্রলোভনের দ্বারা বিমোহিত না হতে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়, যাতে তিনি এই প্রকার অলীক সুখের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অধঃপতিত না হন এবং জড় জগতের বন্ধনে আবার আবদ্ধ না হয়ে পড়েন। এই সাবধানবাণী অনুসারে মানুষকে তার জাগরূক বুদ্ধিরই কেবল অনুসরণ করা উচিত।

পরমেশ্বর ভগবান এক হলেও তাঁর প্রকাশ অনেক। তাই তিনি সব কিছুরই পরমাত্মা। কেউ যখন কোন কিছু দেখে, তখন তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তার দেখাটি গৌণ এবং ভগবানের দেখাটি হচ্ছে মুখ্য। ভগবান যদি প্রথমে না দেখেন তাহলে কারও পক্ষেই কোন কিছু দেখা সম্ভব নয়। এটিই বেদ এবং উপনিষদের উপদেশ। তাই আমরা যা কিছু দেখি বা করি,সেই দর্শন অথবা কর্মের পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান। আত্মা এবং পরমাত্মার যুগপৎ একত্ব এবং পার্থক্যের এই সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব-দর্শনের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপে জড় জগতের সমস্ত বস্তু অন্তর্ভুক্ত, এবং তাই ভগবানের বিরাটরূপ সমস্ত

চেতন এবং অচেতন বস্তুর পরমাত্মা। বিরাটরূপ নারায়ণ অথবা বিষ্ণুরই প্রকাশ। এইভাবে ক্রমশ অগ্রসর হলে অবশেষে আমরা দেখতে পাব যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর পরমাত্মা। সেই সূত্রে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে সকলেরই কর্তব্য নির্দ্বিধায় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যুক্ত হওয়া, অথবা নারায়ণ প্রমুখ তাঁর অংশের আরাধনা করা ; অন্য কারও আরাধনা করার প্রয়োজন নেই। বৈদিক স্তোত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জড়া প্রকৃতির প্রতি নারায়ণের ঈক্ষণের প্রভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা অথবা শিব ছিলেন না, অতএব অন্যের কি কথা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য নিশ্চিতভাবে স্বীকার করেছেন যে, নারায়ণ জড় সৃষ্টির অতীত এবং অন্য সকলেই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই জড় সৃষ্টি যুগপৎ নারায়ণের সঙ্গে এক এবং ভিন্ন। এই মতবাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব সমর্থন করে। নারায়ণের দৃষ্টিশক্তি সম্ভূত বলে এই জড় সৃষ্টি তাঁর থেকে অভিন্ন। কিন্তু যেহেতু এটি তাঁর বহিরঙ্গা মায়া শক্তির ক্রিয়া এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি আত্মমায়া থেকে পৃথক, তাই এই জড় সৃষ্টি তাঁর থেকে ভিন্ন। এই শ্লোকে স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তির যে তুলনাটি দেওয়া হয়েছে, সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ স্বপ্নে বহু কিছু সৃষ্টি করে, এবং সেই স্বপ্নে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে এবং স্বপ্নের পরিণামের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই জড় সৃষ্টিও ঠিক একটি স্বপ্নের মতো ভগবানের সৃষ্টি, তবে পরমাত্মা হওয়ার ফলে, তিনি কখনো এই স্বপ্নবৎ সৃষ্টির বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন না অথবা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব কিছু এবং কোন কিছুই তাঁর থেকে পৃথক নয়। তাই তাঁর বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে একাগ্র চিত্তে তাঁরই কেবল ধ্যান করা উচিত, তা না হলে জড় সৃষ্টির শক্তির দ্বারা একে একে অবশ্যই পরাভূত হতে হবে। সে কথা ভগবদ্গীতায় (৯/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ

সর্বভূতানি কৌন্তেয়
প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্প-ক্ষয়ে পুনস্তানি
কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥

"হে কুন্তীপুত্র, কল্পান্তে প্রত্যেক ভৌতিক বস্তু আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী কল্পের শুরুতে আমার শক্তির দ্বারা আমি পুনরায় সৃষ্টি করি।"

মনুষ্য জীবন হচ্ছে এই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের আবর্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি অবসর। এইটি এমনই একটি মাধ্যম, যার দ্বারা মানুষ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে প্রবেশ করতে পারে।

ইতি "ভগবৎ উপলব্ধির শুভারম্ভ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং পুরা ধারণয়াত্মযোনি-
র্নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য তুষ্টাৎ।
তথা সসর্জেদমমোঘদৃষ্টি-
র্যথাপ্যয়াৎ প্রাগ্ ব্যবসায়বুদ্ধিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন ; **এবম্**—ঠিক এইভাবেই ; **পুরা**—বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে ; **ধারণয়া**—এই প্রকার ধারণার দ্বারা ; **আত্ম-যোনিঃ**—ব্রহ্মার ; **নষ্টাম্**—বিনষ্ট ; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি ; **প্রত্যবরুধ্য**—পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হয়ে ; **তুষ্টাৎ**—ভগবানকে প্রসন্ন করার ফলে ; **তথা**—তারপর ; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন ; **ইদম্**—এই জড় জগৎ ; **অমোঘ-দৃষ্টিঃ**—যিনি স্পষ্ট দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছেন ; **যথা**—যেমন ; **অপ্যয়াৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন ; **প্রাক্**—পূর্বের মতো ; **ব্যবসায়**—সুনিশ্চিত ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বিরাট রূপের ধ্যান করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে তাঁর লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, এবং এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে তার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মার বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের প্রকৃতির একটি গুণের অবতার। জড়া প্রকৃতির রজোগুণের অবতার হওয়ার ফলে তিনি এই সুন্দর জড় জগতকে প্রকাশ করার জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। তথাপি অসংখ্য জীবের মধ্যে একজন হওয়ার ফলে তিনি তাঁর সৃজনাত্মক শক্তির কথা ভুলে যেতে পারেন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবেরই ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু ভগবানের বিরাটরূপের ধ্যান করার মাধ্যমে সেই প্রবণতা প্রতিহত করা

সম্ভব। মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে সেই সুযোগ পাওয়া যায়, এবং কোন মানুষ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ অনুসরণ করেন এবং ভগবান বিরাটরূপের ধ্যান করতে শুরু করেন, তা হলে তাঁর শুদ্ধ চেতনার পুনর্জাগরণ হবে। আর তখন ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার প্রবণতাও প্রতিহত হবে। যখন বিস্মৃতি দূর হয়, তৎক্ষণাৎ ব্যবসায়-বুদ্ধির (নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি) উদয় হয়, যে সম্বন্ধে এখানে এবং ভগবদ্গীতায় (২/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে। জীবের এই জ্ঞান উদয়ের ফলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, যা প্রতিটি জীবেরই পরম প্রয়োজন। ভগবদ্ধাম অন্তহীন; তাই সেখানে ভগবানের সহকারীও অনন্ত। ভগবদ্গীতায় (১৩/১৪) বলা হয়েছে যে, ভগবানের হাত, পা, চক্ষু এবং মুখ তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবেরা তাঁর সহায়ক এবং তাদের সকলেরই কর্তব্য বিশেষভাবে ভগবানের সেবা করা। বদ্ধ জীবে, এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই অহংকার-প্রসূত মায়ার মোহিনী শক্তির প্রভাবে সে কথা ভুলে যায়। ভগবৎ চেতনার উন্মেষের ফলে এই অহংকার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মুক্তি শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিস্মৃতির সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া, যা এখানে ব্রহ্মার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মার এই সেবা মুক্ত অবস্থায় সেবার দৃষ্টান্ত, যা ভ্রান্তিপূর্ণ এবং বিস্মৃতিতে পূর্ণ তথাকথিত পরোপকারের সেবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুক্তি কখনোই নিষ্ক্রিয় নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে ত্রুটিবিহীন সেবা।

শ্লোক ২

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা
যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্
মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ ২ ॥

শাব্দস্য—বৈদিক ধ্বনির; **হি**—অবশ্যই; **ব্রহ্মণঃ**—বেদ সমূহের; **এষঃ**—এই সমস্ত; **পন্থাঃ**—মার্গ; **যৎ**—যা; **নামভিঃ**—বিভিন্ন নামের দ্বারা; **ধ্যায়তি**—ধ্যান করা হয়; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **অপার্থৈঃ**—অর্থহীন ধারণার দ্বারা; **পরিভ্রমন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **তত্র**—সেখানে; **ন**—কখনই না; **বিন্দতে**—উপভোগ করে; **অর্থান্**— বাস্তব; **মায়া-ময়ে**—মোহময়ী বস্তুতে; **বাসনয়া**—বিভিন্ন বাসনার দ্বারা; **শয়ানঃ**— যেন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছে।

অনুবাদ

বৈদিক ধ্বনির দ্বারা প্রদর্শিত পথ এতই মোহময়ী যে, মানুষের বুদ্ধি স্বর্গ আদি অর্থহীন বিষয়ে ধাবিত হয়। বদ্ধ জীব স্বর্গলোকে অলীক সুখভোগের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত স্থানে সে কোনরকম প্রকৃত সুখ আস্বাদন করতে পারে না।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব সর্বদাই জড় জগতে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত সুখভোগের নানা প্রকার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। এই পৃথিবীতে, যেখানে সে প্রকৃতির সম্পদগুলি যথাসাধ্য শোষণ করেছে, সেখানকার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়া সত্ত্বেও সে সন্তুষ্ট নয়। সে চন্দ্রলোকে অথবা শুক্রলোকে যেতে চায় সেখানকার সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু ভগবান ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য গ্রহের এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের সারহীনতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে। কিন্তু তাদের কোনটিই জড় অস্তিত্বের মুখ্য ক্লেশসমূহ অর্থাৎ জন্মের ক্লেশ, মৃত্যুর ক্লেশ, বার্ধক্যের ক্লেশ এবং ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত নয়। ভগবান বলেছেন যে, সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকও উপরোক্ত জড় দুঃখ-দুর্দশাগুলির জন্য সুখে বসবাস করার উপযুক্ত স্থান নয়, তা হলে স্বর্গলোক আদি অন্যান্য লোকের কি কথা! বদ্ধ জীবেরা কর্মের কঠিন আইনের অধীনে, এবং সেই কর্মের প্রভাবে তারা কখনো ব্রহ্মলোকে যায়, আবার কখনো পাতাল-লোকে যায়, ঠিক যেমন একটি অবোধ শিশু নাগরদোলায় চড়ে কখনো উপরে ওঠে এবং কখনো নীচে নামে। প্রকৃত আনন্দ রয়েছে ভগবদ্ধামে, যেখানে কাউকেই জড় অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয় না। তাই বৈদিক শাস্ত্রের কর্মকাণ্ডে যে সকাম কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা জীবের পক্ষে ভ্রান্তিজনক। মানুষ দেশ-দেশান্তরে অথবা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উন্নততর জীবনের আশা করে, কিন্তু এই জড় জগতের কোথাও তার জীবনের প্রকৃত বাসনা, অর্থাৎ নিত্য জীবন, পূর্ণজ্ঞান, এবং পূর্ণ আনন্দ সে লাভ করতে পারে না। পরোক্ষভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রতিপন্ন করছেন যে তাঁর জীবনের অন্তিম সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ যেন তথাকথিত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা না করেন, পক্ষান্তরে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। জড় জগতের কোন গ্রহলোকই, এবং জীবন ধারণের জন্য সেখানকার সুযোগ সুবিধাগুলি চিরস্থায়ী নয়; তাই সেই সমস্ত অনিত্য সুখ ভোগের ব্যাপারে বাস্তবিক অনিচ্ছা পোষণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩

অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ
স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র
পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥ ৩ ॥

অতঃ—সেই কারণে; **কবিঃ**—তত্ত্বজ্ঞানী; **নামসু**—নামমাত্র; **যাবৎ**—ন্যূনতম; **অর্থঃ**—আবশ্যকতা; **স্যাৎ**—হবে; **অপ্রমত্তঃ**—তাদের প্রতি প্রমত্ত না হয়ে; **ব্যবসায়-**

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধিমত্তা সহকারে স্থিত হয়ে; **সিদ্ধে**—সাফল্য লাভের জন্য; **অন্যথা**—অন্যথা; **অর্থে**—উদ্দেশ্যে; **ন**—কখনোই উচিত নয়; **যতেত**—প্রয়াস করে; **তত্র**—সেখানে; **পরিশ্রমম্**—কঠোর পরিশ্রম; **তত্র**—সেখানে; **সমীক্ষমাণঃ**—ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যিনি দর্শন করেন।

অনুবাদ

অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপাধিসমন্বিত এই জগতে কেবল ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলির জন্য প্রয়াস করবেন। তাঁর কর্তব্য বুদ্ধিমত্তা সহকারে স্থির হওয়া এবং কখনো অবাঞ্ছিত বস্তুর জন্য কোন রকম প্রয়াস না করা, কেননা তিনি ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল অর্থহীন পরিশ্রম মাত্র।

তাৎপর্য

ভাগবদ্ধর্ম বা শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শিত পন্থা সকাম কর্মের পন্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক; ভগবদ্ভক্তেরা সকাম কর্মের পন্থাকে কেবল সময়ের অনর্থক অপচয় বলে মনে করেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, তথা সমগ্র জড় জগৎ কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার পরিকল্পনায় আবর্তিত হচ্ছে, যদিও সকলেই দেখতে পায় যে, এই জগতে কারও অস্তিত্বই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় অথবা নিরাপদ নয়; জীবনের কোন অবস্থাতেই মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় অথবা নিরাপদ হতে পারে না। যারা অলীক জড় সভ্যতার মোহময়ী প্রগতির দ্বারা মোহিত, তারা অবশ্যই উন্মাদ। জড় সৃষ্টি কেবল নামের ভোজবাজি; প্রকৃতপক্ষে, তা কেবল মাটি, জল, আগুন ইত্যাদি জড় পদার্থের বিভ্রান্তিকর সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। বাড়িঘর, আসবাবপত্র, গাড়ি, কলকারখানা, শান্তি, যুদ্ধ, এমন কি জড় বিজ্ঞানের সর্বোত্তম সাফল্য, যথা আণবিক শক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স্, এসবই প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে উদ্ভূত জড় উপাদানগুলির বিভ্রান্তিকর নাম মাত্র। যেহেতু ভগবানের ভক্তেরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই তারা সমুদ্রের তরঙ্গে বুদ্‌বুদের মতো নগণ্য অবাস্তব বস্তুসমূহের দ্বারা অবাঞ্ছিত বিষয় সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহী নন। মহান রাজা, নেতা এবং সৈনিকেরা ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কালের প্রভাবে ইতিহাসের আর একটি যুগকে স্থান দেওয়ার জন্য তারা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা যে প্রবহমান কালের কিরকম অর্থহীন উৎপাদন, সে সম্বন্ধে ভক্তরা উপলব্ধি করতে পারেন। সকাম কর্মীরা প্রভূতভাবে ধন-সম্পদ স্ত্রী-রত্ন এবং জাগতিক যশ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু যারা বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের এই সমস্ত অলীক বস্তুর প্রতি কোন রকম আগ্রহ নেই। তাঁদের কাছে তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। যেহেতু মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষণই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করা।

মানব জীবনের এক মুহূর্তও যদি জড় জগতের সুখ ভোগের পরিকল্পনায় নষ্ট করা হয়,তা হলে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তা ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই মায়ার বন্ধন থেকে বা জীবনের মোহময়ী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক অধ্যাত্মবাদীকে এখানে সর্তক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন সকাম কর্মের বাহ্যিক রূপে মোহিত না হন। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা কখনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয় ; মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আত্ম-উপলব্ধি করাই হচ্ছে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সভ্যতা এই পরম সিদ্ধিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে, তা কখনো অর্থহীন বস্তু তৈরির কাজে লিপ্ত হয় না, এবং সেই প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা মানুষকে কেবল জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি গ্রহণ করতে শেখায়, বা খারাপ সওদার সর্বোত্তম উপযোগ করার সিদ্ধান্ত পালন করার ব্যাপারে প্রস্তুত করে। আমাদের জড় দেহ এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আমাদের জীবন হচ্ছে একটি খারাপ সওদা, কেননা প্রকৃতপক্ষে জীব হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, এবং পারমার্থিক প্রগতি হচ্ছে জীবের পরম প্রয়োজন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য উদ্দেশ্যে শক্তির অপচয় না করে ও জড় সুখভোগের প্রতি উন্মত্ত না হয়ে ভগবানের দানের উপর নির্ভরশীল থেকে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা। জড় সভ্যতার প্রগতিকে বলা হয় "আসুরিক সভ্যতা", যা পরিণামে যুদ্ধ এবং অভাবে পর্যবসিত হয়। পরমার্থবাদীদের এখানে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের মনকে স্থির করেন যাতে উচ্চতর চিন্তাধারা সমন্বিত সরল জীবন যাপনেও যদি প্রতিকূলতা আসে, তা হলেও যেন তাঁরা তাঁদের দৃঢ় সংকল্প থেকে একটুও বিচলিত না হন। জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে আত্মহত্যার পন্থা, কেননা এই প্রকার পন্থা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। অধ্যাত্মবাদীদের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃত মুক্তির অভিলাষী ব্যক্তিদের সাহায্য করা এবং মুক্তির উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করা। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন একজন মহান রাজা রূপে রাজ্য শাসন করছিলেন, তখন শুকদেব গোস্বামী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। অধ্যাত্মবাদীদের কার্যকলাপ পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।

সত্যাঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ৪ ॥

সত্যাম্—অধিকারে থাকতে ; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীর ভূমি ; **কিম্**—কি প্রয়োজন ; **কশিপোঃ**—শয্যা ; **প্রয়াসৈঃ**—প্রয়াস করা ; **বাহৌ**—বাহুদ্বয় ; **স্ব-সিদ্ধে**—আত্মনির্ভরশীল হয়ে ; **হি**—অবশ্যই ; **উপবর্হণৈঃ**—শয্যা এবং উপাধান ; **কিম্**—কি প্রয়োজন ; **সতি**—উপস্থিত থাকতে ; **অঞ্জলৌ**—হাতের তালু ; **কিম্**—কি প্রয়োজন ; **পুরুধা**—বিভিন্ন প্রকাব ; **অন্ন**—আহার্য ; **পাত্র্যা**—পাত্রের ; **দিক্**—উন্মুক্ত স্থান ; **বল্কল-আদৌ**—গাছের ছাল ; **সতি**—থাকতে ; **কিম্**—কি প্রয়োজন ; **দুকূলৈঃ**—বস্ত্র।

অনুবাদ

ভূমিরূপ শয্যা থাকতে শয়নের জন্য খাট এবং পালঙ্কের কি প্রয়োজন ? বাহু থাকতে উপাধানের কি প্রয়োজন ? আর যখন অঞ্জলি বর্তমান, তখন বহুমূল্য পাত্রেরই বা কি প্রয়োজন ? দিক্ ও বৃক্ষ বল্কলাদি থাকতে বস্ত্রের কি প্রয়োজন ?

তাৎপর্য

দেহরক্ষার জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি অনর্থক বৃদ্ধি করা উচিত নয়। এই প্রকার মায়িক সুখের অন্বেষণে মানবশক্তি অর্থহীনভাবে নষ্ট হয়। যদি মেঝেতে শয়ন করা যায়, তা হলে সুন্দর পালঙ্কের অথবা নরম গদির অন্বেষণ করে কি লাভ ? মানুষ যদি উপাধান ব্যবহার না করে প্রকৃতির দেওয়া তার নরম বাহুর আশ্রয়ে বিশ্রাম করতে পারে, তা হলে উপাধানের অন্বেষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা যদি পশুদের জীবন পর্যালোচনা করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, বড় বাড়ি, আসবাবপত্র, এবং অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রী তৈরি করার বুদ্ধি তাদের নেই, কিন্তু তবুও খোলা আকাশের নীচে শয়ন করে তারা সুস্থ জীবন যাপন করে। তারা জানে না কিভাবে রান্না করতে হয়, তথাপি তারা অনায়াসে মানুষদের থেকে অধিক সুস্থ জীবন যাপন করে। তার অর্থ এই নয় যে, মানব সভ্যতা পশু জীবনে ফিরে যাবে অথবা কোন রকম সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং নীতিবোধবিহীন হয়ে মানুষেরা নগ্ন হয়ে জঙ্গলে বাস করবে। বুদ্ধিমান মানুষ কখনও পশুর মতো জীবন যাপন করতে পারে না ; পক্ষান্তরে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, কাব্য এবং দর্শনে তার বুদ্ধিমত্তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা। এইভাবে মানুস মানব সভ্যতার প্রগতি সাধন করতে পারে। কিন্তু এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যে ধারণাটি প্রদান করেছেন, সেটি হচ্ছে পশুদের থেকে অনেক উন্নত মানুষের সংরক্ষিত শক্তি কেবল আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্যই ব্যবহার করা উচিত। মানব সভ্যতার প্রগতির লক্ষণ হওয়া উচিত ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, কেননা মানব ব্যতীত অন্য কোন জীবনে তা সম্ভব নয়। আকাশ-কুসুম

সদৃশ জড় জগতের নিরর্থকতা সম্বন্ধে মানুষের যথাযথভাবে অবগত হওয়া উচিত, এবং তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুদর্শার সমাধান করা।

ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে চাকচিক্যপূর্ণ পাশবিক সভ্যতার প্রগতিতে আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকা একটি মস্ত বড় ভ্রম, এবং এই প্রকার 'সভ্যতাকে' সভ্যতা বলা যায় না। এই প্রকার অর্থহীন কার্যকলাপের ফলে মানুষ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। পুরাকালে মহান্ মুনি-ঋষিরা সুন্দর আসবাবপত্র এবং জীবনের সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ প্রাসাদোপম গৃহে বাস করতেন না, তাঁরা পর্ণকুটিরে অথবা উপবনে বাস করতেন এবং ভূমিতে উপবেশন করতেন, তথাপি তাঁরা সর্বতোভাবে পূর্ণ জ্ঞানের অন্তহীন ভাণ্ডার রেখে গেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজমন্ত্রী, কিন্তু তাঁরা এক-একটি বৃক্ষের নীচে এক-একটি রাত্রি যাপন করে অপ্রাকৃত জ্ঞানের এক অন্তহীন রচনা-ভাণ্ডার রেখে গেছেন। সুন্দর আসবাবপত্রে সজ্জিত এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ গৃহে বাস করা তো দূরের কথা, তাঁরা একটি গাছের নীচে দুই রাত্রি পর্যন্ত থাকতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী আমাদের দিয়ে গেছেন। জীবনের তথাকথিত সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার প্রগতির অনুকূল নয়; পক্ষান্তরে তারা এই প্রগতিশীল জীবনের প্রতিবন্ধক। চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মের প্রথায় জীবনের সুখময় সমাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রথার অনুশীলনকারী ব্যক্তি তাঁর জীবনের বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। কেউ যদি জীবনের শুরু থেকেই ত্যাগ এবং নিঃস্বার্থের জীবন যাপনে অভ্যস্ত না হন, তবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নির্দেশ অনুসারে তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তা অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত, তা হলে তা ঈপ্সিত সাফল্য লাভের সহায়ক হবে।

শ্লোক ৫

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্ ॥ ৫ ॥

চীরাণি—জীর্ণবস্ত্র; **কিম্**—কি; **পথি**—পথে; **ন**—না; **সন্তি**—হয়; **দিশন্তি**—দান করা হয়; **ভিক্ষাম্**—ভিক্ষা; **ন**—না; **এব**—ও; **অঙ্ঘ্রিপাঃ**—বৃক্ষ; **পরভৃতঃ**—যিনি অন্যদের পালন করেন; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **অপি**—ও; **অশুষ্যন**—শুকিয়ে গেছে; **রুদ্ধাঃ**—বন্ধ; **গুহাঃ**—গুহা; **কিম্**—কি; **অজিতঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **অবতি**—রক্ষা করেন; **ন**—না; **উপসন্নান্**—শরণাগতকে; **কস্মাৎ**—তা হলে কেন;

ভজন্তি—তোষামোদ করা হয়; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ব্যক্তি; **ধন**—ঐশ্বর্য; **দুর্মদান্ধান্**—অত্যন্ত প্রমত্ত।

অনুবাদ

পথে কি কোন জীর্ণ বস্ত্র পড়ে নেই? অন্যদের পালন করার জন্য যাদের অস্তিত্ব, সেই বৃক্ষরা কি আর ভিক্ষা দান করছে না? নদীগুলি কি শুকিয়ে গেছে, যার ফলে তারা আর তৃষ্ণার্তকে জলদান করছে না? পর্বতের গুহাগুলি কি রুদ্ধ হয়ে গেছে, এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান ভগবান কি শরণাগতকে আর রক্ষা করছেন না? তা হলে জ্ঞানবান মুনিঋষিরা কেন ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ এবং প্রমত্ত ব্যক্তিদের তোষামোদ করতে যায়?

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রম ভিক্ষা করার জন্য বা পরজীবীর মতো অন্যের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করার জন্য নয়। অভিধানের সংজ্ঞা অনুসারে পরজীবী হচ্ছে একজন মোসাহেব, যে সমাজের জন্য কিছুই না করে কেবল সমাজকে শোষণ করার মাধ্যমে নিজের জীবন যাপন করে। সন্ন্যাস আশ্রমের উদ্দেশ্য সমাজের উন্নতিকল্পে সমাজকে কিছু দেওয়া, গৃহস্থদের রোজগারের উপর নির্ভর করা নয়। প্রকৃতপক্ষে, গৃহস্থদের কাছ থেকে প্রকৃত সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণ করার যে ব্যবস্থা, সেটি দাতার প্রকৃত লাভের জন্য মহাজনেরা করে গেছেন। সনাতন ধর্ম-ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাদান করা গৃহস্থদের একটি কর্তব্য, এবং শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহস্থরা যেন সন্ন্যাসীদের তাঁদের পরিবারের শিশুদের মতো মনে করেন এবং তাঁরা না চাইতেই যেন তাঁদের অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদির সংস্থান করেন। তাই শ্রদ্ধালু গৃহস্থদের দান করার যে প্রবণতা রয়েছে, তার সুযোগ নেওয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীদের উচিত নয়। সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত ব্যক্তিদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রচনাবলী দান করা। শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈরাগ্যময় জীবনের সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল বৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে (যেখানে শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যেখানে শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর সমাধি মন্দির রয়েছে) সকলে মিলিত হয়ে পরমার্থ সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী করা।

সমগ্র মানব সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন। তেমনই, সমস্ত আচার্যগণ, যাঁরা স্বেচ্ছায় ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানব সমাজের যথার্থ মঙ্গল সাধন করা, পরমুখাপেক্ষী হয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন আরামের জীবন যাপন করা নয়। আর যারা সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য কিছু দান করতে পারে না, তাদের কেবল

অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য গৃহস্থদের কাছে গিয়ে তারা যদি অন্ন ভিক্ষা করে, তা হলে সমাজের এই সর্বোচ্চ আশ্রমের অপমান করা হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই সাবধানবাণী বিশেষ করে সেই সমস্ত ভিক্ষুকদের জন্য দিয়েছেন, যারা তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য এই বৃত্তি অবলম্বন করে ; কলিযুগে এই প্রকার ভিক্ষুকদের সংখ্যা অগণিত। স্বেচ্ছায় অথবা পরিস্থিতির বশে যেভাবেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা হোক না কেন, পরমেশ্বর ভগবান যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমস্ত জীবের পালন কর্তা, সে সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় হৃদয়ে পোষণ করা একান্ত কর্তব্য। ভগবান যদি সকলেরই পালনকর্তা হন, তা হলে যে শরণাগত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন, তাঁর পালনে কেন তিনি অবহেলা করবেন? একজন সাধারণ মানুষ তার ভৃত্যের সমস্ত প্রয়োজন জোগান দিয়ে থাকেন,তা হলে সর্বশক্তিমান ও সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবান যে তাঁর পূর্ণ শরণাগত ভক্তের অভাব কিভাবে মোচন করবেন তা তো সহজেই অনুমান করা যায়।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, ত্যাগী ভক্ত কারও কাছে না চেয়ে কেবলমাত্র কৌপীন ধারণ করবেন। তিনি পথে পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র থেকে সেটি সংগ্রহ করেন। যখন তিনি ক্ষুধার্ত হন, তখন তিনি ফল বর্ষণকারী কোন উদারাশয় বৃক্ষের কাছে যেতে পারেন, এবং তৃষ্ণার্ত হলে তিনি কোন স্রোতস্বিনীর জল পান করতে পারেন। আরামদায়ক গৃহে বাস করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, কোন হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভীত না হয়ে পর্বতের গুহায় বাস করতে পারেন। ভগবান ইচ্ছা করলে তাঁর ভক্তকে বিরক্ত না করার জন্য ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তুদের নির্দেশ দিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত হরিদাস ঠাকুর এমনই একটি গুহাতে বাস করতেন এবং ঘটনাক্রমে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পও সেই গুহায় বাস করত। হরিদাস ঠাকুরের গুণমুগ্ধ কয়েকজন ভক্ত, যাঁরা প্রতিদিন হরিদাস ঠাকুরের কাছে যেতেন, সেই সাপের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা হরিদাস ঠাকুরকে অনুরোধ করেন সেই গুহাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে। যেহেতু তাঁর ভক্তরা সেই সাপের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, তাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁদের সেই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু যে মুহূর্তে হরিদাস ঠাকুর সেই গুহাটি ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই সাপটি সকলের সমক্ষে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে চিরকালের জন্য সেই গুহাটি ছেড়ে চলে যায়। ভগবানের নির্দেশে, যিনি সেই সাপটির হৃদয়েও বিরাজমান, সেই সাপটি স্থির করেছিল যেন হরিদাস ঠাকুর সেই গুহাতে থাকেন, এবং সেজন্য তাঁকে বিরক্ত না করে সে নিজেই সেই গুহাটি ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করেছিল। হরিদাস ঠাকুরের মতো আদর্শ ভক্তকে ভগবান যে কিভাবে রক্ষা করেন, এটি তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সনাতন ধর্মের বিধান অনুসারে মানুষ প্রথম থেকেই শিক্ষা লাভ করে কিভাবে সর্ব অবস্থায় ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। বৈরাগ্যময় জীবন তাঁদেরই গ্রহণ করা উচিত, যাঁরা পূর্ণরূপে সিদ্ধ এবং পবিত্র। ভগবদ্গীতায় (১৬/৫) এই আশ্রমকে দৈবী-সম্পৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের দৈবী সম্পৎ বা পারমার্থিক সম্পত্তি সংগ্রহ করার আবশ্যকতা রয়েছে, তা না হলে তার বিপরীত সম্পত্তি, অর্থাৎ আসুরী-সম্পৎ তাকে পরাজিত করবে এবং তাকে তখন সংসারের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হতে হবে। সন্ন্যাসীর সর্বদা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা উচিত এবং নির্ভীক হওয়া উচিত। তার একলা থাকতে কখনো ভয় পাওয়া উচিত নয়, যদিও সে কখনই একলা নয়। ভগবান সকলের হৃদয়েই বাস করেন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বিধি-নিয়মের নির্দিষ্ট পন্থা অনুশীলনের দ্বারা শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে একাকীত্ব অনুভব করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে, তখন তাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হয় ; তার ফলে সে তখন সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে এবং তখন আর তার কোনও ভয় থাকে না (যেমন একলা থাকার ভয়)।

প্রত্যেকেই নির্ভীক এবং সৎ হতে পারেন, যদি জীবনের প্রতিটি আশ্রমের বিধি-নিষেধগুলি যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে তার অস্তিত্ব পবিত্র হয়। বৈদিক নির্দেশ শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করার মাধ্যমে এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে বৈদিক জ্ঞানের সার হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মানুষ তার নিত্য কর্তব্যে স্থির হতে পারে।

শ্লোক ৬

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে ; **স্বচিত্তে**—নিজের হৃদয়ে ; **স্বতঃ**—তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **সিদ্ধঃ**—পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করা ; **আত্মা**—পরমাত্মা ; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয় ; **অর্থঃ**—বস্তু ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **অনন্তঃ**—নিত্য অন্তহীন ; **তম্**—তাঁকে ; **নির্বৃতঃ**—সংসারে বিরক্ত হয়ে ; **নিয়ত**—স্থায়ী ; **অর্থঃ**—পরম লাভ ; **ভজেত**—আরাধনা করা কর্তব্য ; **সংসার-হেতু**—বদ্ধ অবস্থার কারণ ; **উপরমঃ**—সমাপ্তি ; **চ**—অবশ্যই ; **যত্র**—যাতে।

অনুবাদ

এইভাবে স্থির হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সেবা করা কর্তব্য। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান, নিত্য এবং অন্তহীন,

তিনিই জীবনের পরম লক্ষ্য এবং তাঁর আরাধনার ফলে মানুষ সংসারের হেতুরূপা অবিদ্যাকে দূর করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা। তাই যিনি যোগী তিনি কেবল তাঁরই আরাধনা করতে পারেন, কেন না তিনি অলীক নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন বাস্তব বস্তু। প্রতিটি জীবই কারও না কারও সেবায় যুক্ত। জীবের স্বরূপগত বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। কিন্তু সে যখন মায়ার দ্বারা প্রভাবিত থাকে অথবা বদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সে মায়ার সেবা করতে চায়। বদ্ধ জীব তার অনিত্য দেহের সেবায়, স্ত্রী, পুত্র আদি দেহ সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনদের সেবায়, এবং গৃহ, ভূমি, ধন-সম্পদ, সমাজ,দেশ ইত্যাদি দেহ এবং দেহ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সর্বদা যুক্ত থাকে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে, তার এই সমস্ত সেবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে মায়িক। পূর্বে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি যে, এই জড় জগৎ হচ্ছে মরুভূমির মরীচিকার মতো অলীক। মরুভূমিতে মরীচিকাকে জল বলে ভ্রম হয়, এবং নির্বোধ পশু সেই ভ্রমের শিকার হয়ে তার পেছনে ধাবিত হয়, যদিও সেখানে কোন জলই নেই। মরুভূমিতে জল নেই ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জল নামক বস্তুটি কোথাও নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে কোথাও না কোথাও জল অবশ্যই রয়েছে, সমুদ্রে এবং মহাসাগরে জল রয়েছে, কিন্তু সেই প্রকার বিশাল জলাশয় মরুভূমি থেকে অনেক দূরে। তাই সমুদ্র এবং মহাসাগরেই জলের অন্বেষণ করা উচিত, মরুভূমিতে নয়। আমরা সকলেই প্রকৃত সুখের অন্বেষণ করছি, যথা নিত্য জীবন, নিত্য ও অন্তহীন জ্ঞান এবং অন্তহীন আনন্দ। কিন্তু যারা মূর্খ তারা মায়ার জগতে এই বাস্তব বস্তুর অন্বেষণ করে। এই জড় দেহ নিত্য নয়, এবং এই অনিত্য দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত যা কিছু যথা স্ত্রী, পুত্র, সমাজ, দেশ ইত্যাদি সব কিছুই অনিত্য—এই দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পরিবর্তন হয়। একে বলা হয় সংসার, অথবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির আবর্ত। আমরা জীবনের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চাই, কিন্তু কিভাবে যে তা সম্ভব, তা আমরা জানি না। এখানে বলা হয়েছে যে যদি কেউ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সমন্বিত জীবনের ক্লেশগুলি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানকে আরাধনার পন্থা অবলম্বন করতে হবে, এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এই সত্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৬৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। আমরা যদি যথার্থই আমাদের বদ্ধ জীবনের সমাপ্তি সাধন করতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যুক্ত হতে হবে, তিনি প্রতিটি জীবের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের বশে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ; কেননা প্রতিটি জীব হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ *(ভঃ গীঃ ১৮/৬১)*।মাতৃক্রোড়ে স্থিত শিশু স্বাভাবিকভাবেই মায়ের প্রতি আসক্ত। কিন্তু

শিশু যখন বড় হয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে ধীরে ধীরে তার মায়ের থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু মা সর্বদাই প্রত্যাশা করেন যে, তাঁর উপযুক্ত সন্তান কোন না কোন ভাবে তাঁর সেবা করবে, আর তাঁর সন্তান তাঁকে ভুলে গেলেও তিনি সর্বদাই তার প্রতি সমভাবে স্নেহশীল। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে ভগবান সর্বদাই আমাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, এবং তিনি সর্বদাই আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামেই আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আমরা, বদ্ধ জীবেরা তাঁর কথা না ভেবে অনিত্য দেহের মায়িক সম্পর্কের পিছনে ধাবিত হই। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জড় জগতের সমস্ত মায়িক সম্পর্ক থেকে নিজেদের মুক্ত করে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এবং এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম সত্য। শিশু যেমন তার মায়ের জন্য আকুল হয়, আমরাও প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্য আকুলতা বোধ করি। আর পরমেশ্বর ভগবানকে খুঁজতে হলে আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে না, কেননা তিনি আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে রয়েছেন। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ভগবানের আরাধনার স্থল মন্দির, মসজিদ বা গীর্জায় যেতে আমাদের নিষেধ করা হচ্ছে। এই সমস্ত পবিত্র স্থানে ভগবান অবশ্যই রয়েছেন, কেননা তিনি সর্বব্যাপ্ত। সাধারণ মানুষদের জন্য এই সমস্ত পবিত্র স্থানগুলি ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান অধ্যয়নের কেন্দ্র। মন্দিরগুলি যখন পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেইসব স্থানের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে, এবং পরিণামে জনসাধারণ ধীরে ধীরে ভগবদ্বিমুখ হয়ে পড়ে, এবং তার ফলে ভগবদ্বিহীন সভ্যতার প্রকাশ হতে দেখা যায়। এই প্রকার নারকীয় সভ্যতা কৃত্রিমভাবে জীবনের বদ্ধ অবস্থা বর্ধিত করে এবং তখন সকলের পক্ষেই বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ভগবদ্বিহীন সমাজের মূর্খ নেতারা জড় বাদের নামে ঈশ্বর বিহীন জগতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার নানা রকম পরিকল্পনা করে, কিন্তু তাদের সেই ভ্রমাত্মক পরিকল্পনা কখনো সার্থক হয় না। জনসাধারণ ভোট দিয়ে একের পর এক অযোগ্য, অন্ধ নেতা নির্বাচন করে, যারা তাদের সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। আমরা যদি ভগবদ্বিহীন সভ্যতার এই অসঙ্গতি দূর করতে চাই, তা হলে আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করতে হবে এবং জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাত্মার উপদেশ পালন করতে হবে।

শ্লোক ৭

কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তা-
মৃতে পশূনসতীং নাম কুর্যাৎ।
পশ্যঞ্জনং পতিতং বৈতরণ্যাং
স্বকর্মজান্ পরিতাপাঞ্জুষাণম্ ॥ ৭ ॥

কঃ—আর কে ; **তাম্**—তা ; **তু**—কিন্তু ; **অনাদৃত্য**—উপেক্ষা করে ; **পরানুচিন্তাম্**—পারমার্থিক চিন্তাধারা ; **ঋতে**—বিনা ; **পশূন্**—জড়বাদীরা ; **অসতীম্**—অনিত্য বস্তুতে ; **নাম**—নাম ; **কুর্যাৎ**—গ্রহণ করবে ; **পশ্যন্**—নিশ্চিত রূপে দর্শন করে ; **জনম্**—জনসাধারণ ; **পতিতম্**—পতিত ; **বৈতরণ্যাম্**—দুঃখ-দুর্দশার নদী বৈতরণীতে ; **স্বকর্মজান্**—স্বীয় কর্ম থেকে উদ্ভূত ; **পরিতাপান্**—ক্লেশ ; **জুষাণম্**—প্রভাবিত হয়ে।

অনুবাদ

ঘোর জড়বাদী ছাড়া আর কে পারমার্থিক বিষয়ে চিন্তা না করে অনিত্য বিষয়ের চিন্তা করবে ? দুঃখ-দুর্দশার নদী বৈতরণীতে পতিত হয়ে তাকে স্বীয় কর্মজাত ত্রিতাপ ভোগ করতে হয়, তা দেখা সত্ত্বেও পশু ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তির বিষয়ে স্পৃহা হবে ?

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষ ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য দেবতাদের প্রতি আসক্ত হয় তারা ঠিক পশুর মতো, যারা এক পশুপালককে অনুসরণ করছে যে তাদের কসাইখানায় নিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত জড়বাদীরাও পশুদের মতো জানে না যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তা অবহেলা করার ফলে তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে। চিন্তাহীন হয়ে কেউই থাকতে পারে না। একটি প্রবাদ আছে যে, "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা", কেন না যারা ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে না তারা এমন বিষয়ের চিন্তা করবে যার ফলে তাদের সর্বনাশ হবে। জড়বাদীরা সর্বদাই কোন না কোন দেবতাদের পূজা করে যারা পরমেশ্বর ভগবানের তুলনায় নিতান্তই নিকৃষ্ট, যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২০) এই ধরনের পূজার নিন্দা করা হয়েছে। মানুষ যখন জড় লাভের আশায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন সে বিশেষ কোন লাভের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের কাছে আবেদন করে, প্রকৃতপক্ষে যদিও তা ভ্রমাত্মক এবং অনিত্য। দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত পরমার্থী কখনো এই প্রকার মায়িক বিষয়ের দ্বারা মোহিত হন না ; তাই তিনি সর্বদাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পরমাত্মার চিন্তা করা উচিত, যা নির্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তার থেকে এক স্তর ঊর্ধ্বে, এবং সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপের ধারণার মাধ্যমে এই ধরনের পরমাত্মা সম্বন্ধীয় চিন্তা করা যেতে পারে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রাম্যমাণ জীবদের তো বটেই, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের অবস্থাও যথাযথভাবে দর্শন করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের আলয়ের প্রবেশদ্বারে বৈতরণী নামক একটি নিত্য প্রবাহিতা নদী রয়েছে। পাপের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত দণ্ড ভোগ করার পর পাপী তার

পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিশেষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যমরাজ কর্তৃক দণ্ডিত এই প্রকার জীবেদের বিভিন্ন প্রকার বদ্ধ জীবনে দেখা যায়। তাদের কেউ স্বর্গলোকে রয়েছে, আবার কেউ বা নরকে রয়েছে। তাদের কেউ ব্রাহ্মণ, আর অন্য কেউ কৃপণ। কিন্তু এই জড় জগতে কেউই সুখী নয়, এবং তারা সকলেই হয় প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর অথবা তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জড় জগৎ রূপ কারাগারে নানা প্রকার দণ্ডভোগ করছে। ভগবান জীবের দুঃখ-দুর্দশার সমস্ত পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু কেউ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ভগবান তখন তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করেন এবং পুনরায় তাঁর ধামে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

শ্লোক ৮

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৮ ॥

কেচিৎ—অন্যেরা ; **স্ব-দেহ-অন্তঃ**—তাদের শরীরের অভ্যন্তরে ; **হৃদয়াবকাশে**—হৃদয় প্রদেশে ; **প্রাদেশমাত্রম্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বসন্তম্**—নিবাসকারী ; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ ; **কঞ্জ**—কমল ; **রথাঙ্গ**—রথের চাকা ; **শঙ্খ**—শঙ্খ ; **গদাধরম্**—গদাধর ; **ধারণয়া**—এইভাবে ধারণা করে ; **স্মরন্তি**—তাঁর স্মরণ করেন।

অনুবাদ

অন্যেরা (যোগীরা) তাঁদের দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার আয়তন প্রাদেশ পরিমাণ, অর্থাৎ প্রসারিত করতলের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পর্যন্ত বা প্রায় আট ইঞ্চি পরিমাণ বলে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবানের রূপটি বিভিন্ন প্রতীকযুক্ত—নীচের ডান হাত থেকে নীচের বাঁ হাত পর্যন্ত তাঁর হাতে যথাক্রমে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ এবং গদা রয়েছে। তাঁর এই রূপকে বলা হয় জনার্দন বা সাধারণ জীবের নিয়ন্ত্রণকারী ভগবানের অংশ প্রকাশ। শঙ্খ, চক্র আদি প্রতীকের অবস্থানের তারতম্য অনুসারে ভগবানের অন্য অনেক রূপ রয়েছে। যথা—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, হৃষীকেশ, কেশব, মাধব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, শ্রীধর, বাসুদেব, দামোদর,

জনার্দন, নারায়ণ, হরি, পদ্মনাভ, বামন, মধুসূদন, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, বিষ্ণুমূর্তি, অধোক্ষজ এবং উপেন্দ্র। অন্তর্যামী ভগবানের এই চব্বিশটি রূপ বিভিন্ন লোকে পূজিত হন, এবং প্রতিটি লোকে ভগবানের অবতার রয়েছেন, যাঁরা পরব্যোম নামক চিদাকাশের বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ লোকে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন। এ ছাড়া ভগবানের শত শত ভিন্ন রূপ রয়েছে এবং চিদাকাশে তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধাম রয়েছে। এই জড় জগৎ সেই চিজ্জগতের একটি নগণ্য অংশ মাত্র। ভগবান পুরুষ বা ভোক্তারূপে বিরাজমান, যদিও এই জড় জগতের কোন পুরুষের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না। তাঁর এই সমস্ত অসংখ্য রূপ অদ্বৈত—তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ নেই, এবং তাঁর সেই সমস্ত রূপই নিত্য নবযৌবনসম্পন্ন। সেই নবযৌবনসম্পন্ন চতুর্ভুজ ভগবান অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, তার বর্ণনা নিম্নে করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

প্রসন্নবক্তং নলিনায়তেক্ষণং
কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্।
লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং
স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্ ॥ ৯ ॥

প্রসন্ন—প্রসন্নতা প্রকাশকারী; **বক্তম্**—মুখ; **নলিন-আয়ত**—কমলদলের মতো আয়ত; **ঈক্ষণম্**—চক্ষু; **কদম্ব**—কদম্ব পুষ্প; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **পিশঙ্গ**—পীত; **বাসসম্**—বসন; **লসৎ**—দোলায়মান; **মহারত্ন**—বহু মূল্যবান রত্নসমূহ; **হিরণ্ময়**—স্বর্ণনির্মিত; **অঙ্গদম্**—আভূষণ; **স্ফুরৎ**—উদ্ভাসিত; **মহারত্ন**—মহা মূল্যবান রত্নসমূহ; **কিরীট**—মুকুট; **কুণ্ডলম্**—কানের দুল।

অনুবাদ

তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করছে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কমল দলের মতো আয়ত, এবং তাঁর বসন কদম্ব পুষ্পের কেশরের মতো পীত বর্ণ এবং তিনি বহু মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা বিভূষিত। মহারত্নখচিত স্বর্ণময় কিরীট ও কুণ্ডল মহামূল্যবান মণিসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে দীপ্তিমান।

শ্লোক ১০

উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে
যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবম্।
শ্রীলক্ষণং কৌস্তুভরত্নকন্ধর-
মম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতম্ ॥ ১০ ॥

উন্নিদ্র—বিকশিত; **হৃৎ**—হৃদয়; **পঙ্কজ**—পদ্মফুল; **কর্ণিকালয়ে**—কর্ণিকার উপরিভাগে; **যোগেশ্বর**—মহান্ যোগীগণ; **আস্থাপিত**—স্থাপিত হয়েছে; **পাদপল্লবম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী বা সুন্দর গো-বৎস; **লক্ষণম্**—সেই প্রকার লক্ষণযুক্ত; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভমণি; **রত্ন**—অন্যান্য রত্নসমূহ; **কন্ধরম্**—স্কন্ধে; **অম্লান**—অম্লান; **লক্ষ্ম্যা**—সৌন্দর্য; **বনমালয়া**—বনফুলের মালার দ্বারা; **আচিতম্**— বিস্তৃত।

অনুবাদ

তাঁর শ্রীপাদপদ্ম মহান্ যোগীদের বিকশিত হৃদয় পদ্মের কর্ণিকারূপ আবাসে সংস্থাপিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত কৌস্তুভ-মণি শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর স্কন্ধে নানাপ্রকার রত্নসমূহ, এবং তাঁর গলদেশ অম্লান শোভা সমন্বিত বনমালায় বেষ্টিত।

তাৎপর্য

অলঙ্কার, ফুল, বসন আদি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অঙ্গের সমস্ত আভূষণ তাঁর দেহ থেকে অভিন্ন। তাদের কোনটিই জড় উপাদান দ্বারা গঠিত নয়, অন্যথায় সেগুলি ভগবানের দেহকে অলঙ্কৃত করতে পারত না। তেমনই, পরব্যোমের চিন্ময় বৈচিত্র্য জড় জগতের বৈচিত্র্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ১১

বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুলীয়কৈ-
র্মহাধনৈর্নূপুরকঙ্কণাদিভিঃ।
স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈ-
র্বিরোচমানাননহাস পেশলম্ ॥ ১১ ॥

বিভূষিতম্—সুসজ্জিত; **মেখলয়া**—মেখলার দ্বারা; **অঙ্গুলীয়কৈঃ**—অঙ্গুরীর দ্বারা; **মহা-ধনৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **নূপুর**—নূপুর; **কঙ্কণাদিভিঃ**—কঙ্কণাদির দ্বারা; **স্নিগ্ধ**—চিকন; **অমল**—নিষ্কলুষ; **আকুঞ্চিত**—কুঞ্চিত; **নীল**—নীল বর্ণ; **কুন্তলৈঃ**—কেশ; **বিরোচমান**—অত্যন্ত মনোহর; **আনন**—মুখ মণ্ডল; **হাস**—হাস্য; **পেশলম্**—সুন্দর।

অনুবাদ

তাঁর কটিদেশ মেখলার দ্বারা এবং অঙ্গুলিগুলি বহুমূল্য রত্ন খচিত অঙ্গুরীর দ্বারা সুশোভিত। তাঁর অন্যান্য অঙ্গ নূপুর, কঙ্কণ আদি বহু মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত স্নিগ্ধ অমল নীলবর্ণ কেশের দ্বারা অতিশয় শোভমান এবং হাস্য দ্বারা পরম মনোহর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত সুন্দরের মধ্যে পরম সুন্দর, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী একে একে তাঁর অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা করেছেন, যাতে নির্বিশেষবাদীরা বুঝতে পারে যে, পরমেশ্বর ভগবান আরাধনার সুবিধার জন্য ভক্তের কল্পনাপ্রসূত নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন বাস্তবিকই পরম পুরুষ। পরম সত্যের নির্বিশেষরূপ তাঁর দেহ নির্গত রশ্মিছটা, ঠিক যেমন সূর্য কিরণ হচ্ছে সূর্যের রশ্মিছটা।

শ্লোক ১২

অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্—
ভ্রূভঙ্গসংসূচিত ভূর্যনুগ্রহম্।
ঈক্ষেত চিন্তাময়মেনমীশ্বরং
যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

অদীন—অত্যন্ত উদার; **লীলা**—লীলা; **হসিত**—হাস্যযুক্ত; **ঈক্ষণ**—দৃষ্টিপাত; **উল্লসৎ**—দীপ্তিমান; **ভ্রূভঙ্গ**—ভ্রূভঙ্গী; **সংসূচিত**—সূচিত; **ভূরি**—অত্যন্ত; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ; **ঈক্ষেত**—একাগ্র করা কর্তব্য; **চিন্তাময়ম্**—দিব্য; **এনম্**—এই বিশেষ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **মনঃ**—মন; **ধারণয়া**—ধ্যানের দ্বারা; **অবতিষ্ঠতে**—নিবদ্ধ করা যায়।

অনুবাদ

ভগবানের উদার লীলা এবং হাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতে যে চমৎকার ভ্রূভঙ্গী দীপ্তিমান হয়, তাতে তাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ণরূপে সূচিত হয়। তাই যতক্ষণ ধ্যানের দ্বারা মনকে নিবদ্ধ করা যায়, ততক্ষণই ভগবানের এই দিব্য রূপের উপর মনকে স্থির করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে যে নির্বিশেষবাদীরা নিরাকারের ধ্যান করার ফলে বিভিন্ন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবা করার মাধ্যমে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। নিরাকারের ধ্যান তাই নির্বিশেষবাদীদের পক্ষে দুঃখ-দুর্দশার উৎসস্বরূপ। এখানে ভগবদ্ভক্তের নির্বিশেষ দার্শনিকদের তুলনায় একটি সুবিধা রয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে সন্দিহান, তাই তারা সর্বদাই অবাস্তব বস্তুর ধ্যান করার চেষ্টা করে। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের বাস্তবিক স্বরূপের ধ্যানে মনকে একাগ্র করার জন্য প্রামাণিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে যে ধ্যানের পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে তা ভক্তিযোগের পন্থা, বা জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার পন্থা। জ্ঞান-যোগ জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। কেউ যখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন, অর্থাৎ পূর্বের বর্ণনা অনুসারে *নিবৃত্ত* হন বা সমস্ত জড়-জাগতিক প্রয়োজন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভক্তিযোগের পন্থা সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই ভক্তিযোগে জ্ঞান-যোগও নিহিত রয়েছে, অথবা শুদ্ধ ভক্তির পন্থা যুগপৎ জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্যও সাধন করে; শুদ্ধ ভক্তির ক্রমবিকাশের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। ভক্তিযোগের এই প্রভাবকে বলা হয় অনর্থ-নিবৃত্তি। ভক্তিযোগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিমভাবে অর্জিত বস্তুসমূহ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। পারমার্থিক প্রগতির প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান অনর্থ-নিবৃত্তির দ্বারা তার প্রভাব প্রদর্শন করবে। সবচাইতে গভীর অনর্থ, যা বদ্ধ জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে তা হচ্ছে যৌন বাসনা, এবং এই যৌন বাসনার চরম প্রকাশ হচ্ছে নর-নারীর মিলন। নর-নারীর মিলনের ফলে যৌন বাসনা পুনরায় বর্ধিত হয় গৃহ, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে। এগুলি লাভ হলে বদ্ধ জীব এগুলির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, এবং তখন মিথ্যা অহঙ্কার বা 'আমি' এবং 'আমার' ধারণা অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকট হয়; তখন যৌন-বাসনা বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক, পরার্থবাদ, লোকহিতৈষণা এবং অন্যান্য নানা প্রকার কার্যকলাপে প্রসারিত হয়, যা সমুদ্রে তরঙ্গের উপরের ফেনার মতো ক্ষণিকের জন্য অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়ে পর মুহূর্তে আকাশের মেঘের মতো মিলিয়ে যায়। বদ্ধজীব এই প্রকার বস্তুসমূহের দ্বারা তথা যৌন-বাসনা প্রসূত বস্তুসমূহের দ্বারা বদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং তাই ভক্তিযোগের প্রভাবে ধীরে ধীরে যৌন-বাসনা, যার সূক্ষ্ম প্রকাশ হচ্ছে লাভ, পূজা এবং প্রতিষ্ঠা, তা ধীরে ধীরে লোপ পায়। সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই বিভিন্ন প্রকার যৌন-বাসনার দ্বারা উন্মাদগ্রস্ত, এবং কে কতটা যৌন-বাসনাভিত্তিক জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছে সে বিষয়ে সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতি গ্রাস অন্ন ভোজনের ফলে যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি অনুভব করা যায়, ঠিক তেমনই পারমার্থিক উন্নতির মাত্রা নির্ধারণ করা যায় যৌন-বাসনার নিবৃত্তির মাত্রা অনুসারে। ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে বিভিন্ন প্রকার যৌন-বাসনার নিবৃত্তি হয়, কেননা ভক্তিযোগের অনুশীলন করলে ভগবানের কৃপায় জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উদয় হয়। এমনকি জাগতিক বিচারে ভক্ত উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন না হলেও তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত সদ্‌ গুণাবলীর উদয় হয়ে থাকে। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে বস্তু সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা, এবং যদি বিচারপূর্বক জানা যায় যে, কোন কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক, তখন জ্ঞানবান ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই সেই সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তু ত্যাগ করে থাকেন। যখন বদ্ধ জীব জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা বুঝতে পারেন যে, জড়জাগতিক সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অবাঞ্ছিত, তখন তিনি

স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির প্রতি অনাসক্ত হন। জ্ঞানের এই স্তরকে বলা হয় বৈরাগ্য, বা অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি অনাসক্তি। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, পরমার্থবাদীকে স্বাবলম্বী হতে হয় এবং তার জীবনের অভাব পূরণ করার জন্য ধনমদান্ধ ব্যক্তিদের কাছে ভিক্ষা করা উচিত নয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জীবনের একান্ত আবশ্যকতাগুলি, যথা আহার, নিদ্রা, আশ্রয় আদি সমস্যার বিকল্প সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু মৈথুন সম্বন্ধে তিনি কোন বিকল্প প্রদর্শন করেননি। যাদের হৃদয়ে কাম-বাসনা বর্তমান, তাদের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা সেই স্তরে উন্নীত না হলে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশ্নই ওঠে না। অতএব ক্রমান্বয়ে সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার মাধ্যমে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে অন্তত স্থূল যৌন-বাসনাকে সংযত করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে যৌন-বাসনা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া, এবং তা সম্ভব হয় এখানে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে সমগ্র শ্রীঅঙ্গের ধ্যান করার মাধ্যমে। যৌন-বাসনা থেকে কতখানি মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে, তা বিচার না করে কৃত্রিমভাবে উপরে ওঠার, অর্থাৎ ভগবানের দিব্যরূপের ঊর্ধ্বাঙ্গসমূহের ধ্যান করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ। বহু অকালপক্ক লোক সরাসরি দশম স্কন্ধ থেকে শুরু করতে চায়, বিশেষ করে ভগবানের রাসলীলা বর্ণনাকারী পাঁচটি অধ্যায় থেকে। এটি অত্যন্ত গর্হিত। শ্রীমদ্ভাগবতের এই ধরনের অধ্যয়ন বা শ্রবণ করার অপপ্রয়াসের ফলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা শ্রীমদ্ভাগবতের নামে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ে তাদের সর্বনাশ সাধন করে থাকে। এই সমস্ত তথাকথিত ভক্তদের কার্যকলাপের ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের অমর্যাদা হয়েছে। জনসাধারণের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব বর্ণনা করতে চেষ্টা করার পূর্বে সর্বপ্রকার যৌন-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে যৌন বিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়া। তিনি বলেছেন,

যথা যথা ধীশ্চ শুধ্যতি
বিষয়-লাম্পট্যং ত্যজতি
তথা তথা ধারয়েদিতি
চিত্ত-শুদ্ধি-তারতম্যেনৈব
ধ্যান-তারতম্যমোক্তম্‌।

অর্থাৎ, বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে যে পরিমাণে যৌন-বাসনার উন্মত্ততা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই অনুসারে ধ্যানের প্রগতির তারতম্য হয়। অর্থাৎ, ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান হৃদয়ে পবিত্রীকরণের মাত্রা অনুসারে হওয়া উচিত। মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, যারা এখনও যৌন-বাসনার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার ফলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ঊর্ধ্বে ধ্যান করা উচিত

নয় ; তাই তাদের পাঠ যেন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধেই সীমিত থাকে। মানুষের কর্তব্য ভাগবতের প্রথম ন'টি স্কন্ধের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়া, তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রবেশ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৩

একৈকশোঽঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ
পাদাদি যাবদ্ধসিতং গদাভৃতঃ।
জিতং জিতং স্থানমপোহ্য ধারয়েৎ
পরং পরং শুদ্ধ্যতি ধীর্যথা যথা ॥ ১৩॥

একৈকশঃ—একে একে ; **অঙ্গানি**—অঙ্গসমূহ ; **ধিয়া**—মনোনিবেশ সহকারে ; **অনুভাবয়েৎ**—ধ্যান করা ; **পাদাদি**—পা ইত্যাদি ; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত ; **হসিতম্**—হাস্যোজ্জ্বল ; **গদাভৃতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **জিতম্ জিতম্**—ধীরে ধীরে মনকে নিয়ন্ত্রিত করে ; **স্থানম্**—স্থান ; **অপোহ্য**—পরিত্যাগ করে ; **ধারয়েৎ**—ধ্যান করা ; **পরম্ পরম্**—উচ্চ থেকে উচ্চতর ; **শুদ্ধ্যতি**—শুদ্ধ হয় ; **ধীঃ**—বুদ্ধি ; **যথা যথা**—যতখানি।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত। প্রথমে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মনকে স্থির করা উচিত, তারপর গুল্ফ, তারপর জঙ্ঘা এবং এইভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গের ধ্যান করা উচিত। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, ধ্যান ততই গভীরতা লাভ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধ্যানের পন্থা বর্ণিত হয়েছে তা নিরাকার বা শূন্যে মনকে স্থির করার পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে ধ্যান করতে হয় পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপের অথবা তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের চিন্তায় মনকে একাগ্র করার মাধ্যমে। বিষ্ণুরূপের প্রামাণিক বর্ণনা রয়েছে, এবং মন্দিরে তাঁর অর্চা-বিগ্রহের প্রামাণিক স্বরূপ রয়েছে। এইভাবে মনকে ভগবানের পাদপদ্মের চিন্তায় একাগ্র করে, এবং ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গে উন্নীত করে অবশেষে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে চিত্তকে একাগ্র করা কর্তব্য।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবানের রাস-নৃত্য হচ্ছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। যেহেতু এই শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত, তাই এক লাফে ভগবানের রাসলীলা বুঝতে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফুল

ও তুলসী নিবেদন করার মাধ্যমে চিত্তকে একাগ্র করার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এইভাবে অর্চনের দ্বারা আমরা ধীরে ধীরে পবিত্র হতে পারব। ভগবানকে স্নান করানো, সাজানো ইত্যাদি অপ্রাকৃত কার্যকলাপ আমাদের জীবনকে পবিত্র করতে সাহায্য করে। আমরা যখন চিত্ত-শুদ্ধির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই এবং ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারি বা ভগবানের রাসলীলা শ্রবণ করতে পারি, তখন আমরা যথাযথভাবে তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপের রস আস্বাদন করতে পারি। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর রাসলীলার বর্ণনা দশম স্কন্ধে (২৯-৩৪ অধ্যায়) বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবানের দিব্যরূপে চিত্তকে যতই একাগ্র করা যায়, তা শ্রীপাদপদ্মেই হোক, গুল্‌ফতে হোক, জঙ্ঘাতে হোক অথবা বক্ষে হোক, ততই পবিত্র হওয়া যায়। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "বুদ্ধি যত পবিত্র হয়," অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা থেকে যত অনাসক্ত হওয়া যায়। বর্তমানে বদ্ধ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে আমাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের ধ্যানের ফল প্রকাশ পায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি আমাদের অনাসক্তির মাধ্যমে। তাই ধ্যানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধিকরণ।

যারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে অত্যন্ত মগ্ন, তাদের অর্চনা করতে দেওয়া উচিত নয় অথবা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বা শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহগণকে স্পর্শ করতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের পক্ষে ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করাই শ্রেয়, যা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে। নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদের তাই ভগবানের বিরাটরূপের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভক্তদের শ্রীমন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীরা তাদের পারমার্থিক কার্যকলাপে পর্যাপ্তরূপে শুদ্ধ হননি, তাই অর্চনার পন্থা তাদের জন্য অনুমোদিত হয়নি।

শ্লোক ১৪

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ১৪ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—করে না; **জায়েত**—বিকশিত হয়; **পর**—অপ্রাকৃত; **অবরে**—জাগতিক; **অস্মিন্**—এইরূপের; **বিশ্বেশ্বরে**—সমগ্র জগতের অধীশ্বর; **দ্রষ্টরি**—দ্রষ্টাকে; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **স্থবীয়ঃ**—স্থূল জড়বাদী; **পুরুষস্য**—বিরাট পুরুষের; **রূপম্**—বিশ্বরূপ; **ক্রিয়া-অবসানে**—স্বীয় কর্তব্যকর্ম সমাপন হলে; **প্রযতঃ**—যথাযথভাবে মনোনিবেশ সহকারে; **স্মরেত**—স্মরণ করা উচিত।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল জড়বাদীদের জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই দ্রষ্টা, পরমেশ্বর ভগবানে প্রেমভক্তির উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পর যত্নপূর্বক ভগবানের বিরাট রূপেরই ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই দ্রষ্টা। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান সমগ্র জগতের পরম সুহৃৎ এবং পরম ভোক্তা, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। চিজ্জগৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ এবং জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। আর জীবেরা হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তি, এবং তাই তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে চিজ্জগতে অথবা জড় জগতে থাকতে পারে। জড় জগৎ জীবের বসবাসের উপযুক্ত স্থান নয়, কেননা সমস্ত জীবেরা তাদের চিন্ময় স্বরূপে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, কিন্তু জড় জগতে জড়া প্রকৃতির আইনের প্রভাবে জীবেরা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভগবান চান যে, তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবেরা যেন চিজ্জগতে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে। তাই জড় জগতে বদ্ধ জীবদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ রয়েছে ; যাতে তারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, বদ্ধ জীবেরা যদিও নিরন্তর জড় জগতে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছে, তথাপি তারা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী নয়। তার কারণ পাপ এবং পুণ্যের জটিলতার প্রভাবে তারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তারা ভগবানের সঙ্গে তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে শুরু করে, কিন্তু তারা ভগবানের সবিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর সেবা করা। সেটি প্রতিটি জীবের স্বরূপগত ধর্ম। কিন্তু যারা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে অক্ষম, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের নির্বিশেষ বিরাট বা বিশ্বরূপের ধ্যান করতে। কেউ যদি প্রকৃত সুখ লাভ করতে চায়, তা হলে কোন না কোনভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাথমিক স্তরের সাধকেরা ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত বিরাট রূপের ধ্যান করতে, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, বিভিন্ন গ্রহ, সমুদ্র, পর্বত, নদী, পশু-পক্ষী, মানুষ, দেবতা ইত্যাদি যা কিছু আমরা চিন্তা করতে পারি তা সবই হচ্ছে ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই প্রকার চিন্তাধারাও পরম সত্যের এক প্রকার ধ্যান, এবং যখনই এই প্রকার ধ্যান শুরু হয়, তখনই দিব্য গুণাবলীর বিকাশ হতে শুরু করে, এবং

তখন সমগ্র জগতকে মনে হয় যেন সমস্ত জীবের বসবাসের এক সুখ এবং শান্তিপূর্ণ স্থান। ভগবানের এই ধরনের সবিশেষ অথবা নির্বিশেষ রূপের ধ্যান ব্যতীত মানুষের সমস্ত সদ্ গুণগুলি তার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, এবং এই ধরনের উন্নত জ্ঞান না থাকার ফলে সমগ্র জগৎ মানুষের পক্ষে নরকে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৫

স্থিরং সুখং চাসনমাস্থিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিয়চ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥ ১৫ ॥

স্থিরম্—বিচলিত না হয়ে; **সুখম্**—আরামদায়ক; **চ**—ও; **আসনম্**—উপবেশনের স্থান; **আস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে; **যতিঃ**—সাধু; **যদা**—যখনই; **জিহাসুঃ**—পরিত্যাগ করার বাসনা করেন; **ইমম্**—এই; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **লোকম্**—এই দেহ; **কালে**—সময়ে; **চ**—এবং; **দেশে**—উপযুক্ত স্থানে; **চ**—ও; **মনঃ**—মন; **ন**—না; **সজ্জয়েৎ**—উদ্বিগ্ন না হয়ে; **প্রাণান্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **নিয়চ্ছেৎ**—সংযত করবে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **জিতাসুঃ**—প্রাণবায়ুকে জয় করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, যোগী যখন এই মনুষ্যলোক ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর উচিত উপযুক্ত স্থান এবং কালের চিন্তায় উদ্বিগ্ন না হয়ে সুখকর আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৮/১৪) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত এবং প্রতি পদক্ষেপে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর কৃপা লাভ করেন। এই প্রকার ভক্তদের দেহত্যাগ করার উপযুক্ত সময়ের অন্বেষণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, যারা মিশ্র ভক্ত অর্থাৎ সকাম কর্ম বা অক্ষজ দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের দেহ ত্যাগ করার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করতে হয়। তাদের জন্য সেই উপযুক্ত সময় শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৮/২৩-২৬) বর্ণিত হয়েছে। তবে সেই উপযুক্ত সময় স্বীয় ইচ্ছানুসারে দেহ ত্যাগ করতে সক্ষম যোগীদের পক্ষে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে সেই প্রকার যোগীদের মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করতে সক্ষম হওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অনায়াসে মনকে জয় করা যায়। এই প্রকার সেবার দ্বারা ধীরে ধীরে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৬

মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিনয়েৎ তমাত্মনি ।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ১৬ ॥

মনঃ—মন ; **স্ব-বুদ্ধ্যা**—স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা ; **অমলয়া**—অন্য বাসনা রহিত ; **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রণ করে ; **ক্ষেত্রজ্ঞে**—জীবে ; **এতাম্**—এই সমস্ত ; **নিনয়েৎ**—বিলীন করা ; **তম্**—তা ; **আত্মনি**—আত্মায় ; **আত্মানম্**—আত্মাকে ; **আত্মনি**—পরমাত্মায় ; **অবরুধ্য**—অবরুদ্ধ হয়ে ; **ধীরঃ**—পূর্ণরূপে তৃপ্ত ; **লব্ধ-উপশান্তি**—যিনি পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন ; **বিরমেত**—বিরত হন ; **কৃত্যাৎ**—অন্য সমস্ত কার্যকলাপ ।

অনুবাদ

তারপর, যোগীর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নির্মল বুদ্ধির দ্বারা তাঁর মনকে আত্মায় লীন করা এবং তারপর আত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করা । তার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত জীব তৃপ্তির পরম অবস্থা লাভ করে অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হন ।

তাৎপর্য

মনের কাজ হচ্ছে চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা । মন যখন জড়ের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, অথবা জড় বিষয়ে মগ্ন থাকে, তখন তা জড় জ্ঞানের প্রগতি সাধনে সক্রিয় থেকে আণবিক অস্ত্র ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মন যখন আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার দ্বারা সক্রিয় হয়, তখন তা জীবনের পূর্ণ আনন্দ এবং নিত্যত্ব লাভের জন্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া করে। তাই মনকে সৎ ও নির্মল বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য । পূর্ণবুদ্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। মানুষের কর্তব্য তার বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ঙ্গম করা যে, সর্ব অবস্থাতেই সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক। প্রকৃতির প্রভাবে প্রতিটি বদ্ধজীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের দাসত্ব করছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির আদেশগুলি পালন করা সত্ত্বেও সে সর্বদা অসুখী। কেউ যখন যথাযথভাবে তা অনুভব করে এবং তার বুদ্ধিকে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে, তখন উপযুক্ত সূত্রের মাধ্যমে সে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার সন্ধান পায়। উপরিউক্ত দেহের বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলির জড় সেবা করার পরিবর্তে জীবের বুদ্ধিমত্তা তখন দুঃখজনক জড়া প্রকৃতির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। অপ্রাকৃত ভগবান ও তাঁর অপ্রাকৃত সেবা অভিন্ন, সেটি হচ্ছে অপ্রাকৃত স্তরের বৈশিষ্ট্য। তাই প্রেমময়ী সেবার প্রভাবে নির্মল

বুদ্ধিমত্তা এবং মন ভগবানে বিলীন হয়, এবং তার ফলে জীব তখন আর দ্রষ্টা থাকে না, পক্ষান্তরে সে অপ্রাকৃত স্তরে ভগবানের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ভগবান যখন সরাসরিভাবে জীবকে দর্শন করেন এবং তাঁর বাসনা অনুসারে কার্য করতে নির্দেশ দেন, তখন জীব পূর্ণরূপে তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের সব রকম ভ্রান্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে। সম্পূর্ণরূপে নির্মল স্তরে জীব সব রকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে *লব্ধোপশান্তির* স্তর প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৭

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥ ১৭ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **কালঃ**—বিনাশকারী কাল; **অনিমিষাম্**—স্বর্গের দেবতাদের; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **প্রভুঃ**—নিয়ন্তা; **কুতঃ**—কোথায়; **নু**—অবশ্যই; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **জগতাম্**—জড় প্রাণী; **যে**—যারা; **ঈশিরে**—নিয়ম; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **সত্ত্বম্**—জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ; **ন**—না; **রজঃ**—জড়া প্রকৃতির রজোগুণ; **তমঃ**—জড়া প্রকৃতির তমোগুণ; **চ**—ও; **ন**—না; **বৈ**—অবশ্যই; **বিকারঃ**—রূপান্তর; **ন**—না; **মহান্**—ভৌতিক কারণার্ণব; **প্রধানম্**—জড়া প্রকৃতি।

অনুবাদ

সেই *লব্ধোপশান্তি* স্তরে, স্বর্গের দেবতাদেরও নিয়ন্তা ও সংহারকারী কাল কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আর সামান্য দেবতা—যারা প্রাকৃত জগতেই কেবল আধিপত্য করেন, তাঁরা কি প্রভাব বিস্তার করবেন? সেখানে সত্ত্ব, রজো অথবা তমোগুণ এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, জড় কারণ সমুদ্র, প্রধান বা প্রকৃতির কোনই প্রভাব নেই।

তাৎপর্য

সংহারক কাল, যা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎরূপে স্বর্গের দেবতাদেরও নিয়ন্ত্রণ করে, চিন্ময় স্তরে তার কোনই প্রভাব নেই। কালের প্রভাব জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই চারটি নিয়ম জড় সৃষ্টির সর্বত্র প্রকট, এমন কি ব্রহ্মালোকেও, যেখানে সকলের আয়ু আমাদের কল্পনারও অতীত। দুরতিক্রম্য কালের প্রভাবে ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়, অতএব ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের কি কথা? জড় জগতের জীবদের উপর দেবতারা যে বিভিন্ন রকম জ্যোতিষ্কের প্রভাব বিস্তার করেন, চিন্ময় স্তরে জ্যোতিষ্কের সেই প্রভাবের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জড় জগতে জীবেরা শনির প্রভাবের ভয়ে ভীত, কিন্তু চিন্ময় স্তরে ভক্তদের

সেরকম কোন ভয় থাকে না। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে বিভিন্নরূপে এবং আকারে জীবেদের জড় শরীরের পরিবর্তন হয়, কিন্তু চিন্ময় স্তরে ভক্তেরা গুণাতীত, এবং সেখানে অহঙ্কারের প্রভাবে 'আমি সব কিছুর ভোক্তা' এই মনোভাবের উদয় হয় না। জড় জগতে অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রচেষ্টা পতঙ্গের জ্বলন্ত অগ্নির দিকে ধাবিত হওয়ার মতো। পতঙ্গ অগ্নির উজ্জ্বল সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হয়, এবং সে যখন তা উপভোগ করতে যায়, তখন সেই আগুন তাকে ভস্মীভূত করে। অপ্রাকৃত স্তরে জীবের চেতনা সম্পূর্ণরূপে নির্মল, এবং তখন আর তার জড় জগতকে ভোগ করার অহঙ্কার থাকে না। পক্ষান্তরে তার শুদ্ধ চেতনা তাকে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পরিচালিত করে, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে—*'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'* এই সমস্ত নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে চিন্ময় স্তরে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি নেই এবং কারণ সমুদ্রও নেই।

চিন্ময় স্তরে উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি বাস্তব, তবে শুদ্ধ চেতন স্তরে বাস্তবিকভাবে সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্মবাদী দুই প্রকার, যথা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত। নির্বিশেষবাদীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে চিদাকাশের ব্রহ্মজ্যোতি, কিন্তু ভক্তদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। ভগবদ্ভক্তেরা উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার ফলে চিন্ময়রূপ লাভ করে সরাসরিভাবে তা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা, ভগবানের সঙ্গ অবহেলা করার ফলে অপ্রাকৃত কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার জন্য চিন্ময় দেহ লাভ করতে পারেন না। তাঁরা কেবল চিৎ-স্ফুলিঙ্গরূপে ভগবানের চিন্ময় দেহনির্গত রশ্মিতে বিলীন হয়ে যান। ভগবানের রূপ পূর্ণরূপে সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি কেবল সৎ এবং চিন্ময়। বৈকুণ্ঠলোকও সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়, এবং তাই ভগবানের যে সমস্ত ভক্ত তাঁর ধামে প্রবিষ্ট হন, তাঁরাও সচ্চিদানন্দময় দেহ প্রাপ্ত হন। তাঁদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের ধাম, নাম, যশ, পরিকর ইত্যাদি সবই চিন্ময়গুণে গুণান্বিত এবং সেই চিন্ময় গুণাবলী কিভাবে জড় জগতের গুণ থেকে ভিন্ন তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তিনটি মুখ্য বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন, যথা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। বৈকুণ্ঠলোকে কেবল ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রবেশ করা যায়, যদিও অন্য পন্থাগুলি পূর্ব বর্ণিত ব্রহ্মজ্যোতিতে নিয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ১৮

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥

পরম্—পরম ; **পদম্**—স্থান ; **বৈষ্ণবম্**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় ; **আমনন্তি**—তাঁরা জানেন ; **তৎ**—তা ; **যৎ**—যা ; **নেতি**—এটি নয় ; **নেতি**—এটি নয় ; **ইতি**—এইভাবে ; **অতৎ**—ভগবৎ বিহীন ; **উৎসিসৃক্ষবঃ**—যারা এড়িয়ে যাওয়ার বাসনা করে ; **বিসৃজ্য**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে ; **দৌরাত্ম্যম্**—দৌরাত্ম্য ; **অনন্য**—সম্পূর্ণরূপে ; **সৌহৃদা**—শুভ আকাঙ্ক্ষা সহ ; **হৃদা-উপগুহ্য**—হৃদয়ে গ্রহণ করে ; **অর্হ**—পূজনীয় ; **পদম্**—শ্রীপাদপদ্ম ; **পদে পদে**—প্রতিক্ষণ।

অনুবাদ

যথার্থ পরমার্থবাদীরা জানেন যে, পরম পদে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তাঁরা যা কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তা পরিত্যাগ করেন। ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তরা তাই কখনো বৈষম্যের সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করে সর্বক্ষণ তাঁর আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'মদ্ধাম' (আমার আলয়) শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বর্ণনা অনুসারে অন্তহীন চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক, বা পরমেশ্বর ভগবানের ধাম বিরাজ করছে। সেই আকাশ, যা জড় আকাশ এবং তার সপ্ত আবরণের অনেক অনেক দূরে, সেই স্থানকে আলোকিত করার জন্য সূর্য অথবা চন্দ্র অথবা অগ্নির প্রয়োজন হয় না। কেননা সেই সমস্ত গ্রহলোক জ্যোতির্ময় এবং সূর্যের থেকেও বহুগুণ অধিক উজ্জ্বল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত ; অর্থাৎ, তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে তাদের একমাত্র সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করেন। তাঁরা কারো মুখাপেক্ষী নন, এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা ব্রহ্মারও নন। তাঁরাই স্পষ্টভাবে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করতে পারেন। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তেরা পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিচালিত হয়ে ব্রহ্ম এবং অব্রহ্ম বা মায়া সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁদের সময়ের অপচয় করেন না, অথবা অন্যের হৃদয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করেন না। তাঁরা কখনো ভ্রান্তিবশত নিজেদের ভগবান বলে মনে করেন না, অথবা ভগবানের ভিন্ন অস্তিত্ব নেই বলে তর্ক করেন না, অথবা বলেন না যে, ভগবান নেই, অথবা শিব হচ্ছে ভগবান, অথবা ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি জড় শরীর ধারণ করেন। এই ধরনের অন্য সমস্ত কল্পনাপ্রসূত ধারণার দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হন না, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির প্রতিবন্ধক। নির্বিশেষবাদী অথবা অভক্ত ব্যতীত অন্য একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের ভগবানের ভক্ত বলে প্রচার করে, কিন্তু অন্তরে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে মুক্ত হওয়ার ধারণা পোষণ করে। তারা খোলাখুলিভাবে লাম্পট্যপূর্ণ আচরণ করে তাদের মনগড়া ভক্তির পথ সৃষ্টি করে এবং

এইভাবে নিরীহ মানুষদের অথবা তাদের মতো লম্পটদের বিপথগামী করে। এই সমস্ত অভক্ত এবং লম্পটরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে মহাত্মার বেশধারী দুরাত্মা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটিতে এই প্রকার অভক্ত এবং লম্পটদের সম্পূর্ণরূপে পরমার্থবাদীদের তালিকা থেকে বহিষ্কৃত করেছেন।

বৈকুণ্ঠলোক হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেও পরম ধাম বলা হয় কেননা তা হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোকের রশ্মিচ্ছটা, ঠিক যেমন সূর্যমণ্ডলের থেকে কিরণ বিকিরণ হয় তেমনই বৈকুণ্ঠলোক থেকেও ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরণ হয়। ভগবদ্গীতায় (১৪/২৭) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং যেহেতু সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মজ্যোতিকে আশ্রয় করে রয়েছে, তাই সব কিছু ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং সব কিছু তাঁরই আশ্রয়ে বিরাজ করছে, এবং প্রলয়ের পর সব কিছু তাঁরই মধ্যে লীন হয়ে যাবে। তাই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র কিছুই নেই। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনোই অব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মের পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টায় তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করেন না, কেননা তিনি পূর্ণরূপে জানেন যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সব কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন, এবং তাই ভক্তের দৃষ্টিতে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। ভক্ত সর্বদাই সব কিছু ভগবানের সেবায় নিয়োগ করতে চেষ্টা করেন এবং কখনো ভগবানের সৃষ্টিতে মিথ্যা আধিপত্য বিস্তার করে বৈষম্যের সৃষ্টি করেন না। তিনি এতই বিশ্বস্ত যে, তিনি সর্বদা সব কিছু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করেন। সব কিছুর মধ্যে ভক্ত ভগবানকে দর্শন করেন, এবং তিনি সব কিছুকেই ভগবানের মধ্যে দর্শন করেন। দুরাত্মারা ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহকে জড় বলে ধারণা করার ফলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

শ্লোক ১৯

ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্বীর্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোহনিলং
স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ ॥ ১৯॥

ইত্থম্—এইভাবে, ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারা; **মুনিঃ**—দার্শনিক; **তু**—কিন্তু; **উপরমেৎ**—অবসর গ্রহণ করা উচিত; **ব্যবস্থিতঃ**—ভালভাবে অবস্থিত হয়ে; **বিজ্ঞানদৃক্**—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা; **বীর্য**—বল; **সুরন্ধিত**—সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত; **আশয়ঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **স্বপার্ষ্ণিনা**—পায়ের গোড়ালির দ্বারা; **আপীড্য**—রোধ করে; **গুদম্**—বায়ুরন্ধ্র; **ততঃ**—তারপর; **অনিলম্**—প্রাণবায়ু; **স্থানেষু**—যথাস্থানে; **ষটসু**—ছ'টি মৌলিক; **উন্নময়েৎ**—উত্তোলন করা কর্তব্য; **জিতক্লমঃ**—জাগতিক কামনা-বাসনার নিবৃত্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে মুনিরা ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে বিষয় বাসনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট করে পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে রুদ্ধ করেন, এবং প্রাণবায়ুকে ষট্ স্থানে উন্নীত করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

বহু দুরাত্মা দাবী করে যে, তাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে, অথচ তারা তাদের জড় বাসনাসমূহ জয় করতে অক্ষম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মভূত অবস্থায় আত্মা সব রকম জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। জড় বাসনাসমূহ জীবের মিথ্যা অহঙ্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রকাশ পায় জড়া প্রকৃতিকে জয় করার এবং প্রকৃতির পঞ্চ-মহাভূতের উপর আধিপত্য করার শিশুসুলভ ও অর্থহীন কার্যকলাপের মাধ্যমে। এই প্রকারের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব আণবিক শক্তি এবং যন্ত্রযানের মাধ্যমে অন্তরীক্ষ ভ্রমণের আবিষ্কারকারী জড় বিজ্ঞানের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করে এবং জড় বিজ্ঞানের এই নগণ্য প্রগতির গর্বে গর্বিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, যিনি এক নিমেষে মানুষের সমস্ত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। ব্যবস্থিত আত্মা, বা ব্রহ্মভূত আত্মা, পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান বাসুদেব এবং তিনি (আত্ম উপলব্ধ পুরুষ) হচ্ছেন সেই পরম পূর্ণের বিভিন্ন অংশ। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর স্বরূপে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অপ্রাকৃত সেব্য-সেবকের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁকে সহযোগিতা করা। এই প্রকার আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়ে শাস্ত্রের মাধ্যমে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্বক সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।

সিদ্ধ যোগী যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁর প্রাণবায়ুকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করে নিম্নলিখিত উপায়ে দেহত্যাগ করেন। তিনি পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে রুদ্ধ করে ধীরে ধীরে প্রাণবায়ুকে ক্রমান্বয়ে নাভি, হৃদয়, বক্ষস্থল, তালুমূল, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে উন্নীত করে দেহত্যাগ করেন। এই যোগ পদ্ধতির দ্বারা প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রক্রিয়া, তা যান্ত্রিক এবং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটি দৈহিক কার্যকলাপের মাধ্যমে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের চেষ্টা। পুরাকালে এই প্রকার অনুশীলন পরমার্থবাদীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, কেননা তখনকার দিনের জীবনধারা এবং মানুষের চরিত্র এই প্রচেষ্টার অনুকূল ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে, কলিযুগের প্রভাবে পরিবেশ এতই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে যে, এই প্রকার দৈহিক-ক্রিয়া যথাযথভাবে অনুশীলন করতে প্রায় সকলেই অক্ষম। এই যুগে মনকে একাগ্র করার সহজ পন্থা হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা, এবং প্রাণায়ামাদি যৌগিক প্রক্রিয়ার থেকে তার ফল অনেক বেশি কার্যকরী।

শ্লোক ২০

নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মা—
দুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী
স্বতালুমূলং শনকৈর্ণয়েত ॥২০॥

নাভ্যাম্—নাভিতে ; **স্থিতুম্**—অবস্থিত ; **হৃদি**—হৃদয়ে ; **অধিরোপ্য**—সংস্থাপন করে ; **তস্মাৎ**—সেখান থেকে ; **উদান**—উদান বায়ু ; **গত্য**—সবেগে ; **উরসি**—কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে ; **তম্**—তারপর ; **নয়েৎ**—নিয়ে যাবেন ; **মুনিঃ**—ধ্যানপরায়ণ ভক্ত ; **ততঃ**—তাদের ; **অনুসন্ধায়**—অনুসন্ধান করার জন্য ; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা ; **মনস্বী**—ধ্যানপরায়ণ ; **স্বতালুমূলম্**—তালুমূলে ; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে ; **নয়েত**—আনতে পারেন।

অনুবাদ

ধ্যানপরায়ণ ভক্ত নাভি থেকে প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে, তারপর সেখান থেকে কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে নিয়ে যাবেন। তারপর জিতচিত্ত মুনি বুদ্ধির দ্বারা অনুসরণ করে তাকে ধীরে ধীরে তালুমূলে নিয়ে যাবেন।

তাৎপর্য

প্রাণবায়ুর গতির ছ'টি চক্র রয়েছে, এবং বুদ্ধিমান ভক্তিযোগীর বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানস্থ চিতে সেই স্থানগুলির অনুসন্ধান করা উচিত। পূর্বোল্লিখিত চক্রগুলি হচ্ছে স্বধিষ্ঠান-চক্র, বা প্রাণ বায়ুর উৎস স্থল এবং তার উর্ধ্বে নাভিমূলে রয়েছে মণিপূরক-চক্র। ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের যে স্থানকে অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করা হয়, তাকে বলা হয় অনাহত-চক্র। তারও উর্ধ্বে তালুমূলে যখন তা স্থাপন করা হয়, তাকে বলে বিশুদ্ধি-চক্র।

শ্লোক ২১

তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ ॥
স্থিত্বা মুহূর্তার্ধমকুণ্ঠদৃষ্টিঃ
নির্ভিদ্য মূর্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ ॥ ২১ ॥

শব্দার্থ

তস্মাৎ—সেখান থেকে ; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূদ্বয়ের ; **অন্তরম্**—মধ্যে ; **উন্নয়েত**—উন্নীত করবে ; **নিরুদ্ধ**—রোধ করে ; **সপ্ত**—সাত ; **আয়তনঃ**—প্রাণবায়ুর বহির্গমনের পথ ;

অনপেক্ষঃ—সব রকম জড় সুখভোগের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে; **স্থিত্বা**—স্থাপন করে; **মুহূর্ত**—ক্ষণকাল; **অর্ধম্**—অর্ধ; **অকুণ্ঠ**—প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে; **দৃষ্টিঃ**—লক্ষ্য স্থির করে; **নির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **মূর্ধন্**—ব্রহ্মরন্ধ্র; **বিসৃজেৎ**—দেহ ত্যাগ করা উচিত; **পরম্**—পরম; **গতঃ**—গিয়ে।

অনুবাদ

তারপর ভক্তিযোগী তাঁর প্রাণবায়ুকে ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে চালিত করে প্রাণবায়ুর বহির্গমনের সাতটি পথ, অর্থাৎ শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখগহ্বর রুদ্ধ করে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে তাঁর লক্ষ্য স্থির করবেন। তিনি যদি সমস্ত জড় ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন, তাহলে তিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। তার শর্তটি হচ্ছে এই যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে জড় ভোগ-বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে। আয়ুষ্কাল এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার জড় ভোগ রয়েছে। সব চাইতে দীর্ঘ আয়ু সমন্বিত সর্বোচ্চ স্তরের ইন্দ্রিয় সুখভোগের কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২০) উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে সবই জড় ভোগ, এবং মানুষের বোঝা উচিত যে জড় ভোগের জন্য এই প্রকার দীর্ঘ আয়ুর কোন প্রয়োজন নেই, এমনকি ব্রহ্মালোকেও। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, এবং কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়ের প্রতি এই প্রকার অনাসক্তি জীবনের পরম স্তরে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। *পরম্ দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। পরা-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত না হলে জড়া প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। চিন্ময় জীবন সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যরহিত বলে যে একশ্রেণীর নির্বিশেষবাদী প্রচার করে থাকে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং তার ফলে জীব জড়া প্রকৃতির ভোগের প্রতি অধিক থেকে অধিকতর আসক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে, অল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের *পরম* সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই; যদিও তারা ব্রহ্মোপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হয়েছে বলে গর্ব করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা জড়া প্রকৃতির আকর্ষণেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই প্রকার স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এই শ্লোকে বর্ণিত *পরম* সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং তাই তারা *পরম ধাম* প্রাপ্ত হতে পারে না। ভক্তরা চিজ্জগত, পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্তহীন বৈকুণ্ঠলোক সমন্বিত তাঁর ধামে তাঁর চিন্ময় সঙ্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত। এখানে *অকুণ্ঠ-দৃষ্টিঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। অকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠ শব্দ দুটি একই অর্থব্যঞ্জক, এবং যাঁর দৃষ্টি চিজ্জগতে সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ হয়েছে এবং যিনি ভগবানের সঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তিনিই কেবল সব রকম

জড়জাগতিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেন, এমনকি এই জড় জগতে অবস্থান কালেও। এই *পরম* এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত *পরম ধাম* শব্দ দু'টি একই অর্থব্যঞ্জক। যিনি *পরম ধাম* প্রাপ্ত হন, তিনি আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েও সেই *পরম ধাম* লাভ করা সম্ভব নয়।

নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় এবং মুখগহ্বর আদি সাতটি রন্ধ্রের মাধ্যমে প্রাণ বায়ু নির্গত হয়। সাধারণ মানুষদের বেলায় সাধারণত তা মুখগহ্বর দিয়ে বহির্গত হয়। কিন্তু পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাণবায়ুকে নিজের ইচ্ছাক্রমে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম যোগী সাধারণত ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে প্রাণবায়ুকে দেহ থেকে মুক্ত করেন। তাই যোগী উপরোক্ত সাতটি রন্ধ্রকে রুদ্ধ করেন, যাতে স্বাভাবিকভাবেই প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করতে পারে। এটি মহান ভক্তের পক্ষে সব রকম জড়জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নিশ্চিত লক্ষণ।

শ্লোক ২২

যদি প্রয়াস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং
বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে
সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥ ২২ ॥

যদি—যদিও; **প্রয়াস্যন্**—বাসনা পোষণ; **নৃপ**—হে রাজন্; **পারমেষ্ঠ্যম্**— ব্রহ্মপদ; **বৈহায়সানাম্**—বৈহায়স নামক জীবদের; **উত**—বলা হয়; **যৎ**—যা; **বিহারম্**—উপভোগের স্থান; **অষ্ট-আধিপত্যম্**—অষ্টসিদ্ধি; **গুণসন্নিবায়ে**—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে; **সহ**—সহিত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **গচ্ছেৎ**—গমন করে; **মনসা**—মনসহ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে রাজন্, যোগীর যদি ব্রহ্মপদ, অষ্টসিদ্ধি, অথবা বৈহায়সদের সঙ্গে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার বাসনাদি জড়ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে তিনি দেহত্যাগের সময় মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ত্যাগ না করে সেগুলি সহ সেই সেই লোকে ভোগার্থে গমন করবেন।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকে জড় সুখভোগের সুযোগ-সুবিধা নিম্নতর লোকগুলির থেকে শত-সহস্র গুণ অধিক। সর্বোচ্চলোকে রয়েছে ব্রহ্মলোক, ধ্রুবলোক ইত্যাদি, এবং সে সবই মহর্লোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা সকলেই অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁদের যোগসিদ্ধির জন্য কোনরকম অলৌকিক প্রক্রিয়া শিখতে হয় না এবং অণুর মতো ক্ষুদ্র হওয়া (অণিমা) বা লঘু থেকে লঘুতর হওয়া (লঘিমা) আদি

সিদ্ধিলাভের জন্য কোনরকম অনুশীলন করতে হয় না। তাঁরা ইচ্ছামতো যে কোন স্থান থেকে যা ইচ্ছা তাই প্রাপ্ত হতে পারেন (প্রাপ্তি সিদ্ধি), তাঁরা সবচাইতে ভারী বস্তুর থেকেও ভারী হতে পারেন (গরিমা সিদ্ধি), তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে অদ্ভুত সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন অথবা ধ্বংস করতে পারেন (ঈশিত্ব সিদ্ধি), তাঁরা সমস্ত জড় উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন (বশিত্ব সিদ্ধি), তাঁদের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার এবং কখনো নিরাশ না হওয়ার শক্তি রয়েছে (প্রাকাম্য সিদ্ধি), অথবা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁরা এমনকি খামখেয়ালী বশে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন (কামাবসায়িতা সিদ্ধি)। এই সমস্ত ক্ষমতাগুলি উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার জন্য তাঁদের কোনরকম যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে নিমেষের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা সবচাইতে কাছের গ্রহটিতেও অন্তরীক্ষ যানের যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীত যেতে পারেন না, কিন্তু এই সমস্ত উচ্চতর লোকের অত্যন্ত দক্ষ অধিবাসীরা অনায়াসে সব কিছু করতে পারেন।

জড়বাদীরা যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত গ্রহে প্রকৃতপক্ষে কি হচ্ছে তা জানতে চায়, তাই তারা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে চায়। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা যেমন সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পরমার্থবাদীরাও সেই সমস্ত গ্রহগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনে অভিলাষী, যেগুলি সম্বন্ধে তারা অনেক আশ্চর্যজনক কথা শুনেছে। যোগীরা অনায়াসে তাদের বর্তমান জড় মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহসহ সে সমস্ত স্থানে গিয়ে তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। জড় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত মনের প্রধান বাসনা হচ্ছে জড় জগৎ ভোগ করা এবং পূর্বে যে সমস্ত সিদ্ধিগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি জড় জগতকে ভোগ করার বিভিন্ন উপায়। ভগবদ্ভক্তেরা কখনো অলীক এবং অনিত্য বস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা করেন না। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চান। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার বাসনা চিন্ময় বা পারমার্থিক, এবং উচ্চ জগতে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই মন এবং ইন্দ্রিয়কে পবিত্র করতে হবে। জড় বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহ চিন্ময়রূপে পবিত্র হয়, যখন সেগুলি আর ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয়, এবং তারা যখন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন তাদের আর জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ২৩

যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত—
বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।

ন কর্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্ ॥ ২৩ ॥

যোগেশ্বরাণাম্—শ্রেষ্ঠ যোগী এবং মহান্ ভক্তদের ; **গতিম্**—গন্তব্য স্থল ; **আহুঃ**—বলা হয় ; **অন্তঃ**—অন্তরে ; **বহিঃ**—বাহিরে ; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের ; **পবন-অন্তঃ**—পবনের অন্তরে ; **আত্মনাম্**—সূক্ষ্ম দেহের ; **ন**—কখনই না ; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা ; **তাম্**—তা ; **গতিম্**—বেগ ; **আপ্নুবন্তি**—প্রাপ্ত হয় ; **বিদ্যা**—ভগবদ্ভক্তি ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা ; **যোগ**—যোগ শক্তি ; **সমাধি**—জ্ঞান ; **ভাজাম্**—ভজনকারীদের।

অনুবাদ

পরমার্থবাদীরা চিন্ময় শরীর লাভের প্রয়াসী। ভগবদ্ভক্তি, তপশ্চর্যা, যোগ এবং দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাদের গতি জড় জগতের অন্তরে এবং বাহিরে অপ্রতিহত। সকাম কর্মীরা, অথবা জড়বাদীরা কখনোই সেই প্রকার অপ্রতিহত গতিতে গমনাগমন করতে পারে না।

তাৎপর্য

যন্ত্রযানের সাহায্যে জড় বৈজ্ঞানিকদের অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার প্রচেষ্টা কেবল একটি ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। পুণ্যকর্মের প্রভাবে যদিও মানুষ স্বর্গলোকে যেতে পারে, কিন্তু এই প্রকার স্থূল অথবা সূক্ষ্ম যান্ত্রিক অথবা জাগতিক প্রয়াসের মাধ্যমে স্বর্গলোক বা জনলোকের ঊর্ধ্বে তারা যেতে পারে না। পরমার্থবাদীরা, যাঁরা স্থূল জড়দেহের প্রভাব থেকে মুক্ত, তাঁরা এই জড় জগতের ভিতরে এবং বাহিরে সর্বত্র গমনাগমন করতে পারেন। জড় জগতের মধ্যে তাঁরা মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোকের সর্বত্র এবং জড় জগতের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠলোকসমূহে অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করতে পারেন। এই ধরনের অপ্রাকৃত মহাকাশচারীর এক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নারদ মুনি, এবং দুর্বাসা মুনি হচ্ছেন এই ধরনের একজন যোগী। ভগবদ্ভক্তি, তপশ্চর্যা, যোগসিদ্ধি এবং দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে সকলেই নারদ মুনি অথবা দুর্বাসা মুনির মতো বিচরণ করতে পারেন। কথিত আছে, দুর্বাসা মুনি মাত্র এক বছরের মধ্যে সমগ্র জড় জগৎ এবং চিন্ময় জগতের কিয়দংশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম জড়বাদীরা কখনই পরমার্থবাদীদের গতি লাভ করতে পারবে না।

শ্লোক ২৪

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ
প্রয়াতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥ ২৪ ॥

বৈশ্বানরম্—অগ্নির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা ; **যাতি**—যায় ; **বিহায়সা**—আকাশ পথে (ছায়াপথ) ; **গতঃ**—গমন করে ; **সুষুম্নয়া**—সুষুম্নার দ্বারা ; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মলোক ; **পথেন**—পথে ; **শোচিষা**—জ্যোর্তিময়ী ; **বিধূত**—ধৌত ; **কল্কঃ**—কলুষ ; **অথ**—তারপর ; **হরেঃ**—শ্রীহরির ; **উদস্তাৎ**—উর্ধ্বমুখী ; **প্রয়তি**—গমন করে ; **চক্রম্**—চক্র ; **নৃপ**—হে রাজন্ ; **শৈশুমারম্**—শিশুমার নামক।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই প্রকার যোগীরা প্রথমে ছায়াপথে ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ জ্যোতির্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর যোগে অগ্নির দেবতা বৈশ্বানর লোকে যান। এখানে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে কলুষ-বিধৌত হয়ে আরও উর্ধ্বে শিশুমার চক্রে যান, যেখানে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্ক লাভ করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের ধ্রুব নক্ষত্র এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ চক্রকে বলা হয় শিশুমার চক্র, যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের (ক্ষীরোদক্শায়ী বিষ্ণুর) বাসস্থান অবস্থিত। সেখানে যাওয়ার পূর্বে যোগীরা ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পথে ছায়াপথ অতিক্রম করেন এবং পথে প্রথমে বৈশ্বানরলোকে গমন করেন, যেখানে অগ্নির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা বিরাজ করেন। এই লোকে যোগীরা জড় জগতের সংসর্গজনিত সমস্ত কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন। এখানে আকাশমার্গে ছায়াপথকে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্য বিষ্ণো—
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি
কল্পায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥ ২৫ ॥

তৎ—তা ; **বিশ্ব-নাভিম্**—বিশ্বেশ্বরের নাভি ; **তু**—কিন্তু ; **অতিবর্ত্য**—অতিক্রম করে ; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ; **অণীয়সা**—যোগসিদ্ধির ফলে ; **বিরজেন**—নিষ্কলুষের দ্বারা ; **আত্মনা**—জীবের দ্বারা ; **একঃ**—কেবল ; **নমস্কৃতম্**—পূজনীয় ; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—যাঁরা পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হন ; **কল্পায়ুষঃ**—৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর ; **যৎ**—স্থান ; **বিধুবাঃ**—আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা ; **রমন্তে**—উপভোগ করেন।

অনুবাদ

এই শিশুমার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু, এবং তাকে বলা হয় শ্রীবিষ্ণুর (গর্ভোদক্শায়ী বিষ্ণুর) নাভি। যোগীরাই কেবল শিশুমার চক্র অতিক্রম করে

মহর্লোক প্রাপ্ত হন যেখানে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা ৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘায়ু উপভোগ করেন। এই গ্রহলোকটি আধ্যাত্মিক স্তরে অধিষ্ঠিত ঋষিদেরও পূজ্য।

শ্লোক ২৬

অথো অনন্তস্য মুখানলেন
দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বর যুষ্টধিষ্ণ্যং
যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্ ॥ ২৬ ॥

অথো—অনন্তর; **অনন্তস্য**—ভগবানের বিশ্রামস্থল অনন্তরূপ অবতারের; **মুখানলেন**—তাঁর মুখাগ্নির দ্বারা; **দন্দহ্যমানম্**—ভস্মীভূত; **সঃ**—তিনি; **নিরীক্ষ্য**—তা দর্শন করে; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **নির্যাতি**—বেরিয়ে যান; **সিদ্ধেশ্বর-জুষ্ট-ধিষ্ণ্যম্**—বিশুদ্ধ মহাত্মাদের বিমানে; **যৎ**—স্থান; **দ্বৈপরার্দ্ধ্যম্**—১,৫৪,৮০,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর; **তৎ**—তা; **উ**—মহৎ; **পারমেষ্ঠ্যম্**—ব্রহ্মার আলয় সত্যলোক।

অনুবাদ

কল্পান্তে যখন অনন্তদেবের মুখাগ্নির দ্বারা লোকত্রয় দগ্ধ হয়, তখন তিনি শুদ্ধ মহাত্মাদের বিমানে করে সত্যলোকে গমন করেন। সত্যলোকের আয়ুষ্কাল ১,৫৪,৮০,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ মহাত্মাদের আবাস মহর্লোকের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। তাঁরা বিশেষ বিমানে চড়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ-লোক সত্যলোকে যেতে পারেন। এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এখান থেকে বহু বহু দূরে অন্যান্য গ্রহ রয়েছে, যেখানে আমাদের বিমান এবং অন্তরীক্ষযানসমূহ কল্পনাতীত গতিতে ধাবিত হয়েও পৌঁছাতে পারবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা শ্রীধর স্বামী, রামানুজাচার্য এবং বল্লভাচার্য প্রমুখ মহান্ আচার্যেরা স্বীকার করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্মল বৈদিক প্রমাণ বলে স্বীকার করে গেছেন এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোন মানুষই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অগ্রাহ্য করতে পারেন না, বিশেষ করে যখন তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ তাঁর মহান্ পিতা বৈদিক শাস্ত্রসমূহের প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্ণনা করেছেন। ভগবানের সৃষ্টিতে বহু আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে, যা আমরা প্রত্যহ স্বচক্ষে দর্শন করতে পারি, অথচ জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে সেখানে পৌঁছাতে পারি না। তাই বিজ্ঞানের সীমিত গণ্ডীর অতীত যা কিছু তা সীমিত

জড় বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জানবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্ঞান উভয়ই স্বীকার্য, কেননা তারা দুটি মতামতের কোনটিরই সত্যতা যাচাই করতে পারে না। তাই সাধারণ লোকের কাছে বিকল্প পন্থা **হচ্ছে—হয় তাদের একটিকে গ্রহণ করা অথবা দুটিকেই গ্রহণ করা। তবে বৈদিক জ্ঞান অধিক প্রামাণিক, কেননা তা সেই সমস্ত মহান্‌ আচার্যদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে, যাঁরা** কেবল **শ্রদ্ধাবান এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিই নন, বদ্ধ জীবের** সব কিছু ভ্রান্তি থেকেও সম্পূর্ণরূপে **মুক্ত। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে বদ্ধ জীব, যাদের ভুল করার প্রবণতা** রয়েছে; **তাই শ্রীমদ্ভাগবত আদি বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিকতা গ্রহণ করাই** শ্রেয়, **যা সমস্ত** মহান্‌ আচার্যেরা **স্বীকার** করে গেছেন।

শ্লোক ২৭

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু—
র্নার্তিন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিত।
যচ্ছিত্ততোঽদঃ কৃপয়ানিদংবিদং
দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

ন—কখনই না; **যত্র**—যেখানে; **শোকঃ**—শোক; **ন**—না; **জরা**—বার্ধক্য; **ন**— না; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ন**—না; **আর্তিঃ**—বেদনা; **ন**—না; **চ**—ও; **উদ্বেগঃ**—উদ্বেগ; **ঋতে**—বিনা; **কুতশ্চিৎ**—কখনো কখনো; **যৎ**—যেহেতু; **চিৎ**—চেতনা; **ততঃ**—তাই; **অদঃ**—করুণা; **কৃপয়া**—আন্তরিক সহানুভূতির প্রভাবে; **অনিদম্‌-বিদম্‌**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ; **দুরন্ত**—দুরতিক্রম্য; **দুঃখ**—দুর্দশা; **প্রভব**—সমৃদ্ধ; **অনুদর্শনাৎ**—অভিজ্ঞতার দ্বারা।

অনুবাদ

সত্যলোকে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, উদ্বেগ এই সমস্ত কিছুই নেই, কেবল চেতনা জনিত এক প্রকার দুঃখ রয়েছে। সেই দুঃখের কারণ এই যে, ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ জড় জগতের বদ্ধ জীবদের অশেষ দুঃখ দর্শন করে তাদের প্রতি তাঁদের করুণার উদ্রেক হয়।

তাৎপর্য

জড় বিষয়াসক্ত মূর্খ মানুষেরা প্রামাণিক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান প্রামাণিক এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন হয় না, পক্ষান্তরে তা মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক নির্দেশ। কেবল পুঁথিগত পাণ্ডিত্য অর্জন করার মাধ্যমে বেদের নির্দেশ উপলব্ধি করা যায় না, তা লাভ করতে হয় গুরু-পরম্পরার ধারায় বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন যে তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তাঁর শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে, যে কথা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/২) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন তা পূর্বে তিনি সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেছিলেন, এবং বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে সেই জ্ঞান দান করেন এবং মনু মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে (শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ) সেই জ্ঞান দান করেন। এইভাবে মহর্ষিদের মাধ্যমে পরম্পরা-ধারায় সেই জ্ঞান প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু কাল-প্রভাবে সেই পরম্পরা ছিন্ন হয়, এবং তাই সেই জ্ঞানের প্রকৃত মর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান তা পুনরায় অর্জুনের কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে অর্জুন ছিলেন সেই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মর্মাথ অর্জুন যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তা ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মূর্খ মানুষেরা অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্গীতার মমার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চায় না। পক্ষান্তরে তারা তাদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করে, যা তাদের মূর্খতারই পরিচায়ক, এবং তার ফলে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার পথে সেগুলি এক-একটি বিরাট প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে তারা তাদের অনুসরণকারীদের, যারা হচ্ছে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বা শূদ্র, তাদের বিপথগামী করে। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণ হতে হবে। যেমন আইন পরীক্ষায় পাশ করে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কেউ আইনজ্ঞ হতে পারে না, ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই প্রকার কঠোরতা পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে এই বিশেষ জ্ঞানটি যাতে অযোগ্য ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে কলুষিত না হয় সেই জন্য। যারা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ নয় তারা বৈদিক জ্ঞানের কদর্থ করে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি, যিনি সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় যথাযথ ভাবে পারমার্থিক শিক্ষা লাভ করেছেন।

বৈদিক জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে এবং আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের পরিচালিত করে। কিন্তু জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা তা বুঝতে পারে না। তারা এমন একটি স্থানে সুখী হওয়ার পরিকল্পনা করে, যেখানে কোনরকম সুখ নেই। সুখ ভোগের ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অথবা অন্তরীক্ষযানের সাহায্যে অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, দুঃখের আলয়ে সুখভোগের জন্য যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তাদের সে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। কেননা চরমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত উপকরণসহ একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন জড়বাদীদের সুখভোগের সমস্ত পরিকল্পনা স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা স্বীয় আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন। এই প্রকার বুদ্ধিমান মানুষেরা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সমন্বিত জড় জগতের সব রকম দুঃখ অতিক্রম করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সুখী, কেননা, তাঁর কোন রকম জড়জাগতিক

উদ্বেগ নেই। কিন্তু সমস্ত জীবের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক করুণা এবং সহানুভূতির ফলে বিষয়াসক্ত মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি দুঃখ অনুভব করেন এবং তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেসেই সমস্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁরা এখানে আসেন। সমস্ত আচার্যেরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার শিক্ষা প্রচার করেন, এবং তাঁরা সাধারণ মানুষদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, এই দুঃখের আলয়ে, যেখানে সুখ কেবল আকাশ-কুসুম মাত্র, সেখানে সুখী হওয়ার ভ্রান্ত পরিকল্পনা না করতে।

শ্লোক ২৮

ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়—
স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্তিরত্বরণ্।
জ্যোতির্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে
বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তারপর; **বিশেষম্**—বিশেষভাবে;**প্রতিপদ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **নির্ভয়ঃ**— শঙ্কা শূন্য হয়ে; **তেন**—তার দ্বারা; **আত্মনা**—শুদ্ধ সত্তা; **আপঃ**—জল; **অনল**—আগুন; **মূর্তিঃ**— রূপ; **অত্বরণ্**—অতিক্রম করে; **জ্যোতির্ময়ঃ**—জ্যোতির্ময়; **বায়ুম্**—বায়ু; **আত্মনা**— আত্মার দ্বারা; **খম্**—আকাশ; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **আত্মলিঙ্গম্**—আত্মার প্রকৃত রূপ।

অনুবাদ

সত্যলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর ভক্ত নির্ভীকভাবে বাহ্যত স্থূলদেহসদৃশ একটি সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করেন এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকাত্ব থেকে জলমূর্তি প্রাপ্ত হন এবং তারপর জ্যোতির্ময় মূর্তি এবং বায়বীয় মূর্তি প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে আকাশ রূপ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রভাবে যিনি ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক প্রাপ্ত হন, তিনি তিন প্রকার সিদ্ধিলাভ করেন। যিনি পুণ্য কর্মের প্রভাবে উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, তিনি তাঁর পুণ্যের মাত্রা অনুসারে সেই গ্রহলোক প্রাপ্ত হন। যিনি ভগবানের বিরাটরূপ বা হিরণ্যগর্ভের আরাধনার ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মার মুক্তির সময় মুক্ত হন। কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন, যে কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন আবরণগুলি অতিক্রম করে পরমধামে তাঁর প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি একত্রে গুচ্ছিভূতভাবে রয়েছে, এবং তাদের প্রতিটি সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই সপ্ত আবরণের বহির্ভাগে রয়েছে

জল, এবং প্রতিটি আবরণ পূর্ববর্তী আবরণটি থেকে দশগুণ প্রসারিত। পরমেশ্বর ভগবান যিনি তাঁর নিশ্বাসের দ্বারা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলির সৃষ্টি করেন তিনি গুচ্ছিভূত ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বে শায়িত অবস্থায় আছেন। কারণ সমুদ্রের জল ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের জল থেকে ভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ রূপ যে জল তা জড়, কিন্তু কারণ সমুদ্রের জল চিন্ময়। এখানে যে জলীয় আবরণের কথা বলা হয়েছে তা সমস্ত জীবের অহঙ্কারের আবরণ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং একে একে জড় আবরণ থেকে ক্রম-মুক্তির যে উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তা স্থূল জড়দেহের অহঙ্কার থেকে মুক্তি, এবং তারপর সূক্ষ্ম শরীরের অনুভূতি এবং অবশেষে ভগবদ্ধামে শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্তি।

শ্রীল ধর স্বামী বলেছেন যে, জড়া প্রকৃতির একটি অংশ ভগবান কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে মহত্তত্ত্ব নামে পরিচিত হয়। মহত্তত্ত্বের একটি অংশ হচ্ছে অহঙ্কার। অহঙ্কারের একটি অংশ শব্দ, এবং শব্দের একটি অংশ বায়ু। বায়ুর একটি অংশ পর্যবসিত হয় রূপে এবং রূপ থেকে তড়িৎ শক্তি বা তাপের উদ্ভব হয়। তাপ থেকে পৃথিবীর গন্ধ এবং এই গন্ধ থেকে স্থূল পৃথিবীর প্রকাশ হয়, এবং এই সমস্তই একত্রে সৃষ্টি-তত্ত্ব। সৃষ্টির ব্যাস চারশ কোটি মাইল। তারপর ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ শুরু হয়। প্রথম আবরণটি আটকোটি মাইল, এবং তার পরবর্তী আবরণগুলি যথাক্রমে, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ পূর্ববর্তী আবরণগুলি থেকে দশগুণ অধিক প্রসারিত। ভগবানের নির্ভীক ভক্ত সেই সমস্ত আবরণগুলি অতিক্রম করে অবশেষে পরম স্তর প্রাপ্ত হন যেখানে সব কিছুই চিন্ময়। তারপর ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করে ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। সেইটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির চরম সিদ্ধি। সিদ্ধ যোগীর পক্ষে তার উর্ধ্বে আর কোন কামনা অথবা প্রাপ্য নেই।

শ্লোক ২৯

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং
রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং
প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥

ঘ্রাণেন—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গন্ধম্**—গন্ধ; **রসনেন**—রসনার দ্বারা; **বৈ**—সঠিকভাবে; **রসম্**—রস; **রূপম্**—রূপ; **চ**—ও; **দৃষ্ট্যা**—দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **শ্বসনম্**—স্পর্শ; **ত্বচা**—ত্বক; **এব**—ঠিক যেমন; **শ্রোত্রেণ**—শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **চ**—ও; **উপেত্য**—লাভ করে; **নভঃ-গুণত্বম্**—আকাশের গুণ থেকে; **প্রাণেন**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **চ**—ও; **আকূতিম্**—জড় ক্রিয়া; **উপৈতি**—লাভ করে; **যোগী**—ভক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ভক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রস, চক্ষুর গ্রাহ্য রূপ, ত্বকের

গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আকাশের গুণ শব্দ, কর্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জড় ক্রিয়া আদি বিষয় সমূহকে অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

আকাশের উপরে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম আবরণগুলি রয়েছে। স্থূল আবরণগুলি প্রকৃতির উপাদানগুলির সূক্ষ্ম কারণাত্মক প্রকাশ। তাই যোগী বা ভক্ত স্থূল উপাদানগুলির বিনাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ঘ্রাণ, দর্শন ইত্যাদি সূক্ষ্ম কারণগুলিও প্রত্যাহার করেন। শুদ্ধ চিৎকণ জীবাত্মা এইভাবে সম্পূর্ণ রূপে সবরকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

শ্লোক ৩০

স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং
মনোময়ং দেবময়ং বিকার্যম্।
সংসাদ্য গত্যা সহতেন যাতি
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি (ভক্ত); **ভূত**—স্থূল; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সন্নিকর্ষম**—প্রশমিত করার স্তরে; **মনঃ-ময়ম্**—মানসিক স্তরে; **দেবময়ম্**—সত্ত্বগুণে; **বিকার্যম্**—অহঙ্কারাত্মক; **সংসাদ্য**—অতিক্রম করে; **গত্যা**—উন্নতি সাধনের দ্বারা; **সহ**—সহিত; **তেন**—তাদের দ্বারা; **যাতি**—গমন করে; **বিজ্ঞান**—বিশুদ্ধ জ্ঞান; **তত্ত্বম্**—সত্য; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **সন্নিরোধম্**—সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে।

অনুবাদ

এইভাবে ভক্ত স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয় স্থান এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হয়ে সেই অহঙ্কারের সঙ্গে বিজ্ঞান তত্ত্ব বা মহৎ তত্ত্বে গমন করেন, এবং তারপর তিনি শুদ্ধ আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি যে শুদ্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে নিজেকে ভগবানের নিত্যদাসরূপে জানবার শুদ্ধ চেতনা। এইভাবে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রকৃত স্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। ভগবানের কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা না করে তাঁর প্রেমময়ী সেবার যে অপ্রাকৃত স্তর, তা লাভ করা যায় যখন জড় ইন্দ্রিয়গুলি কলুষমুক্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে কলুষমুক্ত করার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হয়। মন সত্ত্বগুণজাত এবং তাই তাকে বলা হয় দেবময় বা দিব্য। পূর্ণরূপে নিজেকে ভগবানের সেবকরূপে

উপলব্ধি করার মাধ্যমে মনের পবিত্রীকরণ সম্ভব হয়। তাই সত্ত্বগুণের স্তর প্রাপ্ত হলেও জড় গুণের স্তরেই আবদ্ধ থাকা হয়। এই জড় সত্ত্ব গুণের স্তরও অতিক্রম করতে হবে এবং বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বাসুদেব সত্ত্বের স্তরে উন্নীত হতে হবে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পূর্বোল্লিখিত উপায়ে ভক্তের যে ক্রমোন্নতির পন্থা, তা প্রামাণিক হলেও বর্তমান যুগের পক্ষে কার্যকরী নয়। কেননা এই যুগের মানুষেরা যোগের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ। পেশাদারী কতগুলি ভণ্ড যে তথাকথিত যোগের শিক্ষা দিচ্ছে, তা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কার্যকরী হলেও পারমার্থিক উন্নতি সাধনে কোনরকম সাহায্য করে না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, যখন মানব সমাজ যথাযথভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করত, তখন এই যোগের পন্থা সকলের কাছে স্বাভাবিক ছিল। কেননা সকলে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা, গৃহ থেকে বহু দূরে সদ্‌গুরুর আশ্রমে ব্রহ্মচর্য পালন করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত প্রক্রিয়াটি অনুশীলনের শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষেরা যথাযথভাবে এই পন্থাটি হৃদয়ঙ্গম করে তা অনুশীলনে অক্ষম।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আধুনিক যুগের মানুষদের জন্য ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পন্থাটি অত্যন্ত সরল করে দিয়ে গেছেন। অনুশীলনের প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও চরমে ফলটি কিন্তু অভিন্ন। প্রধান বিষয়টি হচ্ছে ভক্তিযোগের চরম গুরুত্ব সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করা। বিভিন্ন প্রজাতিতে জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার বদ্ধদশা প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু তার বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ সম্পাদন করতে কেউ যখন ভক্তিযোগের সম্পদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় নিষ্ঠাবান জীব ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পান। সেই সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুশীলনের ফলে জীব ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে ভগবদ্ভক্ত যেন ভক্তিলতার সেই বীজ তাঁর হৃদয়রূপ ভূমিতে রোপণ করেন এবং ভগবানের দিব্য নাম, যশ ইত্যাদির শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে সেই বীজটিতে জল সিঞ্চন করেন। নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে অচিরেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

ভগবানের নাম গ্রহণের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে অপরাধযুক্ত হয়ে ভগবানের দিব্য নাম করা, দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে নামাভাসের স্তর, এবং তৃতীয় স্তরটি শুদ্ধ নাম গ্রহণের স্তর। দ্বিতীয় স্তরটিতেই, অর্থাৎ অপরাধ যুক্ত এবং অপরাধ মুক্ত স্তরের মধ্যবর্তী নামাভাসের মাধ্যমে আপনা থেকেই জড় জগতের বন্ধন মুক্তির স্তর লাভ হয়। আর নিরপরাধে ভগবানের নাম গ্রহণের ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তার দেহটি তখনও জড় জগতে বিরাজ করে। অপরাধমুক্ত স্তর লাভ করতে হলে নিম্নলিখিত উপায়ে সচেতন থাকতে হবে।

শ্রবণ-কীর্তন বলতে কেবল রাম, কৃষ্ণ, আদি ভগবানের নাম (অথবা ষোল নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) শ্রবণ এবং কীর্তনই নয়, পক্ষান্তরে ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতও পাঠ করতে এবং শ্রবণ করতে হবে। ভক্তিযোগের প্রাথমিক অনুশীলনের ফলে হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজটি অঙ্কুরিত হবে, এবং উপরোক্ত পন্থায় নিয়মিতভাবে জল সেচনের ফলে ভক্তিলতাটি বর্ধিত হতে থাকবে। যথাযথ ভাবে সেই লতাটি লালন পালনের ফলে তা বর্ধিত হয়ে অবশেষে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে, যা আমরা পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে শুনেছি, জ্যোতির্ময়ী চিদাকাশ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হবে এবং ক্রমে ক্রমে আরও বর্ধিত হয়ে তা চিদাকাশে যেখানে বৈকুণ্ঠলোক নামক অসংখ্য চিন্ময় গ্রহ রয়েছে সেখানে প্রবেশ করবে। তারও ঊর্ধ্বে রয়েছে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে সেই ভক্তিলতাটি আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করবে। কেউ যখন গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন, তখন শ্রবণ, কীর্তনরূপ জল-সিঞ্চনের পন্থা, এবং ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের শুদ্ধ ভক্তি ফলপ্রসূ হয়, এবং ভগবৎ প্রেমরূপ সেই ফলের স্বাদ এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও আস্বাদন করতে পারেন। উপরোক্ত উপায়ে নিরন্তর জলসিঞ্চনে যুক্ত ভগবদ্ভক্তরাই কেবল ভগবদ্ভক্তির সেই সুপক্ক ফল আস্বাদন করতে পারেন। তবে ভগবদ্ভক্তকে সব সময়ে সচেতন থাকতে হবে যাতে ভক্তিলতাটি ছিন্ন হয়ে না যায়। তাই তাঁকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে ঃ

(১) ভগবানের শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ একটি মত্ত হস্তীর সুসজ্জিত বাগানে প্রবেশ করে সব কিছু নষ্ট করে দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(২) একটি লতাকে যেমন বেড়া দিয়ে রক্ষা করা হয়, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ থেকে সব সময় নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হবে।

(৩) জল সিঞ্চনের ফলে অনেক আগাছাও বৃদ্ধি পায়, এবং সেই আগাছাগুলি যদি উপড়ে না ফেলা হয় তা হলে ভক্তিলতার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

(৪) এই সমস্ত আগাছাগুলি হচ্ছে জড় বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি, সাযুজ্য মুক্তি এবং ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ বাসনা।

(৫) অন্যান্য আগাছাগুলি হচ্ছে শাস্ত্র-নির্দেশের অনুশীলনে অনীহা, জীব-হিংসা এবং লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা।

(৬) উপযুক্ত সাবধানতা গ্রহণ না করা হলে জলসিঞ্চনের ফলে আগাছাগুলি বৃদ্ধি পেয়ে মূল লতার সুষ্ঠু বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে চরম ফল ভগবৎ-প্রেম লাভ হবে না।

(৭) তাই ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রথম থেকে সমস্ত আগাছাগুলিকে তুলে ফেলা।　তবেই কেবল ভক্তিলতার যথাযথ বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

(৮) আর তার ফলে ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ-প্রেম রূপ ফল আস্বাদন করতে পারবেন এবং এই জীবনেই সর্বক্ষণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারবেন।

জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা, এবং যিনি তা আস্বাদন করেছেন তিনি আর অন্য কোন উপায়ে এই জড় জগতে অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না।

শ্লোক ৩১

তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত—
মানন্দমানন্দময়োঽবসানো।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ
স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ॥ ৩১ ॥

তেন—সেই নিষ্কলুষ ভক্তের দ্বারা; **আত্মনা**—আত্মার দ্বারা; **আত্মানম্**— পরমাত্মা; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হন; **শান্তম্**—বিশ্রাম; **আনন্দম্**—তৃপ্তি; **আনন্দময়ঃ**—স্বাভাবিকভাবে আনন্দে অবস্থিত; **অবসানে**— সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **এতাম্**—এই প্রকার; **গতিম্**—গতি; **ভাগবতীম্**—ভক্তিময়; **গতঃ**—লাভ করে; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিত ভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—কখনই না; **ইহ**—এই জড় জগৎ; **বিষজ্জতে**—আকৃষ্ট হন; **অঙ্গ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে যিনি পবিত্র হয়েছেন, কেবল তিনিই তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ আনন্দ এবং তৃপ্তির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারেন। যিনি ভগবদ্ভক্তির এই পূর্ণতার স্তর লাভ করেছেন, তিনি আর কখনও এই জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন না এবং এখানে ফিরে আসেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গতিং ভাগবতীম্* শব্দটির বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিতে লীন হয়ে যাওয়ার যে বাসনা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা করে, তা ভাগবতী সিদ্ধি বা পূর্ণতা নয়। ভাগবতেরা কখনোই ভগবানের নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যেতে চান না, পক্ষান্তরে তাঁরা সর্বদা চিজ্জগতে বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। সমগ্র চিদাকাশ, যার একটি নগণ্য অংশ হচ্ছে এই জড় জগৎ, তা অগণিত বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণ, এবং ভগবদ্ভক্ত বা ভাগবতদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কোন এক বৈকুণ্ঠলোকে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করে তাঁর অন্তহীন শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে

নিত্যলীলা আস্বাদন করেন, সেখানে প্রবেশ করা। জড় জগতে বদ্ধজীবেরা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই সমস্ত লোকে উন্নীত হন। কিন্তু নিত্যযুক্ত জীবেদের সংখ্যা এই জড় জগতের বদ্ধ জীবেদের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি, এবং বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবেরা এই দুর্দশাগ্রস্ত জড় জগতে কখনো আসতে চান না।

যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীর চিজ্জগতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং যারা পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করে, তাদের নদীর মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায় ; নদীর মাছ কখনো কখনো মহাসাগরে গেলেও সেখানে দীর্ঘকাল থাকতে চায় না, তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা পুনরায় তাদের নদীতে ফিরিয়ে আনে। তেমনই, জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তখন তাদের নৈরাশ্যের বশে তারা কখনো কখনো কারণ সমুদ্রে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু, কারণ-সমুদ্র এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি যেহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কোন রকম উন্নততর বিকল্প প্রদান করতে পারে না, তাই নির্বিশেষবাদীরা পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দুর্বার বাসনা তাদেরকে এইভাবে জড় জগতের আবর্তে টেনে আনে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন, তখন আর তিনি এই জড় জগতের সীমিত পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৮/১৫) এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, "মহাত্মারা বা ভক্তিযোগীরা আমার সঙ্গলাভ করার পর কখনো আর এই অনিত্য দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগতে ফিরে আসেন না।" এই জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে তাঁর সঙ্গ লাভ করা এবং তা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। ভক্তিযোগীরা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে জ্ঞান অথবা যোগ আদি মুক্তির অন্যান্য পন্থার প্রতি আকৃষ্ট হন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং তা ছাড়া তাঁর আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।

এই শ্লোকটিতে *শান্তম্* এবং *আনন্দম্* শব্দ দুটি দ্রষ্টব্য, যা ব্যক্ত করে যে ভগবদ্ভক্তি শান্তি এবং আনন্দ দান করে থাকে। নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, অর্থাৎ তারা নিজেরাই পরমেশ্বর হতে চায়, যা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। যোগীরা নানারকম যোগ-সিদ্ধি লাভ করতে চায়, আর তার ফলে তারা কখনোই শান্তি এবং তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। তাই নির্বিশেষবাদী অথবা যোগী এরা উভয়ই প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ লাভ করতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত এবং আনন্দময়, কেননা তিনি পরম পূর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই ভক্তরা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার প্রতি অথবা যোগসিদ্ধি লাভের প্রতি কখনো আকৃষ্ট হন না।

ভগবৎ-প্রেম লাভ করার অর্থ হচ্ছে অন্য সমস্ত আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া। বদ্ধজীবেদের নানারকম আকর্ষণ রয়েছে, যেমন ধার্মিক হওয়া, ধনী হওয়া বা প্রথম শ্রেণীর ভোগী হওয়া অথবা ভগবান হওয়া, অথবা যোগসিদ্ধি লাভ করে যা ইচ্ছা তাই পাওয়া অথবা যা ইচ্ছা তাই করা ; কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর সুপ্ত প্রেমকে বিকশিত করতে আকাঙ্ক্ষী যে ভক্ত তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বাসনাগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। অশুদ্ধ ভক্ত ভক্তির প্রভাবে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়াদি লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জড় ভোগ, নির্বিশেষ জ্ঞান এবং যোগসিদ্ধির আদি কলুষসমূহের বিন্দুমাত্রও বর্তমান থাকে না। শুদ্ধভক্তির প্রভাবে, বা পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেমপ্রসূত শ্রমের প্রভাবে ভক্তের ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়।

আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, কেউ যদি ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে চান তা হলে তাঁকে অবশ্যই সমস্ত জড় ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে, অন্যান্য দেবদেবীর পূজা থেকে বিরত হতে হবে এবং কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অসৎ ধারণা ত্যাগ করতে হবে এবং ক্ষণস্থায়ী জাগতিক যশ-প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য অলৌকিক সমস্ত শক্তি অর্জনের দুর্বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকেন। তার ফলে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, বা তিনি এই শ্লোকে উল্লিখিত *শান্তম্* এবং *আনন্দম্* স্তর প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৩২

এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে
ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ।
যে বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহতুষ্ট
আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥

এতে—যা বর্ণনা করা হল ; **সৃতী**—পথ ; **তে**—আপনাকে ; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ; **বেদগীতে**—বেদের বর্ণনা অনুসারে ; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা ; **অভিপৃষ্টে**—যথাযথভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে ; **চ**—ও ; **সনাতনে**—শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে ; **চ**—ও ; **যে**—যা ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে ; **পুরা**—পূর্বে ; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মাকে ; **আহ**—বলেছিলেন ; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে ; **আরাধিতঃ**—পূজিত হয়ে ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বাসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বললাম তা বেদের বর্ণনা বলে জানবেন

এবং তা নিত্য সত্য। ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে তা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যাওয়ার দু'টি পন্থা রয়েছে, যথা সদ্য-মুক্তি বা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, এবং অন্যটি হচ্ছে ক্রম-মুক্তি বা ধীরে ধীরে ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ থেকে উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হওয়া। এই পন্থা দু'টি বেদে বর্ণিত হয়েছে। সে সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে, *যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে অস্য হৃদি শ্রিতাঃ / অথ মর্তোঽমৃতো ভগবত্যত্র ব্রহ্মা সমশ্নুতে* (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৪/৭) এবং *তেঽর্চিরভিসম্ভবান্তি* (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬/২/১৫)—"যাঁরা হৃদয়ের রোগরূপী সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা মৃত্যুকে জয় করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন, তাকে বলা হয় সদ্য-মুক্তি। আর যাঁরা অর্চিআদি মার্গে ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর লোক অতিক্রম করে অবশেষে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন, তাকে বলা হয় ক্রম-মুক্তি।" বেদের এই সমস্ত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ, এবং শুকদেব গোস্বামী এ বিষয়ে প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে এই জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব সর্বপ্রথম বেদবিদ্ ব্রহ্মার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরা হচ্ছে এইরকমঃ— শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে তা দান করেছিলেন, ব্রহ্মা তা নারদকে দান করেছিলেন, নারদ ব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেবের কাছ থেকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে গুরু-শিষ্যের পরম্পরার ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং এই সমস্ত মহাজনদের বর্ণনায় কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সত্য নিত্য, এবং সত্য সম্বন্ধে তাই নতুন কোন মতবাদ সৃষ্টি হতে পারে না। বেদের জ্ঞান লাভ করার এটিই হচ্ছে পন্থা। পাণ্ডিত্যের দ্বারা অথবা মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বৈদিক জ্ঞানে যোগ করার কিছু নেই এবং তার থেকে বিয়োগ করারও কিছু নেই, কেননা সত্য সর্বদাই সত্য। সেই সত্যকে জানতে হলে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাপারে জনসাধারণের কাছে তত্ত্ববেত্তা। সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ অনুসরণ করে। তার অর্থ হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ কর্তৃত্ব স্বীকার করে। বৈদিক জ্ঞানও এইভাবে আহরণ করতে হয়। আকাশ অথবা ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে কি রয়েছে তা নিয়ে সাধারণ মানুষ তর্ক করতে পারে, কিন্তু তাকে বেদের উক্তি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যেহেতু তা প্রামাণিক গুরু-শিষ্য পরম্পরায় উপলব্ধ হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও চতুর্থ অধ্যায়ে গীতার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে সেই পন্থারই বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি আচার্যদের কর্তৃত্ব স্বীকার না করে, তা হলে বেদে যে সত্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তার অনুসন্ধান ও সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

শ্লোক ৩৩

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

ন—কখনই না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অতঃ**—এর উর্ধ্বে; **অন্যঃ**—অন্য কোন; **শিবঃ**—মঙ্গলময়; **পন্থাঃ**—উপায়; **বিশতঃ**—ভ্রাম্যমান; **সংসৃতৌ**—জড় জগতে; **ইহ**—এই জীবনে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিযোগঃ**—ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা; **যতঃ**—যেখানে; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রাম্যমান জীবদের ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা ব্যতীত ভববন্ধন মোচনের আর কোন মঙ্গলময় পন্থা নেই।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে, ভগবদ্ভক্তি বা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করার পন্থাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র মঙ্গলময় পথ। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নানারকম পরোক্ষ পন্থা রয়েছে, কিন্তু তাদের কোনটিই ভক্তিযোগের মতো এত সহজ এবং মঙ্গলময় নয়। জ্ঞান, যোগ এবং অন্য কোন পন্থা স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠানকারীকে উদ্ধার করতে পারে না। সেই সমস্ত পন্থাগুলি মানুষকে বহু বহু বছর অনুশীলনের পর ভক্তিযোগের স্তরে পৌঁছে দেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে, যারা পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে নানা প্রকার ক্লেশ এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) আরও বলা হয়েছে যে, জ্ঞানীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে জানতে পারেন। যোগের পন্থা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/৪৭) বলা হয়েছে যে, সমস্ত যোগীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১৮/৬৬) চরম উপদেশ হচ্ছে, সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ আত্ম-উপলব্ধির এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ইতিপূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সবরকম সকাম কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করে সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অথবা সেই পথ অবলম্বন করা যা চরমে ভক্তিযোগে পর্যবসিত হবে। তাছাড়া আর সবকিছুই সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামী প্রমুখ সমস্ত আচার্যেরা স্বীকার করে গেছেন যে, ভক্তিযোগ কেবল সহজ, সরল, স্বাভাবিক এবং ক্লেশমুক্তই নয়, তা সমগ্র মানবকুলের সবরকম সুখের একমাত্র উৎস।

শ্লোক ৩৪

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবসাৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্—মহাত্মা ব্রহ্মা; **ব্রহ্ম**—বেদ; **কার্ৎস্ন্যেন**—সারাংশীভূত করার দ্বারা; **ত্রিঃ**—তিনবার; **অন্বীষ্য**—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করেছিলেন; **মনীষয়া**—মনীষার দ্বারা; **তৎ**—তা; **অধ্যবস্যৎ**—নির্ধারণ করেছিলেন; **কূটস্থঃ**—একাগ্রচিত্তে; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **আত্মন্(আত্মনি)**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভবেৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

মহাত্মা ব্রহ্মা, গভীর মনোনিবেশ সহকারে একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে স্থির করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে ধর্মানুষ্ঠানের পরম পূর্ণতা।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ মহাত্মা ব্রহ্মার উল্লেখ করেছেন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের গুণাবতার। জড় সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মাজী বেদের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মা যদিও সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বৈদিক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তথাপি বেদের সমস্ত ভবিষ্যৎ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা নিরসন করার জন্য একজন সাধারণ ছাত্রের মতো তিনি তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, যা সাধারণত শিক্ষার্থীরা করে থাকেন। তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে, একাগ্রচিত্তে বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা বিচার করে স্থির করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত হওয়াই সমস্ত ধর্মানুশীলনের পরম সিদ্ধি। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও পরমেশ্বর ভগবান চরমে সেই উপদেশই দিয়েছেন। সমস্ত আচার্যেরাও এইভাবে বেদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেছেন, এবং যারা সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাদের শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (২/৪২) *বেদবাদরত* বলে নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব**—সমগ্র; **ভূতেষু**—জীবে; **লক্ষিতঃ**—দৃষ্ট হন; **স্ব-আত্মনা**—আত্মাসহ; **হরিঃ**—ভগবান; **দৃশ্যৈঃ**—দৃশ্য বস্তুর দ্বারা; **বুদ্ধি-আদিভিঃ**—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; **দ্রষ্টা**—যিনি দর্শন করেন; **লক্ষণৈঃ**—বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা; **অনুমাপকৈঃ**—অনুমানের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন। দর্শন দ্বারা এবং বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্বক সেই সত্য অনুভব করা যায়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষেরা অনেক সময় তর্ক করে যে, ভগবানকে যেহেতু চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না, তাই কিভাবে তাঁর শরণাগত হওয়া সম্ভব অথবা ভক্তিযোগে তাঁর সেবা করা সম্ভব? সেই সমস্ত সাধারণ মানুষদের জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কিভাবে বিচার এবং বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে অনুভব করা যায় তার একটি ব্যবহারিক উপদেশ এখানে দিয়েছেন। আসলে, আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে কখনোই দর্শন করা সম্ভব নয়, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রতি সেবা-বৃত্তির প্রভাবে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হন, তখন ভগবানের কৃপায় সেই শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। তখন তিনি অনুভব করতে পারেন যে, তাঁর বুদ্ধিমত্তা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মারই নির্দেশস্বরূপ। পরমাত্মা যে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেছেন তা হৃদয়ঙ্গম করা খুব একটা কঠিন নয়। তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করার পন্থাটি হচ্ছে এই রকমঃ সকলেই তার ব্যক্তিগত সত্তা অনুভব করতে পারে এবং নিশ্চিতভাবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। আকস্মিকভাবে সেই অনুভূতির প্রকাশ নাও হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিচার করলে সে সহজেই অনুমান করতে পারে যে সে তার দেহ নয়। সে অনুভব করতে পারে যে তার হাত, তার পা, তার মাথা, তার চুল এবং তার দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার দেহের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তার হাত, পা, মাথা ইত্যাদি তার প্রকৃত স্বরূপ নয়। এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা সে তার আত্মা এবং দৃশ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। এইভাবে সহজেই স্থির করা যায় যে জীব, তা সে মানুষই হোক বা পশুই হোক, হচ্ছে দ্রষ্টা, এবং সে নিজেকে ছাড়া অন্য সবকিছুই দর্শন করছে। অতএব দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখন একটু বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের দ্বারা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে সাধারণ দৃষ্টিতে আত্মা ছাড়া অন্য আর যা কিছু দর্শন হয়, তাদের স্বতন্ত্রভাবে দর্শন করার বা চলাফেরা করার কোন শক্তি নেই।

আমাদের সমস্ত সাধারণ কার্যকলাপ এবং অনুভূতি নির্ভর করে প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার শক্তির মাধ্যমে। আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—(১) চক্ষু, (২) কর্ণ, (৩) নাসিকা, (৪) জিহ্বা, (৫) ত্বক। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—(১) বাক্, (২) পাণি,

(৩) পাদ, (৪) পায়ু, (৫) উপস্থ এবং তিনটি অন্তরেন্দ্রিয় যথা—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার—এই তেরটি ইন্দ্রিয় প্রকৃতির সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানের মাধ্যমে আমাদের সরবরাহ করা হয়েছে। তেমনই, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়গুলি প্রকৃতির উপাদানগুলির অন্তহীন সমন্বয়ের প্রকাশ মাত্র। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে জীবের স্বতন্ত্রভাবে দর্শন করার অথবা চলাফেরা করার কোন ক্ষমতা নেই, এবং যতই আমরা নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারি যে আমাদের অস্তিত্ব প্রকৃতির শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ততই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে যিনি দর্শন করেন তিনি হচ্ছেন চেতন আত্মা, আর ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে জড়। দ্রষ্টার চিন্ময় গুণাবলী প্রকাশ পায় সীমিত জড়া প্রকৃতির বদ্ধ অবস্থায় তার অতৃপ্তির মাধ্যমে। চেতন এবং জড়ের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। কিছু মূর্খ লোক তর্ক করে, জড়ের মধ্যে দর্শন করার এবং গমনাগমন করার শক্তি বিকশিত হয়েছে। যেমন অনেক সময় প্রকৃতিতে প্রাণীদের ক্রমবিকাশ হতে দেখা যায়; কিন্তু এই প্রকার যুক্তি স্বীকার করা যায় না, কেননা এমন কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না যে জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে অথবা জড় পদার্থ জীবন সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা প্রতিশ্রুতি দেয় যে ভবিষ্যতে তারা দেখাবে কিভাবে জড় থেকে জীবনের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাদের এই মূর্খ এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি কোন দিনই সফল হবে না, কেননা পৃথিবীর কোথাও জড় পদার্থ থেকে দর্শন করার অথবা চলাফেরা করার ক্ষমতা উদ্ভব হয়েছে বলে শোনা যায়নি। অতএব নিশ্চিতভাবে স্থির করা যায় যে জড় এবং চেতন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের দ্বারা। এখন আমরা বিচার করে দেখতে পারি যে বুদ্ধিমত্তার অল্প প্রয়োগের দ্বারা যে দর্শন হয় তা আপনা থেকেই হয় না, পক্ষান্তরে কেউ নিশ্চয়ই সেই বুদ্ধির ব্যবহার করছেন অথবা প্রয়োগ করছেন। বুদ্ধি আমাদের পরিচালিত করে, এবং এই বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যতীত জীব কিছুই দেখতে পারে না অথবা চলাফেরা করতে পারে না অথবা খেতে পারে না অথবা অন্য কোন কিছুই করতে পারে না। কেউ যখন যথাযথভাবে তার বুদ্ধির ব্যবহার করতে পারে না, তখন সে বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে যায়। এইভাবে দেখা যায় যে জীব তার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল অথবা উন্নত কোন সত্তার পরিচালনার উপর নির্ভরশীল। এই বুদ্ধি সর্বব্যাপ্ত। প্রতিটি জীবেরই নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, এবং এই বুদ্ধি কোন উন্নততর নিয়ন্তা কর্তৃক পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন পিতা তার পুত্রকে পরিচালিত করেন। সেই পরিচালক, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনিই হচ্ছেন পরমাত্মা।

আমাদের অনুসন্ধানের এই পর্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নটি বিবেচনা করতে পারি। একদিক দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের সমস্ত অনুভূতি বা কার্যকলাপ জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত, তথাপি সাধারণত আমাদের অনুভব হয় বা আমরা বলি, 'আমি দেখছি' অথবা 'আমি করছি।' অতএব আমরা বলতে পারি যে আমাদের জড় কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া করছে, কেননা আমরা আমাদের

জড় দেহকে আমাদের আত্মা বলে মনে করছি এবং পরমাত্মা আমাদের পরিচালিত করছেন এবং আমাদের বাসনা অনুসারে সবকিছু সরবরাহ করছেন। বুদ্ধিরূপে পরমাত্মা যে আমাদের পরিচালনা করছেন, তা স্বীকার করার ফলে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত—'আমি এই দেহ নই' সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে পারি এবং ব্যবহারিক ভাবে সেই উপলব্ধি অনুশীলন করতে পারি, অথবা নিজেদের কর্তা এবং ভোক্তা বলে অভিমান করে জড় জগতে মিথ্যা পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারি। জড় জগতের ভ্রান্ত ধারণার অভিমুখে অথবা প্রকৃত পারমার্থিক উপলব্ধির অভিমুখে আমাদের বাসনা পরিচালিত করার স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। পরমাত্মাকে আমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং পরিচালকরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে এবং আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পরমাত্মার উন্নত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা অনায়াসে প্রকৃত পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারি। পরমাত্মা এবং আত্মা উভয়েই চিন্ময়, এবং তাই গুণগতভাবে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক এবং উভয়েই জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন। কিন্তু তা বলে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা সমান নন। কেননা পরমাত্মা জীবকে পরিচালিত করেন অথবা বুদ্ধিমত্তা দান করেন, আর জীব তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করে, এবং তখনই সমস্ত কার্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়। জীব পরমাত্মার নির্দেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, কেননা দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন, অনুভব, ইচ্ছা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই জীবাত্মা প্রতি পদক্ষেপে পরমাত্মার নির্দেশ অনুসরণ করছে।

সাধারণ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জড়, আত্মা এবং পরমাত্মা এই তিনটি পরিচিতি রয়েছে। আমরা যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা বৈদিক বুদ্ধিমত্তার শরণ গ্রহণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে এই তিনটি পরিচিতি পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপী অংশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আংশিক প্রকাশের দ্বারা সমগ্র জড় জগতের উপর আধিপত্য করেন। ভগবান মহান্, এবং তিনি কেবল জীবের বস্তু সরবরাহকারী হতে পারেন না, তাই পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান বা পুরুষোত্তম ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হতে পারেন না। পরমাত্মাকে উপলব্ধির মাধ্যমে জীবাত্মার আত্মা-উপলব্ধি শুরু হয়, তারপর শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে এবং বিশেষ করে সদ্গুরুর কৃপার ফলে, জীব তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান এবং শ্রীমদ্ভাগবত আরও গভীরভাবে এই ভগবত্ত্ব-বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে। তাই আমরা যদি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে আমাদের দেহরূপ বৃক্ষে (উপনিষদে বর্ণিত) অবস্থিত দুটি পাখির মধ্যে একটির অর্থাৎ বুদ্ধির পরিচালক পরমাত্মার কৃপা ভিক্ষা করি, তা হলে অবশ্যই বৈদিক জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবে এবং তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবকে উপলব্ধি করতে আর কোন অসুবিধা হবে না। বুদ্ধিমান মানুষ তাই বহু জন্ম-জন্মান্তরে এইভাবে তার বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করার পর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের

পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেন, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম ॥ ৩৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব ; **সর্ব**—সমগ্র ; **আত্মনা**—আত্মা ; **রাজন্**—হে রাজন্ ; **সর্বদা**—সর্বদা ; **শ্রোতব্যঃ**—শ্রবণীয় ; **কীর্তিতব্যঃ**—কীর্তনীয় ; **চ**—ও ; **স্মর্তব্যঃ**—স্মরণীয় ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

হে রাজন্, তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বত্র এবং সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটি শুরু করেছেন *তস্মাৎ* বা 'অতএব' শব্দটি দিয়ে, কেননা পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছেন যে ভগবদ্ভক্তির পরম মহিমান্বিত পন্থা ব্যতীত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় নেই। ভগবানের ভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করেন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদনের দ্বারা। এই ন'টি পন্থার সব কয়টিই প্রামাণিক, এবং তাদের সবকটি, কয়েকটি অথবা কেবল একটি অনুশীলনের ফলে নিষ্ঠাবান ভক্ত আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারেন। তবে এই ন'টি পন্থার মধ্যে প্রথমটি, অর্থাৎ শ্রবণ, হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যথাযথভাবে এবং যথেষ্টভাবে শ্রবণ না করলে অন্য পন্থাগুলির অনুশীলনের দ্বারা পারমার্থিক প্রগতি সম্ভব নয়। আর কেবল শ্রবণের জন্যই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রগুলি রয়েছে, যা ব্যাসদেবের মতো ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন সবকিছুরই পরমাত্মা, তাই সর্বদা এবং সর্বত্র তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা উচিত। সেটি হচ্ছে প্রতিটি মানুষের একটি বিশেষ কর্তব্য। আর মানুষ যখন সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার পন্থা পরিত্যাগ করে, তখন সে মানুষের তৈরি যন্ত্রের দ্বারা প্রচারিত আবর্জনাসদৃশ শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণের শিকার হয়। যন্ত্র খারাপ নয়, কেননা যন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের কথা শ্রবণ করা যেতে পারে ; কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে এই সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মানব সমাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অধঃপতিত হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে যে ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্র গ্রন্থ শ্রবণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য, কেননা সেই উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীবের এই প্রকার বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার ক্ষমতা নেই। সমাজকে অধঃপতিত

করে যে সমস্ত পাপী, তাদের সৃষ্ট পাপময় শব্দতরঙ্গের শিকার মানব সমাজকে কখনই হতে হয় না যদি তারা বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণের পন্থা গ্রহণ করে। শ্রবণের পন্থা দৃঢ় হয় কীর্তনের মাধ্যমে। যিনি যথার্থ সূত্র থেকে যথাযথভাবে শ্রবণ করেছেন, তিনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা পরায়ণ হন এবং তার ফলে তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তনে উৎসাহিত হন। রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সরস্বতী ঠাকুর প্রমুখ মহান আচার্যেরা, এমনকি অন্যান্য দেশে মহম্মদ, যিশুখ্রিস্ট এবং অন্য সমস্ত মহাপুরুষেরা সর্বত্র এবং সর্বদা ব্যাপকভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছেন। ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই সর্বত্র এবং সর্বদা তাঁর মহিমা কীর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভগবানের মহিমা কীর্তনে স্থান-কাল-পাত্রের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। একে বলা হয় সনাতন ধর্ম বা ভাগবদ্ধর্ম। সনাতন মানে নিত্য, সর্বদা এবং সর্বত্র। ভাগবত মানে হচ্ছে ভগবানের কথা। ভগবান সমস্ত সময় এবং সমস্ত স্থানের প্রভু, এবং তাই ভগবানের দিব্য নাম অবশ্যই শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য এবং স্মর্তব্য। তার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষ যে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে প্রতীক্ষা করছে, সেই শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হবে। *চ* শব্দটি উপরোক্ত ভগবদ্ভক্তির অন্য সমস্ত পন্থাগুলিকে ইঙ্গিত করছে।

শ্লোক ৩৭

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

পিবন্তি—যিনি পান করেন; **যে**—যাঁরা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আত্মনঃ**—প্রিয়তমের; **সতাম্**—ভক্তদের; **কথামৃতম্**—অমৃতময় বাণী; **শ্রবণপুটেষু**—কর্ণকুহরে; **সম্ভৃতম্**—সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ; **পুনন্তি**—পবিত্র করে; **তে**—তাদের; **বিষয়**—জড় সুখভোগ; **বিদূষিত-আশয়ম**—জীবনের কলুষিত উদ্দেশ্য; **ব্রজন্তি**—প্রত্যাবর্তন করেন; **তৎ**—ভগবানের; **চরণ-সরোরুহ-অন্তিকম্**—শ্রীপাদপদ্মের নিকটে।

অনুবাদ

যাঁরা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত কর্ণকুহরের দ্বারা পান করেন, তাঁরা বিষয় ভোগে দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপে গমন করেন।

তাৎপর্য

মানব সমাজের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার দূষিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন যাপন করা। মানব সমাজ যতই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য জড়া প্রকৃতিকে শোষণ করার চেষ্টা করবে, ততই তা ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তার ফলে পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ভগবান অন্ন, দুধ, ফল, কাঠ, পাথর, চিনি, রেশম, মণিরত্ন, সূতা, লবণ, জল, শাকসব্জি ইত্যাদি রূপে মানুষের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করছেন। ভগবান সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করেছেন, সমগ্র মানব সমাজ তথা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহের সমস্ত প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সরবরাহের উৎসটি পূর্ণ, মানুষকে কেবল একটুখানি শক্তি ক্ষয় করে সেগুলি উপযুক্ত প্রণালীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে হয়। কৃত্রিমভাবে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার জন্য বড় বড় কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতির কোন প্রয়োজন নেই। কৃত্রিমভাবে অভাবের সৃষ্টি করে জীবনকে কখনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করা যায় না, পক্ষান্তরে প্রকৃত সুখের জীবন হচ্ছে উচ্চ চিন্তাধারা সমন্বিত সরল জীবন। মানব সমাজের সর্বোচ্চ চিন্তাধারার উল্লেখ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে করেছেন, যথেষ্টভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা। এই কলিযুগের মানুষেরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছে, এবং শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সেই প্রকৃত পথ প্রদর্শনকারী আলোক-বর্তিকা। শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকে উল্লিখিত *কথামৃতম* শব্দটি সম্বন্ধে বলেছেন যে তা পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় বাণী সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতকে ইঙ্গিত করছে। শ্রীমদ্ভাগবতের যথেষ্ট শ্রবণের ফলে জীবনের দূষিত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনা প্রশমিত হবে, এবং সারা পৃথিবীর মানুষ জ্ঞান এবং আনন্দে পরিপূর্ণ এবং শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারবে।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে তাঁর নাম, যশ, গুণ, পরিকর, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় যেহেতু নারদ মুনি, হনুমানজী, নন্দমহারাজ এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, তাই তা অবশ্যই অপ্রাকৃত এবং হৃদয় ও আত্মার আনন্দদায়ক।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে আশ্বাস দিয়েছেন যে, নিরন্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করার ফলে একটি বিশাল পদ্মসদৃশ গোলোক বৃন্দাবন নামক চিন্ময়ধামে ভগবানের কাছে পৌঁছে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

এইভাবে সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার ফলে, ভগবানের অপ্রাকৃত কথা যথেষ্টভাবে শ্রবণ করার ফলে সরাসরি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তখন আর ভগবানের নির্বিশেষ বিরাট রূপের ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না। ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে অনুশীলনকারী যদি জড় কলুষ থেকে মুক্ত না হয়,

তাহলে বুঝতে হবে যে সে হচ্ছে একটি প্রাকৃত বা মিছা ভক্ত। সেই প্রকার ভণ্ডের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের "হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান" নামক দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

শুদ্ধ ভক্তি ঃ হৃদয়ের পরিবর্তন

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবমেতন্নিগদিং পৃষ্টবান্ যদ্ভবান্ মম।
নৃণাং যন্ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন ; **এবম্**—এইভাবে ; **এতৎ**—এই সমস্ত ; **নিগদিতম্**—উত্তর দেওয়া হয়েছে ; **পৃষ্টবান্**—আপনার প্রশ্ন অনুসারে ; **যৎ**—যা ; **ভবান্**—আপনি ; **মম**—আমাকে ; **নৃণাম্**—মানুষদের ; **যৎ**—এক ; **ম্রিয়মাণানাম্**—মরণোন্মুখ ব্যক্তির ; **মনুষ্যেষু**—মানুষের মধ্যে ; **মনীষিণাম্**—বুদ্ধিমান মানুষদের।

অনুবাদ

শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন ঃ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যেভাবে আপনি আমাকে মরণোন্মুখ বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, সেই অনুসারে আমি আপনাকে উত্তর দিয়েছি।

তাৎপর্য

সারা পৃথিবী জুড়ে মানব সমাজে কোটি কোটি নর-নারী রয়েছে, এবং তাদের প্রায় সকলেই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, কেননা আত্মার সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতি অল্প। তাদের প্রায় সকলেরই জীবন সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, কেননা তারা তাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় শরীরকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করছে, যদিও বাস্তবে তারা তা নয়। মানব সমাজের বিচারে তারা উচ্চ অথবা নিম্ন স্তরে অবস্থিত হতে পারে, কিন্তু সকলেরই বিশেষভাবে জানা উচিত যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের দেহ এবং মনের অতীত আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ। তাই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল একজন আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারে এবং সেজন্য বেদান্ত-সূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রগ্রন্থের শরণাগত হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও তত্ত্বজ্ঞানী সদগুরুর সান্নিধ্যে না আসা

পর্যন্ত আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মানুষদের মধ্যে কেবল দু-একজন মাত্র তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ২০/১১২-১২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
'শাস্ত্র-গুরু-আত্মা'রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

ব্যাসদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বৈদিক শাস্ত্রসমূহ দান করেছেন, যাতে বুদ্ধিমান মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বুদ্ধিমান মানুষেরাও ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রায় ভুলে যাচ্ছেন। তাই ভক্তিযোগের পন্থা হচ্ছে সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মানব জীবনেই কেবল তা সম্ভব হয়, যা ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনির মধ্যে অত্যন্ত দুর্লভ। তাই বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য নিশ্চিতভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। সমস্ত মানুষেরাই বুদ্ধিমান নয়, তাই তারা সব সময় মানব জীবনের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই এই শ্লোকে *মনীষিণাম্*, অর্থাৎ চিন্তাশীল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো *মনীষিণাম্* ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের দিব্য নাম এবং লীলা রূপ হরিকথামৃত শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে যুক্ত হন। বিশেষভাবে এই কার্য মরণোন্মুখ ব্যক্তিদের করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২—৭

ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ ২॥
দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্॥ ৩॥
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥ ৪॥
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥ ৫॥
রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥ ৬॥
যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্॥ ৭॥

ব্রহ্ম —পরম ; **বর্চস**—জ্যোতি ; **কামস্তু**—যারা সেইভাবে কামনা করে ; **যজেত**—পূজা করে ; **ব্রহ্মণঃ**—বেদের ; **পতিম্**—প্রভু ; **ইন্দ্রম্**—স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ; **ইন্দ্রিয়কামস্তু**—যারা কেবল প্রবল ইন্দ্রিয়কামনা করে ; **প্রজা-কামঃ**—যারা বহু সন্তান-সন্ততি কামনা করে ; **প্রজাপতীন্**—প্রজাপতিদের ; **দেবীম্**—দেবী ; **মায়াম্**—জড়া প্রকৃতির পালনকর্ত্রীকে ; **তু**—কিন্তু ; **শ্রীকামঃ**—যারা সৌন্দর্যকামনা করে ; **তেজঃ**—শক্তি ; **কামঃ**—যারা কামনা করে ; **বিভাবসুম্**—অগ্নিদেব ; **বসুকামঃ**—যারা সম্পদ কামনা করে ; **বসূন্**—বসু দেবতাগণ ; **রুদ্রান্**—শিবের রুদ্র অংশকে ; **বীর্যকামঃ**—যারা বলিষ্ঠ হতে চায় ; **অথ**—তাই ; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী ; **অন্ন-অদ্য**—শস্য ; **কামঃ**—যারা কামনা করে ; **তু**—কিন্তু ; **অদিতিম্**—দেবতাদের মাতা অদিতি ; **স্বর্গ**—স্বর্গলোক ; **কামঃ**—যারা কামনা করে ; **অদিতেঃ সুতান্**—অদিতির পুত্রদের ; **বিশ্বান্**—বিশ্বদেব ; **দেবান্**—দেবতারা ; **রাজ্যকামঃ**—যারা রাজ্য কামনা করে ; **সাধ্যান্**—সাধ্যদেবদের ; **সংসাধকঃ**—যা ইচ্ছাপূর্ণ করে ; **বিশাম্**—বৈশ্য সম্প্রদায়দের ; **আয়ুষ্কামঃ**—যারা দীর্ঘ আয়ু কামনা করে ; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনী কুমার নামক ভ্রাতৃদ্বয় ; **দেবৌ**—দুইজন দেবতা ; **পুষ্টিকামঃ**—যারা সুগঠিত শরীর কামনা করে ; **ইলাম্**—পৃথিবীকে ; **যজেৎ**—পূজা করে ; **প্রতিষ্ঠাকামঃ**—যারা যশ কামনা করে অথবা পদের স্থিরতা কামনা করে ; **পুরুষঃ**—এই প্রকার ব্যক্তিরা ; **রোদসী**—দিগন্ত ; **লোকমাতরৌ**—পৃথিবীকে ; **রূপ**—সৌন্দর্য ; **অভিকামঃ**—নিশ্চিতরূপে যারা কামনা করে ; **গন্ধর্বান্**—গন্ধর্ব লোকের অধিবাসীদের যারা অত্যন্ত সুন্দর এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ; **স্ত্রীকামঃ**—যারা ভাল পত্নী কামনা করে ; **অপ্সরঃ উর্বশীম্**—স্বর্গের অপ্সরা, উর্বশী নামক সুরকামিনীগণের ; **আধিপত্য-কামঃ**—যারা অন্যদের উপর আধিপত্য করতে চায় ; **সর্বেষাম্**—সকলের ; **যজেত**—পূজা করা কর্তব্য ; **পরমেষ্ঠিনম্**—ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা ব্রহ্মার ; **যজ্ঞম্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **যজেৎ**—পূজা করা কর্তব্য ; **যশঃকামঃ**—যশের আকাঙ্ক্ষী ; **কোষকামঃ**—ধনাকাঙ্ক্ষী ; **প্রচেতসম্**—স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরকে ; **বিদ্যা-কামস্তু**—বিদ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষী ; **গিরিশম্**—হিমালয়ের ঈশ্বর শিবের ; **দাম্পত্য-অর্থঃ**—দাম্পত্য প্রেমের জন্য ; **উমাম্-সতীম্**—শিবের সতী পত্নী উমাকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন, তাঁর বেদপতি (ব্রহ্মা অথবা বৃহস্পতির) আরাধনা করা উচিত। যিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের পটুতা কামনা করেন, তাঁর দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি পুত্রাদি কামনা করেন, তাঁর প্রজাপতিদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শ্রী কামনা করেন, তাঁর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি তেজ কামনা করেন তাঁর অগ্নিকে আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ধন কামনা করেন, তাঁর অষ্টবসুর আরাধনা করা উচিত। যিনি বল এবং বীর্য কামনা করেন, তাঁর শিবের অংশ রুদ্রের আরাধনা করা উচিত। যিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য কামনা

করেন, তাঁর অদিতির আরাধনা করা উচিত। যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁর আদিত্যদের উপাসনা করা উচিত। যিনি রাজ্য কামনা করেন, তাঁর বিশ্বদেবের উপাসনা করা উচিত, এবং যিনি জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চান, তাঁর সাধ্যদেবের পূজা করা উচিত। যিনি দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁর অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি দেহের পুষ্টি কামনা করেন, তাঁর পৃথিবীকে পূজা করা উচিত। যিনি প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বপদে স্থিত থাকার কামনা করেন, তার অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি রূপ কামনা করেন, তাঁর গন্ধর্বরূপ আরাধনা করা উচিত। যিনি স্ত্রী কামনা করেন, তাঁর উর্বশী-অপ্সরার আরাধনা করা উচিত। যিনি সকলের উপর আধিপত্য কামনা করেন, তাঁর ব্রহ্মাকে আরাধনা করা উচিত। যিনি যশ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত এবং যিনি ধন সঞ্চয়ের অভিলাষী, তাঁর কুবেরের আরাধনা করা উচিত। যিনি বিদ্যালাভের অভিলাষ করেন, তাঁর শিবের আরাধনা করা উচিত, এবং তিনি দাম্পত্য-প্রেম কামনা করেন, তাঁর সতী উমাদেবীর আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন রকম পূজার বিধি রয়েছে। জড় জগতের সীমার মধ্যে আবদ্ধ জীবেরা সব রকম ভোগের বিষয়ে দক্ষ না হতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত বিশেষ বিশেষ দেবতাদের আরাধনা করার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শিবের আরাধনা করার ফলে রাবণ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং সে শিবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মাথাগুলি কেটে তাঁকে তা নিবেদন করত। শিবের কৃপায় সে এত শক্তিশালী হয়েছিল যে, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা পর্যন্ত তার ভয়ে ভীত ছিল। অবশেষে সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং তার ফলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, এই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিকভাবে জড় সুখভোগ করতে চায়, অর্থাৎ স্থূল জড়বাদীরা প্রকৃতপক্ষে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন একথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কামনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে,অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে যাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে, তারাই বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার মাধ্যমে জড়জাগতিক সুখভোগ করতে চায় অথবা বৈজ্ঞানিক প্রগতির মাধ্যমে জাগতিক উন্নতি সাধন করতে চায়।

জড়জাগতিক জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি, এবং সেই সমস্যাগুলির সমাধান করাই হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত কর্তব্য। কেউই চায় না তার জন্মগত অধিকার ত্যাগ করতে, কেউই চায় না মরতে, কেউই চায় না জরাগ্রস্ত হতে বা ব্যাধিগ্রস্ত হতে। কিন্তু কোন দেবতার কৃপায় অথবা জড় বিজ্ঞানের তথাকথিত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সব রকম সদ্‌গুণবর্জিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে মানব জীবন হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ এবং মূল্যবান, এবং এই সমস্ত মানুষদের মধ্যে জড় জগতের সমস্যাগুলির সমাধানে সচেষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা আরও দুর্লভ; তার থেকেও দুর্লভ হচ্ছে সেই প্রকার মানুষেরা যারা শ্রীমদ্ভাগবতের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন, কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধভক্তদের বাণী রয়েছে। বুদ্ধিমান এবং মূর্খ নির্বিশেষে সকলের জন্যই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে মনীষী বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁর অনুভব অত্যন্ত উন্নত, কেননা মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তিনি সমস্ত জড়ভোগ ত্যাগ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো উপযুক্ত ব্যক্তির শ্রীমুখ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়েছেন।

জড় সুখভোগের প্রচেষ্টার সব সময়ই নিন্দা করা হয়েছে। সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পতিত মানব সমাজের নেশার মতো। বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে নিত্য জীবন লাভের চেষ্টা করা।

শ্লোক ৮

ধর্মার্থ উত্তমশ্লোকং তন্তুঃ তন্বন্ পিতৃন যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদগণান্ ॥ ৮ ॥

ধর্ম-অর্থঃ—পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য; **উত্তমশ্লোকম্**—পরমেশ্বর ভগবান অথবা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের; **তন্তুঃ**—সন্তানের জন্য; **তন্বন্**—এবং তাদের সুরক্ষার জন্য; **পিতৃন**—পিতৃকুল; **যজেৎ**—পূজা করা উচিত; **রক্ষাকামঃ**—যারা সুরক্ষার আকাঙ্ক্ষা করে; **পুণ্যজনান্**—পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ; **ওজঃ-কামঃ**—শক্তিকামী; **মরুদগণান্**—দেবতাদের।

অনুবাদ

পারমার্থিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তদের আরাধনা করা উচিত। যাঁরা সন্তানাদির কামনা করেন, তাঁদের পিতৃবর্গের আরাধনা করা উচিত, যাঁরা সুরক্ষা কামনা করেন, তাঁদের পুণ্যবান যক্ষসমূহের এবং যাঁরা বল কামনা করেন, তাঁদের বিভিন্ন দেবতাদের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

ধার্মিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করা, এবং অবশেষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্বিশেষ দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায়, তাঁর অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে এবং চরমে তাঁর

সবিশেষ ভগবান রূপের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। যাঁরা রাজ্য কামনা করেন এবং অনিত্য দেহের উন্নতি কামনা করেন, তাঁদের কর্তব্য পিতৃবর্গ এবং অন্যান্য পুণ্যবান লোকসমূহের দেবতাদের শরণাগত হওয়া। বিভিন্ন দেবতাদের বিভিন্ন শ্রেণীর পূজকেরা চরমে এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁদের লোকে যেতে পারেন, কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মজ্যোতিতে চিন্ময় লোকে প্রবেশ করেন, তাঁদের সাফল্য অনেক উন্নত স্তরের।

শ্লোক ৯

রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥ ৯ ॥

রাজ্য-কামঃ—সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষী; **মনূন্**—ভগবানের আংশিক অবতার মনুদের; **দেবান্**—দেবতাদের; **নির্ঋতিন্**—অসুরেরা; **তু**—কিন্তু; **অভিচরণ্**—শত্রুবিজয়ের আকাঙ্ক্ষী; **যজেৎ**—পূজা করা উচিত; **কাম-কামঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী; **যজেৎ**—আরাধনা করা উচিত; **সোমম্**—চন্দ্রদেবকে; **অকামঃ**—যাঁর কোন জড় বাসনা নেই; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম**—পরম।

অনুবাদ

যিনি রাজত্ব কামনা করেন, তাঁর মনুদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শত্রুবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর অসুরদের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেন, তাঁর চন্দ্রদেবের আরাধনা করা উচিত। কিন্তু যাঁর কোন জড় সুখভোগের বাসনা নেই, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

মুক্ত পুরুষ উপরোক্ত সমস্ত ভোগগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে করে। কেবল যারা বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবদ্ধ, তারাই বিভিন্ন রকম জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ, পরমার্থবাদীদের কোন রকম জড় বাসনা থাকে না, কিন্তু জড়বাদীরা নানা প্রকার ভোগ বাসনার আকাঙ্ক্ষী। ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী জড়বাদীরা, যারা পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন দেবতাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে, কখনোই তাদের ইন্দ্রিয় দমন করতে পারে না এবং তাই তারা নানারকম অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তাই কখনো কোনরকম জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা না করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

মূর্খ মানুষদের নেতারা আরও অধিক মূর্খ, কেননা তারা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করে যে, যে কোন দেবতাদের পূজা করা যেতে পারে কেননা চরমে তার ফল একই। এই ধরনের প্রচার কেবল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার বিরোধীই নয়, তা মূঢ়তাও বটে, এবং এটি যে কোন একটি ট্রেনের টিকিট কিনে একই গন্তব্যে পৌঁছনোর

দাবী করার মতো মূঢ়তা। কেউই বরোদার টিকিট কিনে দিল্লী থেকে বোম্বাই যেতে পারে না।

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার পূজার বিধি রয়েছে, কিন্তু যার কোনরকম জড় ভোগ বাসনা নেই, তিনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন। এই আরাধনার পদ্ধতিকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।

শুদ্ধভক্তির অর্থ হচ্ছে সবরকম জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, এমন কি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের বাসনা থেকেও মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের আরাধনা করা যায়, কিন্তু তার ফল ভিন্ন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

সাধারণত ভগবান কারও ইন্দ্রিয় সুখভোগের জড় বাসনা চরিতার্থ করেন না, কিন্তু ভগবান এই প্রকার পূজকদের পুরস্কৃত করেন, কেননা চরমে তারা সমস্ত জড় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করেন। এখানে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, জড় সুখভোগের বাসনা হ্রাস করা উচিত, এবং সেই জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত, যাঁকে এখানে পরম বা জড়াতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও বলেছেন—*নারায়ণঃ পরো ঽব্যক্তাৎ ঃ* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ জড়া প্রকৃতির অতীত।

শ্লোক ১০

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১০ ॥

অকামঃ—যিনি সব রকম জড় বাসনার অতীত; **সর্বকামঃ**—যিনি সব রকম জড় কামনাযুক্ত; **বা**—অথবা; **মোক্ষকামঃ**—মুক্তিকামী; **উদারধীঃ**—বিশাল বুদ্ধিসম্পন্ন; **তীব্রেণ**—তীব্র; **ভক্তিযোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **যজেত**—আরাধনা করা উচিত; **পুরুষম্ পরম্**—পরম পুরুষ ভগবানকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কতর্ব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *পুরুষোত্তম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই কেবল তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে নির্বিশেষবাদীদের আত্মসাৎ

করে মুক্তিদান করতে পারেন। ব্রহ্মজ্যোতি ভগবানের থেকে ভিন্ন নয়, ঠিক যেমন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ সূর্যমণ্ডল থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাই যিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী, তাঁরও কর্তব্য ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা, যে কথা এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দিষ্ট হয়েছে। এখানে সর্ব প্রকার সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ ভক্তিযোগের পন্থাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয়েরই চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তিযোগ, তেমনই এই অধ্যায়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভক্তিযোগ হচ্ছে বিভিন্ন দেবতাদের বিভিন্ন প্রকার পূজার চরম লক্ষ্য। ভক্তিযোগকে এখানে আত্মোপলব্ধির চরম উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই নিষ্ঠা সহকারে এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা সকলেরই কর্তব্য। এমন কি যারা জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষী, তাদেরও নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

অকাম হচ্ছেন তিনি, যাঁর কোন জড় বাসনা নেই। *পুরুষং পূর্ণং* বা পূর্ণ পুরুষের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জীবের প্রবৃত্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, ঠিক যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ দেহের সেবা করে। তাই কামনাশূন্য হওয়া মানে পাথরের মতো জড় হয়ে যাওয়া নয়, পক্ষান্তরে প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল সন্তুষ্ট হওয়ার বাসনা করা। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর সন্দর্ভে এই অকামভাবের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, *ভজনীয়-পরম-পুরুষ-সুখমাত্র-স্ব-সুখত্বম্*। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করে মানুষের প্রসন্ন হওয়া উচিত। জীবের এই স্বজ্ঞা বা স্বচেতনা ভৌতিক জগতে বদ্ধ অবস্থাতেও কখনো কখনো প্রকাশ পায়, এবং এই স্বজ্ঞা অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অবিকশিত চেতনায় পরার্থবাদ, পরোপকার, সমাজবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়। জড়জাগতিক স্তরে সমাজ, জাতি, পরিবার, দেশ অথবা মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করার যে প্রবৃত্তি, তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে জীবের তৃপ্তি লাভ করার প্রবণতারই আংশিক প্রকাশ।

এই অপূর্ব অনুভূতি ভগবানের আনন্দ বিধান করার মাধ্যমে ব্রজবালারা প্রদর্শন করেছিলেন। কোন কিছু প্রত্যাশা না করেই গোপিকারা ভগবানকে ভালবেসেছিলেন, এবং অকামভাবের এটিই হচ্ছে আদর্শ দৃষ্টান্ত। কামভাব, বা নিজের সন্তুষ্টি বিধানের বাসনা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় এই জড় জগতে, কিন্তু অকাম ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় চিজ্জগতে।

ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা কামভাবেরই প্রকাশ, কেননা তা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সুখভোগের বাসনারই প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত কখনো মুক্তি কামনা করেন না, যার ফলে তিনি জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন। তথাকথিত মুক্তি

ব্যতীতই শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের অভিলাষ করেন। কামভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রথমে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন, কেননা তিনি যাঁর নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধভক্ত হওয়ার ফলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন, কেননা তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করাই ছিল তাঁর পরম কর্তব্য। এইভাবে তিনি অকাম হয়েছিলেন। সেইটিই হচ্ছে শুদ্ধ জীবের পরম অবস্থা।

উদারধীঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার। জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা ক্ষুদ্র দেবতাদের পূজা করে, এবং সেই প্রকার বুদ্ধির নিন্দা করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২০) তাদের *হৃতজ্ঞান* বলা হয়েছে, অর্থাৎ যার বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে গেছে। পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত দেবতাদের কাছ থেকে কোন ফল লাভ করা যায় না। তাই উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, এমন কি জড়জাগতিক লাভের জন্যও। তাই উদার দৃষ্টিভঙ্গী বা বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে সর্ব অবস্থাতেই, তা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষীই হোন অথবা মুক্তির আকাঙ্ক্ষীই হোন, সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। অকাম বা সকাম বা মোক্ষকাম, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় যুক্ত হওয়া। এর অর্থ এই যে, যথাযথভাবে ভক্তিযোগের অনুশীলন করার জন্য কর্ম এবং জ্ঞানের মিশ্রণ থেকে মুক্ত হতে হবে। অবিমিশ্রিত সূর্যের কিরণ অত্যন্ত তীব্র, তেমনই অন্তরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হয়ে সকলেই শ্রবণ, কীর্তন আদি অবিমিশ্রিত ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে পারে।

শ্লোক ১১

এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ১১ ॥

এতাবান্—এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার পূজকেরা ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **যজতাম্**— পূজা করার সময় ; **ইহ**—এই জীবনে ; **নিঃশ্রেয়স**—সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ; **উদয়ঃ**— বিকাশ ; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে ; **অচলঃ**—অবিচলিত ; **ভাবঃ**—স্বতঃস্ফূর্ত ; **যৎ**—যা ; **ভাগবত**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ; **সঙ্গতঃ**—সঙ্গ।

অনুবাদ

বিভিন্ন দেবদেবীর পূজকেরা এই পৃথিবীতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণরূপ অবিচলিত ভক্তি লাভ করেন, তারই ফলে তাঁদের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়।

তাৎপর্য

দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত এই জড় সৃষ্টিতে সমস্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতি বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের দ্বারা আবদ্ধ। জীব তার শুদ্ধ স্বরূপে সচেতন থাকে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে সে যখন জড় জগতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার বেঁচে থাকাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে মনে করে এবং বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে। এই জীবন-সংগ্রাম জড় জগতকে ভোগ করার মোহে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হওয়ার মতো। জড় সুখভোগের যত পরিকল্পনা, তা এই অধ্যায়ের পূর্বোক্ত শ্লোকগুলিতে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার মাধ্যমেই হোক অথবা ভগবান বা দেবতাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের ফলে হোক, সবই মায়িক। কেননা সুখভোগের এই সমস্ত পরিকল্পনা সত্ত্বেও জীব এই জড় সৃষ্টিতে কখনোই তার জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস এই ধরনের সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের কাহিনীতে পূর্ণ, এবং বহু রাজা এবং মহারাজা কালচক্রে আবির্ভূত হয়ে সেই কালচক্রেই মিলিয়ে গেছেন, রেখে গেছেন কেবল তাদের পরিকল্পনার কাহিনী। এই সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কোনই সমাধান হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করা। বিভিন্ন দেবদেবীদের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পূজা করে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে অথবা ভগবান বা দেবদেবীদের সাহায্য ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তথাকথিত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে কখনো এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান হয় না।

ঘোর জড়বাদীরা, যারা ভগবান অথবা দেবতাদের মানে না, তাদের ছাড়া অন্য মানুষদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেদ বিভিন্ন দেবদেবীদের পূজা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সমস্ত নির্দেশগুলি ভ্রান্ত বা কল্পনাপ্রসূত নয়। দেবতারা আমাদেরই মতো বাস্তব, তবে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা করার দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী।

এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা আদি বিভিন্ন দেবতাদের বিভিন্ন লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘোর জড়বাদীরা ভগবান অথবা দেবতাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। এমনকি তারা এও বিশ্বাস করে না যে, বিভিন্ন গ্রহগুলি বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা সবচাইতে নিকটবর্তী গ্রহ চন্দ্রলোকে গিয়েছে বলে বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি করছে বটে ; কিন্তু নানাপ্রকার যান্ত্রিক গবেষণার পরেও তারা চন্দ্রলোক সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং চন্দ্রে জমি বিক্রি করার ব্যাপারে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই সমস্ত গর্বান্ধ বৈজ্ঞানিক

অথবা ঘোর জড়বাদীরা সেখানে বসবাস পর্যন্ত করতে পারে না, আর অন্যান্য অসংখ্য গ্রহে প্রবেশ করার কি কথা ; সেগুলি তারা গণনাও পর্যন্ত করতে পারে না।

কিন্তু বেদের অনুগামীদের জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তাঁরা বৈদিক শাস্ত্রের সমস্ত বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন, যে কথা আমরা পূর্বেই প্রথম স্কন্ধে আলোচনা করেছি। তাই ভগবান, দেবতা এবং জড় জগতে অথবা জড় আকাশের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে তাঁদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্কাচার্য এবং চৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ ভারতের সমস্ত মহান আচার্যেরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র বলে স্বীকার করেছেন। এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাই পাঠ করেছেন, যেখানে দেবতাদের পূজা করার কথা এবং তাদের বিভিন্ন লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

"বিভিন্ন দেবতাদের পূজকেরা সেই সেই দেবতাদের লোকে গমন করেন, পিতৃপুরুষের পূজকেরা পিতৃলোকে গমন করেন। ঘোর জড়বাদীরা জড় জগতেই অবস্থান করে, কিন্তু ভগবানের ভক্তরা অন্তিমে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, এই জড় জগতের সমস্ত গ্রহ, এমনকি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সবই অনিত্য, এবং কোন বিশেষ সময়ে সেগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রলয়ের সময়ে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের অনুগামীরাও ধ্বংস হয়ে যাবেন, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তখন তিনি নিত্য জীবন লাভ করেন। বেদে সে কথাই বলা হয়েছে।

নাস্তিকদের থেকে দেব-দেবীর পূজকদের একটি বাড়তি সুবিধা রয়েছে, এবং তা হচ্ছে বেদের নির্দেশ সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার ফলে তারাএক সময় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার সুফল সম্বন্ধে জানতে পারবেন। কিন্তু ঘোর জড়বাদীদের বৈদিক নির্দেশের প্রতি কোনরকম শ্রদ্ধা নেই, তাই তারা সর্বদা অপূর্ণ প্রয়োগাত্মক জ্ঞান বা তথাকথিত ভৌতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয় এবং কখনোই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ভগবানের শুদ্ধভক্তের সান্নিধ্যে না আসে, ততক্ষণ ঘোর জড়বাদী অথবা অনিত্য দেবদেবীর উপাসকদের সমস্ত প্রচেষ্টাই শক্তির অপচয় মাত্র। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কৃপার ফলেই কেবল শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা যায়, যা হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই কেবল প্রগতিশীল জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করতে পারেন। তা ছাড়া, ভগবান অথবা দেবতাদের বিষয়ে তত্ত্ববিহীন জীবন অথবা অনিত্য জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের পূজায় যুক্ত জীবন, উভয়ই আকাশ-কুসুমের

বিভিন্ন স্তর মাত্র। সেকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রকৃত জ্ঞান ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রাজনৈতিক অথবা শুষ্ক মনোধর্মী দার্শনিকদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা কখনোই জানা যায় না।

শ্লোক ১২

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্র—
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ॥ ১২॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **যৎ**—যা; **আ**—পর্যন্ত; **প্রতিনিবৃত্ত**—সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত; **গুণোর্মি**—প্রকৃতির গুণের তরঙ্গ; **চক্রম্**—ঘূর্ণিস্রোত; **আত্মপ্রসাদঃ**—আত্মতৃপ্তি; **উত**—অধিকন্তু; **যত্র**—যেখানে; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণে; **অসঙ্গঃ**—আসক্তিরহিত; **কৈবল্য**—দিব্য; **সম্মত**—স্বীকৃত; **পথঃ**—পথ; **তু**—কিন্তু; **অথ**—অতএব; **ভক্তিযোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **কঃ**—কে; **নিবৃতঃ**—মগ্ন; **হরিকথাসু**—ভগবানের অপ্রাকৃত কথায়; **রতিম্**—আকর্ষণ; **ন**—না; **কুর্যাৎ**—করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের চক্রকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করে। এই জ্ঞান জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আত্মতৃপ্তি প্রদান করে, এবং অপ্রাকৃত হওয়ার ফলে মহাত্মাগণ কর্তৃক স্বীকৃত। কে এই জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১০/৯) বর্ণনা অনুসারে শুদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ অত্যন্ত বিচিত্র। শুদ্ধ ভক্তের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা, এবং তার ফলে তাঁরা পরস্পর ভাব বিনিময় করেন এবং দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। সদ্‌গুরুর নির্দেশানুসারে যথাযথভাবে শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করা হলে সাধন অবস্থাতেও এই দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা যায়। উন্নত স্তরে এই অপ্রাকৃত অনুভূতি ভগবানের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের উপলব্ধিতে পর্যবসিত হয়, যেটি হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই স্বরূপগত সম্পর্ক মধুর রসে ভগবৎ-প্রেম পর্যন্ত বিকশিত হয়, যা হচ্ছে সর্বোত্তম চিন্ময় আনন্দ।

ভগবদুপলব্ধির একমাত্র পন্থা বলে ভক্তিযোগকে বলা হয় *কৈবল্য*। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—*একো নারায়ণো দেবঃ পরাবরাণাং*

পরমাস্তে কৈবল্য-সংজ্ঞিতঃ, এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ কৈবল্য নামে পরিচিত, এবং যে উপায়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়, তাকে বলা হয় কৈবল্য পন্থা, বা ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা।

এই কৈবল্য পন্থার শুরু হয় পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ থেকে, এবং এই প্রকার হরিকথা শ্রবণের ফলে স্বাভাবিকভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, যার ফলে জড় বিষয়ের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না। তাই ভগবদ্ভক্তের জড় সুখভোগের প্রতি কোনরকম আসক্তি থাকে না। ভগবদ্ভক্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত, এবং উন্নত স্তরে ভগবদ্ভক্ত তাঁর নিজের শরীরের প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়েন। অতএব শরীরের সহিত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের কি কথা! ভগবদ্ভক্তির এই স্তরে ভক্ত আর জড়া প্রকৃতির গুণের তরঙ্গের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হন না।

জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ রয়েছে, এবং সমস্ত বৈষয়িক কার্যকলাপ, যার প্রতি সাধারণ মানুষেরা অত্যন্ত আকৃষ্ট, সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি ভগবদ্ভক্তের কোন আসক্তি থাকে না। এই অবস্থাকে এখানে *প্রতিনিবৃত্ত গুণোর্মি,* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সবরকম জড় সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত বা *আত্ম প্রসাদ* লাভ করার পন্থা সম্ভব হয়।

উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে এই স্তর প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁর অতি উন্নত অবস্থা সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় ভগবানের মহিমা প্রচার কার্যে ব্রতী হন এবং সব কিছুই, এমন কি তাঁর জাগতিক স্বার্থও ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন, যাতে নবীন ভক্তরাও তাদের জাগতিক স্বার্থগুলি দিব্য আনন্দে পর্যবসিত করতে পারে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধভক্তের এই আচরণকে *'নির্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে'* বলে বর্ণনা করেছেন। যদি জাগতিক কার্যকলাপও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করা যায়, তা হলে তা-ও দিব্য বা কৈবল্য-ক্রিয়ায় পরিণত হয়।

শ্লোক ১৩

শৌনক উবাচ

ইত্যভিব্যাহৃতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
কিমন্যৎপৃষ্টবান্ ভূয়ো বৈয়াসকিমৃষিং কবিম্ ॥ ১৩॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিব্যাহৃতম্**—যা কিছু বলা হয়েছে; **রাজা**—রাজা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ভরত-ঋষভঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **কিম্**—কি; **অন্যৎ**—অধিক; **পৃষ্টবান্**—তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **বৈয়াসকিম্**—ব্যাসদেবের পুত্রকে; **ঋষিম্**—অভিজ্ঞ; **কবিম্**—কাব্যময়।

অনুবাদ

শৌনক বললেন, ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন একজন অতি বিদ্বান ঋষি এবং তিনি কাব্যের আকারে সব কিছু বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে এ সব বিষয় শ্রবণ করার পর পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁকে পুনরায় কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী আপনা থেকেই বিকশিত হয়, এবং সেই সমস্ত গুণাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হচ্ছে—তিনি দয়ালু, শান্ত, সত্যবাদী, সমদর্শী, ত্রুটিহীন, উদার, মৃদু, শুচি, অনাসক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী, সন্তুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত, লালসা-রহিত, সরল, স্থির, সংযত, মিতভুক, প্রকৃতিস্থ, শিষ্ট, নিরহঙ্কার, গম্ভীর, দয়ালু, মৈত্রীভাবাপন্ন, কবি, দক্ষ এবং মৌন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক বর্ণিত ভগবদ্ভক্তের এই ছাব্বিশটি প্রধান গুণের মধ্যে এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সম্বন্ধে কবিত্ব গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে যেভাবে তা বর্ণনা করেছেন, তা কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দশন। তিনি ছিলেন আত্মতত্ত্ববেত্তা মহর্ষি। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন ঋষিদের মধ্যে কবি।

শ্লোক ১৪

এতচ্ছুশ্রূষতাং বিদ্বন্ সূত নোঽর্হসি ভাষিতুম্।
কথা হরিকথোদর্কাঃ সতাং স্যুঃ সদসি ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥

এতৎ—এই ; **শুশ্রূষতাম্**—শ্রবণেচ্ছাকারীদের মধ্যে ; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান ; **সূত**— সূত গোস্বামী ; **নঃ**—আমাদের ; **অর্হসি**—আপনি করতে পারেন ; **ভাষিতুম্**—ব্যাখ্যা করার জন্য ; **কথা**—বিষয় ; **হরি-কথা-উদর্কাঃ**—ভগবানের কথায় পর্যবসিত ; **সতাম্**—ভক্তদের ; **স্যুঃ**—হতে পারে ; **সদসি**—সভায় ; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

হে বিদ্বান সূত গোস্বামী! দয়া করে আপনি আমাদের বলুন তারপর কি হয়েছিল, কেননা আমরা তা শুনতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। ভগবদ্ভক্তের সভায় যে কথা হয় তা নিশ্চয়ই হরিকথা ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বে শ্রীল রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু* গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছি যে, জড় বস্তুও যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করা হয়, তা হলে তা অপ্রাকৃত বস্তুতে পর্যবসিত হয়। যেমন, মহাকাব্য বা রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাস, যা

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য (স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের) জন্য রচিত হয়েছিল, তাও বৈদিক শাস্ত্র বলে স্বীকার করা হয়, কেননা তাতে ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতকে বলা হয় পঞ্চম বেদ। অন্য চারটি বেদ হচ্ছে সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মহাভারতকে বেদের অংশ বলে স্বীকার করে না, কিন্তু মহর্ষিরা এবং মহাজনেরা তাকে পঞ্চম বেদ বলে স্বীকার করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশ এবং তাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য ভগবানের পূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলতে পারে যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গৃহস্থদের জন্য নয়, কিন্তু সেই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভেবে দেখে না যে, এই গ্রন্থটি গৃহস্থ লীলাবিলাসকারী ভগবান গৃহস্থ অর্জুনকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যদিও বৈদিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ দর্শন বিশ্লেষণ করেছে, তা হচ্ছে অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের নবীন অধ্যয়নকারীদের জন্য। আর শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সেই বিজ্ঞানের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর অধ্যয়নকারীদের জন্য। তাই মহাভারত, পুরাণ এবং অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থে ভগবানের লীলা পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই অপ্রাকৃত শাস্ত্র, এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে মহান ভক্তদের সভায় তা আলোচনা করা উচিত।

এই বিষয়ে সবচাইতে অসুবিধা হল এই যে, এই সমস্ত শাস্ত্র যখন পেশাদারী পাঠকেরা পাঠ করে, তখন তা জাগতিক ইতিহাস বলে মনে হয়, কেননা তাতে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব রয়েছে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত শাস্ত্র ভক্তদের সভায় আলোচনা করা উচিত। ভক্তদের সভায় যদি তা আলোচনা না করা হয়, তা হলে উচ্চস্তরের মানুষেরা তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন না।

অতএব চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ বা নিরাকার নন; তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, এবং তাঁর বিভিন্ন লীলা রয়েছে। তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গুরু এবং তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর আত্মমায়ার প্রভাবে এই জগতে অবতরণ করেন বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য। তার ফলে তিনি ঠিক একজন সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতার মতো আচরণ করেন। যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা চরমে ভগবানের কথায় পর্যবসিত হয়, তাই সেই সমস্ত বিষয়ের প্রাথমিক আলোচনাগুলিও অপ্রাকৃত। মানব সমাজের সামাজিক কার্যকলাপকে পারমার্থিক স্তরে পর্যবসিত করার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, নাটক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের রয়েছে। তাই যদি এই প্রবণতাকে ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত করা হয়, তা হলে সেগুলি ভগবানের ভক্তদের আস্বাদ্য বিষয়ে পর্যবসিত হবে।

নির্বিশেষবাদের অপপ্রচারের ফলে মানুষ নাস্তিক এবং শ্রদ্ধাহীন অসুরে পরিণত হচ্ছে; সকলকে শেখানো হচ্ছে যে, ভগবান নিরাকার, তাঁর কোন কার্যকলাপ নেই এবং তিনি নাম-রূপ বিহীন একটি জড় পাথর মাত্র। মানুষ যতই ভগবানের লীলার বিমুখ

হয়, ততই তারা বৈষয়িক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের নরকে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হচ্ছে (প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক কার্যকলাপ সমন্বিত) পাণ্ডবদের ইতিহাস থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমদ্ভাগবতকে বলা হয় *পরমহংস-সংহিতা*, বা সর্বোচ্চ স্তরের মহাত্মাদের জন্য বৈদিক শাস্ত্র, এবং তাতে পরম জ্ঞান বা সর্বোচ্চ স্তরের পারমার্থিক জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সকলেই পরমহংস, এবং হংসেরা যেমন জল থেকে দুধ আলাদা করে পান করতে পারে, তাঁরাও সেই রকম সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম।

শ্লোক ১৫

স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ।
বালক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভাগবতঃ**—ভগবানের মহান্ ভক্ত; **রাজা**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পাণ্ডবেয়ঃ**—পাণ্ডবদের পৌত্র; **মহারথঃ**—মহান যোদ্ধা; **বাল**—বাল্য অবস্থাতে; **ক্রীড়নকৈঃ**—খেলার পুতুল নিয়ে; **ক্রীড়ন্**—খেলতেন; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ক্রীড়াম্**—কার্যকলাপ; **যঃ**—যিনি; **আদদে**—স্বীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর শৈশব থেকেই একজন মহান্ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। পুতুল নিয়ে খেলার ছলে তিনি পরিবারের শ্রীবিগ্রহের পূজার অনুকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, যোগভ্রষ্ট পুরুষ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে অথবা সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা বা ধনী বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তার থেকেও অধিক, কেননা তাঁর পূর্ব জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন ভগবানের মহান্ ভক্ত, এবং তাই তিনি কুরু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে পাণ্ডবদের বংশে। তাই তাঁর শৈশবের প্রথম থেকেই তাঁর নিজের পরিবারে অন্তরঙ্গভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

---

* এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা এত সুসংহত ছিল যে, কেউই ভগবানের লীলা সমন্বিত শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করত না। ভগবদ্ সম্বন্ধ বিহীন অন্য কোন নাটক তারা অভিনয় করত না। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন মেলা বা উৎসব অনুষ্ঠান করত না। এমন কি ভগবানের লীলা বিজড়িত পবিত্র তীর্থ বা ধাম ছাড়া অন্য কোন স্থানে যেত না। তার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষও, তার শৈশব থেকেই, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করত। কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে তারা মানব সমাজকে কুকুর-শূকরের স্তরে অধঃপতিত করেছে এবং পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে কেবল অন্ন বস্ত্রের সংস্থানের জন্য পরিশ্রম করছে।

পাণ্ডবেরা সকলেই ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই তাঁরা নিশ্চয় রাজপ্রাসাদে পূজিত পরিবারের বিগ্রহের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। এইরকম পরিবারে যে সমস্ত শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, তারা সৌভাগ্যবশত শৈশবে শ্রীবিগ্রহের পূজার অনুকরণ করে খেলা করে।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল, এবং আমাদের শৈশবে আমরা আমাদের পিতৃদেবকে অনুকরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতাম। আমাদের পিতৃদেব রথযাত্রা, দোলযাত্রা আদি সমস্ত অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে পালন করতে অনুপ্রাণিত করতেন, এবং তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে মুক্ত হস্তে শিশুদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রসাদ বিতরণ করতেন।

আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবও বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মহান্ বৈষ্ণব পিতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কাছ থেকে ভক্তিবিষয়ক সব রকম অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। সমস্ত সৌভাগ্যবান বৈষ্ণব পরিবারে এইটিই হচ্ছে ধারা।

বিখ্যাত মীরাবাঈ ছিলেন গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাবতী ভক্ত। এই সমস্ত ভক্তদের ইতিহাস প্রায় একই রকম কেননা ভগবানের সমস্ত বড় বড় ভক্তদের প্রারম্ভিক জীবনে সর্বদা একপ্রকার ঐক্য দেখা যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে পরীক্ষিৎ মহারাজ নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর শৈশবে খেলার সাথীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করতেন। শ্রীধর স্বামীর মতে, মহারাজ পরীক্ষিৎ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার অনুকরণ করতেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও জীব গোস্বামীর মত সমর্থন করেছেন। উভয় মতানুসারেই মহারাজ পরীক্ষিৎ তার শৈশব থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি উপরোক্ত দুটি ভাবের যেটিরই অনুকরণ করে থাকুন না কেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর শৈশব থেকেই গভীরভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, যা হচ্ছে মহাভাগবতের লক্ষণ।

এমন মহাভাগবতদের বলা হয় নিত্য সিদ্ধ, বা জন্ম থেকেই মুক্ত-আত্মা। কিন্তু অন্য অনেকে রয়েছেন যাঁরা জন্ম থেকে মুক্ত পুরুষ নন, কিন্তু সঙ্গ প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হন। তাঁদের বলা হয় সাধন-সিদ্ধ। চরমে এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সকলেই সাধন-সিদ্ধ হতে পারেন। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন আমাদের আচার্য শ্রীনারদ মুনি। তাঁর পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, কিন্তু মহাভাগবতদের সঙ্গ প্রভাবে তিনি ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, যে দৃষ্টান্ত ভগবদ্ভক্তির ইতিহাসে বিরল।

শ্লোক ১৬

বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ।
উরুগায়গুণোদারাঃ সতাং স্যুর্হি সমাগমে ॥ ১৬ ॥

বৈয়াসকিঃ—ব্যাসদেবের পুত্র; **চ**—ও; **ভগবান্**—দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণ; **পরায়ণঃ**—আসক্ত; **উরুগায়**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যার মহিমা মহান দার্শনিকেরা কীর্তন করেন; **গুণ-উদারাঃ**—শ্রেষ্ঠ গুণাবলী; **সতাম্**—ভক্তদের; **স্যুঃ**—অবশ্যই হয়েছে; **হি**—নিশ্চয়; **সমাগমে**—উপস্থিতিতে।

অনুবাদ

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ ছিলেন এবং তিনি বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত ছিলেন। অতএব মহান ভক্তদের সমাগমে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনরূপ উদার কথাই হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সতাম্* শব্দটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। *সতাম্* শব্দটির অর্থ— ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য বাসনাশূন্য শুদ্ধভক্ত। এই প্রকার ভক্তসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মহিমা যথাযথভাবে আলোচিত হয়। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর কথা দিব্য বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ এবং কেউ যখন যথাযথভাবে *সতাম্দের* সঙ্গে তাঁর কথা শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই তার প্রভাব অনুভব করতে পারেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্তির স্তর লাভ করেন। এই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তাঁর জন্ম থেকেই মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের একজন মহান্ ভক্ত, তেমনই শুকদেব গোস্বামীও তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই একজন মহান্ ভক্ত ছিলেন। তাঁরা উভয়ই ছিলেন সমপর্যায়ভুক্ত। যদিও মনে হতে পারে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন রাজকীয় সুযোগ-সুবিধায় অভ্যস্ত একজন সম্রাট, আর শুকদেব গোস্বামী ছিলেন এমনই একজন আদর্শ ত্যাগী যে, তিনি তাঁর অঙ্গে বস্ত্র পর্যন্ত ধারণ করতেন না। আপাতদৃষ্টিতে মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামীকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুজনেই ছিলেন অনন্য ভক্তিসম্পন্ন ভগবানের শুদ্ধভক্ত। তেমন ভক্তরা যখন একত্রিত হন, তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন বা ভক্তিযোগের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা হতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও, যখন ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত অর্জুনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, তখনও ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা হতে পারেনি, যদিও তথাকথিত পণ্ডিতেরা তা নিয়ে তাদের নিজস্ব মত অনুসারে নানারকম জল্পনা কল্পনা করে থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *বৈয়াসকি* শব্দের পরে *চ* শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিত করে যে, শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ উভয়েই ছিলেন সমপর্যায়ভুক্ত ভগবদ্ভক্ত,

যদিও তাঁদের একজন গুরুর ভূমিকা এবং অপর জন শিষ্যের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সেই আলোচনার বিষয়, তাই *বাসুদেব-পরায়ণঃ* বা 'বাসুদেবের ভক্ত' উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা উভয়ই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। মহারাজ পরীক্ষিৎ যেখানে প্রায়োপবেশন অবলম্বন করেছিলেন, সেখানে যদিও অন্য অনেকে সমবেত হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা হয়নি; কেননা সেই সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন শুকদেব গোস্বামী এবং প্রধান শ্রোতা ছিলেন মহারাজ পরীক্ষিৎ। অতএব ভগবানের দুজন প্রধান ভক্তের দ্বারা কথিত এবং শ্রুত হওয়ার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনেরই নিমিত্ত।

শ্লোক ১৭

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তয়া ॥ ১৭ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **হরতি**—হরণ করে; **বৈ**—অবশ্যই; **পুংসাম্**—মানুষদের; **উদ্যন্**—উদিত হয়ে; **অস্তম্**—অস্তগত হয়ে; **চ**—ও; **যন্**—ভ্রমণ করে; **অসৌ**—সূর্য; **তস্য**—যিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন; **ঋতে**—বিনা; **যৎ**—যাঁর দ্বারা; **ক্ষণঃ**—সময়; **নীত**—ব্যবহৃত; **উত্তমশ্লোক**—সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবান; **বার্তয়া**—বার্তায়।

অনুবাদ

সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যাঁরা সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদেরই আয়ু কেবল তিনি হরণ করেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, মানব জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য অতি শীঘ্র ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হওয়া। কাল এবং জোয়ার-ভাঁটা কারোরই প্রতীক্ষা করে না। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাধ্যমে কালের যে গতি, তা ব্যর্থ হবে যদি পারমার্থিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার না করা হয়। পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণের বিনিময়েও জীবনের অপব্যবহৃত একটি ক্ষণও ফিরে পাওয়া যায় না। এই মনুষ্য জীবন জীবকে এই জন্য প্রদান করা হয় যাতে সে তার চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং তার নিত্য আনন্দের উৎস খুঁজে পেতে পারে। প্রতিটি জীব, বিশেষ করে মানুষ আনন্দের অন্বেষণ করে, কেননা আনন্দ হচ্ছে জীবের প্রকৃতিগত অবস্থা। কিন্তু সে বৃথাই জড় পরিবেশে সেই আনন্দের অন্বেষণ করছে। জীব তার স্বরূপে

পূর্ণতমের একটি চিৎ-স্ফুলিঙ্গ, এবং চিন্ময় কার্যকলাপের মাধ্যমে সে পূর্ণরূপে সেই আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ চিন্ময়, এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য তাঁর থেকে অভিন্ন। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যথাযথভাবে ভগবানের উপরোক্ত শক্তিগুলির মধ্যে যে কোন একটির সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ তার জন্য সিদ্ধির দ্বার খুলে যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/৪০) ভগবান সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না, তার স্বল্প আচরণও মানুষকে ভবসাগরের মহা ভয় থেকে উদ্ধার করার পক্ষে যথেষ্ট।" অত্যন্ত শক্তিশালী ওষুধ ধমনীতে প্রবেশ করানোর ফলে যেমন তৎক্ষণাৎ তা সারা শরীরের উপর ক্রিয়া করে, ঠিক তেমনই ভগবানের অপ্রাকৃত কথা শুদ্ধ ভক্তের কর্ণকুহরের মাধ্যমে প্রবিষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়। শ্রবণের দ্বারা অপ্রাকৃত বাণীর উপলব্ধি বলতে পূর্ণ উপলব্ধি বোঝায়, ঠিক যেমন গাছের এক জায়গায় ফল ধরলে বুঝতে হবে গাছের অন্যান্য অংশেও ফল ধরেছে। শুকদেব গোস্বামীর মতো শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ক্ষণিকের উপলব্ধিও মনুষ্য জীবনকে অমরত্ব প্রদান করে। তার ফলে সূর্য সেই শুদ্ধ ভক্তের আয়ু হরণ করতে পারে না, কেননা ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর যুক্ত থাকার ফলে তার অস্তিত্ব বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। মৃত্যু হচ্ছে অমৃতময় জীবের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থার লক্ষণ; জড় জগতের ভবরোগ নামক সংক্রামক ব্যাধির প্রভাবেই নিত্য জীব জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কবলগ্রস্ত হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, দান আদি জাগতিক পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ স্মৃতি-শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করা হলে নিঃসন্দেহে পরবর্তী জীবনে তার সুফল পাওয়া যাবে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই প্রকার দান যেন ব্রাহ্মণকে করা হয়। যদি অব্রাহ্মণকে (ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী বিহীন ব্যক্তিকে) অর্থ দান করা হয়, তা হলে পরবর্তী জীবনে সেই মাত্রায় অর্থ ফিরে পাওয়া যায়। তা যদি অর্ধ শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তা হলে দ্বিগুণ মাত্রায় সেই অর্থ ফিরে পাওয়া যায়। বিদ্বান এবং পূর্ণ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যদি তা দান করা হয়, তা হলে তা শত-সহস্র গুণে ফিরে পাওয়া যায় এবং সেই অর্থ যদি বেদ-পারগ (যিনি বেদের পন্থা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছেন) ব্যক্তিকে দান করা হয়, তা হলে তা অনন্ত গুণে বর্ধিত হয়।

বৈদিক জ্ঞানের চরম স্তর হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানা, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্য*) বলা হয়েছে। অর্থদান করা হলে, মাত্রা নির্বিশেষে তা নিশ্চিতভাবে ফিরে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তেমনই, শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে যদি একটি ক্ষণও যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে নিত্য জীবন লাভ করে জীবের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। *মদ্ধাম গত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত যে নিত্য জীবন লাভ করবেন, তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হয়েছে। ভক্তের বর্তমান জীবনে যে জরা এবং ব্যাধির প্রভাব দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুত নিত্য জীবনের প্রেরণা।

শ্লোক ১৮

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ১৮ ॥

তরবঃ—বৃক্ষ সমূহ; **কিম্**—কি; **ন**—করে না; **জীবন্তি**—জীবন ধারণ; **ভস্ত্রাঃ**—হাপর; **কিম্**—কি; **ন**—করে না; **শ্বসন্তি**—শ্বাস গ্রহণ; **উত**—ও; **ন**—করে না; **খাদন্তি**—খায়; **ন**—করে না; **মেহন্তি**—বীর্যপাত; **কিম্**—কি; **গ্রামে**—স্থানে; **পশবঃ**—পশু; **অপরে**—অন্য।

অনুবাদ

বৃক্ষসমূহ কি বেঁচে থাকে না? কামারের হাপর কি শ্বাসগ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? আমাদের চতুর্দিকে পশুরা কি আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে না?

তাৎপর্য

আধুনিক যুগের জড়বাদীরা তর্ক করবে যে, জীবন বা জীবনের একটি অংশেরও উদ্দেশ্য অধ্যাত্মবিদ্যা বা ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনার জন্য নয়। তাদের মতে, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহার, পান, স্ত্রী-সম্ভোগের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করার জন্য দীর্ঘায়ু লাভ করা। আধুনিক যুগের মানুষেরা জড়-বিজ্ঞানের প্রগতির মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। দীর্ঘতম আয়ু লাভ করার জন্য তাদের অনেক মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত রয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, আহার, স্ত্রী-সম্ভোগ, আসব পান এবং মজা উপভোগ করার ভোগবাদী দর্শনের চরিতার্থতা সাধনের জন্য তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা জড় বিজ্ঞানের প্রগতি জীবনের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার জন্য তপস্যা করা, যাতে এই জীবনের অন্তে শাশ্বত জীবনে প্রবেশ করা যায়।

জড়বাদীরা দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায়, কেননা পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। এই জীবনে তারা যতদূর সম্ভব সুখ-সুবিধা লাভ করতে চায়, কেননা তারা মনে করে যে, মৃত্যুর পর আর জীবন নেই। মানবের নিত্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং জড়দেহের পরিবর্তন সম্বন্ধে অজ্ঞতা আধুনিক মানব সমাজে এক প্রচণ্ড উৎপাত সৃষ্টি করেছে। তার ফলে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এবং আধুনিক মানুষের পরিকল্পনাগুলি যত বাড়ছে সেই সমস্ত সমস্যাগুলিও সেই পরিমাণে বাড়ছে। সমস্যাগুলির সমাধানের পরিকল্পনা সমস্যাগুলি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ যদি একশ বছরেরও অধিক আয়ু লাভ করে, তার অর্থ এই নয় যে, তার ফলে মানব সভ্যতার বিকাশ হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে

বলা হয়েছে যে, কিছু বৃক্ষ আছে যেগুলি শত সহস্র বছর বেঁচে থাকে। বৃন্দাবনে (ইমলিতলা নামক স্থানে) একটি তেঁতুল গাছ আছে, যা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসকালে বর্তমান ছিল। কলকাতায় বোটানিকাল গার্ডেনে একটি বটগাছ আছে, যার বয়স পাঁচশ বছরেরও অধিক। পৃথিবীর সর্বত্রই এ রকম বহু বৃক্ষ রয়েছে। অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই, শঙ্করাচার্য প্রকট ছিলেন কেবল বত্রিশ বছরের জন্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট ছিলেন কেবল আটচল্লিশ বছর। তার অর্থ কি এই যে, উপরোক্ত বৃক্ষগুলি শঙ্করাচার্য বা চৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ? আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ব্যতীত দীর্ঘ জীবনের কোন গুরুত্ব নেই।

অনেকে সন্দেহ পোষণ করে যে, গাছ-পালা যেহেতু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে না, তাই তাদের প্রাণ নেই। কিন্তু জগদীশ বসু প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে গাছ-পালারও জীবন আছে। অতএব শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করাটাই জীবনের প্রকৃত লক্ষণ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে কামারের হাপর খুব ভালভাবে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, হাপরের জীবন আছে। জড়বাদীরা তর্ক করবে যে, মানুষের জীবনের সঙ্গে বৃক্ষের জীবনের তুলনা করা চলে না, কেননা বৃক্ষ সুস্বাদু খাদ্য আহার করে অথবা মৈথুন সুখের মাধ্যমে তাদের জীবন উপভোগ করতে পারে না। তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রশ্ন করছে, কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুরা কি মানুষদের সঙ্গে এক গ্রামে থেকে আহার এবং মৈথুন সুখ উপভোগ করে না? শ্রীমদ্ভাগবত এই সম্পর্কে "অন্যান্য পশুরা"—এই বিশেষ শব্দ দুটি উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষেরা কেবল আহার, শ্বাস গ্রহণ এবং মৈথুনের পরিকল্পনা করে জীবন যাপন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যরূপী পশু মাত্র। এই প্রকার চাকচিক্যপূর্ণ পশুরা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানব-সমাজের কোন উপকার করতে পারে না। কারণ—পশুরা অনায়াসে অন্য পশুদের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু সাধারণত কোন উপকার করতে পারে না।

শ্লোক ১৯

শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ
সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো
জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ১৯ ॥

শ্ব—কুকুর; **বিড়্‌ বরাহ**—বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর; **উষ্ট্র**—উট; **খরৈঃ**—গর্দভদের দ্বারা; **সংস্তুতঃ**—পূর্ণরূপে প্রশংসিত; **পুরুষ**—ব্যক্তি; **পশুঃ**—পশু; **ন**—কখনো না; **যৎ**—যার; **কর্ণ**—কান; **পথ**—পথ; **উপেত**—আগত; **জাতু**—কোন সময়; **নাম**—দিব্য নাম; **গদাগ্রজঃ**—সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে, যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কখনো শ্রবণ করে না।

তাৎপর্য

জনসাধারণ যদি যথাযথভাবে পারমার্থিক মূল্য সমন্বিত উচ্চতর জীবন যাপনের শিক্ষা লাভ না করে, তাহলে তারা পশুদের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়, এবং এই শ্লোকে তাদের বিশেষ করে কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষা দিচ্ছে কুকুরোচিত মনোভাব অর্জন করে একজন প্রভুর সেবা স্বীকার করার। তথাকথিত শিক্ষা শেষ করে, তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তি একটি চাকরির আশায় একটি কুকুরের মতো দরখাস্ত হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরি খালি নেই বলে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কুকুর যেমন একটি উপেক্ষিত পশু এবং এক টুকরো রুটির জন্য সে তার প্রভুর দাসত্ব করে, তেমনই সেই সমস্ত মানুষেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত বিশ্বস্তভাবে তাদের প্রভুর সেবা করে।

যে সমস্ত মানুষের আহার্য সম্বন্ধে কোন বাছ-বিচার নেই এবং যারা সবরকম অখাদ্য খায়, তাদের শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শূকরেরা বিষ্ঠা আহার করতে অত্যন্ত ভালবাসে। অতএব বিষ্ঠা কোন বিশেষ পশুর খাদ্য। এমনকি পাথরও কোন বিশেষ প্রকার পশু বা পাখীর আহার্য। কিন্তু যা ইচ্ছা তাই খাওয়াটা মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের খাদ্য হচ্ছে শস্য, শাক-সব্জি, ফলমূল, দুধ, চিনি ইত্যাদি। পশুদের আহার মানুষদের আহার্য নয়। মানুষদের দন্ত-পংক্তি ফল-মূল, শাক-সব্জি ইত্যাদি কাটার জন্য বা চর্বণ করার জন্য বিশেষভাবে গঠিত। যে সমস্ত মানুষ পশুদের খাদ্য আহার না করে থাকতে পারবে না, তাদের জন্য দুটি শ্বপদ-দন্ত দেওয়া হয়েছে। সকলেই জানে যে, একজনের আহার আর একজনের বিষ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৯/২৬) বর্ণনা অনুসারে ভগবান পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি গ্রহণ করেন। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনরকম পশুর আহার ভগবানকে নিবেদন না করতে। তাই মানুষের আহার এক বিশেষ প্রকারের খাদ্য। তথাকথিত ভিটামিন সংগ্রহের জন্য তার পশুদের অনুকরণ করা উচিত নয়। তাই যে মানুষের খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোন বাছবিচার নেই, তাকে একটি শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

উট কাঁটা খেতে ভালবাসে। যে মানুষ পারিবারিক সুখ বা তথাকথিত জাগতিক সুখ ভোগ করতে চায়, তাকে একটি উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জড় সুখ নানারকম কণ্টকে পূর্ণ, তাই মানুষের কর্তব্য জড় জগতের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব কল্যাণ সাধনের জন্য বৈদিক বিধি-নিষেধের নির্দেশানুসারে জীবন যাপন করা। জড়

জগতে জীবন ধারণ করাটা এক রকম নিজের রক্ত শোষণ করার মতো। জড় সুখভোগের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মৈথুন। মৈথুন সুখ উপভোগ নিজের রক্ত শোষণ করারই মতো এবং সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার বিশেষ কিছু নেই। উট যখন কাঁটা চর্বণ করে, তখন সে তার নিজের রক্তই গলাধঃকরণ করে। কাঁটা চর্বণের ফলে তার জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত হয়, এবং তার মুখে রক্ত ঝরতে থাকে। সেই রক্ত মিশ্রিত কাঁটা খেয়ে উট মনে করে সেই কাঁটাগুলি কত সুস্বাদু। তেমনই বড় বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিরা যে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে নানা প্রকার অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, তা তাদের নিজেদের রক্তমিশ্রিত কর্মের কণ্টকময় ফল ভোগ করার মতো। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে এই সমস্ত অসুস্থ ব্যক্তিদের উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গর্দভ এমনই একটি পশু যে পশুদের মধ্যে সবচাইতে বড় মূর্খ বলে বিদিত। গর্দভ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে এবং তার নিজের কোন রকম লাভ ছাড়াই বিরাট বিরাট ভারি বোঝা বহন করে।*

গর্দভেরা সাধারণত ধোপার কাজে নিযুক্ত থাকে, যার সামাজিক অবস্থা খুব একটা সম্মানজনক নয়! আর গর্দভের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, সে গর্দভীর লাথি খেতে খুব অভ্যস্ত। গর্দভ যখন মৈথুন আকাঙ্ক্ষা করে তখন গর্দভী তাকে লাথি মারে, তথাপি

---

* বিশেষ মূল্যবোধ অর্জন করাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জীবনকে বলা হয় *অর্থদম্*, বা মূল্যবোধ প্রদানকারী। আর জীবনের পরম মূল্যবোধ কি? তা হচ্ছে জীবের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৮/১৫) ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষের স্বার্থের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। গর্দভ তার হিত সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং সে কঠোর পরিশ্রম করে কেবল অন্যদের জন্য। যে মানুষ মানব জীবনে লব্ধ তার নিজের হিত বিস্মৃত হয়ে কেবল অন্যদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, তাকে একটি গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তাঞ্জীব জাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্যায়াৎ॥
তদপ্যভলতাং জাতঃ তেষাম্ আত্মাভিমানিনাম্।
বরাকাণাম্ অনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্॥

মানব জীবন এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ যে, স্বর্গের দেবতারাও কখনো কখনো এই পৃথিবীতে মনুষ্য জীবন লাভের বাসনা করেন। কেননা মনুষ্য শরীর লাভ করার ফলেই কেবল অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। এই প্রকার মাহাত্ম্যপূর্ণ শরীর লাভ করা সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের সঙ্গে তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে, তা হলে অবশ্যই সে একটি মূর্খ, যে তার প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হয়েছে। এই ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি ক্রমশ ভ্রমণ করার পর এই মনুষ্য শরীর লাভ হয়। আর দুর্ভাগা মানুষ তার স্বার্থ ভুলে গিয়ে অপরকে নেতা সাজিয়ে তাদের রাজনৈতিক উত্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য নানা প্রকার ভ্রমাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক উত্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করাটা ক্ষতিকর নয়, তবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এই সমস্ত পরোপকারের কার্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সে কথা যে জানে না, তাকে সেই গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে নিজের বা অন্যের কল্যাণ সাধনের কথা না ভেবে কেবল অপরের জন্য পরিশ্রম করে।

মৈথুন-সুখের জন্য গর্দভ তার পিছন পিছন যায়। তাই স্ত্রৈন ব্যক্তিদের গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, বিশেষ করে এই কলিযুগে। এই যুগে মানুষ ঠেলাগাড়িতে অথবা রিকশায় অত্যন্ত ভারি বোঝা বহন করে গর্দভের কাজে লিপ্ত। মানব সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি মানুষকে গর্দভের কাজে লিপ্ত করেছে। বড় বড় কলকারখানায় শ্রমিকেরাও এই প্রকার ভারবাহী কার্যে যুক্ত, এবং দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করার পর সেই সমস্ত দুর্ভাগা শ্রমিকেরা কেবল মৈথুন সুখের জন্যই নয়, নানা প্রকার গৃহস্থালী ব্যাপারেও তাদের স্ত্রীর লাথি খায়।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে আধ্যাত্মিক চেতনাবিহীন মানুষদের যে কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। এই প্রকার মূর্খ জনসাধারণের নেতারা এই সমস্ত কুকুর-শূকরদের দ্বারা পূজিত হয়ে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতে পারে, কিন্তু সেটি খুব একটা সম্মানজনক নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেউ মনুষ্যবেশী এই সমস্ত কুকুর-শূকরদের নেতা হতে পারে, কিন্তু তার যদি কৃষ্ণভাবনামৃত-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার অভিরুচি না থাকে, তা হলে সেই সমস্ত নেতারাও এক-একটি পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে একটি শক্তিশালী পশু বা বিশাল পশু বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে, তার নাস্তিক মনোভাবের জন্য তাকে মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কুকুর-শূকরের মতো ব্যক্তিদের ভগবদ্বিহীন এই সমস্ত নেতারা অধিক পরিমাণে পাশবিক গুণসম্পন্ন বড় বড় এক-একটি পশু।

শ্লোক ২০

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ২০ ॥

বিলে—সর্পের গর্ত ; **বত**—মতো ; **উরুক্রম**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত ; **বিক্রমান্**—শৌর্য ; **যে**—এই সমস্ত ; **ন**—কখনই না ; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ করেছে ; **কর্ণপুটে**—কর্ণরন্ধ্রে ; **নরস্য**—মানুষের ; **জিহ্বা**—জিভ ; **অসতী**—অর্থহীন ; **দার্দুরিকা**—ভেকের ; **ইব**—সদৃশ ; **সূত**—হে সূত গোস্বামী ; **ন**—কখনোই না ; **চ**—ও ; **উপগায়তি**—উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে ; **উরুগায়**—গান করার উপযুক্ত ; **গাথাঃ**—গীত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ভগবানের শৌর্য এবং অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেনি এবং ভগবানের গুণগাথা কীর্তন করেনি, তার কর্ণরন্ধ্র সর্পের গর্তের মতো এবং তার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মতো।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদিত হয় দেহের প্রতিটি অঙ্গের দ্বারা। এটি হচ্ছে আত্মার চিন্ময় শক্তি ; তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বতোভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে দেহের ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায় এবং সব কটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের কার্যকলাপ অপবিত্র বা জড় বলে বিবেচনা করা হয়। বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ব্যাপারে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয় সমেত পরম ঈশ্বর, আর তাঁর সেবক যারা তাঁরা বিভিন্ন অংশ, তারাও সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সমন্বিত। ভগবৎ-সেবা ইন্দ্রিয়সমূহের সর্বতোভাবে শুদ্ধ উপযোগ, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। ভগবান পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপদেশ দান করেছিলেন এবং অর্জুন পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে পূর্ণ অর্থ সমন্বিত এবং যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানের আদর্শ বিনিময় হয়েছিল। গুরুদেব পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যকে বৈদ্যুতিক আবেশের মতো দেন না, যা মূর্খ প্রচারকেরা অনেক সময় অজ্ঞতাবশত দাবী করে। সবকিছু অর্থবহ এবং যুক্তিসঙ্গত, এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বিচারের আদান-প্রদান তখনই সম্ভব হয় যখন শিষ্য বিনীতভাবে সেই যথার্থ জ্ঞান গ্রহণে আগ্রহী হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্ণ বিচার সহকারে গ্রহণ করা উচিত, যাতে তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কলুষিত অবস্থায় জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকে। কর্ণ যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে তা অবশ্যই আবর্জনার দ্বারা পূর্ণ হবে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী উদাত্ত কণ্ঠে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা উচিত। যে শুদ্ধ ভক্ত যথার্থ সূত্রে তা শ্রবণ করেছেন, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে সেই বাণী প্রচার করা। সকলেই প্রায় অন্যদের কিছু বলতে চায়, কিন্তু যেহেতু তারা বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলার শিক্ষা লাভ করেনি, তাই তারা নানা প্রকার অর্থহীন বিষয় নিয়ে কথা বলছে এবং অন্য মানুষেরাও তা গ্রহণ করছে। জাগতিক খবর বিতরণ করার হাজার উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ তা গ্রহণও করেছে। তেমনই, পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে ভগবান সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান শ্রবণ করতে হয়, এবং ভগবদ্ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে উদাত্ত কণ্ঠে সেই বাণী প্রচার করা যাতে তারা তা শুনতে পায়। ভেক বা ব্যাঙ উচ্চৈঃস্বরে কলরব করে এবং তার ফলে গ্রাসকারী সর্পকে সে আমন্ত্রণ জানায়। মানুষকে তার জিহ্বা দেওয়া হয়েছে

বিশেষভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য, ব্যাঙের মতো কোলাহল করার জন্য নয়। এই শ্লোকে *অসতী* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অসতী* মানে হচ্ছে যে স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। বেশ্যার মধ্যে সৎ স্ত্রীসুলভ গুণাবলী থাকে না। তেমনই, যে জিহ্বা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য মানুষকে দেওয়া হয়েছিল তা যদি অর্থহীন জাগতিক বিষয়ের গুণগানে মুখর হয়, তা হলে তাকে বেশ্যা বলেই বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ২১

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতে সপর্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২১ ॥

ভারঃ—মস্ত বড় বোঝা; **পরম্**—ভারী; **পট্ট**—রেশম; **কিরীট**—উষ্ণীষ; **জুষ্টম্**—সজ্জিত; **অপি**—এমনকি; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট; **অঙ্গম্**—অঙ্গ; **ন**—কখনোই না; **নমেৎ**—প্রণতি; **মুকুন্দম্**—মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণকে; **শাবৌ**—মৃতদেহ; **করৌ**—হস্তদ্বয়; **নো**—করে না; **কুরুতে**—করা; **সপর্যাম্**—পূজা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **কাঞ্চন**—সোনা দিয়ে তৈরী; **কঙ্কণৌ**—কঙ্কণদ্বয়; **বা**—যদ্যপি।

অনুবাদ

রেশমের উষ্ণীষ এবং কিরীটির দ্বারা মস্তক শোভিত থাকলেও তা যদি মুক্তিদাতা ভগবানের শ্রীচরণে প্রণত না হয়, তবে তা কেবল অত্যন্ত ভারী একটি বোঝার মতো। আর যে হস্তদ্বয় উজ্জ্বল সুবর্ণ কঙ্কণের দ্বারা অলঙ্কৃত, তা যদি ভগবান শ্রীহরির সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে তা শবের হস্তের মতো।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত তিন প্রকার। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত বা উত্তম অধিকারী ভক্তের দৃষ্টিতে সকলেই ভগবানের সেবায় যুক্ত, কিন্তু মধ্যম অধিকারী ভক্ত, ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য বিচার করেন। তাই মধ্যম অধিকারী ভক্ত প্রচার কার্যে যুক্ত হন, এবং উপরোক্ত শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে মুক্ত কণ্ঠে ভগবানের মহিমা প্রচার করা। মধ্যম অধিকারী ভক্ত কনিষ্ঠ ভক্ত বা অভক্তদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কখনো কখনো উত্তম অধিকারী ভক্ত প্রচারের জন্য মধ্যম অধিকারীর স্তরে নেমে আসেন। কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষদের, যাঁরা অন্তত কনিষ্ঠ ভক্ত হবেন বলে আশা করা হয়, তাঁদের এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন ভগবানের মন্দিরে গিয়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করেন। এমনকি অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি অথবা রেশমের উষ্ণীষ বা কিরীট শোভিত রাজাদের পর্যন্ত তা করা কর্তব্য।

ভগবান হচ্ছেন সকলেরই প্রভু, এমনকি তিনি মহান্ রাজা এবং সম্রাটদেরও প্রভু। তাই জনসাধারণের বিচারে যাঁরা অত্যন্ত ধনবান, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করা। মন্দিরে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহকে কখনোই পাথর অথবা কাঠ দিয়ে তৈরী বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়ে অধঃপতিত জীবদের তাঁর অসীম করুণা প্রদর্শন করছেন। শ্রবণের মাধ্যমে, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মন্দিরে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রথম বিধিটি হচ্ছে শ্রবণ। সকল শ্রেণীর ভক্তদেরই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। যে সমস্ত মানুষ তাদের জাগতিক ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহকে প্রণতি নিবেদন করে না, অথবা ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু না জেনে মন্দিরে ভগবানের পূজার নিন্দা করে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের উষ্ণীষ অথবা কিরীট কেবল তাদের ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে সাহায্য করবে। তবে ভারী বোঝা সমেত নিমজ্জমান ব্যক্তি বোঝাবিহীন ব্যক্তির থেকে অধিক দ্রুতগতিতে নিমজ্জিত হয়। মূর্খ মদমত্ত মানুষেরা ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান অস্বীকার করে ঘোষণা করে যে, ভগবান বলে কেউ নেই। কিন্তু তারা যখন ভগবানের আইনের কবলিত হয়ে নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তারা তাদের জাগতিক সম্পদের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে অবিদ্যার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। ভগবচ্চেতনাবিহীন ভৌতিক বিজ্ঞানের প্রগতি মানব সমাজের মস্তকে একটি ভারী বোঝার মতো, তাই এই মহান সতর্কবাণী সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত।

সাধারণ মানুষের যদি ভগবানের পূজা করার সময় না থাকে, তা হলে অন্তত অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও তারা হাত দিয়ে ভগবানের মন্দির পরিষ্কার করতে পারে অথবা ঝাড়ু দিতে পারে। উড়িষ্যার অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও জগন্নাথ পুরীতে রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর শ্রীজগন্নাথের মন্দির ঝাড়ু দিতেন। সকলেরই কর্তব্য, তা তিনি যত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই হোন না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা। জগন্নাথের আনুগত্যের ফলে মহারাজ প্রতাপরুদ্র এমনই শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন যে, সেই সময়ের অত্যন্ত পরাক্রমশালী পাঠান রাজা উড়িষ্যাতে প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন। জগন্নাথের প্রতি তাঁর আনুগত্য দর্শন করার ফলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে তাঁকে কৃপা করেন। ধনী ব্যক্তির গৃহিণীর হস্ত মূল্যবান কঙ্কণ ও বলয় দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় তাদের হস্তগুলিকে নিযুক্ত করা।

শ্লোক ২২

বর্হায়িতে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।

পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ২২ ॥

বর্হায়িতে—ময়ূরের পালকের মতো ; **তে**—তারা ; **নয়নে**—আঁখি ; **নরাণাম্**—মানুষদের ; **লিঙ্গানি**—রূপ ; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ; **ন**—করে না ; **নিরীক্ষতঃ**—দর্শন করে ; **যে**—এই সমস্ত ; **পাদৌ**—পদ ; **নৃণাম্**—মানুষদের ; **তৌ**—তারা ; **দ্রুমজন্ম**—বৃক্ষজাত ; **ভাজৌ**—সদৃশ ; **ক্ষেত্রাণি**—পবিত্র স্থান ; **ন**—কখনই না ; **অনুব্রজতঃ**—পরিভ্রমণ ; **হরেঃ**—ভগবানের ; **যৌ**—যা।

অনুবাদ

যে নয়ন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না তা ময়ূর পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর মতো, এবং যে পদ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ করে না তা বৃক্ষের মতো স্থাবর।

তাৎপর্য

বিশেষ করে গৃহস্থ ভক্তদের জন্য অর্চা-বিগ্রহের পূজা করার পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব প্রতিটি গৃহস্থের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা সীতা-রামের, অথবা নৃসিংহ, বরাহ, গৌর-নিতাই, মৎস্য, কূর্ম, শালগ্রাম বা বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, কেশব, অচ্যুত, বাসুদেব, নারায়ণ, দামোদর আদি বৈষ্ণব-তন্ত্র বা পুরাণে বর্ণিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠা সহকারে অর্চন-বিধি পালনপূর্বক সপরিবারে সেই বিগ্রহের পূজা করা। বার বছর বা বেশি বয়ঃপ্রাপ্ত পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়া উচিত, এবং ভোর চারটা থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত মঙ্গল-আরাত্রিক, নিরঞ্জন, অর্চন, পূজা, কীর্তন, শৃঙ্গার, বৈকালিক-ভোগ, সন্ধ্যা-আরাত্রিক, পাঠ, সান্ধ্য-ভোগ, শয়ন-আরাত্রিক ইত্যাদি ভগবানের দৈনন্দিন সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় এইভাবে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত হওয়ার ফলে গৃহস্থ ভক্ত অনায়াসে পবিত্র হতে পারবে এবং অতি দ্রুত পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবে। পুঁথিগত জ্ঞান কেবল ধারণাগত, কিন্তু অর্চনের পন্থা ব্যবহারিক। ধারণাগত এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়। কনিষ্ঠ ভক্তের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সুদক্ষ গুরুর উপর, যিনি জানেন কিভাবে তাঁর শিষ্যকে ধীরে ধীরে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জনের মানসে কপটতাপূর্বক গুরুগিরি করা উচিত নয় ; পক্ষান্তরে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে শিষ্যকে উদ্ধার করার জন্য গুরু হওয়ার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। সদ্‌গুরুর গুণাবলী বর্ণনা করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্বাষ্টক রচনা করেন। তার একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের পূজনীয় অর্চাবিগ্রহ, এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে নিয়মিতভাবে সেই বিগ্রহকে শৃঙ্গার করার মাধ্যমে, মন্দির মার্জন করার মাধ্যমে তাঁর আরাধনায় যুক্ত হওয়া। সদ্‌গুরু কৃপা করে নবীন ভক্তকে স্বয়ং এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেন এবং ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, রূপ ইত্যাদি উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন।

কেবল নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, বিশেষ করে ভগবানের শৃঙ্গার মন্দির সজ্জা, কীর্তন এবং শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করার মাধ্যমে পারমার্থিক উপদেশ অর্জনপূর্বক নিয়মিতভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার ফলে সাধারণ মানুষ নারকীয় সিনেমার আকর্ষণ এবং বেতারে পরিবেশিত জঘন্য আধুনিক গানের আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারে। কেউ যদি বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করতে পারে, তা হলে তার উচিত যে সমস্ত মন্দিরে নিয়মিতভাবে উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি পালন করা হয় সেখানে যাওয়া। মন্দিরে গিয়ে পবিত্র পরিবেশে সুন্দর শৃঙ্গারে সজ্জিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার ফলে বিষয়াসক্ত মন স্বাভাবিক ভাবেই চিন্ময় চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে। মানুষের কর্তব্য বৃন্দাবন আদি ধামে যাওয়া যেখানে এই রকম মন্দিরে বিশেষভাবে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হয়। পুরাকালে রাজা-মহারাজা এবং ধনী বণিকেরা ষড় গোস্বামীর মতো ভগবানের সুদক্ষ ভক্তদের নির্দেশনায় এই প্রকার মন্দির নির্মাণ করতেন। সাধারণ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মহান্ ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (*অনুব্রজ*) পবিত্র ধামে তীর্থ করতে গিয়ে এই সমস্ত মন্দিরে এবং সেখানে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে যোগদান করার মাধ্যমে সেই সুযোগের যথার্থ সদ্‌ব্যবহার করা। এই সমস্ত পবিত্র তীর্থে কেবল ভ্রমণের মনোভাব নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে ভগবানের দিব্য লীলা অনুষ্ঠানের ফলে অমর হয়ে রয়েছে বলে জেনে এবং ভগবত্তত্ত্ব ব্যক্তির নির্দেশনায় এই সমস্ত স্থান দর্শন করতে হয়। তাকে বলা হয় *অনুব্রজ*। *অনু* মানে অনুসরণ করা। তাই শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করা, এমন কি মন্দির দর্শন এবং তীর্থপর্যটনের ক্ষেত্রেও। যে ব্যক্তি এইভাবে বিচরণ না করে, সে একটি জড় বৃক্ষের মতো, যাকে ভগবান চলচ্ছক্তির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কেবল প্রাকৃত দৃশ্য দর্শন করার জন্য ভ্রমণ করা হলে মানুষের চলচ্ছক্তির অপব্যবহার হয়। ভ্রমণের প্রবণতার সবচাইতে সুন্দর সদ্ব্যবহার হয় মহান্ আচার্যদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পবিত্র স্থান ভ্রমণের ফলে, এবং তা হলে পারমার্থিক জ্ঞান রহিত ধন উপার্জনের আকাঙ্ক্ষী নাস্তিকদের অপপ্রচারের দ্বারা বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ২৩

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ২৩ ॥

জীবন—জীবিত অবস্থায়; **শবঃ**—মৃতদেহ; **ভাগতাঙ্ঘ্রিরেণুম্**—ভগবানের শুদ্ধভক্তের চরণরেণু; **ন**—কখনই না; **জাতু**—কোন সময়; **মর্তাঃ**—মরণশীল; **অভিলভেত**—বিশেষভাবে প্রাপ্ত; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **শ্রী**—ঐশ্বর্যসহ; **বিষ্ণুপদ্যা**—শ্রীবিষ্ণুর চরণ কমলের; **মনুজঃ**—মনুর বংশধর (মানব); **তুলস্যাঃ**—তুলসীদল; **শ্বসন্**—শ্বাস গ্রহণ করলেও; **শবঃ**—মৃত শরীর; **যঃ**—যে; **তু**—কিন্তু; **ন বেদ**—জানে না; **গন্ধম্**—সুগন্ধ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কখনো তার মস্তকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণরেণু ধারণ করেনি, সে জীবিত থাকলেও তার দেহটি মৃত। আর যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের তুলসীদলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করেনি, সে শ্বাস গ্রহণ করলেও তার দেহটি মৃত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে যে মৃতদেহ শ্বাস গ্রহণ করে তা হচ্ছে প্রেতাত্মা। কেউ যখন দেহত্যাগ করে, তখন তাকে বলা হয় মৃত, কিন্তু সে যদি পুনরায় আমাদের দৃষ্টির অগোচরে সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয় এবং নানারকম কার্যকলাপ করতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় প্রেতাত্মা। ভূত বা প্রেতেরা অত্যন্ত খারাপ বস্তু, এবং তারা সর্বদাই ভীতিজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং মন্দিরে বিষ্ণু-বিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাহীন প্রেতবৎ অভক্তেরা সর্বদাই ভক্তদের জন্য ভীতিজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এই প্রকার অপবিত্র প্রেতাত্মাদের নিবেদন ভগবান কখনো গ্রহণ করেন না। একটি প্রবাদ আছে যে, প্রিয়তমার প্রতি প্রেমভাব প্রদর্শন করার পূর্বে তার কুকুরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করতে হয়। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ভগবদ্ভক্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সেবক হওয়া এবং তার সার্থকতা ব্যক্ত করে বলা হয়, "শুদ্ধ ভক্তের সেবা করেছেন যে শুদ্ধ ভক্ত তাঁর চরণরেণু গ্রহণ করা।" সেইটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের পরম্পরা।

মহারাজ রহূগণ মহাভাগবত জড়ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কিভাবে তিনি পরমহংসের মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তার উত্তরে সেই মহাত্মা বলেছিলেন—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপনাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্যৈর
বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেসম্ ॥ ২৩ ॥ (ভাঃ ৫/১২/১২)

"হে মহারাজ রহূগণ, মহান্ ভগবদ্ভক্তের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তর বা পরমহংস স্তর লাভ করা যায় না। তপস্যা, বৈদিক প্রথায় পূজা-অর্চনা, সন্ন্যাস গ্রহণ, গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য পালন, বৈদিক মন্ত্র পাঠ, অথবা প্রচণ্ড সূর্য কিরণে বা শীতল জলের ভিতর অথবা জ্বলন্ত অগ্নির সম্মুখে কৃচ্ছ্রসাধন করার মাধ্যমে তা লাভ করা যায় না।"

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সম্পত্তি, এবং শুদ্ধ ভক্তই কেবল অন্য ভক্তদের সেই শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণকে কখনো সরাসরিভাবে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*, বা "ব্রজগোপিকাদের পালন কর্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসের অনুদাসের দাস" বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ভগবানের শুদ্ধভক্ত তাই কখনো সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের দাসের অনুদাসের সন্তুষ্টিবিধান করার চেষ্টা করেন, এবং তার ফলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তখনই কেবল ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণের তুলসীদলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করে আনন্দিত হন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, বৈদিক শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে—তাঁর কাছে যাওয়া যায়। বৃন্দাবনে সমস্ত শুদ্ধ ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাভিক্ষা করেন। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন পরম পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের কোমলহৃদয়া অর্ধাঙ্গিনী। তিনি সারা জগতের স্ত্রীরূপা প্রকৃতির সিদ্ধ অবস্থার অনুরূপা। তাই নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত অনায়াসে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা লাভ করতে পারেন, এবং তিনি যদি একবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই ভক্তের জন্য অনুমোদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাকে তাঁর সঙ্গী করে নেন। তাই যথার্থ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা না করে ভগবদ্ভক্তের কৃপা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হতে হয়, এবং তার ফলে (ভগবানের ভক্তের শুভেচ্ছার প্রভাবে) ভগবানের সেবা করার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ পুনরায় জাগরিত হবে।

শ্লোক ২৪

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—তা ; **অশ্ম-সারম্**—ইস্পাতের আবরণে আচ্ছাদিত ; **হৃদয়ম্**—হৃদয় ; **বতেদম্**—নিশ্চিতরূপে সেই ; **যৎ**—যা ; **গৃহ্যমাণৈঃ**—গ্রহণ করা সত্ত্বেও ; **হরিনাম**—ভগবানের পবিত্র নাম ; **ধেয়ৈ**—মনের একাগ্রতার দ্বারা ; **ন**—করে না ; **বিক্রিয়েত**—পরিবর্তন ; **অথ**—সেইভাবে ; **যদা**—যখন ; **বিকারঃ**—প্রতিক্রিয়া ; **নেত্রে**—নয়নে ; **জলম্**—অশ্রু ; **গাত্ররুহেষু**—লোমকূপে ; **হর্ষঃ**—উল্লাসের প্রস্ফুটন।

অনুবাদ

হরিনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং লোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, তার হৃদয় অবশ্যই ইস্পাতের আবরণে আচ্ছাদিত।

তাৎপর্য

আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তর বর্ণনা করা হয়েছে, এবং নবীন ভক্তদের জন্য ভগবানের বিশ্বরূপের মাধ্যমে ভগবানের স্থূল ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ভগবানের শক্তির ভৌতিক প্রকাশের মাধ্যমে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা যায় এবং ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মনকে মগ্ন করা যায়, যিনি পরমাত্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান। সাধারণ মানুষের পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তির জন্য যে পঞ্চ উপাসনার পদ্ধতি রয়েছে তাও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতরের পূজা করার ক্রমোন্নতির পদ্ধতি, যেমন অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য, সমগ্র জীবসত্তা, শিব এবং অবশেষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আংশিক অভিব্যক্তি নির্বিশেষ পরমাত্মা। সে সব অত্যন্ত সুন্দরভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রমোন্নতির পরবর্তী পর্যায় বর্ণিত হয়েছে তাঁদের জন্য, যাঁরা যথার্থই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন বা শুদ্ধভক্তি লাভ করেছেন ; এবং এখানে বিষ্ণুপূজার পরিপক্ক অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে হৃদয়ের পরিবর্তন হয়।

পারমার্থিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করা যার ফলে সে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তির প্রগতির ফলে হৃদয়ে যে পরিবর্তন হয় তার প্রকাশ হয় ধীরে ধীরে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা প্রসূত ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বিরক্তি এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি আসক্তির মাধ্যমে। বিধি-ভক্তি বা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা (যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে) সাধিত ভক্তি এখানে এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপের প্রেরণা প্রদানকারী মনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বতোভাবে আশা করা হয় যে,

বৈধী-ভক্তি অনুশীলনের ফলে অবশ্যই হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। সেরকম পরিবর্তন যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই হৃদয় কঠিন ইস্পাতে গাঁথা, কেননা ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা দ্রবীভূত হল না। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে সব চেয়ে মুখ্য অঙ্গ, এবং তা যদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণ সমন্বিত অপ্রাকৃত আনন্দের উপলব্ধি হবে। এইগুলি ভগবৎ-প্রেমের পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ভাব-স্তরের প্রাথমিক লক্ষণ, যা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়।

ভগবানের দিব্য নাম নিরন্তর শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলেও যদি এই ধরনের প্রতিক্রিয়া না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, নাম-অপরাধ হচ্ছে। এটি সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত। ভগবানের নাম গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় দশটি অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ভক্ত যদি বিশেষভাবে সতর্ক না হন, তা হলে অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণের মাধ্যমে ভগবৎ-বিরহের প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না।

ভাব-স্তরের প্রকাশ হয় আটটি অপ্রাকৃত লক্ষণের মাধ্যমে। যথা—*জাড্য, স্বেদ, পুলক, গদগদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু,* এবং অবশেষে *সমাধি*। শ্রীল রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* নামক গ্রন্থে এই সমস্ত অপ্রাকৃত লক্ষণ এবং *স্থায়ী* ও *সঞ্চারী ভাবের* বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

কিছু দুরাচারী কনিষ্ঠ ভক্ত যে সস্তা খ্যাতি লাভের জন্য উপরোক্ত লক্ষণগুলির অনুকরণ করে, সেই প্রসঙ্গে এই সমস্ত ভাবগুলির আলোচনাত্মক ব্যাখ্যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর করেছেন। কেবল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নন, শ্রীল রূপ গোস্বামীও এই সম্বন্ধে আলোচনাত্মক ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো কখনো প্রাকৃত সহজিয়ারা ভগবৎ-প্রেমানন্দের এই আটটি লক্ষণের অনুকরণ করে থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত কপট অনুকরণ তখনই ধরা পড়ে যায়, যখন দেখা যায় যে সেই সমস্ত কপট ভক্তরা নানারকম অবৈধ কর্মের প্রতি আসক্ত। ভক্তের বেশ ধারণ করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ধূমপান, আসবপান অথবা অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে সে কখনোই উপরোক্ত ভাবের লক্ষণগুলি উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি স্বেচ্ছায় অনুকরণ করা হচ্ছে, এবং তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সমস্ত অনুকরণকারীদের পাষাণ-হৃদয় মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন। তারা কখনো কখনো এই সমস্ত অপ্রাকৃত লক্ষণের আভাস হয়ত অনুভব করতে পারে, কিন্তু তারা যদি অবৈধ কার্যকলাপগুলি পরিত্যাগ না করে, তা হলে তাদের পারমার্থিক উপলব্ধির চেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

কভুরে গোদাবরী নদীর তীরে যখন শ্রীল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু রামানন্দ রায়ের পার্ষদ কতিপয় অভক্ত ব্রাহ্মণের উপস্থিতির ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভাব সংবরণ করেন। তাই কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত

কারণে মহাভাগবতের শ্রীঅঙ্গেও এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। **তাই প্রকৃত স্থায়ীভাব যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় *ক্ষান্তি* (জড় বাসনার সমাপ্তি), *অব্যর্থ কালত্বম্* (প্রতিটি ক্ষণ ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করা), *নাম গানে সদারুচি* (নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তনে ঔৎসুক্য), *প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে* (ভগবানের ধামে বাস করার আকর্ষণ), *বিরক্তি*** (সমস্ত জড় সুখের প্রতি পূর্ণ অনাসক্তি), **এবং *মানশূন্যতা*** (গর্বহীনতা) **আদি গুণগুলির মাধ্যমে। যিনি এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণগুলি অর্জন করেছেন তিনিই প্রকৃত *ভাবদশা* প্রাপ্ত হন, পাষাণ হৃদয় অনুকরণকারী প্রাকৃত অভক্তরা কখনোই সেই দশা প্রাপ্ত হয় না।**

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির সারাংশ বিশ্লেষণ করে বলা যায়—অনেক উন্নত ভক্ত সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ হয়ে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করেন এবং যিনি সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন তিনিই বাস্তবিকভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তনের অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন; এবং সেই উপলব্ধি পরিলক্ষিত হয় সবরকম জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি আদি উপরোক্ত লক্ষণগুলির মাধ্যমে। ভগবদ্ভক্তির নিম্নতর অবস্থায় অবস্থিত হওয়ার ফলে কনিষ্ঠ ভক্তেরা স্বভাবতই মাৎসর্যপরায়ণ, এবং তাই তারা আচার্যদের অনুগমন না করে নিজেদের মনগড়া ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিয়মের উদ্ভাবন করে। আপাতদৃষ্টিতে নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম জপ করার অভিনয় করলেও তারা ভগবানের নামের অপ্রাকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। তাই, তাদের অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি নিন্দনীয় অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে তাদের এই সমস্ত বদ অভ্যাসগুলির সংশোধন করা; তা না হলে তাদের পাষাণ হৃদয় কখনোই দ্রবীভূত হবে না এবং তাদের ভবরোগেরও নিরাময় হবে না। আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের প্রগতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তত্ত্বদ্রষ্টা ভগবদ্ভক্তের নির্দেশনায় শাস্ত্রের উপদেশাবলী অনুসরণ করার উপর।

শ্লোক ২৫

অথাভিধেহ্যঙ্গ মনোঽনুকূলং
প্রভাষসে ভাগবতপ্রধানঃ।
যদাহ বৈয়াসকিরাত্মবিদ্যা-
বিশারদো নৃপতিং সাধু পৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

অথ—অতএব; **অভিধেহি**—কৃপাপূর্বক বিশ্লেষণ করুন; **অঙ্গ**—হে সূত গোস্বামী; **মনঃ**—মন; **অনুকূলম্**—আমাদের মনোবৃত্তির অনুকূল; **প্রভাষসে**—বলুন; **ভাগবত**—মহান্ ভক্ত; **প্রধানঃ**—প্রধান; **যদাহ**—তিনি যা বলেছেন; **বৈয়াসকিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **আত্মবিদ্যা**—অপ্রাকৃত জ্ঞান; **বিশারদঃ**—দক্ষ; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **সাধু**—অতি উত্তম; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী! আপনার বাণী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তাই, আত্মবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সে কথা আমাদের কাছে কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো পূর্ববর্তী আচার্যেরা এই জ্ঞান বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং সূত গোস্বামীর মতো পরবর্তী আচার্যেরা যেভাবে তা অনুশীলন করেছেন তা সর্বদাই অত্যন্ত বলবতী দিব্য জ্ঞান, এবং তাই তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং সমস্ত শ্রদ্ধালু শিষ্যদের পক্ষে লাভপ্রদ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের 'শুদ্ধভক্তি ঃ হৃদয়ের পরিবর্তন' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ অধ্যায়

সৃষ্টি-প্রকরণ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

বৈয়াসকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ ।
উপধার্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন ; **বৈয়াসকেঃ**—শুকদেব গোস্বামীর ; **ইতি**—এইভাবে ; **বচঃ**—বাণী ; **তত্ত্বনিশ্চয়ম্**—সত্য নিরূপণকারী ; **আত্মনঃ**—আত্মায় ; **উপধার্য**—উপলব্ধি করে ; **মতিম্**—মনের একাগ্রতা ; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ; **ঔত্তরেয়ঃ**—উত্তরার পুত্র ; **সতীম্**—শুদ্ধ ; **ব্যধাৎ**—প্রয়োগ করেছিলেন ।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন ঃ শুকদেব গোস্বামীর আত্মতত্ত্ব নির্ণায়ক বাণী শ্রবণ করে উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ নিষ্ঠা সহকারে তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করেছিলেন ।

তাৎপর্য

সতীম্ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে 'বিদ্যমান' এবং 'শুদ্ধ' । এই দুটি অর্থই যথাযথভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। সমগ্র বৈদিক অধ্যবসায় মানুষের চেতনাকে পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের প্রতি আকৃষ্ট করায়, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) নির্দেশিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর জীবনের শুরু থেকেই মাতৃজঠরে অবস্থানকালে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি যখন তাঁর মাতৃ গর্ভে ছিলেন তখন অশ্বত্থামা তাঁর প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নামক আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হওয়ার হাত থেকে তিনি রক্ষা পান এবং তখন থেকেই তিনি নিরন্তর তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করেছিলেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ভক্তিতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন। অতএব স্বাভাবিকভাবে তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং যখন তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে জানতে পারেন যে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবানেরই আরাধনা করা, তা সকামভাবেই হোক বা নিষ্কামভাবেই হোক,

তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রীতি দৃঢ়তর হয়েছিল। সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যথা ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ এবং সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পরীক্ষিৎ মহারাজ এই দুটি সৌভাগ্যই অর্জন করেছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের মতো ভক্তদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং পাণ্ডব বংশ রক্ষা করার জন্য এবং তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান বিশেষভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে ভগবানেরই ব্যবস্থাপনায় ব্রাহ্মণ বালক কর্তৃক অভিশপ্ত হন এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১৯/১৫১)* বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

এই তত্ত্বটি পরীক্ষিৎ মহারাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এবং এই যোগাযোগের ফলে তিনি নিরন্তর তাঁর কথা স্মরণ করেছিলেন, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমার্গে উন্নতিসাধনের জন্য রাজাকে আরেকটি সুযোগ প্রদান করেছিলেন। তাঁকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত শ্রেষ্ঠ ভক্ত শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্য প্রদান করার মাধ্যমে, এবং সদ্‌গুরুর উপদেশ শ্রবণ করার ফলে তিনি তাঁর বিশুদ্ধ মনকে স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং বিরূঢ়াং মমতাং জহৌ ॥ ২ ॥

আত্ম—দেহ; **জায়া**—পত্নী; **সুত**—পুত্র; **আগার**—প্রাসাদ; **পশু**—হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি; **দ্রবিণ**—কোষাগার; **বন্ধুষু**—আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের; **রাজ্যে**—রাজ্যে; **চ**—ও; **অবিকলে**—বিচলিত না হয়ে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **বিরূঢ়াম্**—গভীর; **মমতাম্**—আসক্তি; **জহৌ**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর দেহ, জায়া, পুত্র, প্রাসাদ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি পশু, রাজকোষ, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দৃঢ় আসক্তি চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে *দেহাত্ম-বুদ্ধি* বা দেহরূপ আবরণ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, সন্তানাদি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। মানুষ দেহসুখের জন্য পত্নীর পাণিগ্রহণ করে এবং তার ফলে সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-পুত্রদের জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন হয়, এবং তার ফলে গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। ঘোড়া, হাতি, গাভী, কুকুর ইত্যাদি গৃহপালিত পশু, গৃহস্থদের গৃহস্থালীর জন্য এ সমস্ত রাখতে হয়। আধুনিক সভ্যতায় হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির স্থানে এসেছে পর্যাপ্ত অশ্বশক্তি সমন্বিত গাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহন। গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষকে তার ব্যাঙ্কের পুঁজি বাড়াতে হয় এবং কোষাগার সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। জাগতিক ধনসম্পদ উপস্থাপন করার জন্য মানুষকে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, এবং নিজের সামাজিক অবস্থা বজায় রাখতে হয়। একে বলা হয় জড় আসক্তি সমন্বিত জড় সভ্যতা। কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত সমস্ত জড় আসক্তি বর্জন করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিৎ সবরকম জড়জাগতিক সুবিধা এবং নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেছিলেন রাজারূপে নির্বিঘ্নে তা ভোগ করার জন্য, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি সবরকম জড় আসক্তি ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইটিই শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে তাঁর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের বশে পরীক্ষিৎ মহারাজ সর্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, এবং সারা পৃথিবীর একজন দায়িত্বশীল রাজারূপে তিনি সর্বদাই সতর্ক ছিলেন যাতে কলির প্রভাব তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। ভগবানের ভক্ত কখনোই তাঁর গৃহস্থালীকে তাঁর নিজের সম্পত্তি বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সবকিছুই ভগবানের সেবায় সমর্পণ করেন। তার ফলে জীব ভগবদ্ভক্তের তত্ত্বাবধানে, ভগবদ্ভক্ত প্রভুর পরিচালনায় ভগবদুপলব্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

গৃহস্থালীর প্রতি আসক্তি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একটি আসক্তি অন্ধকারের পথ এবং অন্যটি আলোকের পথ। যেখানে আলোক রয়েছে সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না, এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলোকের অভাব। কিন্তু সুদক্ষ ভক্ত ভগবানের সেবাবৃত্তির মাধ্যমে সবকিছু আলোকের পথে নিয়ে যেতে পারেন, এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন পাণ্ডবেরা। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর মতো গৃহস্থেরা তথাকথিত জড় বিষয়কে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে সবকিছুই আলোকে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু যারা যথাযথভাবে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়নি অথবা সবকিছুই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে পারে না *(নিবন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে)*, তাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার যোগ্যতা লাভের জন্য সবরকম জড় সম্পর্ক ত্যাগ করা। অথবা বলা যায়, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো যিনি অন্তত একদিনের জন্যও শুকদেব গোস্বামীর মতো

উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছেন, তিনি সমস্ত জড় আসক্তি ত্যাগ করতে সক্ষম হতে পারেন। মহারাজ পরীক্ষিতের অনুকরণ করে শ্রীমদ্ভাগবত পেশাদারী পাঠকদের কাছে শ্রবণ করলে কোন লাভ হয় না, এমনকি তা যদি সাতশ' বছর ধরেও শ্রবণ করা হয়। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ নাম-প্রভুর চরণে সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ (*সর্ব শুভ ক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ*)।

শ্লোক ৩-৪

পপ্রচ্ছ চেমমেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ।
কৃষ্ণানুভাব শ্রবণে শ্রদ্দধানো মহামনাঃ ॥ ৩ ॥
সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্য কর্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।
বাসুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ ॥ ৪ ॥

পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসিত; **চ**—ও; **ইমম্**—এই; **এব**—ঠিক যেমন; **অর্থম্**—উদ্দেশ্য; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমাকে; **পৃচ্ছথ**—আপনি জিজ্ঞাসা করছেন; **সত্তমাঃ**—হে মহান্ ঋষিগণ; **কৃষ্ণ-অনুভাব**—শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন; **শ্রবণে**—শ্রবণ করতে; **শ্রদ্দধানঃ**—শ্রদ্ধায় পূর্ণ; **মহামনাঃ**—মহাত্মা; **সংস্থাম্**—মৃত্যু; **বিজ্ঞায়**—জ্ঞাত হয়ে; **সংন্যস্য**—ত্যাগ করে; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **ত্রৈবর্গিকম্**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম নামক তিনটি বর্গ; **চ**—ও; **যৎ**—যাই হোক; **বাসুদেবে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মভাবম্**—প্রেমের আকর্ষণ; **দৃঢ়ম্**—অটল; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে ধর্মানুষ্ঠান আদি সবরকম সকাম কর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেমকে আরও দৃঢ়ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং আপনারা যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করছেন ঠিক সেই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বদ্ধ জীবেরা সাধারণত ধর্ম, অর্থ এবং কামের দ্বারা আকৃষ্ট। বেদে নির্দেশিত এই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপকে বলা হয় জীবনের কর্মকাণ্ডীয় ধারণা, এবং গৃহস্থদের সাধারণত এই সমস্ত বিধিগুলি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় ইহজীবনে এবং পরলোকে জাগতিক সুখভোগের জন্য। অধিকাংশ মানুষই এইপ্রকার কার্যকলাপের দ্বারা আকৃষ্ট। আধুনিক ভগবদ্বিহীন

সভ্যতায়ও মানুষ অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় অধিক ব্যস্ত, তবে তারা তা সাধন করার চেষ্টা করে স্বধর্মীয় চেতনাকে বাদ দিয়ে। সারা পৃথিবীর মহান্ সম্রাটরূপে পরীক্ষিৎ মহারাজকে বৈদিক কর্মকাণ্ডের এই সমস্ত বিধি নিষেধ পালন করতে হত, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ক্ষণিকের সঙ্গ প্রভাবে তিনি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বাসুদেব), যাঁর প্রতি তাঁর জন্মের সময় থেকে স্বাভাবিক প্রেম ছিল, তিনিই হচ্ছেন সবকিছু, এবং তাই তিনি বেদের কর্মকাণ্ডে নির্দেশিত সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে তাঁর মনকে দৃঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় স্থির করেছিলেন। জ্ঞানীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। মুক্তিকামী জ্ঞানীরা সকাম কর্মীদের থেকে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, এবং শত-সহস্র জ্ঞানীদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একজন হয়ত মুক্ত হতে পারেন। এই প্রকার শত-সহস্র মুক্তদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত আত্মা এবং ভক্ত দুর্লভ, যেকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন। এখানে *মহামনাঃ* শব্দটির দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের বিশেষ যোগ্যতা বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাঁকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত মহাত্মাদের সমপর্যায়ভুক্ত করেছে। পরবর্তীকালেও এই প্রকার বহু মহাত্মা আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরা সকলে সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডীয় ধারণা পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে শিক্ষা দিয়েছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

"বহু ভক্তের (রমণীর) প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ এই পাদরতা দাসীকে আলিঙ্গনকরুন অথবা পদদলিত করুন, অথবা দীর্ঘকাল দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুন, তথাপি তিনি আমার হৃদয়ের নাথ।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

বিরচয়ময়ী দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ামী বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরস্বা নবাম্ভঃ
তদপি কিলপয়োধঃ স্তূয়তে চাতকেন ॥

"হে দীনের নাথ! আপনি আমাকে নিয়ে যা করতে চান তাই করুন। আপনি যদি চান তা হলে আমার প্রতি আপনি কৃপা বর্ষণ করতে পারেন অথবা দণ্ডদান করতে পারেন, কিন্তু এই জগতে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই; যেমন চাতক সর্বদা মেঘের প্রার্থনা করে, তা সে মেঘ বারিই বর্ষণ করুক অথবা বজ্রপাত করুক।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় দায়-দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে এই কথাগুলি বলেছেন—

সন্ধ্যা-বন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্রক্বাপি নিষদ্য যাদব-কুলোত্তমস্য কংস-দ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেনমে ॥

"হে সন্ধ্যাবন্দনা, তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক। হে প্রাতঃস্নান, আমি তোমাকে শুভ বিদায় জানাই। হে দেবগণ এবং পিতৃগণ, দয়া করে আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, কেননা আমি আপনাদের প্রসন্নতার জন্য যোগ্য কার্য সম্পাদনে অক্ষম। আমি এখন কেবল সর্বত্র সর্বদা যদুকুলতিলক কংসারিকে (শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরণ করার মাধ্যমে সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে মনস্থ করেছি। আমি মনে করি এটিই যথেষ্ট। অতএব অন্য প্রচেষ্টা করার আর কি প্রয়োজন?"

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী আরও বলেছেন—

মুগ্ধং মাং নিগদন্তু নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকাঃ
মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধীয়ং মুক্তাদরাঃ সোদরাঃ।
উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামম্মহাদাম্ভিকম্
মোক্তুং ন ক্ষামতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাম্ ॥

"নীতিবাদীরা আমাকে মোহগ্রস্ত বলে নিন্দা করুক, তাতে আমি কিছু মনে করি না। বৈদিক কার্যকলাপে নিপুণ ব্যক্তিরা আমাকে পথভ্রষ্ট হয়েছি বলে বলুক, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে মন্দমতি বলে বলুক, আমার সহোদরেরা আমাকে মূর্খ বলে মনে করুক, ধনী ব্যক্তিরা আমাকে উন্মত্ত বলে মনে করুক এবং বিবেকচতুর দার্শনিকেরা আমাকে মহা দাম্ভিক বলে বিবেচনা করুক; তথাপি শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার সংকল্প থেকে আমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, যদিও আমি তা সম্পাদনে অক্ষম।"

প্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন—

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽবিহিতাস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষাত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্ব-সুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥

"ধর্ম, অর্থ এবং কাম, মোক্ষ-প্রাপ্তির তিনটি উপায় বলে বিবেচিত হয়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে *ঈক্ষাত্রয়ী,* অর্থাৎ, আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, সকাম কর্মের জ্ঞান এবং তর্কবিদ্যা, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক জীবিকা-নির্বাহের বিভিন্ন উপায়। এই সমস্ত বৈদিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়, এবং তাই আমি সেইগুলিকে অনিত্য কার্যকলাপ বলে মনে করি।

পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগতিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত লাভ, এবং তাকে আমি পরম সত্য বলে মনে করি।" *(ভাঃ ৭/৬/২৬)*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/৪১) সমগ্র বিষয়কে *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ* বা সিদ্ধিলাভের চরম পন্থা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। মহান্ বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, এটিকে *ভগবদর্চনা-রূপৈকনিষ্কাম-কর্মভি বিশুদ্ধ চিত্তঃ*—ভগবানের প্রেমময়ী সেবাকে, সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত, পরম কর্তব্য বলে স্বীকার করেছেন।

অতএব পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় ধারণাগুলি ত্যাগ করে ভগবানের চরণকমল দৃঢ়তাপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন তা যথার্থই মঙ্গলজনক হয়েছিল।

শ্লোক ৫

রাজোবাচ

সমীচীনং বচোব্রহ্মন্ সর্বজ্ঞস্য তবানঘ।
তমো বিশীর্যতে মহ্যং হরেঃ কথয়তঃ কথাম্ ॥ ৫ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন ; **সমীচীনম্**—যথার্থ সত্য ; **বচঃ**—বাণী ; **ব্রহ্মন্**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ; **সর্বজ্ঞস্য**—যিনি সবকিছু জানেন ; **তব**—আপনার ; **অনঘ**—নিষ্পাপ ; **তমঃ**—অজ্ঞানের অন্ধকার ; **বিশীর্যতে**—ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে ; **মহ্যম্**—আমাকে ; **হরেঃ**—ভগবানের ; **কথয়তঃ**—যেভাবে আপনি বলছেন ; **কথাম্**—বিষয়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন ঃ হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ! আপনি সবকিছুই জানেন, কেননা আপনি সবরকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই আপনি আমাকে যা কিছু বলেছেন তা যথার্থই বলে প্রতীত হচ্ছে। আপনার বাণী ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করছে, কেননা আপনি পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করছেন।

তাৎপর্য

এখানে মহারাজ পরীক্ষিতের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে, যার ফলে বুঝতে পারা যায় যে, ভগবানের অপ্রাকৃত কথা যখন ঐকান্তিক ভক্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করেন তখন তা ওষুধের মতো কাজ করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মকাণ্ডপরায়ণ শ্রোতারা যখন পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করে, তখন তা কখনোই অলৌকিকভাবে কার্য করে না, যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের বাণীর ভক্তিপূর্ণ শ্রবণ সাধারণ বিষয়ের কথা শোনার মতো নয় ; তাই নিষ্ঠাপরায়ণ শ্রোতা, ক্রমশ অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার মাধ্যমে তার ফল অনুভব করতে পারবেন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ।।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩)

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যখন খেতে দেওয়া হয় তখন সে একসঙ্গে ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং আহারের তৃপ্তি অনুভব করতে পারে। তখন আর তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে, তাকে সত্যি সত্যি খাওয়ানো হচ্ছে কিনা। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের যথার্থ ফল হচ্ছে যে, তার মাধ্যমে জীব জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়।

শ্লোক ৬

ভূয় এব বিবিৎসামি ভগবানাত্মমায়য়া।
যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্বিভাব্যমধীশ্বরৈঃ ॥ ৬ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায় ; **এব**—ও ; **বিবিৎসামি**—আমি জানতে চাই ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **আত্ম**—নিজের ; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা ; **যথা**—যেমন ; **ইদম্**—এই বৈষয়িক জগৎ ; **সৃজতে**—সৃষ্টি করেন ; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **দুর্বিভাব্যম**—অচিন্ত্য ; **অধীশ্বরৈঃ**—মহান্ দেবতাদের দ্বারা।

অনুবাদ

আমি আপনার কাছে জানতে চাই পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, যা মহান্ দেবতাদের পক্ষেও দুর্বোধ্য।

তাৎপর্য

প্রতিটি জিজ্ঞাসু মনেই এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্নের উদয় হয়, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ব্যক্তির পক্ষে, যিনি তাঁর গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপের কথা জানতে চেয়েছিলেন, এই প্রকার প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। প্রতিটি অজ্ঞাত বিষয়ই আমাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানতে হয়। সৃষ্টি বিষয়ক প্রশ্নটিও এমন একটি প্রশ্ন যা যথার্থ ব্যক্তির কাছে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে জানতে হয়। তাই এখানে শুকদেব গোস্বামী সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, সদ্‌গুরুকে অবশ্যই সর্বজ্ঞ হতে হবে। এইভাবে ভগবান সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্ন যা শিষ্যের কাছে অজ্ঞাত তা যোগ্য গুরুর কাছ থেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানতে হয়, এবং এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, ইতিমধ্যেই জানতেন যে আমরা যা কিছু দেখি তা সবই ভগবানের শক্তিসম্ভূত, যা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই জানতে পেরেছি *(জন্মাদ্যস্য যতঃ)*। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। সৃষ্টির উৎস তাঁর জানা ছিল ; তা না হলে তিনি প্রশ্ন করতেন না কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা এই

দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন। সাধারণ মানুষও জানে যে, কোনো সৃষ্টিকর্তা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আপনা থেকে তা সৃষ্টি হয়নি। এই ব্যবহারিক জগতে আমরা কোন কিছুই আপনা থেকে সৃষ্টি হতে দেখি না। মূর্খ মানুষেরা বলে যে, সৃজনী শক্তিও বৈদ্যুতিক শক্তির মতো স্বতন্ত্র এবং আপনা থেকেই কাজ করে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তিও কোন সুদক্ষ কারিগরের দ্বারা শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে তৈরি হয়, এবং তারপর সেই শক্তি স্থানীয় কারিগরের তত্ত্বাবধানে সর্বত্র বিতরণ করা হয়। সৃষ্টি সম্পর্কে ভগবানের অধ্যক্ষতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩০) উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতি ভগবানের অসংখ্য শক্তির মধ্যে একটি *(পরাস্য শক্তিরবিবিধৈব শ্রূয়তে)*। একজন অনভিজ্ঞ বালক তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে সম্পাদিত স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক পদার্থবিদ্যার (ইলেক্‌ট্রনিক) নির্বিশেষ কার্যকলাপ এবং অন্যান্য অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে পারে, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ মানুষ জানেন যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন একজন সজীব মানুষ যিনি এই শক্তি সৃষ্টি করছেন। তেমনই এই পৃথিবীর তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা তাদের মনের জল্পনা-কল্পনা এবং অনুমানের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নির্বিশেষ সৃষ্টি সম্বন্ধে নানারকম অলীক মতবাদ উপস্থাপন করতে পারে, কিন্তু একজন বুদ্ধিমান ভগবদ্ভক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, সৃষ্টির পিছনে ভগবানের হাত রয়েছে, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী শক্তি-কেন্দ্রে একজন পরিচালক রয়েছেন। গবেষক পণ্ডিতেরা সমস্ত কার্যের কারণ অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের মতো গবেষক পণ্ডিতেরাও ভগবানের সৃষ্টি শক্তির অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হন, অতএব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত অতি ক্ষুদ্র জড় পণ্ডিতদের কি কথা!

ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহে যেমন জীবেদের বসবাসের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, এবং একটি গ্রহ যেমন অন্য গ্রহটি থেকে শ্রেষ্ঠ, তেমনই সেই সমস্ত গ্রহের জীবেদের মস্তিষ্কের ক্ষমতাও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি ব্রহ্মালোকের অধিবাসীদের জীবন কত দীর্ঘ। তা এই পৃথিবীর মানুষদের পক্ষে একপ্রকার অচিন্তনীয়, তেমনই এই গ্রহের বৈজ্ঞানিকদের কাছেও ব্রহ্মার মস্তিষ্কের ক্ষমতা অচিন্তনীয়। সেইরকম বিশাল মস্তিষ্কের ক্ষমতা সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাঁর মহান্ সংহিতায় (*ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/১*) বর্ণনা করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

"ভগবানের গুণাবলী সমন্বিত বহু ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর কেননা তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ গোবিন্দ এবং সর্বকারণের পরম কারণ।"

ব্রহ্মাজী স্বীকার করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান তাদেরই মতো একজন। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন যে তিনিই হচ্ছেন সর্বেসর্বা, তখন মূঢ় দার্শনিক এবং জড়বাদী তার্কিকেরা তাঁর অবজ্ঞা করে। তাই ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১) দুঃখ করে বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি তখন মূর্খেরা আমার অবজ্ঞা করে। সর্বভূতের মহেশ্বররূপে আমার পরম ভাব তারা জানে না।" ব্রহ্মা এবং শিব (অন্যান্য দেবতাদের আর কি কথা) হচ্ছেন ভূত বা অত্যন্ত শক্তিশালী দেবতা, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন, অনেকটা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীদের মতো। মন্ত্রীরা ঈশ্বর হতে পারেন, বা নিয়ন্তা হতে পারেন, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন মহেশ্বর বা সমস্ত ঈশ্বরদের স্রষ্টা। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সে কথা জানে না, এবং তাই তিনি যখন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে কখনো কখনো মনুষ্যরূপে অবতরণ করেন, তখন তারা তাঁকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা করে। ভগবান মানুষের মতো নন। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং পরম ঈশ্বর, এবং তাঁর দেহ এবং আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। তিনি একাধারে শক্তি এবং শক্তিমান।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেননি; পক্ষান্তরে তিনি প্রথমে ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রথমেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কথা শুনতে বলেননি। তখন সময় ছিল অত্যন্ত কম, এবং তাই শুকদেব গোস্বামী স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সরাসরিভাবে দশম স্কন্ধের বর্ণনা করতে পারতেন, যা সাধারণত পেশাদারী পাঠকেরা করে থাকে। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা উভয়েই ভাগবত-সপ্তাহ আয়োজনকারীদের মতো এক লাফে ভগবানের গূঢ় লীলায় প্রবেশ করেননি; তাঁরা উভয়েই সুসংবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যৎ পাঠক এবং শ্রোতারা তাঁদের সেই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে কিভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে হয়।

ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির দ্বারা যারা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ যারা জড় জগতে রয়েছে, সর্ব প্রথমে তাদের জানা উচিত কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় তাঁর বহিরঙ্গা-শক্তি কার্য করে, এবং তারপর ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্যকলাপ জানা যেতে পারে। অধিকাংশ জড়বাদী দুর্গাদেবী বা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির পূজক, কিন্তু তারা জানে না যে, দুর্গাদেবী হচ্ছেন ভগবানের শক্তির ছায়া-স্বরূপা। তাঁর অত্যন্ত অদ্ভুত জড় কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় ভগবানেরই নির্দেশনায়, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম-সংহিতাতেও বলা হয়েছে যে, দুর্গার শক্তি গোবিন্দের নির্দেশনায়

কার্য করে, এবং তাঁর অনুমোদন ব্যতীত অতি শক্তিশালী দুর্গা-শক্তি একটি তৃণকে পর্যন্ত সরাতে পারেন না। তাই কনিষ্ঠ ভক্তরা, এক লাফে ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি কর্তৃক আয়োজিত তাঁর অপ্রাকৃত লীলার স্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে তাঁর সৃষ্টি-শক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে ভগবানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সৃষ্টি শক্তির বর্ণনা এবং সৃষ্টি বিষয়ে ভগবানের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* রচয়িতা কনিষ্ঠ ভক্তদের ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে জানতে অবহেলা করার বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেউ যখন ভগবানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখনই কেবল তিনি অটল বিশ্বাস সহকারে একনিষ্ঠভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে পারেন; তা না হলে মানব সমাজের মহান্ নেতারাও সাধারণ মানুষের মতো ভ্রান্তিবশত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন দেবতা বা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা রূপকথার নায়ক বলে মনে করতে পারেন। বৃন্দাবনে এমনকি দ্বারকায় ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ অতি উন্নত পরমার্থবাদীরাও আস্বাদন করেন, আর সাধারণ মানুষেরা ভগবানের সেবা এবং ভগবান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই স্তরে উন্নীত হতে পারে, যা আমরা পরীক্ষিৎ মহারাজের বেলায় দেখতে পাব।

শ্লোক ৭

যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ॥ ৭॥

যথা—যেমন; **গোপায়তি**—পালন করেন; **বিভুঃ**—মহান; **যথা**—যেমন; **সংযচ্ছতে**—সংবরণ করেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **যাম্ যাম্**—যেমন; **শক্তিম্**—শক্তি; **উপাশ্রিত্য**—নিয়োগ করে; **পুরুশক্তিঃ**—সর্বশক্তিমান; **পরঃ**—পরম; **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মানম্**—অংশ প্রকাশ; **ক্রীড়য়ন্**—তাদের নিযুক্ত করে; **ক্রীড়ন্**—এবং স্বয়ং নিযুক্ত হয়ে; **করোতি**—করেন; **বিকরোতি**—করা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি বলুন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং বিভিন্ন অংশদের কেমনভাবে এই জগতের পালন কার্যে এবং সংহার কার্যে নিযুক্ত করেন।

তাৎপর্য

কঠোপনিষদে (২/২/১৩) পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত নিত্য জীবেদের মধ্যে পরম নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে *(নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্)* এবং সেই

পরমেশ্বর ভগবান অসংখ্য অন্য সমস্ত জীবদের পালন করেন *(একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্)*। অতএব বদ্ধ এবং মুক্ত সমস্ত জীবদের সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান পালন করেন। ভগবান সেই পালন কার্য সম্পাদন করেন তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ এবং অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা নামক তিনটি প্রধান শক্তির মাধ্যমে। জীবেরা তাঁর তটস্থা শক্তি, এবং তাদের মধ্যে ব্রহ্মা, মরীচি আদি কয়েকজন বিশ্বস্ত জীবদের ভগবান অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে *(তেনে ব্রহ্ম হৃদা)* সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত করেন। বহিরঙ্গা (মায়া) শক্তির গর্ভে বদ্ধ জীবদের নিক্ষেপ করা হয়। আর মুক্ত তটস্থা শক্তিরা চিজ্জগতে সক্রিয় হয়, এবং ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের দ্বারা চিদাকাশে তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে তাঁদের পালন করেন। এইভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান বহুরূপে *(বহুস্যাম্)* নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে সমস্ত বৈচিত্র্য তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়, এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি প্রকাশিত হন, যদিও তিনি তাদের সকলের থেকে ভিন্ন। এইটি হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি, এবং সবকিছুই একাধারে তাঁর সঙ্গে অচিন্ত্যরূপে ভিন্ন এবং অভিন্ন। *(অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব)*।

শ্লোক ৮

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
দুর্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥

নূনম্—অপর্যাপ্ত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ব্রহ্মন্**—হে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অদ্ভুত**—আশ্চর্য; **কর্মণঃ**—যিনি কর্মকরেন; **দুর্বিভাব্যম্**—অচিন্ত্য; **ইব**—সদৃশ; **আভাতি**—পতিত হয়; **কবিভিঃ**—অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারাও; **চ**—ও; **অপি**—সত্ত্বেও; **চেষ্টিতম্**—প্রয়াস করা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

হে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, এবং তা অচিন্ত্য বলে মনে হয়, কেননা মহান্ পণ্ডিতদের মহতী প্রচেষ্টাও তা বোঝার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

তাৎপর্য

এই একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবানের কার্যকলাপ অচিন্ত্যরূপে অদ্ভুত বলে মনে হয়। আর এরকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং তাদের সমষ্টিকে বলা হয় জড় জগৎ। আর এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির একটি অংশ মাত্র *(একাংশেন স্থিতো জগৎ)*। যদি এই জড় জগতকে ভগবানের শক্তির এক অংশের প্রদর্শন বলে মনে করা হয়, তা হলে বাকি তিন অংশ হচ্ছে বৈকুণ্ঠ জগৎ বা চিজ্জগৎ, যাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান *মদ্ধাম* বা সনাতন ধাম বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা লক্ষ্য

করেছি যে, ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তা গুটিয়ে নেন। এই ক্রিয়া কেবল জড় জগতের বেলাই হয়, কেননা অন্য জগতটি, যা ভগবানের সৃষ্টির বৃহত্তর অংশ, সেই বৈকুণ্ঠ লোকের কখনো সৃষ্টি হয় না ; এবং ধ্বংসও হয় না। তা যদি হত তা হলে বৈকুণ্ঠ ধামকে নিত্য বা সনাতন বলা হত না। ভগবান তাঁর ধামে বিরাজ করেন, এবং তাঁর নিত্য নাম, গুণ, লীলা, পরিকর এবং রূপ হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রদর্শন এবং বিস্তার। ভগবানকে বলা হয় *অনাদি*, অর্থাৎ তাঁর কোন স্রষ্টা নেই এবং আদি, অর্থাৎ তিনি সবকিছুর উৎস। আমরা আমাদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করি যে ভগবানেরও সৃষ্টি হয়, কিন্তু বেদান্ত-শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে তাঁর কখনো সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে সবকিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট *(নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ)*। তাই সাধারণ মানুষদের এই সমস্ত অদ্ভুত বিষয় বিচার করে দেখা উচিত। এই বিষয়টি বড় বড় পণ্ডিদেরও অচিন্ত্য, এবং তার ফলে এই সমস্ত পণ্ডিতেরা বিপরীত সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপন করে। এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, যা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির একটি নগণ্য অংশ, তাদের পুরোপুরি জ্ঞান নেই ; তারা জানে না এই আকাশ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, অথবা সেখানে কত গ্রহ এবং নক্ষত্র রয়েছে, অথবা এই সমস্ত অসংখ্য গ্রহের পরিস্থিতি কিরকম। এই সমস্ত বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাদের কেউ কেউ বলে যে আকাশে দশ কোটি গ্রহ রয়েছে। ১৯৬০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মস্কোর একটি সংবাদে ঘোষণা করা হয়েছে—

"রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক বোরিস বোরোনৎসোভ ভেলিয়ামিনোভ বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে যেখানে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী রয়েছে।"

"এমনও হতে পারে যে এই পৃথিবীর মতো প্রাণীরা সেই সমস্ত গ্রহে বিস্তার লাভ করছে।"

"রসায়ন বিজ্ঞানের ডঃ নিকোলাই জিরোভ অন্যান্য গ্রহের বায়ুমণ্ডলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা দেহের নিম্ন তাপ সমন্বিত সাধারণ পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে।"

"তিনি বলেছেন যে তিনি মনে করেন যে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল সেই গ্রহের প্রাণীদের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত।"

বিভিন্ন গ্রহের প্রাণীদের সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার বর্ণনা করে ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে *বিভূতি-ভিন্নম্*; অর্থাৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য গ্রহের প্রত্যেকটি গ্রহই বিশেষ ধরনের বায়ুমণ্ডল সমন্বিত এবং সেখানকার জীবেরা বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত, কেননা সেখানকার পরিবেশ এখানকার পরিবেশ থেকে অনেক ভাল। *বিভূতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিশেষ শক্তি', আর *ভিন্নম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিবিধ'। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা অন্তরীক্ষে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে এবং যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহে

যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের অবশ্যই জেনে রাখা কর্তব্য যে, পৃথিবীর পরিবেশে বসবাসের উপযুক্ত প্রাণীরা অন্যান্য গ্রহের পরিবেশে থাকতে পারবে না। তাই বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর অন্য গ্রহে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) বলা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের উপাসনা করে, তারা দেবলোকে গমন করবে, যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে গমন করবে, যারা ভূতপ্রেতের পূজা করে, তারা প্রেতলোকে গমন করবে এবং যারা আমার আরাধনা করে, তারা আমাতে গতিলাভ করবে।"

ভগবানের সৃষ্টি শক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে সবকিছু জানতেন। তা হলে কেন তিনি সেই সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করলেন ? সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, পাণ্ডবদের বংশধর এবং শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু সেই জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি বলেছেন যে মহান্ পণ্ডিতেরাও গভীর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে জানতে অক্ষম। ভগবান অনন্ত এবং তাঁর কার্যকলাপও অপরিমেয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ জীব ব্রহ্মা পর্যন্ত কেউই তাদের সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে এবং ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই অনন্তকে জানার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। অনন্ত যখন নিজেকে জানান, যা তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁর অতুলনীয় বর্ণনার মাধ্যমে করেছেন, তখনই কেবল আমরা অনন্ত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। আবার সেই জ্ঞান শুকদেব গোস্বামীর মতো আত্মতত্ত্ববেত্তা পুরুষের কাছ থেকেও কিছু পরিমাণে লাভ করা যায়, যিনি সেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন নারদ মুনির শিষ্য ব্যাসদেবের কাছ থেকে। এইভাবে গুরু পরম্পরার ধারাতে এই পূর্ণজ্ঞান প্রবাহিত হয়। কোন প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা তা জানা যায় না, তা সে প্রাচীনই হোক বা আধুনিকই হোক।

শ্লোক ৯

যথা গুণাংস্তু প্রকৃতের্যুগপৎ ক্রমশোঽপি বা।
বিভর্তি ভূরিশস্ত্বেকঃ কুর্বন্ কর্মাণি জন্মভিঃ ॥ ৯ ॥

যথা—যেমন ; **গুণান্**—প্রকৃতির গুণ ; **তু**—কিন্তু ; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির ; **যুগপৎ**—একসাথে ; **ক্রমশঃ**—ধীরে ধীরে ; **অপি**—ও ; **বা**—অথবা ; **বিভর্তি**—পালন করে ; **ভূরিশঃ**—বিবিধ রূপ ; **তু**—কিন্তু ; **একঃ**—পরম পুরুষ ; **কুর্বন্**—কার্য করে ; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ ; **জন্মভিঃ**—অবতারদের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এক, তা তিনি একলাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা কার্য করুন, অথবা যুগপৎ বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করুন অথবা প্রকৃতির গুণসমূহ পরিচালনা করার জন্য ক্রমশ নিজেকে বিস্তার করুন।

শ্লোক ১০

বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা।
শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥ ১০ ॥

বিচিকিৎসিতম্—সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন; **এতৎ**—এই; **মে**—আমার; **ব্রবীতু**—পরিষ্কার করে; **ভগবান্**—ভগবানের মতো শক্তিশালী; **যথা**—যতখানি; **শাব্দে**—দিব্য শব্দে; **ব্রহ্মণি**—বৈদিক শাস্ত্র; **নিষ্ণাতঃ**—পূর্ণরূপে উপলব্ধি; **পরস্মিন্**—চিন্ময় স্তরে; **চ**—ও; **ভবান্**—আপনি; **খলু**—বাস্তবিকভাবে।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন করুন। আপনি কেবল বৈদিক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং আত্মতত্ত্ববেত্তাই নন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান্ ভক্ত এবং তাই আপনি ভগবানেরই সমান।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও অনন্ত অচ্যুতরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং সেই সমস্ত প্রকাশগুলি পরস্পর থেকে অভিন্ন। যদিও তিনি আদিপুরুষ তথাপি তাঁর রূপ নিত্য নবযৌবনসম্পন্ন। বেদের অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের মাধ্যমেও তাঁকে জানা দুর্লভ, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁকে অনায়াসে জানতে পারেন।

ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ, যেমন কৃষ্ণ থেকে বলদেব, বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ থেকে বাসুদেব, বাসুদেব থেকে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ থেকে প্রদ্যুম্ন, এবং তাঁর থেকে আবার দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ, এবং তাঁর থেকে নারায়ণ পুরুষাবতার এবং অন্যান্য অসংখ্য রূপ, যাঁদের নিত্য প্রবহমান নদীর অসংখ্য তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই এক এবং অভিন্ন। তাঁরা সমান শক্তিসম্পন্ন দীপের মতো, যেগুলি অন্য একটি দীপ থেকে প্রজ্বলিত হয়েছে। এটি ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তি। বেদে বলা হয়েছে যে তিনি এমনই পূর্ণ যে তাঁর থেকে পূর্ণশক্তিসম্পন্ন আর একজন প্রকাশিত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই বর্তমানে থাকেন *(পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে)*। অতএব জ্ঞানীদের ভগবানের সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত ভৌতিক ধারণার কোনই ভিত্তি নেই। তাই জড়বাদী পণ্ডিতদের কাছে, তা তিনি যদি বৈদিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিতও হন,

তথাপি ভগবানের পরিচয় তার কাছে সর্বদাই রহস্যাবৃত থাকবে *(বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ)*। তাই ভগবান জাগতিক পণ্ডিত, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকদের বিচার-বুদ্ধির অতীত। অথচ তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি সহজেই প্রকাশিত হন, কেননা ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) ঘোষণা করেছেন যে জ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে ভক্তি সহকারে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ হলে কেবল তখনই তাঁকে যথাযথভাবে জানা সম্ভব হয়। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, লীলা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) যে বলা হয়েছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, তার অর্থ হচ্ছে এই যে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। তাহলেই কেবল সেই ভক্তির বলে ভগবানকে জানা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বীকার করেছেন যে ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদেরও চিন্তার অতীত। তাহলে কেন তিনি শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছেন ভগবান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করতে ? তার কারণটি সহজেই বোধগম্য। শুকদেব গোস্বামী বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানের মহান পণ্ডিতই কেবল ছিলেন না, তিনি ছিলেন তত্ত্বদ্রষ্টা মহান ভগবদ্ভক্তও। ভগবানের কৃপায় ভগবানের শক্তিশালী ভক্ত ভগবানের থেকেও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সাগর অতিক্রম করে লঙ্কার দ্বীপে যাওয়ার জন্য সেতু বন্ধন করতে হয়েছিল, কিন্তু হনুমানজী, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত, লাফ দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তকে তাঁর থেকেও অধিক শক্তিশালী রূপে উপস্থাপন করেন। দুর্বাসা মুনি এতই ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন যে ভৌতিক অবস্থাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যেতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত মহারাজ অম্বরীষ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের থেকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্নই কেবল নন, ভগবানের ভক্তের পূজা সরাসরিভাবে ভগবানের পূজার থেকেও অধিক কার্যকরী বলে বিবেচনা করা হয়েছে *(মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা)*।

অতএব চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐকান্তিক ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া, যিনি কেবল বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শীই নন, অধিকন্তু ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে পরম উপলব্ধ বা তত্ত্বদ্রষ্টা। এই প্রকার ভক্ত-গুরুর সাহায্য ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। আর শুকদেব গোস্বামীর মতো আদর্শ সদ্গুরু কেবল ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি সম্বন্ধেই উপদেশ দেন না, পক্ষান্তরে ভগবান কিভাবে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গ করেন তাও বিশ্লেষণ করেন।

অন্তরঙ্গা-শক্তিতে ভগবানের কার্যকলাপ প্রকাশিত হয় তাঁর বৃন্দাবন-লীলায়, কিন্তু তাঁর বহিরঙ্গা-শক্তির কার্যকলাপ পরিচালিত হয় কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু রূপের মাধ্যমে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উৎসাহী বৈষ্ণবদের সদুপদেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাদের কেবল ভগবানের লীলা (যেমন রাসলীলা) শ্রবণেই উৎসাহী হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো আদর্শ শিষ্য এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো আদর্শ গুরুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পুরুষাবতাররূপে ভগবানের সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রবণ করতেও গভীরভাবে আগ্রহী হওয়া উচিত।

শ্লোক ১১

সূত উবাচ

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ।
হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে ॥ ১১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন ; **ইতি**—এইভাবে ; **উপামন্ত্রিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে ; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক ; **গুণ-অনুকথনে**—অপ্রাকৃত গুণও লীলাবিলাস বর্ণনে ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের ; **অনুস্মৃত্য**—যথাযথভাবে স্মরণ করে ; **প্রতিবক্তুম্**—উত্তর দেবার জন্য ; **প্রচক্রমে**—প্রস্তুতিমূলক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, রাজা কর্তৃক এইভাবে ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তি বর্ণনা করতে প্রার্থিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী সর্বেন্দ্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে ভাষণ দেন, তখন তাঁরা মনে করেন না যে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পতি পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ তাঁদের দিয়ে যা বলান তাই কেবল তারা বলতে পারেন। জীবের ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে তাদের নয়। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সেগুলির যথাযথ উপযোগ তখনই সম্ভব হয় যখন তারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে যন্ত্র এবং পঞ্চমহাভূত হচ্ছে উপাদান এবং সে সমস্তই ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। তাই মানুষ যা কিছু করে, বলে, দেখে, তা সবই ভগবানের পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) সে কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *সর্বস্য*

চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃস্মৃতির্জ্ঞানমপহনঞ্চ। কেউই স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না, এবং তাই কর্ম করার জন্য, খাওয়ার জন্য অথবা কিছু বলার জন্য সর্বদাই ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং ভগবানের আশীর্বাদ সহকারে ভক্ত যা কিছু করেন তা সবই বদ্ধ জীব কর্তৃক কৃত কর্মের চারটি স্বাভাবিক দোষ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে
সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা-
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নমঃ**—নমস্কার করে; **পরস্মৈ**—পরম; **পুরুষায়**—ভগবানকে; **ভূয়সে**—পরম পূর্ণকে; **সদুদ্ভব**—জড় জগতের সৃষ্টি; **স্থান**—তার পালন; **নিরোধ**—এবং তার সংহার; **লীলয়া**—লীলার দ্বারা; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **শক্তি**—শক্তি; **ত্রিতয়ায়**—ত্রিগুণ; **দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারীদের; **অন্তর্ভবায়**—যিনি অন্তরে বিরাজ করেন; **অনুপলক্ষ্য**—অচিন্ত্য; **বর্ত্মনে**—এমনই যাঁর কার্যকলাপ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন ঃ আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যিনি জড় জগতের সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির তিনটি গুণ অঙ্গীকার করেন। তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে বিরাজমান পরম পূর্ণ এবং তাঁর কার্যকলাপ অচিন্ত্য।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ সত্ত্ব, রজো এবং তমো এই তিনটি গুণের প্রকাশ, এবং পরমেশ্বর ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর (শিব) এই তিনটি মুখ্য রূপ স্বীকার করেন। বিষ্ণুরূপে তিনি জড় জগতের প্রতিটি সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। গর্ভোদক্শায়ী বিষ্ণুরূপে তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেন। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস হওয়ার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে *পরঃ পুমান্* বা *পুরুযোত্তম* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যেভাবে তাঁকে শ্রীমদ্ভবদ্গীতায়ও (১৫/১৮) বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পরম পূর্ণ। তাই পুরুষাবতারেরা হচ্ছেন তাঁর অংশ প্রকাশ। ভক্তিযোগই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যার মাধ্যমে তাঁকে জানা যায়। যেহেতু জ্ঞানী এবং যোগীরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই তাঁকে *অনুপলক্ষ্যবর্ত্মনে* বলা হয়েছে, অর্থাৎ ভগবানের কার্যকলাপ অচিন্ত্য। ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে জানা সম্ভব।

শ্লোক ১৩

ভূয়ো নমঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-
মসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ১৩ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায়; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **সৎ**—ভগবদ্ভক্ত বা পুণ্যবানদের; **বৃজিন**—দুর্দশাগ্রস্তদের; **ছিদে**—মুক্তিদাতা; **অসতাম্**—নাস্তিক বা অভক্ত অসুরদের; **অসম্ভবায়**—সংকট মোচন; **অখিল**—পূর্ণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **মূর্তয়ে**—পরম পুরুষকে; **পুংসাম্**—পরমার্থবাদীদের; **পুনঃ**—পুনরায়; **পারমহংস্য**—পারমার্থিক সিদ্ধির চরম স্তর; **আশ্রমে**—পদে; **ব্যবস্থিতানাম্**—বিশেষভাবে স্থিত; **অনুমৃগ্য**—গন্তব্যস্থল; **দাশুষে**—উদ্ধারকর্তা।

অনুবাদ

আমি পুনরায় পূর্ণ অস্তিত্ব এবং অধ্যাত্ম রূপ সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পুণ্যবান ভক্তদের সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করেন এবং অভক্ত অসুরদের নাস্তিক মনোবৃত্তি বৃদ্ধিতে বাধা দেন। পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরমহংসদের তিনি বিশিষ্টপদ দান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই সমস্ত অস্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ। *অখিল* শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্ণ অথবা যা *খিল* বা নিকৃষ্ট নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে প্রকৃতি দুই প্রকার, যথা জড়া এবং পরা, অথবা ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তি। জড় জগতকে বলা হয় অপরা বা নিকৃষ্ট প্রকৃতি এবং চিজ্জগতকে বলা হয় পরা বা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি। তাই ভগবানের রূপ নিকৃষ্ট জড়া-প্রকৃতিসম্ভূত নয়। তিনি পূর্ণ চিন্ময়, এবং তাঁর মূর্তি বা অপ্রাকৃত রূপ রয়েছে। যে সমস্ত অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁর অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা তাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করে। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে কেবল তাঁর অপ্রাকৃত দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা *(যস্য প্রভা)*। তাঁর অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে অবগত ভগবদ্ভক্তেরা তাঁর সেবা করেন, এবং ভগবানও তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে তাঁদের সেই সেবার প্রতিদান দেন এবং তার ফলে তাঁর ভক্তেরা সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হন। যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তিরা বেদের বিধান অনুসরণ করেন, তাঁরাও তাঁর প্রিয়, এবং তাই এই জগতের পুণ্যবান মানুষদেরও তিনি রক্ষা করেন। পাপী এবং অভক্তেরা বৈদিক অনুশাসনের বিরোধী, এবং তাই ভগবান তাদের নিন্দনীয় কার্যকলাপের প্রগতিতে বাধা প্রদান করেন। তাদের মধ্যে যারা

বিশেষভাবে ভগবানের কৃপা লাভ করে, তারা ভগবান কর্তৃক নিহত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাবণ, হিরণ্যকশিপু এবং কংসের নাম উল্লেখ করা যায়। এইভাবে ভগবান কর্তৃক নিহত হওয়ার ফলে এই সমস্ত অসুরেরা মুক্তি লাভ করে এবং তার ফলে তাদের আসুরিক কার্যকলাপের প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি তাঁর ভক্তদের কৃপা করুন অথবা অসুরদের দণ্ড দান করুন, ভগবান সর্ব অবস্থাতেই একজন স্নেহময় পিতার মতো সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ, কেননা তিনি সমস্ত অস্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ।

পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধ অবস্থা হচ্ছে পরমহংস স্তর। শ্রীমতী কুন্তীদেবীর মতে পরমহংসরাই কেবল যথাযথভাবে ভগবানকে জানতে পারেন। চিন্ময় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমের ব্যাপারে যেমন নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে অন্তর্যামী পরমাত্মা, তারপর ক্রমে ক্রমে সবিশেষ ভগবান, পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণকে জানার স্তর রয়েছে, তেমনই পারমার্থিক জীবনের সন্ন্যাস আশ্রমেও মানুষের ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতির স্তর রয়েছে। সন্ন্যাস আশ্রমের সেই ক্রমোন্নতির স্তরগুলি হচ্ছে কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজক এবং পরমহংস। পাণ্ডবদের জননী শ্রীমতী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রার্থনায় (প্রথম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়) সে কথা বলেছেন। সাধারণত নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত উভয়ের মধ্যেই পরমহংস দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে (যা কুন্তীদেবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন) শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি পরমহংসেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং কুন্তীদেবী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে ভগবান পরমহংসদের ভক্তিযোগ দান করার জন্য বিশেষভাবে অবতরণ করেন *(পরিত্রাণায় সাধূনাম্)*। অতএব চরমে পরমহংস বলতে ভগবানের অনন্য ভক্তদেরই বোঝায়। শ্রীল জীব গোস্বামী সরাসরিভাবে স্বীকার করেছেন যে জীবের পরম গতি হচ্ছে ভক্তিযোগ যার দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেছেন তাঁরাই প্রকৃত পরমহংস।

ভগবান যেহেতু সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাদেরও তিনি তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১১) তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়েছেন---- *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে দুই প্রকার পরমহংস রয়েছেন, যথা ব্রহ্মানন্দী (নির্বিশেষবাদী) এবং প্রেমানন্দী (ভগবদ্ভক্ত), এবং প্রেমানন্দীরা যদিও ব্রহ্মানন্দীদের থেকে অধিক ভাগ্যবান, তথাপি উভয়েরই বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মানন্দী এবং প্রেমানন্দী উভয়েই পরমার্থবাদী, এবং জড় জীবনের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ নিকৃষ্ট জড়া প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ১৪

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।

নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥ ১৪ ॥

নমঃ নমস্তে—আমি আপনাকে আমার স্বশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি ; **অস্তু**—হয় ; **ঋষভায়**—মহান পার্যদকে ; **সাত্বতাম্**—যদু বংশের সদস্যদের ; **বিদূরকাষ্ঠায়**—জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের থেকে যিনি অনেক দূরে থাকেন ; **মুহুঃ**—সর্বদা ; **কুযোগিনাম্**—অভক্তদের ; **নিরস্ত**—বিনাশ করে ; **সাম্য**—সমান পদ ; **অতিশয়েন**—মহানতার দ্বারা ; **রাধসা**—ঐশ্বর্যের দ্বারা ; **স্বধামনি**—তাঁর স্বীয় ধামে ; **ব্রহ্মণি**—চিদাকাশে ; **রংস্যতে**—উপভোগ করেন ; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যদুবংশীয়দের পার্ষদ এবং অভক্তদের যিনি সর্বদা সমস্যার সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তিনি জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই পরম ভোক্তা, তথাপি তিনি চিদাকাশে তাঁর লীলাবিলাস করেন। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, কেননা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য অনন্ত এবং অসীম।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকাশের দুটি দিক রয়েছে। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের তিনি নিত্য সঙ্গী, যেমন যদুকূলে আবির্ভূত হয়ে তিনি যাদবদের তাঁর সঙ্গ দান করেছিলেন ; অথবা সখারূপে অর্জুনকে, অথবা নন্দ-যশোদার পুত্ররূপে বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের প্রতিবেশীরূপে সঙ্গ দান করেছিলেন, সুদাম, শ্রীদাম এবং মধুমঙ্গলকে সখা রূপে তাঁর সঙ্গদান করেছিলেন অথবা ব্রজগোপিকাদের প্রেমিক রূপে সঙ্গ দান করেছিলেন। এটি তাঁর সবিশেষরূপের একটি প্রকাশ। আর নির্বিশেষরূপে তিনি অন্তহীন এবং সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। সূর্যের আলোকের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়, সেই সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতির একটি অংশ মহত্তত্ত্বের অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নগণ্য অংশটি হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগতে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মতো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের এই পৃথিবীর মতো শত সহস্র গ্রহ রয়েছে। জড়বাদীরা ভগবানের রশ্মিচ্ছটার অন্তহীন প্রকাশ দ্বারা মোহিত, কিন্তু ভক্তেরা তাঁর সবিশেষরূপের প্রতি আসক্ত, যার থেকে সবকিছু প্রকাশিত হয়েছে *(জন্মাদ্যস্য যতঃ)*। সূর্যকিরণ যেমন সূর্যমণ্ডলে ঘনীভূত রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মজ্যোতি চিদাকাশের সর্বোচ্চ লোক গোলোক বৃন্দাবনে কেন্দ্রীভূত। জড় আকাশের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে অন্তহীন চিদাকাশ বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময় গ্রহে পূর্ণ। জড়বাদীদের জড় আকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান নেই, অতএব চিদাকাশ সম্বন্ধে তারা কি ধারণা করতে পারে? তাই জড়বাদীরা সর্বদাই তাঁর থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। ভবিষ্যতে তারা যদি বায়ুর গতিতে অথবা মনের গতিতে

ভ্রমণ করতে সক্ষম কোন যন্ত্র তৈরি করতে পারেও, তথাপি জড়বাদীরা চিদাকাশের গ্রহগুলিতে যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের সম্বন্ধে কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না। তাই ভগবান এবং তাঁর ধাম চিরকালই তাদের কাছে রহস্যাবৃত থাকবে অথবা তা রূপকথা বলে মনে হবে। কিন্তু ভক্তদের কাছে ভগবান সর্বদাই তাদের সঙ্গীরূপে সহজলভ্য।

চিদাকাশে তাঁর ঐশ্বর্য অসীম। অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করে ভগবান তাঁর নিত্যমুক্ত ভক্তপার্ষদদের নিয়ে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন। কিন্তু যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়, তারা চরমে ব্রহ্মজ্যোতির একটি চিৎস্ফুলিঙ্গে লীন হতে পারে। বৈকুণ্ঠলোকে অথবা ভগবানের পরমধাম গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করার কোন যোগ্যতা তাদের নেই। এই বৈকুণ্ঠ এবং গোলোক বৃন্দাবনের বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন *মদ্ধাম*, এবং এখানে এই শ্লোকটিতেও তাদের ভগবানের *স্বধাম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মদ্ধাম বা স্বধামের বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/৬) বলা হয়েছে—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

ভগবানের স্বধামকে আলোকিত করার জন্য সূর্যকিরণ অথবা চন্দ্রকিরণ অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। তাঁর সেই স্থান হচ্ছে সর্বোচ্চ, এবং সেখানে একবার গেলে আর কখনো এই জড় ফিরে আসতে হয় না।

বৈকুণ্ঠলোক এবং গোলোক বৃন্দাবন জ্যোতির্ময় এবং ভগবানের সেই স্বধাম থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় তা হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি। *মুণ্ডক উপনিষদ (২/২/১০), কঠোপনিষদ (২/২/১৫), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬/১৪)* আদি বৈদিক শাস্ত্রে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনু ভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি॥

ভগবানের সেই স্বধামকে আলোকিত করার জন্য সূর্য, চন্দ্র অথবা তারকার প্রয়োজন হয় না। সেখানে বিদ্যুতেরও প্রয়োজন হয় না, সুতরাং দীপের আলোকের কি কথা? পক্ষান্তরে যেহেতু সেগুলি জ্যোতির্ময় তাই সে জগৎ পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত, এবং সেই স্বধামের জ্যোতির প্রভাবে সেখানে সবকিছুই জ্যোতির্ময়।

নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির প্রভাবে যাদের চোখ ঝলসে গেছে তারা কখনো সবিশেষ চিন্ময় তত্ত্বকে জানতে পারে না; তাই *ঈশোপনিষদে (১৫)* প্রার্থনা করা হয়েছে যে ভগবান যেন তাঁর চোখ-ঝলসানো জ্যোতি সংবরণ করেন যাতে ভক্তেরা তাঁর প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারেন। সেই শ্লোকটি হচ্ছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

"হে ভগবান, আপনি জড় এবং চেতন উভয় জগতের সব কিছুরই পালন কর্তা, এবং আপনার কৃপার প্রভাবেই সবকিছু সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আপনার প্রতি প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগ হচ্ছে ধর্মের মূল তত্ত্ব বা সত্য ধর্ম, এবং আমি সেই সেবায় যুক্ত। তাই দয়া করে আপনার প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করে আমাকে রক্ষা করুন। তাই, দয়া করে আপনি ব্রহ্মজ্যোতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করুন যার ফলে আমি আপনার সচ্চিদানন্দময় রূপ দর্শন করতে পারি।"

শ্লোক ১৫

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যাঁর; **কীর্তনম্**—মহিমা গান; **যৎ**—যাঁর; **স্মরণম্**—স্মরণ; **যৎ**—যাঁর; **ঈক্ষণম্**—দর্শন; **যৎ**—যাঁর; **বন্দনম্**—প্রার্থনা; **যৎ**—যাঁর; **শ্রবণম্**—শ্রবণ; **যৎ**—যাঁর; **অর্হণম্**—পূজা; **লোকস্য**—সমস্ত মানুষদের; **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **বিধুনোতি**—বিশেষভাবে পরিষ্কার করে; **কল্মষম্**—পাপের প্রভাব; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সুভদ্র**—সর্বমঙ্গলময়; **শ্রবসে**—যশগাথা; **নমঃ**—আমার শ্রদ্ধ প্রণাম; **নমঃ**—পুনঃ পুনঃ প্রণতি।

অনুবাদ

আমি সেই সর্বমঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর যশগাথা কীর্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ এবং পূজনের ফলে সমস্ত পাপরাশি অচিরেই ধৌত হয়।

তাৎপর্য

সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার সাবলীল পন্থা এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের মহিমা কীর্তন নানাভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব, যেমন স্মরণ, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভগবানের সামনে তাঁর বন্দনা এবং শ্রীমদ্ভাগবত অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের যে সমস্ত মহিমা কীর্তিত হয়েছে তা শ্রবণ। মধুর সঙ্গীতসহ ভগবানের মহিমা গান করার মাধ্যমে অথবা শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে, উভয় প্রকারে কীর্তন অনুষ্ঠান করা যায়।

ভগবানের দৈহিক অনুপস্থিতিতে ভক্তদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, যদিও তাঁরা মনে করতে পারেন যে তাঁরা তাঁর সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কীর্তন, শ্রবণ,

স্মরণ ইত্যাদি ভক্ত্যাঙ্গের (কোন একটি অঙ্গের অথবা সবকটি অঙ্গের) অনুশীলন করার ফলে অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে ভগবানের সান্নিধ্যের ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। এমনকি ভগবানের দিব্য নাম কৃষ্ণ অথবা রাম উচ্চারণের ফলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিবেশ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে যেখানে এইপ্রকার শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন হয় ভগবান সেখানে উপস্থিত থাকেন, এবং তার ফলে নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তনকারী ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। তেমনি, সুদক্ষ পরিচালনায় যথাযথভাবে স্মরণ এবং বন্দন হলেও ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। ভগবদ্ভক্তির মনগড়া পন্থা প্রস্তুত করা উচিত নয়। কেউ মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করতে পারে, অথবা অন্য কেউ মসজিদে বা গীর্জায় তাঁর নির্বিশেষ রূপের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে। মন্দিরে আরাধনা অথবা গীর্জায় প্রার্থনা করার মাধ্যমে মানুষ নিশ্চিতভাবে পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে, যদি সে পুনরায় পাপ না করার ব্যাপারে সচেতন থাকে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের বলে স্বেচ্ছাকৃতভাবে পাপ করার মনোভাবকে বলা হয় *নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপ বুদ্ধিঃ,* অর্থাৎ নামবলে পাপাচরণ করা, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে এইটিই হচ্ছে সবচাইতে গর্হিত অপরাধ। তাই এইপ্রকার পাপের সম্ভাবনা থেকে সাবধান থাকার জন্য শ্রবণ অত্যন্ত আবশ্যক। এই শ্রবণ-বিধির বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সর্বমঙ্গলময় সৌভাগ্যের আহ্বান করেছেন।

শ্লোক ১৬

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ
সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-
স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

বিচক্ষণাঃ—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **যৎ**—যাঁর; **চরণ-উপসাদনাৎ**—তাঁর চরণকমলে আত্ম-সমর্পণ করার ফলে; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **ব্যুদস্য**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **উভয়তঃ**—বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে; **অন্তঃ-আত্মনঃ**—হৃদয়ের এবং আত্মার; **বিন্দন্তি**—প্রগতি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রহ্মগতিম্**—পারমার্থিক জগতের প্রতি; **গতক্লমাঃ**—নির্বিঘ্নে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সুভদ্র**—সর্বমঙ্গলময়; **শ্রবসে**—যাঁর বিষয়ে শ্রবণ করা হয়েছে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—পুনঃ পুনঃ প্রণতি।

অনুবাদ

আমি সর্বমঙ্গল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর চরণকমলের শরণ গ্রহণ করার ফলে পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং অনায়াসে চিন্ময় জগতের প্রতি অগ্রসর হন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা তাঁর সমস্ত অনন্য ভক্তদের বারংবার উপদেশ প্রদান করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৪-৬৬) তাঁর অন্তিম উপদেশ হচ্ছে

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ম ইতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজি মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"হে অর্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাই তোমার কল্যাণের জন্য আমি আমার গুহ্যতম উপদেশ তোমার কাছে প্রকাশ করব। তা হচ্ছে, আমার শুদ্ধ ভক্ত হও এবং সর্বতোভাবে আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ কর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে পূর্ণরূপে তোমার পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ হবে, যার ফলে তুমি আমার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী ভক্তি লাভ করতে পারবে। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও তা হলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা করো না।"

বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের এই অন্তিম উপদেশটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ, যাকে বলা হয় গুহ্য জ্ঞান। তার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ভগবদুপলব্ধি, যাকে বলা হয় গুহ্যতর জ্ঞান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরম পরিণতি এই ভগবদুপলব্ধিতে, এবং এই ভগদুপলব্ধির স্তরপ্রাপ্ত হলে স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ভক্ত যুক্ত হন। সর্বদাই এই ভগবদ্ভক্তির ভিত্তি হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম, এবং তা কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ বা ধ্যান যোগের গতানুগতিক বিধি থেকে ভিন্ন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং সেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম, ইন্দ্রিয়-দমন, ধ্যান, যোগ-সিদ্ধি আদি বিভিন্ন পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমবশত সেবা সম্পাদন করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে বেদে বর্ণিত সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। যিনি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এই পন্থা অবলম্বন করেন তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। মানব জীবনের এই সিদ্ধিকে বলা হয় ব্রহ্মগতি। বৈদিক নির্দেশের ভিত্তিতে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ব্রহ্মগতির অর্থ হল, ভগবানের মতো চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হওয়া, এবং সেইরূপে মুক্ত জীব চিদাকাশের কোন চিন্ময় ধামে নিত্য জীবন লাভ করেন। সিদ্ধি লাভের কোন কঠোর পন্থা অনুশীলন না করেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে জীবনের এই পরম সিদ্ধি লাভ

করেন। এই প্রকার ভক্তিময় জীবন পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত *কীর্তনম্, স্মরণম্, ঈক্ষণম্* ইত্যাদিতে পূর্ণ। তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তির এই সরল পন্থা অবলম্বন করা, তা তিনি পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন। বৃন্দাবনে ক্রীড়ারত শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁর বর্ণনা করে বলেছিলেন—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০/১৪/৪)

ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের সিদ্ধি যা বুদ্ধিমান মানুষেরা বহু পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার বিনিময়ে লাভ করে থাকেন। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। একমুঠো চাল স্তূপীকৃত তুষের থেকে অধিক মূল্যবান। তেমনই মানুষের কর্তব্য কর্মকাণ্ড,জ্ঞানকাণ্ড বা যোগাসন ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সদ্‌গুরুর নির্দেশে কীর্তন, স্মরণ আদি সরল পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে অনায়াসে চরম সিদ্ধি লাভ করা।

শ্লোক ১৭

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

তপস্বিনঃ—মহা বিদ্বান্ ঋষিগণ; **দানপরা**—মহান দাতাগণ; **যশস্বিনঃ**—যশস্বী ব্যক্তিগণ; **মনস্বিনঃ**—মহান দার্শনিক বা যোগীগণ; **মন্ত্রবিদঃ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী ব্যক্তিগণ; **সুমঙ্গলাঃ**—বৈদিক সিদ্ধান্তে নিষ্ঠাবান অনুগামী; **ক্ষেমম্**—সকাম ফল; **ন**—কখনই না; **বিন্দন্তি**—প্রাপ্ত হন; **বিনা**—ব্যতীত; **যদর্পণম্**—সমর্পণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সুভদ্র**—শুভ; **শ্রবসে**—তাঁর বিষয়ে শ্রবণ করে; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **নমঃ**—পুনঃ পুনঃ প্রণতি।

অনুবাদ

আমি সর্ব মঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা তপস্যা পরায়ণ মহান্ ঋষিগণ, দানশীল কর্মীগণ, প্রতিষ্ঠাবান যশস্বীগণ, মনস্বী বা যোগীগণ, বেদজ্ঞ মন্ত্র উচ্চারণকারীগণ অথবা সদাচারী পুরুষগণ কেউই সেই সমস্ত মহান গুণের দ্বারা ভগবানের সেবা না করে মঙ্গল লাভ করতে সমর্থ হন না।

তাৎপর্য

উচ্চশিক্ষা, দানশীলতা, মানব সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্মীয় নেতৃত্ব, দার্শনিক জ্ঞান, যোগাভ্যাস, বৈদিক অনুষ্ঠানে নিপুণতা আদি মানুষের সমস্ত উত্তম গুণাবলী তখনই তার সিদ্ধিপ্রাপ্তির সহায়ক হয় যখন তা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। তা না হলে এই সমস্ত গুণ মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব কিছু, হয় নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অথবা অপরের সেবায় ব্যবহার করা যায়। স্বার্থও দুই প্রকার—ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বিস্তৃত স্বার্থ। কিন্তু এই দুই প্রকার স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি তার ব্যক্তিগত স্বার্থে চুরি করে অথবা পারিবারিক স্বার্থে চুরি করে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই তা অপরাধজনক। কোন চোর যদি বিচারকের কাছে আবেদন করে বলে যে সে নির্দোষ কেন না সে ব্যক্তিগত স্বার্থে চুরি করেনি, পক্ষান্তরে তা করেছে সমাজের বা রাষ্ট্রের স্বার্থে তাহলে কি কখনো কোন দেশের আইন তাকে ক্ষমা করবে? সাধারণ মানুষ জানে না যে, জীবের স্বার্থ তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন তা ভগবানের স্বার্থ থেকে অভিন্ন হয়। যেমন, দেহ এবং আত্মা একসাথে পালন ও পোষণ করার স্বার্থ কি? মানুষ অর্থ উপার্জন করে দেহের পালন-পোষণের জন্য (ব্যক্তিগত বা সামাজিক), কিন্তু যদি ভগবচ্চেতনা না থাকে, যদি দেহের পালন-পোষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের উপলব্ধির জন্য না হয়, তা হলে দেহ এবং আত্মার পালন-পোষণের সমস্ত প্রয়াস পশুর জীবন ধারণের মতো হয়। মানুষের জীবন ধারণের উদ্দেশ্য পশুদের থেকে ভিন্ন। তাই, উচ্চ শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রগতি, দার্শনিক গবেষণা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা পুণ্য কর্ম (যথা দান, হাসপাতাল খোলা, অন্নদান) ইত্যাদি ভগবানের সম্পর্কে সম্পাদন করা উচিত। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং প্রচেষ্টা করা উচিত। কখনোই অন্য কোন উদ্দেশ্যে, তা ব্যক্তিগতই হোক অথবা সমষ্টিগতই হোক, করা উচিত নয় (*সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) এই সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন হয়েছে, যখন বলা হয়েছে যে, আমরা যা কিছু দান করি এবং যে তপস্যার অনুষ্ঠান করি তা যেন অবশ্যই কেবল ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। ভগবদ্বিহীন মানব সমাজের নেতারা যতই সুদক্ষ হোক না কেন, তাদের শিক্ষার উন্নতি সাধনের এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সমস্ত প্রচেষ্টা কখনোই ফলপ্রসূ হবে না যদি তা ভগবচ্চেতনা সমন্বিত না হয়। আর ভগবদ্ভাবনায় ভাবিত হতে হলে মানুষকে সর্বমঙ্গলময় ভগবানের বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থ থেকে শ্রবণ করতে হবে।

শ্লোক ১৮

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।

যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৮ ॥

কিরাত—প্রাচীন ভারতে একটি অঞ্চল; **হূণ**—জার্মানি এবং রাশিয়ার একটি অংশ; **আন্ধ্র**—দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল; **পুলিন্দ**—গ্রীক; **পুল্কশা**—আর একটি অঞ্চল; **আভীর**—প্রাচীন সিন্ধুপ্রদেশের একটি অংশ; **শুম্ভাঃ**—আর একটি অঞ্চল; **যবনাঃ**—তুর্কী; **খসাদয়ঃ**—মঙ্গোলিয়ার একটি অঞ্চল; **যে**—তারাও; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **পাপা**—পাপ কর্মে আসক্ত; **যৎ**—যাঁর; **অপাশ্রয়-আশ্রয়া**—ভক্তের শরণ গ্রহণ করে; **শুধ্যন্তি**—তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়; **তস্মৈ**—তাঁকে; **প্রভবিষ্ণবে**—শক্তিমান শ্রীবিষ্ণুকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কিরাত ঃ প্রাচীন ভারতের একটি অঞ্চল, মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত কিরাতেরা ভারতের আদিবাসীরূপে পরিচিত এবং আধুনিক বিহার ও ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগনা হয়ত প্রাচীন কিরাত প্রদেশ।

হূণ ঃ জার্মানি এবং রাশিয়ার কিছু অংশ হচ্ছে হূণ প্রদেশ। সেই অনুসারে কখনো কখনো পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদেরও হূণ বলা হয়।

আন্ধ্র ঃ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলটি এখনও সেই নামেই পরিচিত।

পুলিন্দ ঃ মহাভারতে (*আদিপর্ব* ১৭৪/৩৮) পুলিন্দ নামক অঞ্চলের অধিবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। সহদেব এবং ভীমসেন এই দেশটি জয় করেন। গ্রীকদের পুলিন্দ বলা হয়। মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অবৈদিক জাতি সারা পৃথিবীর উপর একসময় আধিপত্য করবে। এই পুলিন্দ অঞ্চল ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের ক্ষত্রিয় বলে গণনা করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পরিত্যাগ করার ফলে তাদের ম্লেচ্ছ বলে বিবেচনা করা হয় (ঠিক যেমন মুসলমানদের মধ্যে যারা মুসলমান ধর্ম মানে না তাদের কাফের বলা হয় এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান ধর্ম মানে না তাদের হেথেন্স বলা হয়)।

আভীর ঃ মহাভারতের সভা পর্বে এবং ভীষ্ম পর্বে এই নামটির উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অঞ্চলটি সিন্ধু প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্বে সিন্ধু প্রদেশ বিস্তৃত ছিল আরব সাগরের অপর প্রান্ত পর্যন্ত, এবং

সেখানকার অধিবাসীরা আভীর নামে পরিচিত ছিল। তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীন ছিল, এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই অঞ্চলের ম্লেচ্ছরা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করবে। পরবর্তীকালে পুরাণের সেই বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল, ঠিক যেমন পুলিন্দদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল। পুলিন্দ জাতির আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করেছিল, এবং আভীরদের পক্ষে মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ জয় করেছিল। পূর্বে আভীরেরাও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, কিন্তু তারা সেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। যে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা পরশুরামের ভয়ে ভীত হয়ে ককেসাস প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল, পরবর্তীকালে তারা আভীর নামে পরিচিত হয়, এবং যে অঞ্চলে তারা বসবাস করত সেই অঞ্চলটি আভীর দেশ নামে পরিচিত হয়।

শুম্ভ বা কঙ্কঃ মহাভারতে উল্লিখিত প্রাচীন ভারতের কঙ্ক নামক প্রদেশের অধিবাসী।

যবনঃ মহারাজ যযাতির পুত্র তুর্বসুর বংশধরেরা যবন নামে পরিচিত। তুর্বসুকে বর্তমান তুরস্কের আধিপত্য প্রদান করা হয়েছিল। তাই তুর্বসুর বংশধর তুরস্কের অধিবাসীরা হচ্ছে যবন। যবনেরাও তাই ছিল ক্ষত্রিয়, এবং পরবর্তীকালে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি পরিত্যাগ করার ফলে তারা ম্লেচ্ছ-যবনে পরিণত হয়। মহাভারতে (আদি পর্ব ৮৫/৩৪) যবনদের বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চপাণ্ডবদের অন্যতম সহদেব সেই দেশটি জয় করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কর্ণের চাপে পশ্চিমের যবনেরা দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। বেদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, যবনেরাও ভারতবর্ষ জয় করে তার উপর আধিপত্য করবে, এবং পরবর্তীকালে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

খসঃ মহাভারতের দ্রোণ পর্বে খস দেশের অধিবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। যে জাতির মানুষদের গোঁফের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাদের বলা হয় খস। মঙ্গোলীয়, চীন, এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্থানের মানুষদের আকৃতি সেইরকম, তাদের বলা হয় খস।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক নামগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম। এমনকি যারা নিরন্তর পাপকার্যে লিপ্ত তারাও ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হয়ে যথার্থ মনুষ্য স্তর প্রাপ্ত হতে পারে। যিশুখ্রিস্ট এবং মহম্মদ, ভগবানের দুজন শক্তিশালী ভক্ত ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পৃথ্বীপৃষ্ঠে এক বিরাট কার্য সম্পাদন করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বর্ণনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে আধুনিক পৃথিবীর ভগবদ্বিহীন শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে, ভগবানের ভক্তদের উপর যদি পৃথিবীর নেতৃত্ব করার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়, যে জন্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ নামক সারা পৃথিবীব্যাপী একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে, তাহলে সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপায় সারা পৃথিবীর মানুষদের হৃদয়ে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন হতে পারে, কেননা জনসাধারণের কলুষিত হৃদয় পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেবল ভগবানের ভক্তদেরই রয়েছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিজেদের আসনে আসীন থাকতে পারে, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব অথবা কূটনৈতিক কার্যকলাপের

প্রতি মোটেই আসক্ত নন। ভগবদ্ভক্তেরা কেবল এটিই চান যে রাজনৈতিক অপপ্রচারের ফলে জনসাধারণ যেন বিপথগামী না হয় এবং ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার অনুসরণ করে জনসাধারণের দুর্লভ মানব জীবন যেন ব্যর্থ না হয়। তাই রাজনৈতিক নেতারা যদি ভগবদ্ভক্তদের সদুপদেশের দ্বারা পরিচালিত হন, তা হলে অবশ্যই পৃথিবীর বুকে এক মহান্ পরিবর্তন সাধিত হবে যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রার্থনা শুরু করেছেন *যৎ-কীর্তনম্* শব্দটির মাধ্যমে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের সরল পন্থাই নির্দেশ করে গেছেন, তার ফলে মানব হৃদয়ে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন হতে পারে এবং তখন রাজনীতিবিদেরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে এক মনোমালিন্য সৃষ্টি করেছে তা অচিরেই দূর হতে পারে। বিবাদের অগ্নি নির্বাপিত হলে আপনা থেকেই অন্যান্য সুফলগুলি দেখা দেবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যা আমরা পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি।

ভক্তি-সম্প্রদায়ের মতানুসারে, সাধারণত যাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে, ভগবদুপলব্ধির মার্গে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বৈষ্ণব এমনই শক্তিশালী যে তিনি পূর্বোল্লিখিত কিরাত আদি নীচ জাতিদেরও বৈষ্ণবে পরিণত করতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন যে ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ব্যাপারে কারোরই কোন বাধা নেই (এমন কি নিম্নকুলোদ্ভূত বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত ভগবদ্ভক্ত হতে পারে)। আর ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে সকলেই তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ব্যাপারে কেবল একটিই যোগ্যতার প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে হবে। পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তি, যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানে পারঙ্গত, তিনি শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন এবং জনসাধারণের গুরু হয়ে তাদের হৃদয় শুদ্ধ করে তাদের উদ্ধার করতে পারেন। কেউ যদি মস্ত বড় পাপীও হয়, সেও শুদ্ধ বৈষ্ণবের যথাযথ সঙ্গ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। তাই বৈষ্ণব জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কোন স্থানের মানুষদের শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন, এবং তাদের বিধি-বিধানের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত করতে পারেন, যা হচ্ছে ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতিরও ঊর্ধ্বে। এমনকি এই পন্থার তথাকথিত অনুগামীদের কাছেও বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রচলন থাকে না। বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতিনীতির অপেক্ষা না করে সকলেই পারমার্থিক বৈষ্ণব-পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, এবং এই অপ্রাকৃত পন্থা অনুসরণে কোনরকম বাধ্য-বাধকতা নেই। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করার মাধ্যমে, সেই পন্থা অনুসরণে আগ্রহী ব্যক্তিদের উদ্ধার করা যেতে পারে। ভক্তদের দ্বারা প্রচারিত এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন

বিচক্ষণ এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতি নীতির অপেক্ষা না করেই গ্রহণ করবেন। বৈষ্ণব কখনো অপর বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করেন না, ঠিক যেমন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মূর্তি বলে মনে করেন না। এই বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। (*প্রভবিষ্ণবে নমঃ*)। সর্বশক্তিমান ভগবান যেমন তাঁর ভক্তের ভক্তিময় অর্চনার সামান্য সেবাই গ্রহণ করেন এবং মন্দিরে তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের দেহ যখন উপযুক্ত বৈষ্ণবের শিক্ষকতায় ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তাও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বিধির নির্দেশ হচ্ছে—*অর্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ* ইত্যাদি। "মন্দিরে পূজিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মূর্তি বলে মনে করা উচিত নয়, সদ্ গুরুকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়, শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কোন বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয় এবং ভগবানের দিব্য নামকে সাধারণ শব্দ বলে মনে করা উচিত নয়।" (*পদ্ম-পুরাণ*)।

অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যেহেতু ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই তিনি যে কোন অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং অথবা তাঁর অভিন্ন প্রকাশস্বরূপ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে অঙ্গীকার করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম বহির্ভূত সম্প্রদায় থেকে বহু ভক্ত অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কোন বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন ব্রজগোপীদের ভর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসানুদাস। এইটিই হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির পন্থা।

শ্লোক ১৯

স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
স্ত্রয়ীময়ো ধর্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মবতাম্**—আত্মতত্ত্ববেত্তাদের; **অধীশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রয়ীময়ঃ**—মূর্তিমান বেদ; **ধর্মময়ঃ**—মূর্তিমান ধর্মশাস্ত্র; **তপঃ-ময়ঃ**—মূর্তিমান তপস্যা; **গতব্যলীকৈঃ**—যিনি সমস্ত কপটতার ঊর্ধ্বে তাঁর দ্বারা; **অজ**—ব্রহ্মা; **শঙ্করাদিভিঃ**—শিব এবং অন্যদের দ্বারা; **বিতর্ক্যলিঙ্গঃ**—যাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে দর্শন করা হয়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রসীদতাম্**—তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

তিনি আত্মতত্ত্ববেত্তা পুরুষদের পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর। তিনি বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং তপস্যার মূর্তিমান প্রকাশ। তিনি ব্রহ্মা, শিব এবং কপটতা রহিত সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত। এই প্রকার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আস্পদ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও আত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থার সমস্ত অনুগামীদেরই প্রভু, তথাপি যারা সমস্ত কপটতা এবং ছলনা থেকে মুক্ত তাঁরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। সকলেই পরাশান্তি এবং নিত্য জীবনের অন্বেষণ করছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই হয় বৈদিক শাস্ত্র নয়তো অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন অথবা কঠোর তপস্যা করছেন। তাঁরা হচ্ছেন জ্ঞানী, যোগী, অনন্য ভক্ত ইত্যাদি পরমার্থবাদী। কিন্তু অনন্য ভক্তরাই কেবল ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারেন, কেননা তাঁরা সমস্ত ছলনা এবং কপটতা থেকে মুক্ত। যাঁরা আত্ম উপলব্ধির পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁদের কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভগবদ্ভক্ত এই চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাদের বলা হয় কর্মী বা ভুক্তিকামী, অর্থাৎ যারা জড় সুখভোগে আকাঙ্ক্ষী। মননের দ্বারা যারা ভগবানকে জানতে চায়, তাদের বলা হয় জ্ঞানী বা মুক্তিকামী, অথবা যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। যারা আট প্রকার জড় সিদ্ধি লাভের জন্য বিভিন্ন রকম তপস্যা করে, তাদের বলা হয় যোগী, এবং চরমে তারা সমাধিস্থ অবস্থায় পরমাত্মাকে দর্শন করে ; তারা সিদ্ধিকামী বা অণিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব ইত্যাদি সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী। শক্তিশালী যোগীদের সেই সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের আত্মতৃপ্তির জন্য সেই সমস্ত কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা কেবল চান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে, কেননা ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবরূপে তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ এবং নিত্য দাস। তাঁর স্বরূপে এই পূর্ণ উপলব্ধি ভগবদ্ভক্তকে নিষ্কাম হতে সাহায্য করে, অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের জন্য কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না।জীব তার স্বরূপে বাসনারহিত হতে পারে না। তবে ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী এবং সিদ্ধিকামীরা তাদের ব্যক্তিগত সুখের বাসনা করে, কিন্তু নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধনের বাসনা করেন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং তাঁরা সর্বদাই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত থাকেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে বাসনা শূন্য করার জন্য ভগবান শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুনিয়েছিলেন, যাতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ এবং ভক্তিযোগের

পন্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্জুন যেহেতু ছিলেন নিষ্কপট, তাই তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন (*করিষ্যে বচনং তব*), এবং তার ফলে তিনি বাসনাশূন্য হয়েছিলেন।

এখানে ব্রহ্মা এবং শিবের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কেননা ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবী এবং চার কুমার সনক, সনাতন আদি হচ্ছেন চারটি নিষ্কাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁরা সমস্ত কপটতা থেকে মুক্ত। শ্রীল জীব গোস্বামী *গতব্যলীকৈঃ* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন *প্রোজ্ঝিত কৈতবৈঃ* রূপে, অর্থাৎ যারা সব রকম কপটতা থেকে মুক্ত (ভগবানের অনন্য ভক্ত)। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (মধ্য ১৯/১৪৯) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী', সকলি 'অশান্ত' ॥

যারা তাদের পুণ্য কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে, যারা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, এবং যারা যোগসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে, তারা অশান্ত, কেননা তারা সকলেই তাদের নিজেদের জন্য কিছু চায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত, কেননা তিনি তাঁর নিজের জন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সর্বদাই ভগবানের বাসনা অনুসারে সেবা করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা যায় যে ভগবান সকলেরই, কেননা তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কেউই তাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারে না, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/৯) ভগবানই ঘোষণা করেছেন যে তিনিই সকলকে তাদের কর্মের ফল প্রদান করেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন বৈদান্তিক, কর্মকাণ্ডী, ধর্মনেতা, তপস্বী আদি পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হতে আকাঙ্ক্ষী সকলেরই অধীশ্বর (পরম নিয়ন্তা)। কিন্তু চরমে নিষ্কপট ভক্তরাই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন।

শ্লোক ২০

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥ ২০ ॥

শ্রিয়ঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য; **পতিঃ**—অধীশ্বর; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের; **পতিঃ**—নির্দেশক; **প্রজাপতিঃ**—সমস্ত জীবেদের নায়ক; **ধিয়াম্**—বুদ্ধির; **পতিঃ**—প্রভু; **লোকপতিঃ**—সমস্তলোকের অধীশ্বর; **ধরা**—পৃথিবী; **পতিঃ**—পরম; **পতিঃ**—প্রধান; **গতিঃ**—গন্তব্যস্থল; **চ**—ও; **অন্ধক**—যদুবংশের একজন রাজা; **বৃষ্ণি**—যদু বংশের প্রথম

রাজা ; **সাত্বতাম্**—যদুগণ ; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন ; **মে**—আমার প্রতি ; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ; **সতাম্**—সমস্ত ভক্তদের ; **পতিঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

সমস্ত ভক্তদের আরাধ্য ভগবান, অন্ধক, বৃষ্ণি প্রমুখ যদুবংশীয় রাজাদের পালক এবং গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি, সমস্ত যজ্ঞের নির্দেশক এবং সেই সূত্রে সমস্ত জীবের নায়ক, সমস্ত বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্তা, জড় এবং চেতন সমস্ত লোকসমূহের অধীশ্বর এবং পৃথিবীর পরম অবতার (সর্বেসর্বা) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট *গতব্যলীক*, যিনি সবরকম ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত সিদ্ধির পূর্ণ প্রকাশ পরমেশ্বর ভগবান বলে তাঁর নিজ উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। সকলেই লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, কিন্তু মানুষ জানে না যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবীর পতি। ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে, তাঁর অপ্রাকৃত আলয় গোলোক বৃন্দাবনে তিনি সুরভী গাভীদের পালন করেন এবং সেখানে শত সহস্র লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেবা করেন। এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে তাঁর অপ্রাকৃত আনন্দদায়িনী শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করেন তখন জঘন্য মৈথুন সুখের অলীক আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট বদ্ধ জীবদের আকর্ষণ করার জন্য তাঁর রাস লীলার মাধ্যমে তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তির কার্যকলাপ আংশিকভাবে প্রদর্শন করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা, যাঁরা জড় জগতের জঘন্য যৌন জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, যখন ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তির কার্যকলাপ বর্ণনা করেন তখন অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাতে কামের নামগন্ধ নেই। পক্ষান্তরে, তাঁরা সেই বিষয়ে আলোচনা করেন মৈথুনাসক্ত জড়বাদীদের কল্পনারও অতীত এক অপ্রাকৃত মাধুর্যময় স্বাদ আস্বাদন করার জন্য। জড় জগতের যৌন জীবন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মূল কারণ, শুকদেব গোস্বামী অবশ্যই সেই যৌন জীবনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। আর ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তিরও এই প্রকার জঘন্য বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন এমনই একজন নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী যে, তিনি কোন স্ত্রীলোককে প্রণাম করার জন্যও কাছে আসতে দিতেন না। তিনি জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসীদের প্রার্থনা সঙ্গীতও কখনো শুনতেন না কেননা সন্ন্যাসীর পক্ষে রমণীদের কণ্ঠে সঙ্গীত শ্রবণ করা নিষিদ্ধ। এত কঠোর সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও বৃন্দাবনের গোপ বালিকারা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন তিনি তাকে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা বলে অনুমোদন করেছেন। এই সমস্ত লক্ষ্মীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন প্রধানা, এবং তাই তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের প্রতিমূর্তি এবং তার থেকে অভিন্ন।

জীবনের সর্বোচ্চ লাভ প্রাপ্তির জন্য বৈদিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে যে বর লাভ হয় তা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা, আর লক্ষ্মীদেবীর পতি বা প্রিয়তম হওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞেরও পতি। তিনি সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা ; তাই শ্রীবিষ্ণুর আর এক নাম যজ্ঞপতি। ভগবদ্গীতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবকিছুই যেন যজ্ঞপতির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় *(যজ্ঞার্থাৎ কর্মনঃ)*, তা না হলে কর্ম জড় জগতের কর্মবন্ধনের কারণ হবে। যারা ভ্রান্ত ধারণা *(ব্যলীকম্)* থেকে মুক্ত নয় তারা ছোট ছোট দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, যেহেতু ভগবৎ ভক্তরা খুব ভালভাবে জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, তাই তাঁরা তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সঙ্কীর্তন যজ্ঞ *(শ্রবণং কীর্তনম্ বিষ্ণো)* অনুষ্ঠান করেন যা এই কলিযুগের জন্য বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। কলিযুগে অন্যান্য যজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব নয় কেননা এই যুগে যথাযথভাবে যজ্ঞের আয়োজন করা সম্ভব নয় এবং সেই সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করার উপযুক্ত পুরোহিতও নেই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩/১০-১১) থেকে আমরা জানতে পারি যে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধ জীবদের পুনর্জন্ম দান করার পর তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন যাপন করতে। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হলে বদ্ধ জীবদের কখনো জীবন ধারণের জন্য কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। চরমে তাঁরা তাদের অস্তিত্বকে পবিত্র করতে পারেন। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হবেন এবং তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন। বদ্ধ জীবদের কখনোই, কোন অবস্থাতে, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার অনুশীলন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এই সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞপতি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা ; তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রজাপতি। কঠ উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে এক ভগবান হচ্ছেন অসংখ্য জীবের নায়ক। ভগবান জীবদের পালন করেন *(একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্)*। তাই ভগবানকে বলা হয় পরম ভূত-ভৃৎ বা সমস্ত জীবের পালন কর্তা।

জীবদের তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বুদ্ধি প্রদান করা হয়। সমস্ত জীবেরা সমবুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নয় কেননা এই বুদ্ধির বিকাশের পিছনে রয়েছে ভগবানের নিয়ন্ত্রণ, যা ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ঘোষণা করা হয়েছে। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতির শক্তি আসে *(মত্ত স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ)*। ভগবানের কৃপায় কেউ স্পষ্টভাবে তাদের পূর্বকৃত কর্মসমূহ স্মরণ করতে পারে আবার কেউ পারে না। ভগবানের কৃপায় কেউ অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়, আবার কেউ তার সেই নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে মূর্খ হয়। তাই ভগবান হচ্ছেন ধিয়াম্-পতি বা বুদ্ধির নিয়ন্তা।

বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের প্রভু হওয়ার প্রয়াস করে। সকলেই তার বুদ্ধিমত্তার সর্বোত্তম প্রয়োগের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে। বদ্ধ জীবদের বুদ্ধিমত্তার এই অপব্যবহারকে বলা হয় উন্মত্ততা। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু বদ্ধ জীবেরা তাদের উন্মত্ততার ফলে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তাদের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে এবং ইন্দ্রিয়গণের সেই সমস্ত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নানা রকম অপকর্ম করে। তার ফলে মুক্ত জীবন লাভ করার পরিবর্তে উন্মত্ত বদ্ধ জীব বার বার বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জড় জগতে আমরা যা কিছু দর্শন করি তা সবই ভগবানের সৃষ্টি। তাই তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর প্রকৃত অধীশ্বর। ভগবানের নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ জীব এই জড় সৃষ্টির এক অংশ উপভোগ করতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে সে তা কখনো পারে না। ঈশোপনিষদে সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য জগতপতি কর্তৃক প্রদত্ত বস্তুগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। উন্মত্ততার ফলেই জীব অন্যের জাগতিক সম্পত্তি অবৈধভাবে অধিকার করার চেষ্টা করে।

ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবান, বদ্ধ জীবের প্রতি তাঁর অহৈতুকী করুণার বশে, বদ্ধ জীবেদের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর আত্মমায়ার প্রভাবে অবতরণ করেন। তিনি সকলকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে, আংশিকভাবে ভোগ করার অধিকার লাভ করে মিথ্যা ভোক্তা হওয়ার অভিমান না করার পরিবর্তে, তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি যখন অবতরণ করেন তখন তিনি প্রমাণ করেন তাঁর ভোগ করার ক্ষমতা কত বেশি, এবং তাঁর ভোগ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করে তিনি এক সঙ্গে ষোল হাজার পত্নীকে বিবাহ করেন। বদ্ধ জীবেরা এক পত্নীর পতি হয়ে গর্ব করে, কিন্তু ভগবান তাদের সেই মনোভাব দর্শন করে হাসেন। বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন প্রকৃত পতি কে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সৃষ্টিতে সমস্ত রমণীদের পতি হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণে এক বা দুই পত্নীর পতি হয়ে গর্ব অনুভব করে।

এই শ্লোকে যে বিভিন্ন প্রকার পতির উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত যোগ্যতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে বিরাজমান, এবং তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাকে বিশেষভাবে যদুবংশের পতি এবং গতি বলে বর্ণনা করেছেন। যদুবংশের সমস্ত সদস্যদের কাছে শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন সবকিছু, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ করেন তখন তাঁরা সকলে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল, কেননা ভগবানের সঙ্গে তাঁদেরও স্বধামে ফিরে যেতে হয়েছিল। যদু বংশের ধ্বংস প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই সৃষ্টির ভৌতিক প্রদর্শন। প্রকৃতপক্ষে যদুবংশের সমস্ত সদস্যরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ। ভগবান তাই সমস্ত ভক্তদের পথ প্রদর্শক এবং সেই হেতু শুকদেব গোস্বামী প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ২১

যদঙ্‌ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ২১ ॥

যৎ-অঙ্‌ঘ্রি—যাঁর চরণ কমল; **অভিধ্যান**—সর্বক্ষণ চিন্তা করে; **সমাধি**—সমাধি; **ধৌতয়া**—ধৌত হয়ে; **ধিয়া**—সেই বিচিত্র বুদ্ধির দ্বারা; **অনুপশ্যন্তি**—মহাপুরুষদের অনুসরণপূর্বক দর্শন করেন; **হি**—নিশ্চিত ভাবে; **তত্ত্বম্**—পরম সত্যকে; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের এবং নিজের; **বদন্তি**—তাঁরা বলেন; **চ**—ও; **এতৎ**—এই; **কবয়ো**—দার্শনিক অথবা বিদ্বান পণ্ডিতগণ; **যথারুচম্**—যেভাবে তাঁরা চিন্তা করেন; **স**—তিনি; **মে**—আমার; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ (যিনি মুক্তি দান করেন); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রসীদতাম্**—আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন মুক্তিদাতা। মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিক্ষণ তাঁর চরণকমলের চিন্তা করার ফলে ভগবদ্ভক্তেরা সমাধিতে সেই পরম সত্যকে দর্শন করতে পারেন। কিন্তু মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাদের কল্পনা অনুসারে তাঁকে অনুমান করতে চেষ্টা করে। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

যোগীরা ইন্দ্রিয় দমন করার কঠোর প্রয়াস করার পর সমাধিমগ্ন অবস্থায় সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে দর্শন করলেও করতে পারেন, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল প্রতিক্ষণ ভগবানের চরণকমলের স্মরণ করার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ প্রকৃত সমাধিযোগে অবস্থিত হতে পারেন কেননা সে উপলব্ধির প্রভাবে তাঁর মন এবং বুদ্ধি জড় ভোগবাসনা রূপী রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। শুদ্ধ ভক্ত মনে করেন যে তিনি জন্ম-মৃত্যুর সাগরে পতিত হয়েছেন এবং তাই তিনি নিরন্তর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন তাঁকে উদ্ধার করার জন্য। তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একটি অপ্রাকৃত ধূলিকণায় পরিণত হতে। ভগবানের কৃপার প্রভাবে শুদ্ধ ভক্ত জড় সুখভোগের সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হন, এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন। ভগবানের একজন মহান ভক্ত, সম্রাট কুলশেখর প্রার্থনা করেছেন—

কৃষ্ণ তদীয়-পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

"হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি প্রার্থনা করি যেন আমার মনরূপী রাজহংস তোমার শ্রীপাদপদ্মরূপ সরোবরে ডুব দিয়ে তার জলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ; তা না হলে প্রাণ ত্যাগ করার সময়, যখন আমার কণ্ঠ কফ, বায়ু এবং পিত্তের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি কিভাবে তোমাকে স্মরণ করব ?"

হংস এবং মৃণালের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই উপমাটি অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে; হংস বা পরমহংস না হলে ভগবানের চরণকমলের জালে প্রবেশ করা যায় না। ব্রহ্ম-সংহিতায় যে বর্ণনা করা হয়েছে, মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাদের পাণ্ডিত্যের দ্বারা চেষ্টা করেও অন্তকালে স্বপ্নেও পরম তত্ত্বকে জানবার কথা কল্পনা করতে পারে না। এই প্রকার জ্ঞানীদের কাছে প্রকট না হওয়ার অধিকার ভগবানের আছে। যেহেতু তারা ভগবানের চরণকমলরূপী মৃণালের জালে প্রবেশ করতে পারে না, তাই বিভিন্ন মনোধর্মীর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রয়েছে, এবং চরমে তারা একটা অর্থহীন বোঝাপড়া করে নিয়ে তাদের রুচি অনুসারে সিদ্ধান্ত করে যে, 'যত মত তত পথ'। কিন্তু ভগবান কোন দোকানদার নন যে তিনি তাঁর সবরকম মনোধর্মী খরিদ্দারদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করবেন। ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর, এবং তিনি কেবল তাঁর কাছেই পূর্ণ শরণাগতি দাবী করেন। শুদ্ধ ভক্তেরা কিন্তু পুর্ববর্তী মহাজনদের বা আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বচ্ছ মাধ্যমরূপী সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন *(অনুপশ্যান্তি)*। শুদ্ধ ভক্তেরা কখনো মনের আকাশকুসুম কল্পনার মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করার চেষ্টা করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন *(মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ)*। তাই ভগবান এবং তার ভক্ত সম্বন্ধে বৈষ্ণব আচার্যদের সিদ্ধান্তে কোন মতবিরোধ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস/কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ'। জীব ভগবানের নিত্য দাস এবং সে যুগপৎ ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই তত্ত্ব চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই স্বীকার করে (মুক্তি লাভের পরে জীব ভগবানের নিত্য দাসত্ব অঙ্গীকার করে), এবং কোন বৈষ্ণব আচার্যই মনে করেন না যে, ভগবান এবং তিনি এক।

সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভগবানের শুদ্ধভক্তের এই বিনম্রতা ভক্তকে এমনই এক সমাধিতে মগ্ন করে যার প্রভাবে তিনি সবকিছু উপলব্ধি করতে পারেন, কেননা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের কাছে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেন, যে কথা ভগবদ্গীতায় (১০/১০) উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান সকলের বুদ্ধির অধীশ্বর হওয়ার ফলে (এমনকি অভক্তদেরও) তিনি তাঁর ভক্তকে সমুচিত বুদ্ধি প্রদান করেন যার প্রভাবে শুদ্ধ ভক্ত ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হন। ভগবান কখনো কারো জল্পনা কল্পনার দ্বারা অথবা পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বাক্য বিন্যাসের

প্রভাবে প্রকাশিত হন না, পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর ভক্তের সেবা বৃত্তির প্রভাবে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ রূপে প্রসন্ন হন তখন তিনি তাঁর সেই ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মনোধর্মী জ্ঞানী অথবা 'যত মত তত পথ' সিদ্ধান্তের সমর্থক নন, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের প্রসন্নতা কামনা করে কেবল তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন। ভগবানকে জানার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ২২

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
সমে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥ ২২॥

প্রচোদিতা—অনুপ্রাণিত; **যেন**—যার দ্বারা; **পুরা**—সৃষ্টির প্রারম্ভে; **সরস্বতী**—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; **বিতন্বতা**—বিস্তারিত; **অজস্য**—প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার; **সতীম স্মৃতিম্**—শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি; **হৃদি**—হৃদয়ে; **স্ব**—নিজস্ব; **লক্ষণা**—উদ্দেশ্য; **প্রাদুরভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কিল**—যেন; **আস্যতঃ**—মুখ থেকে; **স**—তিনি; **মে**—আমাকে; **ঋষীণাম্**—শিক্ষকদের; **ঋষভঃ**—প্রধান; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে শক্তিশালী জ্ঞান বিকশিত করেছিলেন এবং সৃষ্টি এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং সেই বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। সমস্ত জ্ঞানদাতা ঋষিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে ভগবান সকলকে বাঞ্ছিত জ্ঞান প্রদান করেন। জীব ভগবানের শক্তির চৌষট্টি ভাগের পঞ্চাশ ভাগ বা ৭৮% জ্ঞান অর্জন করতে পারে। জীব যেহেতু তার স্বরূপে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার পক্ষে ভগবানের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। বদ্ধ অবস্থায়, জীবের পরিবর্তন বা মৃত্যুর পর জীব সব কিছু ভুলে যায় সেই বলবতী জ্ঞান পুনরায় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবানের কৃপায় পুনরায় প্রকাশিত হয় এবং তাকে বলা হয় জ্ঞানের জাগরণ, কেননা অচেতন বা সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে ওঠার সাথে তার তুলনা করা যায়। জ্ঞানের এই জাগরণ পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাই ব্যবহারিক জগতে আমরা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান দর্শন

করি। জ্ঞানের এই উদয় আপনা থেকে হয় না অথবা জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে হয় না। তার উৎস হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান (*ধিয়াং পতি*)

এমন কি, ব্রহ্মা পর্যন্ত পরম স্রষ্টার এই নিয়মের অধীন। সৃষ্টির প্রারম্ভে কোন পিতামাতা ব্যতীতই ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল, কেননা ব্রহ্মার পূর্বে কোন জীব ছিল না। ব্রহ্মার জন্ম হয় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে উদ্ভূত পদ্ম থেকে, এবং তাই তাকে বলা হয় অজ। এই ব্রহ্মা বা অজও ভগবানের বিভিন্ন অংশ একটি জীব, কিন্তু ভগবানের অত্যন্ত পুণ্যবান ভক্ত হওয়ার ফলে, প্রকৃতির দ্বারা ভগবানের মুখ্য সৃষ্টির পর তিনি ভগবান কর্তৃক সৃষ্টিকার্যে অনুপ্রাণিত হন।

তাই জড়া প্রকৃতি এবং ব্রহ্মা উভয়ই ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নন। জড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াসমূহই কেবল অবলোকন করতে পারে, তারা সেই কার্যকলাপের পিছনে যে একজন পরিচালক আছে, তা বুঝতে পারে না, ঠিক যেমন পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটি শিশু বিদ্যুতের কার্যকলাপ দর্শন করে।

ভৌতিক বৈজ্ঞানিকদের এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণ হচ্ছে তাদের অল্পজ্ঞতা। তাই বৈদিক জ্ঞান প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করা হয়েছিল, এবং সেই জ্ঞান ব্রহ্মা বিতরণ করেন। নিঃসন্দেহে ব্রহ্মা হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রবক্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানই তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করেন, কেননা এই জ্ঞান সরাসরিভাবে ভগবানের থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। বেদকে তাই বলা হয় *অপৌরুষেয়*, অর্থাৎ কোন সৃষ্ট জীব থেকে তার উদ্ভব হয়নি।

সৃষ্টির পূর্বেও ভগবান ছিলেন (*নারায়ণঃ পরো ব্যক্তা*), এবং তাই ভগবানের এই বাণী হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত এই দুই প্রকার শব্দ তরঙ্গের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। পদার্থবিদেরা কেবল প্রাকৃত ধ্বনি বা জড় আকাশে স্পন্দিত ধ্বনিরই বিচার করতে পারে। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, সাংকেতিক অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে যে বৈদিক জ্ঞান, তা ভগবান থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাসদেব—এইভাবে গুরুপরম্পরা ধারায় অনুপ্রাণিত না হলে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ কোন জড় পণ্ডিত অনুবাদ অথবা প্রকাশ করতে পারে না। সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত বা অনুপ্রাণিত না হলে তা কখনোই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আদি গুরু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, এবং পরম্পরা ধারায় সেই জ্ঞান প্রবাহিত হয়, যা ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, বৈধ পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত না হলে সেই মন্ত্র নিষ্ফল (*বিফলা মতাঃ*), যদিও তিনি জড়জাগতিক শিল্প শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানে তিনি মহা পণ্ডিত হতে পারেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থলে বিরাজমান ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নগুলির উত্তর

তিনি যেন যথাযথভাবে দিতে পারেন। সদ্‌গুরু জড় পণ্ডিতদের মতো মনোধর্মী অনুমানকারী নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন *শ্রোত্রিয়ম ব্রহ্মনিষ্ঠম্*।

শ্লোক ২৩

ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভু-
নির্মায় শেতে যদমূষু পূরুষঃ।
ভুঙ্ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ
সোঽলংকৃষীষ্ট ভগবান্ বচাংসি মে ॥ ২৩ ॥

ভূতৈঃ—সৃষ্টির উপাদানসমূহের দ্বারা ; **মহদ্ভিঃ**—জড় সৃষ্টির ; **যঃ**—যিনি ; **ইমাঃ**— এই সমস্ত ; **পুরঃ**—শরীর ; **বিভুঃ**—ভগবানের ; **নির্মায়**—সৃষ্টি করার জন্য ; **শেতে**— শয়ন করেন ; **যৎ-অমূষু**—যিনি অবতরণ করেছেন ; **পূরুষঃ**—শ্রীবিষ্ণু ; **ভুঙ্ক্তে**— প্রভাবিত করেন ; **গুণান্**—প্রকৃতির তিনটি গুণ ; **ষোড়শ**—ষোলভাগে ; **ষোড়শাত্মকঃ**—এই ষোলটির জনক হওয়ার ফলে ; **সঃ**—তিনি ; **অলংকৃষীষ্ট**— অলংকৃত করতে পারেন ; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বচাংসি**—বাণী ; **মে**—আমার।

অনুবাদ

যে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে শয়ন করে প্রকৃতির উপাদান থেকে সৃষ্ট সমস্ত শরীরকে উজ্জীবিত করেন, এবং পুরুষাবতাররূপে জীবকে তার জড় শরীরের জনক ষোলটি গুণের (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত) অধীনস্থ করেন, সেই ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার বাণীকে অলংকৃত করেন।

তাৎপর্য

সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ভক্ত, শুকদেব গোস্বামী (জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের মতো নিজের ক্ষমতার গর্বে গর্বিত না হয়ে) পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য প্রার্থনা করেছেন যাতে তাঁর বাণী সফল হয় এবং শ্রোতাগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই সফলভাবে সম্পাদিত সমস্ত কার্যে নিজেকে নিমিত্ত মাত্র বলে মনে করেন, এবং তার কোন কার্যের জন্য কোন রকম কৃতিত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরম আত্মা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত যে তৃণও নড়তে পারে না, সে কথা না জেনে ভগবৎ বিমুখ নাস্তিকেরা সবসময় তাদের কার্যকলাপের সমস্ত কৃতিত্ব দাবী করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় অগ্রসর হতে চেয়েছেন, যিনি ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রে যে সমস্ত তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে তা স্বকপোল কল্পিত মতবাদ নয় অথবা মনগড়া গল্প নয়, যা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় মনে করে থাকে। বৈদিক তত্ত্ব বাস্তবিক সত্যে পূর্ণ বিবরণ যাতে কোন ত্রুটি বা ভ্রম নেই। শুকদেব গোস্বামী সৃষ্টি তত্ত্ব দার্শনিক অনুমানের

ভিত্তিতে বর্ণনা করতে চাননি, পক্ষান্তরে ব্রহ্মা যেভাবে ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তা বর্ণনা করেছিলেন ঠিক সেইভাবে বাস্তবিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন বেদান্তের জনক, এবং তিনি কেবল বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত অর্থ জানেন। তাই ধর্ম সম্বন্ধে বেদে বর্ণিত সিদ্ধান্ত থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন সত্য নেই। এই বৈদিক জ্ঞান বা ধর্ম শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, কেননা তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিনীত সেবক যাদের স্বনিযুক্ত ব্যাখ্যাকার হওয়ার বাসনা ছিল না। বৈদিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করার এইটিই বিধি যাকে বলা হয় পরম্পরা।

বুদ্ধিমান মানুষেরা সহজেই অনুমান করতে পারেন কোন জড় সৃষ্টি (তার নিজের দেহই হোক অথবা কোন ফল বা ফুল হোক) চেতনের স্পর্শ বিনা সুন্দরভাবে বর্ধিত হতে পারে না। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা অথবা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁদের মতামত ততক্ষণই কেবল প্রকাশ করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের শরীরে আত্মা বিরাজমান থেকে শরীরকে জীবিত রাখে। তাই সমস্ত সত্যের উৎস হচ্ছেন পরমাত্মা, জড় পদার্থ নয় যা জড়বাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে সৃষ্টির আদিতে জড় ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর শূন্য ছিল এবং ভগবান তাতে প্রবেশ করে একে একে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। তেমনই পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন ; তাই সব কিছুই তাঁরই দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। সৃষ্টির ষোলটি তত্ত্ব, যথা ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ এবং একাদশ ইন্দ্রিয় প্রথমে ভগবান থেকে প্রকাশিত হয় এবং তারপর জীব কর্তৃক গৃহীত হয়। এইভাবে জীবের উপভোগের জন্য জড় উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়। সমগ্র জড় সৃষ্টির পরিচালনার যে সুন্দর ব্যবস্থা তা সম্ভব হয়েছে ভগবানেরই শক্তির প্রভাবে, এবং জীব কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারে যাতে সে তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম সত্তা, শুকদেব গোস্বামী থেকে ভিন্ন, তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পেরেছেন। ভগবান জীবকে জড় সৃষ্টি উপভোগ করতে সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি এই প্রকার সমস্ত ভ্রান্ত উপভোগ থেকে দূরে থাকেন। শুকদেব গোস্বামী কেবল সেই সত্য বর্ণনা করতে সাহায্য করার জন্য ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করেননি, তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর শ্রোতাদেরও সাহায্য করেন।

শ্লোক ২৪

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥ ২৪ ॥

নমঃ—আমার প্রণতি ; **তস্মৈ**—তাঁকে ; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে ; **বাসুদেবায়**—বাসুদেবকে অথবা তাঁর অবতারকে ; **বেধসে**—বৈদিক শাস্ত্রের সঙ্কলনকারী ;

পপু—পান করেছিলেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অয়ম্**—এই বৈদিক জ্ঞান; **সৌম্যাঃ**—ভক্তগণ, বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদেরা; **যৎ**—যাঁর থেকে; **মুখ-অম্বুরুহ**—কমলসদৃশ মুখ; **আসবম্**—তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃত।

অনুবাদ

আমি বৈদিক শাস্ত্রের সঙ্কলনকর্তা, বাসুদেবের অবতার শ্রীল ব্যাসদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত অমৃতময় দিব্যজ্ঞান পান করেন।

তাৎপর্য

বেধসে বা 'দিব্য জ্ঞানের সঙ্কলনকারী' শব্দটির ব্যাখ্যা করে শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা হয়েছে বাসুদেবের অবতার শ্রীল ব্যাসদেবকে। শ্রীল জীব গোস্বামী তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অধিক অগ্রবর্তী, যথা,শ্রীকৃষ্ণের মুখামৃত তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং তার ফলে তাঁরা সঙ্গীত, নৃত্য, বেশ শয্যা, অলঙ্করণ আদি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক ললিত কলায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এই প্রকার সঙ্গীত, নৃত্য এবং অলঙ্করণ যা ভগবান উপভোগ করেন তা কখনই জড়জাগতিক নয়, কেননা শুরুতেই ভগবানকেপরা বা চিন্ময় বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আত্মবিস্মৃত বদ্ধ জীবদের কাছে এই দিব্য জ্ঞান অজ্ঞাত। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব বদ্ধ জীবদের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই বৈদিক শাস্ত্রসমূহ সঙ্কলন করেছেন। তাই মানুষের কর্তব্য, বৈদিক শাস্ত্র,বা শৃঙ্গার রসে ভগবান থেকে তাঁর নিত্য সহচরীদের মধ্যে সঞ্চারিত অমৃত, ব্যাসদেব বা শুকদেবের মুখপদ্ম থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। অপ্রাকৃত জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে ভগবান কর্তৃক রাস লীলায় পরিবেশিত সঙ্গীত এবং নৃত্যের অপ্রাকৃত কলা হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু গভীর দার্শনিক আলোচনা এবং রাস নৃত্যে ভগবানের চুম্বনরূপ অমৃত সমভাবে আস্বাদন করেন, কেননা এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ২৫

এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে।
বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদ্ যদাহ হরিরাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

এতৎ—এই বিষয়ে; **এব**—ঠিক এইভাবে; **আত্মভূ**—প্রথম জন্মা (ব্রহ্মাজী); **রাজন্**—হে রাজন্; **নারদায়**—নারদ মুনিকে; **বিপৃচ্ছতে**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **বেদ-গর্ভঃ**—জন্মের সময় থেকেই যাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল; **অভ্যধাৎ**—

জ্ঞাপন করা হয়েছিল ; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে ; **যদাহ**—তিনি যা বলেছিলেন ; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের (ব্রহ্মার) প্রতি।

অনুবাদ

হে রাজন্ প্রথম জন্মা, জন্ম থেকেই যাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁর সেই পুত্র ব্রহ্মাকে ভগবান নিজ মুখে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, ব্রহ্মাও নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে সেই কথাই বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে যখন ব্রহ্মার জন্ম হয় তখনই তার মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল, এবং তাই তিনি বেদগর্ভ নামে পরিচিত অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি ছিলেন বেদান্ত তত্ত্ববেত্তা। বৈদিক জ্ঞান বা পূর্ণ অচ্যুত জ্ঞান ব্যতীত কেউই সৃষ্টি করতে পারে না। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে বৈদিক। বেদে সব রকম তত্ত্ব পাওয়া যায়, এবং তাই ব্রহ্মার মধ্যে সমস্ত পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার করা হয়েছিল যাতে তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হতে পারেন। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ণ বিবরণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, যেহেতু সে সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাকে যথাযথ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। নারদ মুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, ব্রহ্মা ঠিক যেভাবে সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে সেই জ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে তা দান করেছিলেন। নারদ আবার ব্যাসদেবকে ঠিক সেইভাবে তা বলেছিলেন, এবং ব্যাসদেব নারদ মুনির কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শুনেছিলেন তা শুকদেব গোস্বামীকে বলেছিলেন। আর শুকদেব গোস্বামী ব্যাসদেবের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছিলেন। এইটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার বিধি। উপরোক্ত পরম্পরা ধারার মাধ্যমেই কেবল বেদের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

কল্পনাপ্রসূত মতবাদের কোন প্রয়োজন নেই। জ্ঞান অবশ্যই বাস্তব হওয়া উচিত। অনেক জটিল বিষয় রয়েছে, এবং সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি তা বুঝিয়ে না দিলে তা বোঝা যায় না। বৈদিক জ্ঞান বোঝা অত্যন্ত কঠিন এবং তা অবশ্যই উপরোক্ত প্রণালীতে শেখা কর্তব্য ; তা না হলে তা বোঝা মোটেই সম্ভব নয়।

তাই শুকদেব গোস্বামী ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেছেন যাতে ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, অথবা ব্রহ্মা সাক্ষাৎ নারদ মুনিকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, তা যেন তিনি যথাযথভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। অতএব, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক বর্ণিত সৃষ্টি বিষয়ক বর্ণনাকে কাল্পনিক মতবাদ বলে জড়বাদীরা যে মত পোষণ করে থাকে, তা আদৌ ঠিক নয় ; পক্ষান্তরে তাঁর সেই বর্ণনা পূর্ণ সত্য। যে ব্যক্তি সেই বাণী যথাযথভাবে শ্রবণ করে তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন তিনি জড় সৃষ্টির বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

ইতি 'সৃষ্টির প্রকরণ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সর্বকারণের কারণ

শ্লোক ১

নারদ উবাচ

দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্বজ।
তদ্বিজানীহি যজ্জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্ ॥ ১ ॥

নারদঃ উবাচ—শ্রী নারদ বললেন; **দেব**—সমস্ত দেবতাদের; **দেব**—দেবতা; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—হয়; **ভূতভাবন**—সমস্ত জীবের স্রষ্টা; **পূর্বজ**—প্রথম জন্মা; **তৎ-বিজানীহি**—দয়া করে সেই জ্ঞান দান করুন; **যজ্জ্ঞানম্**—সেই জ্ঞান; **আত্মতত্ত্ব**—চিন্ময়; **নিদর্শনম্**—বিশেষভাবে নির্দেশ করে।

অনুবাদ

শ্রী নারদমুনি ব্রহ্মাকে বললেনঃ হে দেবাদিদেব! আপনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রথম জন্মা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কৃপা করে আপনি আমাকে দিব্য জ্ঞান দান করুন, যা মানুষকে আত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাপন করে।

তাৎপর্য

এখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রণালীর সার্থকতা পুনরায় প্রতিপন্ন হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং সেই জ্ঞান তিনি তাঁর শিষ্য নারদকে দান করেছিলেন। নারদ সেই জ্ঞান ভিক্ষা করেছিলেন এবং ব্রহ্মা তাঁকে তা দান করেছিলেন। তাই, উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে দিব্য জ্ঞান ভিক্ষা করা এবং যথাযথভাবে তা প্রাপ্ত হওয়াই পরম্পরার বিধান। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৪/২) এই প্রথা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসু শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে যোগ্য গুরুর শরণাগত হয়ে বিনীত জিজ্ঞাসা এবং সেবার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে দিব্য জ্ঞান লাভ করা। বিনীত জিজ্ঞাসা এবং সেবার মাধ্যমে লব্ধ যে, জ্ঞান তা অর্থের বিনিময়ে লব্ধ জ্ঞানের থেকে অধিক ফলপ্রদ। ব্রহ্মা এবং নারদের পরম্পরায় অধিষ্ঠিত গুরু কখনো টাকা-পয়সার আকাঙ্ক্ষা

করেন না। ঐকান্তিক সেবার দ্বারা সদ্ গুরুকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আদর্শ শিষ্যকে আত্মা এবং পরমাত্মার প্রকৃতি ও তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করতে হয়।

শ্লোক ২

যদ্রূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো।
যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥

যৎ—যা ; **রূপম্**—লক্ষণ ; **যৎ**—যা ; **অধিষ্ঠানম্**—পটভূমি ; **যতঃ**—যেখান থেকে ; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট ; **ইদম্**—এই জগৎ ; **প্রভো**—হে পিতৃদেব ; **যৎ**—যাতে ; **সংস্থম্**—সংরক্ষিত ; **যৎ**—যা ; **পরম্**—বশীভূত ; **যৎ**—যা হয় ; **চ**—এবং ; **তৎ**—তার ; **তত্ত্বম্**—লক্ষণসমূহ ; **বদ**—দয়া করে বর্ণনা করুন ; **তত্ত্বতঃ**—বাস্তবভাবে।

অনুবাদ

হে পিতা! কৃপা করে আপনি আমাকে এই ব্যক্ত জগতে বাস্তবিক লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন। তার আশ্রয় কি? কিভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে? কিভাবে তার সংরক্ষণ হয়? এবং কার নিয়ন্ত্রণে এই সবকিছু সম্পাদিত হচ্ছে?

তাৎপর্য

বাস্তবিক কারণ এবং কার্যের ভিত্তিতে নারদমুনির প্রশ্নগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। নাস্তিকেরা কিন্তু তাদের মনগড়া বহু মতবাদ উপস্থাপন করে যেগুলির কার্য এবং কারণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকেরা তাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বহু মতবাদ সৃষ্টি করেছে, তথাপি ব্যক্ত জগত এবং চিন্ময় আত্মার রহস্য তারা উদ্ঘাটন করতে পারেনি। নারদ মুনি কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের মতো জল্পনা কল্পনা না করে যথাযথভাবে তার তত্ত্ব অবগত হতে চেয়েছিলেন।

আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞানে জগৎ এবং তার সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিহিত রয়েছে। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এই জগতে বাস্তবিকভাবে তিনটি জিনিস দেখতে পান—জীব, জগৎ এবং তাদের উপর পরম নিয়ন্ত্রণ। বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারেন যে জীব এবং জগত উভয়েরই সৃষ্টি ঘটনাক্রমে হয়নি। সৃষ্টি এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমনই একটি সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে যে, তা দেখে বোঝা যায় যে, তার পিছনে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরিকল্পনা রয়েছে, এবং কোন তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির সহায়তায় ঐকান্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে সর্ব কারণের পরম কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩

সর্বং হ্যেতত্ত্ববান্ বেদ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।
করামলকবদ্বিশ্বং বিজ্ঞানাবসিতং তব ॥ ৩ ॥

সর্বম্—সবকিছু; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এই; **ভবান্**—আপনি; **বেদ**—জানেন; **ভূত**—যা কিছুর সৃষ্টি হয়েছে বা জন্ম হয়েছে; **ভব্য**—যা কিছুর সৃষ্টি হবে বা জন্ম হবে; **ভবৎ**—যা কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে; **প্রভুঃ**—সব কিছুর স্বামী, আপনি; **করামলকবৎ**—আপনার মুঠোয় আমলকীর মতো; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ডে; **বিজ্ঞান-অবসিতম্**—আপনার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তর্গত; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে পিতা, এই সব কিছুই আপনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানেন কেননা পূর্বে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে এবং বর্তমানে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু রয়েছে তা সবই আপনার হস্তস্থিত একটি আমলকীর মতো।

তাৎপর্য

এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সে সবেরই সাক্ষাৎ স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা। তাই তিনি জানেন পূর্বে কি হয়েছিল, ভবিষ্যতে কি হবে, এবং বর্তমানে কি হচ্ছে। তিনটি মুখ্য বস্তু যথা জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, সর্বদাই কার্যশীল। এবং যিনি প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপক, তিনি তাঁর হস্তধৃত একটি আমলকীর মতো, সেই সমস্ত বিষয়ে কার্য এবং কারণ সম্বন্ধে সমস্তই অবগত। কেউ যখন কোন কিছু তৈরি করেন, তখন সেই বস্তুটি সম্বন্ধে সবকিছু জানা তার পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন সেই বস্তুটি তৈরি করার কলা তিনি কিভাবে শিখেছিলেন, তার উপাদান তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, কিভাবে তিনি সেগুলি আয়োজন করেছেন এবং কিভাবে সেগুলির উৎপাদন চলছে। ব্রহ্মা যেহেতু প্রথম জন্মা জীব, তাই তাঁর পক্ষে সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে সবকিছু জানা স্বাভাবিক।

শ্লোক ৪

যদ্বিজ্ঞানো যদাধারো যৎপরস্ত্বং যদাত্মকঃ।
একঃ সৃজসি ভূতানি ভূতৈরেবাত্মমায়য়া ॥ ৪ ॥

যৎ-বিজ্ঞানঃ—জ্ঞানের উৎস; **যৎ-আধারঃ**—যাঁর আশ্রয়; **যৎপরঃ**—যাঁর অধীনে; **ত্বম্**—আপনি; **যদাত্মকঃ**—যেই ক্ষমতায়; **একঃ**—একলা; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করছেন; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **ভূতৈঃ**—জড় উপাদানের সাহায্যে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম**—স্বীয়; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে পিতা! আপনার জ্ঞানের উৎস কি? আপনি কার আশ্রয়ে রয়েছেন? এবং কার অধীনে আপনি কার্য করছেন? আপনার বাস্তবিক স্থিতি কি? আপনি কি আপনার শক্তির দ্বারা জড় উপাদানের সাহায্যে সমস্ত জীবদের সৃষ্টি করেন?

তাৎপর্য

শ্রীনারদমুনি জানতেন যে, ব্রহ্মা কঠোর তপস্যা করার মাধ্যমে সৃজনাত্মক শক্তি লাভ করেছিলেন। অতএব তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ কেউ একজন আছেন যিনি ব্রহ্মাকে সৃজনী শক্তি দান করেছিলেন। তাই উপরোক্ত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের প্রগতির মাধ্যমে যা কিছু আবিষ্কার করছেন তা স্বতন্ত্র নয়। বৈজ্ঞানিকদের উর্বর মস্তিষ্কের সাহায্যে বিদ্যমান বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হয়, আর সেই মস্তিষ্ক অন্য একজন তৈরি করেছেন। যে মস্তিষ্কের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা কাজ করেন, সে রকম আর একটি মস্তিষ্ক তৈরি করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কোন বস্তু সৃষ্টির ব্যাপারে কেউ স্বতন্ত্র নয়, এবং এই সৃষ্টিও আপনা থেকে হয় না।

শ্লোক ৫

আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্।
আত্মশক্তিমবষ্টভ্য উর্ণনাভিরিবাক্লমঃ ॥ ৫ ॥

আত্মন্ (আত্মনি)—নিজের দ্বারা; **ভাবয়সে**—প্রকাশ করে; **তানি**—সেই সব; **ন**—না; **পরাভাবয়ন্**—পরাভূত হয়ে; **স্বয়ম্**—আপনি; **আত্মশক্তিম্**—স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি; **অবষ্টভ্য**—নিযুক্ত হয়ে; **উর্ণনাভিঃ**—মাকড়সা; **ইব**—সদৃশ; **অক্লমঃ**—সহায়তা বিনা।

অনুবাদ

মাকড়সা যেমন অনায়াসে কারো দ্বারা পরাভূত না হয়ে জাল সৃষ্টি করে, আপনিও তেমন অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত, আপনার স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

স্বয়ংসম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে সূর্য। সূর্যকে আলোক প্রদান করার জন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, সূর্য অন্য সমস্ত আলোক প্রদানকারী বস্তুদের সাহায্য করে, এবং সূর্যের উপস্থিতিতে অন্য সমস্ত জ্যোতির্ময় বস্তু প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। সৃষ্টির ব্যাপারে ব্রহ্মার স্বয়ংসম্পূর্ণতা নারদমুনি মাকড়সার স্বয়ংসম্পূর্ণতার সঙ্গে তুলনা করেন, যে অন্য কারো সহায়তা ব্যতীত তার লালা দিয়ে তার কার্যক্ষেত্র তৈরি করে।

শ্লোক ৬

নাহং বেদ পরং হ্যস্মিন্নাপরং ন সমং বিভো।
নামরূপগুণৈর্ভাব্যং সদসৎ কিঞ্চিদন্যতঃ ॥ ৬ ॥

ন—না ; **অহম্**—আমি ; **বেদ**—জানি ; **পরম**—উৎকৃষ্ট ; **হি**—কেননা ; **অস্মিন্**—এই জগতে ; **ন**—না ; **অপরম্**—নিকৃষ্ট ; **ন**—না ; **সমম্**—সমান ; **বিভো**—হে মহান্ ; **নাম**—নাম ; **রূপ**—লক্ষণ ; **গুণৈঃ**—যোগ্যতার দ্বারা ; **ভাব্যম্**—যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে ; **সৎ**—নিত্য ; **অসৎ**—অনিত্য ; **কিঞ্চিৎ**—অথবা এই প্রকার কোন বস্তু ; **অন্যতঃ**—অন্য কোন সূত্র থেকে।

অনুবাদ

নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারি, তা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা সমান হোক অথবা নিত্য বা অনিত্য হোক, তা সবই আপনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, আপনি এতই মহান্।

তাৎপর্য

এই ব্যক্ত জগত ৮৪,০০,০০০ যোনি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার জীবে পরিপূর্ণ। তাদের মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট আবার কেউ অন্যদের থেকে নিকৃষ্ট। মানুষদের উৎকৃষ্ট জীব বলে বিবেচনা করা হয়, আবার মানুষদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ রয়েছে—ভাল, মন্দ, সম ইত্যাদি। কিন্তু নারদ মুনির বদ্ধমূল ধারণা যে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা ব্যতীত তাদের অন্য কারোর সৃষ্টি করার শক্তি নেই। তাই তিনি তাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন।

শ্লোক ৭

স ভবানচরদ্ ঘোরং যত্তপঃ সুসমাহিতঃ।
তেন খেদয়সে নস্ত্বং পরাশঙ্কাঞ্চ যচ্ছসি ॥ ৭ ॥

সঃ—তিনি ; **ভবান্**—আপনি ; **অচরৎ**—করেছেন ; **ঘোরম্**—কঠোর ; **যৎ-তপঃ**—ধ্যান ; **সুসমাহিতঃ**—পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতায় ; **তেন**—সেই কারণে ; **খেদয়সে**—কষ্ট দেয় ; **নঃ**—আমাদের ; **ত্বম্**—আপনি ; **পরা**—পরম সত্য ; **শঙ্কাম্**—সন্দেহ ; **চ**—এবং ; **যচ্ছসি**—আমাদের সুযোগ দেয়।

অনুবাদ

আপনি যদিও সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী, তথাপি আপনি যে পূর্ণরূপে অনুশাসন অনুসরণ করে কঠোর তপস্যা করেছেন সে কথা ভেবে আমরা আশ্চর্যান্বিত

চিত্তে অনুমান করি যে, আপনার থেকেও অধিক শক্তিশালী আর কেউ একজন রয়েছেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষের কর্তব্য অন্ধের মতো তার গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে না করা। গুরুদেবকে ভগবানের মতো সম্মান করা হয়, কিন্তু গুরু যদি দাবী করে যে, সে ভগবান তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত। ব্রহ্মার সৃষ্টি বিষয়ক অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শন করে নারদ মুনি ব্রহ্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, ব্রহ্মাও তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কারো উপাসনা করছেন, তখন তাঁর মনে সন্দেহের উদয় হয়েছিল। পরমেশ্বর হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম, এবং তাঁর আরাধ্য কেউ নেই। *অহংগ্রহ* উপাসনা বা ভগবান হবার উদ্দেশ্যে নিজের পূজা করা একটি মস্ত বড় ভ্রষ্টাচার। বুদ্ধিমান শিষ্য বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানকে ভগবান হওয়ার জন্য কারো উপাসনা করতে হয় না, এমনকি তাঁর নিজের উপাসনাও করতে হয় না। দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য *অহংগ্রহ* উপাসনা একটি পদ্ধতি হতে পারে, কিন্তু *অহংগ্রহ* উপাসনার মাধ্যমে কেউ ভগবান হতে পারে না। কোন পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে কেউ কখনো ভগবান হতে পারে না। নারদ মুনি ব্রহ্মাজীকে পরম পুরুষ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, ব্রহ্মাজীও পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির অনুশীলনে যুক্ত, তখন তাঁর হৃদয়ে সন্দেহের উদয় হয়েছিল, তাই তিনি যথাযথভাবে সে সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্বং সর্বজ্ঞ সকলেশ্বর।
বিজানীহি যথৈবেদমহং বুধ্যেহনুশাসিত ঃ ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **মে**—আমাকে; **পৃচ্ছতঃ**—জিজ্ঞাসু; **সর্বম্**—সমস্ত জিজ্ঞাস্য বিষয়; **সর্বজ্ঞ**—যিনি সবকিছু জানেন; **সকল**—সকলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তা; **বিজানীহি**—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন; **যথা**—যেমন; **এব**—তারা হয়; **ইদম্**—এই; **অহম্**—আমি; **বুধ্যে**—বুঝতে পারি; **অনুশাসিতঃ**—আপনার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে।

অনুবাদ

হে পিতা! আপনি সবকিছু জানেন, এবং আপনি সকলের নিয়ন্তা। তাই আমি যে সমস্ত প্রশ্ন আপনার কাছে করেছি, আপনি কৃপা করে আমাকে তার উত্তর দিন যাতে আমি আপনার শিষ্যরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

তাৎপর্য

নারদমুনি যে প্রশ্নগুলি করেছেন তা সকলেরই জন্য অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, তাই নারদমুনি ব্রহ্মাজীর কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন সেগুলি উপযুক্ত বলে মনে করেন যাতে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের পরম্পরায় যাঁরা আসবেন তাঁরা সকলেই যেন অনায়াসে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৯

ব্রহ্মোবাচ

সম্যক্ কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্যদর্শনে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মাজী বললেন; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **কারুণিকস্য**—অত্যন্ত দয়ালু তোমার; **ইদম্**—এই; **বৎস**—হে পুত্র; **তে**—তোমার; **বিচিকিৎসিতম্**— জানবার স্পৃহা; **যৎ**—যার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত; **সৌম্য**— যে শান্ত স্বভাব; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বীর্য**—পরাক্রম; **দর্শনে**—বিষয়ে।

অনুবাদ

ঋষি ব্রহ্মা বললেনঃ হে বৎস নারদ, সকলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে (এমনকি আমার প্রতিও) তুমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলি করেছ, কেননা তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের পরাক্রম দর্শন করে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

তাৎপর্য

নারদমুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ব্রহ্মাজী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কেননা কেউ যখন ভক্তদের সর্বশক্তিমান ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন তখন তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহিত হন। সেইটি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ। ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় এই প্রকার আলোচনা, যেখানে হয় সেখানে পরিবেশকে পবিত্র করে, এবং সেই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় ভক্তরা অনুপ্রাণিত হন। এই প্রকার আলোচনায় প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা উভয়েরই হৃদয় নির্মল হয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল ভগবান সম্বন্ধে সবকিছু জেনেই তৃপ্ত হন তাই নয়, তাঁরা সেই বার্তা অন্যদের কাছেও প্রচার করতে উৎসুক হন, কেননা তাঁরা চান যে, ভগবানের মহিমা যেন সকলেই অবগত হতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তকে যখন এই সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। প্রচার কার্যের এইটিই মূল ভিত্তি।

শ্লোক ১০

নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
অবিজ্ঞায় পুরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতোহি মে ॥ ১০ ॥

ন—না ; **অনৃতম্**—মিথ্যা ; **তব**—তোমার ; **তৎ**—তা ; **চ**—ও ; **অপি**—তুমি যেভাবে উল্লেখ করেছ ; **যথা**—এই বিষয়ে ; **মাম্**—আমার ; **প্রব্রবীষি**—যেভাবে তুমি বর্ণনা করেছ ; **ভোঃ**—হে পুত্র ; **অবিজ্ঞায়**—না জেনে ; **পরম্**—পরম ; **মত্ত**—আমার উর্ধ্বে ; **এতাবৎ**—তুমি যা কিছু বলেছ ; **ত্বম্**—তুমি ; **যতঃ**—সেই কারণে ; **হি**—নিশ্চিতভাবে ; **মে**—আমার বিষয়ে।

অনুবাদ

তুমি আমার সম্বন্ধে যা বলেছ তা মিথ্যা নয়, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমার থেকে পরতর পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অবশ্যই আমার বীর্যবতী কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হয়।

তাৎপর্য

'কূপমণ্ডুক-ন্যায়' অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে কূপের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে বাস করে যে ব্যাঙ তার পক্ষে বিশাল সমুদ্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুমান করা অসম্ভব। সেই ব্যাঙ যখন বিশাল সমুদ্র সম্বন্ধে শোনে, তখন প্রথমে সে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, সেরকম কোন সমুদ্র রয়েছে, এবং তারপর যদি কেউ তাকে বোঝায় যে, বাস্তবিকপক্ষে সেরকম কোন সমুদ্র আছে, তখন সেই ব্যাঙ তার নিজের পেট যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে সমুদ্রের আয়তন সম্বন্ধে অনুমান করার চেষ্টা করে, এবং অবশেষে তার ক্ষুদ্র পেটটি ফেটে যায় এবং প্রকৃত সমুদ্রের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ না করেই হতভাগা ব্যাঙের মৃত্যু হয়। তেমনই, জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের ব্যাঙের মতো মস্তিষ্ক এবং বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দ্বারা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, কিন্তু অবশেষে ঠিক সেই ব্যাঙটির মতো ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

কখনো কখনো ভৌতিক দৃষ্টিতে শক্তিশালী কোন মানুষকে, ভগবান সম্বন্ধে কিছু না জেনেই, ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা হয়। এই প্রকার ভৌতিক মূল্যায়ন ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ব্রহ্মা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়, তিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেদের মধ্যে সর্বোত্তম, এবং তাঁর আয়ু জড় বৈজ্ঞানিকদের কল্পনারও অতীত। সবচাইতে প্রামাণিক ভগবদ্গীতা (৮/১৭) থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মার একদিন এবং একরাত্রি আমাদের এই গ্রহের লক্ষ লক্ষ বৎসরের তুল্য। কূপমণ্ডুক এত দীর্ঘ-আয়ুর কথা অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু যে-ব্যক্তি গীতায় বর্ণিত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্রতা সৃজনকারী এক মহান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত আরও বহু ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং তাদের অধ্যক্ষ ব্রহ্মার তুলনায় এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা অনেক ছোট, কিন্তু তাঁরা কেউই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নন।

নারদজী হচ্ছেন একজন মুক্ত আত্মা। মুক্তির পর তিনি নারদ নামে পরিচিত হন ; কিন্তু মুক্তির পূর্বে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ দাসীর পুত্র। এখন প্রশ্ন হতে পারে

নারদজী কেন পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, এবং কেন তিনি ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর বলে মনে করেছিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা নন। মুক্ত পুরুষেরা কখনো এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা মোহিত হন না, তা হলে নারদজী কেন একজন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মতো এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন ?

এই প্রকার মোহ অর্জুনেরও হয়েছিল, যদিও তিনি ছিলেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ। অর্জুন অথবা নারদের এই প্রকার মোহ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে উৎপন্ন হয় যাতে অন্যান্য বদ্ধ জীবেরা প্রকৃত সত্য এবং ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

নারদের মনে ব্রহ্মাজীর সর্বশক্তিমান হওয়ার যে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়েছিল তা কূপমণ্ডুকদের পক্ষে একটি সুন্দর শিক্ষা, যাতে তারা ভগবান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন না হয় (ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তিরও তুলনা করা যায় না, অতএব যে ক্ষুদ্র মানব নিজেকে ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে জাহির করতে চায় তাদের কি কথা) !

পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই পরম ঈশ্বর, এবং এই গ্রন্থের তাৎপর্যে বহুবার আমরা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছি যে, কোন জীব, এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত, ভগবানের সমকক্ষ হওয়ার দাবী করতে পারে না। মানুষেরা যখন কোন মহান ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পরে বীরপূজা রূপে তাকে ভগবান বলে পূজা করে, তখন তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের মতো বহু রাজা ছিলেন কিন্তু তাদের কাউকেই শাস্ত্রে ভগবান বলে উল্লেখ করা হয়নি।

সৎ রাজা হলেই ভগবান রামচন্দ্র হওয়া যায় না, পক্ষান্তরে ভগবান হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের মতো মহান পুরুষ হওয়া আবশ্যক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান রামচন্দ্র থেকে কম পুণ্যবান ছিলেন না, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বড় নৈতিকতাবাদী। শ্রীকৃষ্ণ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলতে বলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির তার প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন। মহাজনেরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুণ্যাত্মা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। অতএব সমস্ত পরিস্থিতিতেই ভগবানের সত্তা স্বতন্ত্র এবং তাঁর বেলায় অ্যানথ্রোপোমরফিজম্ বা তাঁর ঈশ্বরত্বে নরসুলভ গুণাবলীর ধারণা প্রয়োগ করা যায় না। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান, এবং কোন সাধারণ জীব কখনোই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।

শ্লোক ১১

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্ ।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥ ১১ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা; **স্ব-রোচিষা**—তাঁর জ্যোতির দ্বারা; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **রোচিতম্**—ইতিপূর্বেই রচনা করেছেন; **রোচয়ামি**—প্রকট করি; **অহম্**—আমি; **যথা**—যেমন; **অর্কঃ**—সূর্য; **অগ্নিঃ**—আগুন; **যথা**—যেমন; **সোমঃ**—চন্দ্র; **যথা**—যেমন; **ঋক্ষ**—আকাশ; **গ্রহ**—প্রভাবশালী গ্রহসমূহ; **তারকাঃ**—তারকা।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর স্বীয় জ্যোতি (ব্রহ্মজ্যোতি) দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করার পর তাঁরই শক্তিতে সেই ভগবৎ প্রকাশিত বস্তুকে আমি পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করি, ঠিক যেমন সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, আকাশ, প্রভাবশালী গ্রহসমূহ, নক্ষত্র আদি প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা নারদকে বললেন যে, সৃষ্টির বিষয়ে তিনি যে পরম সৃষ্টিকর্তা নন সে সম্বন্ধে নারদের ধারণা ঠিক। কখনো কখনো অল্পবুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, ব্রহ্মা হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ অধিকর্তা ব্রহ্মার মাধ্যমে নারদমুনি সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছেন। আইনের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের রায় যেমন সর্বোচ্চ, তেমনই বৈদিক জ্ঞানের ব্যাপারে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ অধিকর্তা ব্রহ্মাজীর সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা প্রতিপন্ন করেছি যে, নারদমুনি ছিলেন একজন মুক্ত আত্মা; তাই যে সমস্ত মূর্খ মানুষ তাদের মনগড়া ভগবান সৃষ্টি করে অথবা কোন প্রতারককে ভগবান বলে মনে করে, তিনি তাদের একজন ছিলেন না। তিনি নিজেকে একজন অল্পজ্ঞ বলে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তিনি এমনভাবে সর্বোত্তম মহাজনের কাছে তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন যাতে তাঁর দ্বারা তা নিরসন হওয়ার মাধ্যমে অজ্ঞ ব্যক্তিরা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার জটিল তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হতে পারে।

এই শ্লোকে ব্রহ্মাজী অল্প বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছেন এবং প্রতিপন্ন করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটা কর্তৃক এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জড় জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর তিনি তা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মাজী তাঁর ব্রহ্ম-সংহিতাতেও (৫/৪০) সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলম্ অনন্তম্ অশেষভূতম্
গোবিন্দম্ আদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

'আমি পরমেশ্বর ভগবান, আদি পুরুষ, গোবিন্দের ভজনা করি, ব্রহ্মজ্যোতি নামক যাঁর অনন্ত অসীম এবং সর্বব্যাপ্ত দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা হচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ এবং অবস্থা সমন্বিত অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র আদি সৃষ্টির কারণ।'

সেই বর্ণনা ভগবদ্গীতাতেও (১৪/২৭) করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির উৎস *(ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্)*। বৈদিক অভিধান নিরুক্তিতে *প্রতিষ্ঠা* শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে 'যা স্থাপন করে'। অতএব ব্রহ্মজ্যোতি স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির স্রষ্টা, যে সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছে *স্ব-রোচিষা* বা ভগবানের অপ্রাকৃত দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা। এই ব্রহ্মজ্যোতি সর্বব্যাপ্ত, এবং তারই প্রভাবে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়েছে; তাই বৈদিক শ্লোকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টি ব্রহ্মজ্যোতি কর্তৃক প্রকাশিত *(সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)*। তাই সমগ্র সৃষ্টির বীজ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, এবং সেই অন্তহীন এবং অগাধ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছেন ভগবান। তাই ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির পরম কারণ *(অহং সর্বস্য প্রভবঃ)*।

আমাদের কখনো মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান একজন কামারের মতো হাতুড়ি অথবা অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করেন। ভগবান তাঁর শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাঁর বহু প্রকার শক্তি রয়েছে *(পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে)*। ঠিক যেমন একটি ক্ষুদ্র বটগাছের বীজে বিশাল বটবৃক্ষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে, তেমনই ভগবান তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি *(স্ব-রোচিষা)* দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বীজ উৎপন্ন করেন যা ব্রহ্মার মতো ব্যক্তি কর্তৃক জল সিঞ্চনের ফলে বিকশিত হয়। ব্রহ্মা বীজ সৃষ্টি করতে পারেন না, কিন্তু তিনি বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে পারেন, ঠিক যেমন একজন মালী জল সিঞ্চনের দ্বারা বাগানে তরু-লতাদের বর্ধিত করে। এখানে সূর্যের যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। জড় জগতে সূর্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ, চন্দ্রের কিরণ ইত্যাদি প্রকাশের কারণ, আকাশে সমস্ত জ্যোতিষ্ক সূর্যের সৃষ্টি। সেই সূর্য ব্রহ্মজ্যোতির সৃষ্টি, এবং ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা। তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির পরম কারণ।

শ্লোক ১২

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্গুরুম্ ॥ ১২ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ধীমহি**—আমি তাঁর ধ্যান করি; **যৎ**—যাঁর; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা; **দুর্জয়য়া**—দুর্জয়; **মাম্**—আমাকে; **বদন্তি**—তারা বলে; **জগৎ**—জগৎ; **গুরুম্**—প্রভু।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁর ধ্যান করি, যাঁর দুর্জয় মায়া অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যে,তারা আমাকে পরম নিয়ন্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হবে যে, ভগবানের মায়াশক্তি অল্পবুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষদের এমনভাবে মোহিত করে যে,তারা ব্রহ্মাজী অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে। ব্রহ্মাজী কিন্তু এইভাবে সম্বোধিত হতে অস্বীকার করেছেন, এবং তিনি সরাসরিভাবে ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে ব্রহ্ম-সংহিতাতেও (৫/১) তাঁকে সেইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ সচ্চিদানন্দময় তিনি অনাদির আদি, এবং সর্ব কারণের পরম কারণ। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

ব্রহ্মাজী তাঁর প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি জানেন অল্প বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা কিভাবে ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে তাদের খেয়াল খুশিমতো যাকে তাকে ভগবান বলে স্বীকার করে। ব্রহ্মাজীর মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাঁর শিষ্য অথবা অধস্তন ব্যক্তিদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধিত হতে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু মূর্খ মানুষেরা কুকুর, শূকর, উট এবং গদর্ভের মতো প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে খুশি হয়। এই ধরনের মানুষেরা ভগবদ্ বলে সম্বোধিত হবার ফলে আনন্দিত হয় কেন, অথবা এই ধরনের মানুষদের মূর্খ তোষামোদকারীরা ভগবান বলে সম্বোধন করে কেন, তা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

বিলজ্জমানয়া—লজ্জিত ব্যক্তির দ্বারা ; **যস্য**—যাঁর ; **স্থাতুম্**—অবস্থান করার জন্য ; **ঈক্ষা-পথে**—সম্মুখে ; **অমুয়া**—মোহিনী শক্তির দ্বারা ; **বিমোহিতাঃ**—যারা বিমোহিত ; **বিকত্থন্তে**—অর্থহীন প্রজল্প করে ; **মম**—এটি আমার ; **অহম্**—আমি সবকিছু ; **ইতি**—এইভাবে অসৎ বিষয়ে আলোচনা করে ; **দুর্ধিয়**—এইভাবে মন্দ বলে বিচার করা হয়েছে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া শক্তি তাঁর কার্যকলাপের জন্য লজ্জাবোধ করার ফলে ভগবানের সম্মুখে আসতে পারেন না। কিন্তু যে সমস্ত জীব মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছে, তারা সর্বদাই 'আমি' এবং 'আমার' এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বক্ষণ প্রলাপ করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের দুর্জয় মোহিনী শক্তি বা তৃতীয়া শক্তি যা অজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে, তা সমগ্র চেতন জগতকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু তবুও তার ভগবানের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা নেই। অজ্ঞান, পরমেশ্বর ভগবানের পিছনে থেকে জীবদের মোহিত করে, এবং মোহাচ্ছন্ন হওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে তারা অর্থহীন প্রজল্প করে। বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে অর্থহীন প্রজল্পের সমর্থন করা হয়নি, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজল্প হচ্ছে—'আমি এই, এবং এটি আমার'। ভগবদ্ বিহীন সভ্যতা এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, এবং সেই সমস্ত মানুষেরা যথাযথ ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান না থাকার ফলে কতকগুলি প্রতারককে ভগবান বলে মনে করে বা নিজেদের ভগবান বলে ঘোষণা করে মায়ামুগ্ধ জীবদের বিপথগামী করে। কিন্তু ভগবানের সম্মুখে রয়েছেন যে সমস্ত শরণাগত জীব, তাঁরা কখনোই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না ; তাই তাঁরা 'আমি এই, এবং এটি আমার,' এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত। তাই তাঁরা কখনো কোন প্রতারককে ভগবান বলে স্বীকার করেন না অথবা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করেন না। এই শ্লোকে মোহাচ্ছন্ন মানুষের পরিচয় স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৪ ॥

দ্রব্যম্—উপাদান (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) ; **কর্ম**— ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ; **চ**—এবং ; **কালঃ**—শাশ্বত কাল ; **চ**—ও ; **স্বভাবঃ**—প্রবৃত্তি ; **জীবঃ**— জীব ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **চ**—এবং ; **বাসুদেবাৎ**—বাসুদেব থেকে ; **পরঃ**—ভিন্ন অংশ ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ ; **ন**—কখনোই না ; **চ**—ও ; **অন্যঃ**—পৃথক ; **অর্থঃ**— মূল্যবোধ ; **অস্তি**—হয় ; **তত্ত্বতঃ**—বাস্তবে।

অনুবাদ

সৃষ্টির পাঁচটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চ মহাভূত, কর্ম, শাশ্বত কাল, জীবের স্বভাব এবং জীব, এই সমস্তই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অংশ, এবং বাসুদেব থেকে এদের কোন ভিন্ন সত্তা নেই।

তাৎপর্য

এই বিস্ময়কর জগতের নির্বিশেষ অভিব্যক্তি বাসুদেবের প্রকাশ কেননা সৃষ্টির উপাদান, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া এবং সেই কর্মের ভোক্তা, এরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে উদ্ভূত। তা ভগবদ্গীতায় (৭/৪-৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ, এবং জড় পরিচিতির ধারণা, বুদ্ধি এবং মন, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি সম্ভূত। শাশ্বতকাল কর্তৃক নির্ধারিত উপরোক্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদানগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভোক্তা জীব ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির উপাঙ্গ স্বরূপ। তাদের জড় জগতে অথবা চিৎ জগতে থাকবার স্বাধীনতা রয়েছে। জড় জগতে জীব অবিদ্যার দ্বারা মোহিত থাকে, কিন্তু চিৎ জগতে মোহমুক্ত জীব তার চিন্ময় স্বরূপে অবস্থান করে। জীবকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হয়। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই জড় উপাদান অথবা চিন্ময় বিভিন্ন অংশ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব থেকে স্বতন্ত্র নয়। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি সম্ভূত সবকিছুই ভগবানের জ্যোতিরই বিভিন্ন প্রকাশ, ঠিক যেমন আলোক, তাপ এবং ধূম্র অগ্নির বিভিন্ন প্রকাশ। তাদের কোনটি আগুন থেকে ভিন্ন নয়—সম্মিলিতভাবে তাদের বলা হয় আগুন ; তেমনই সমগ্র বিস্ময়কর প্রকাশ এবং বাসুদেবের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা তাঁর নির্বিশেষ অভিব্যক্তি, কিন্তু তিনি, উপরোক্ত সমস্ত জড় উপাদানগুলির ধারণার অতীত, তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নামক চিন্ময় স্বরূপে তিনি নিত্য বিরাজমান।

শ্লোক ১৫

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণ পরা মখাঃ ॥ ১৫ ॥

নারায়ণ—পরমেশ্বর ভগবান ; **পরাঃ**—কারণস্বরূপ এবং তার নিমিত্ত ; **বেদা**— জ্ঞান ; **দেবা**—দেবতা ; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **অঙ্গজাঃ**—অঙ্গ থেকে উদ্ভূত ; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **পরাঃ**—নিমিত্ত ; **লোকাঃ**—গ্রহসমূহ ; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **পরাঃ**—কেবল তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ; **মখাঃ**—সমস্ত যজ্ঞ।

অনুবাদ

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং সেগুলি তাঁরই নিমিত্ত ; সমস্ত দেবতারা তাঁরই অঙ্গ থেকে উদ্ভূত এবং তাঁরা সকলেই তাঁর সেবক ; স্বর্গ আদি বিভিন্ন লোকসমূহ তাঁরই জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা।

তাৎপর্য

বেদান্ত সূত্র *(শাস্ত্র যোনিত্বাৎ)* অনুসারে সমস্ত শাস্ত্রের প্রণেতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার জন্যই সমস্ত শাস্ত্র। বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবদ্

বিষয়ক জ্ঞান। বেদ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ভগবৎ বিস্মৃত বদ্ধ জীবদের পুনরায় ভগবৎ চেতনা জাগরিত করা, এবং যে সমস্ত সাহিত্য ভগবৎ চেতনা জাগরিত করে না, নারায়ণপর ভক্তরা তা ত্যাগ করেন। যে সমস্ত গ্রন্থের লক্ষ্য নারায়ণ নন, সেই সমস্ত গ্রন্থ জ্ঞান প্রদান করে না, পক্ষান্তরে সেগুলি হচ্ছে বায়স তীর্থ বা কাকেদের বিচরণ ভূমি, যারা কেবল পৃথিবীর আবর্জনা সংগ্রহে আগ্রহী। সমস্ত গ্রন্থ (বিজ্ঞান অথবা কলা) যেন অবশ্যই নারায়ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করে ; তা না হলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। জ্ঞানের উন্নতি সাধনের এইটিই হচ্ছে পন্থা। পরম আরাধ্য বিগ্রহ হচ্ছেন নারায়ণ। পূজা করার ব্যাপারে দেবতাদের গৌণ স্থান প্রদান করা হয়েছে কেননা দেবতারা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার ব্যাপারে নারায়ণের সহকারী। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যেমন রাজার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, দেবতারাও তেমন ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে পূজিত হন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে দেবতাদের পূজা অবৈধ *(অবিধিপূর্বকম্)*, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে পাতায় এবং ডালে জল ঢালা অনুচিত। সমস্ত দেবতারা ভগবানের উপর নির্ভরশীল। স্বর্গ আদি বিভিন্ন লোক আকর্ষণীয় বলে মনে হয় কেননা তাতে বিভিন্ন রকম জীবন এবং আনন্দ রয়েছে, যা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের আংশিক অভিব্যক্তি। সকলেই চায় আনন্দ এবং জ্ঞানময় শাশ্বত জীবন। জড় জগতে এই প্রকার আনন্দ এবং জ্ঞানময় শাশ্বত জীবন ক্রমান্বয়ে উচ্চতর লোকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে ভগবদ্ধামে যাওয়ার বাসনা উদিত হয়। উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে জ্ঞান এবং আনন্দ সমন্বিত জীবনের দৈর্ঘ্য অধিক থেকে অধিকতর বর্ধিত হতে পারে। বিভিন্ন গ্রহলোকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত আয়ু লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু কোথাও নিত্য জীবন লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বোচ্চ লোক, ব্রহ্মলোকে পৌঁছনোর পর চিৎ জগতে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা হতে পারে, যেখানে জীবন নিত্য। তাই এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে উন্নীত হওয়ার যাত্রার সমাপ্তি হয় ভগবদ্ধামে *(মদ্ধাম)* পৌঁছানোর পর, যেখানে জীবন নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা, এবং এই কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ যা নারায়ণপর ভক্তদের ভক্তির মূল আধার।

শ্লোক ১৬

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ১৬ ॥

নারায়ণ পরঃ—কেবল নারায়ণকে জানবার জন্য ; **যোগঃ**—মনের একাগ্রতা ; **নারায়ণ-পরম্**—নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া উদ্দেশ্যে ; **তপঃ**—তপস্যা ; **নারায়ণ-পরম্**—পলকের জন্য নারায়ণের দর্শন পাওয়ার জন্য ; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতি ;

নারায়ণ-পরা—নারায়ণের ধামে প্রবেশ করার ফলে মোক্ষের পথ সমাপ্ত হয় ; **গতিঃ**—প্রগতির পন্থা।

অনুবাদ

সর্বপ্রকার ধ্যান এবং যোগ হচ্ছে নারায়ণকে জানবার বিভিন্ন উপায়, সর্বপ্রকার তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের দর্শন লাভ করা এবং মুক্তির চরম অবস্থা হচ্ছে নারায়ণের ধামে প্রবেশ করা।

তাৎপর্য

ধ্যানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে, যথা অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সাংখ্যযোগ। অষ্টাঙ্গযোগ ধ্যান, ধারণ, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার অভ্যাস। আর সাংখ্য যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ এবং অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। কিন্তু চরমে উভয় পদ্ধতিরই লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি, যা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের আংশিক অভিব্যক্তি। পূর্বেই আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের অংশমাত্র। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন। সেকথা ভগবদ্গীতা এবং মৎস্য পুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে। *গতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে চরম লক্ষ্য বা মুক্তির চরম অবস্থা। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া চরম মুক্তি নয় ; তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোকের কোন একটি লোকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম আনন্দময় সঙ্গ লাভ করা। অতএব পারমার্থিক দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে, নারায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবান সর্বপ্রকার যোগ পদ্ধতি এবং সর্বপ্রকার মুক্তির চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৭

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥ ১৭ ॥

তস্য—তার ; **অপি**—নিশ্চিতভাবে ; **দ্রষ্টুঃ**—দ্রষ্টার ; **ঈশস্য**—নিয়ন্তার ; **কূটস্থস্য**—যিনি সকলের বুদ্ধিমত্তার অতীত ; **অখিল-আত্মনঃ**—পরমাত্মার ; **সৃজ্যম্**—পূর্বেই যার সৃষ্টি হয়েছে ; **সৃজামি**—আমি আবিষ্কার করি ; **সৃষ্টঃ**—সৃষ্ট ; **অহম্**—আমি ; **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা ; **এব**—সঠিক ; **অভিচোদিতঃ**—তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

অনুবাদ

তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মারূপ তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তিনি পূর্বেই যা সৃষ্টি করেছেন আমি কেবল তা পুনঃপ্রকাশ করি। এমনকি আমিও তাঁরই সৃষ্টি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও স্বীকার করেন যে, তিনি প্রকৃত স্রষ্টা নন, পক্ষান্তরে নারায়ণ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে পূর্বেই তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা সৃজন করেন। আত্মার দুই স্বরূপ, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন স্বীকার করেছেন। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর জীবাত্মা ভগবানের নিত্য সেবক। ভগবান জীবাত্মাকে পূর্বেই তিনি যা নির্মাণ করেছেন তা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করেন, এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এই জগতে কেউ যখন কোন কিছু আবিষ্কার করে, তখন তাকে আবিষ্কর্তা রূপে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। কলোম্বাসকে পশ্চিম গোলার্ধ সৃষ্টি করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলোম্বাস তা সৃষ্টি করেনি। পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সেই বিশাল ভূখণ্ড পূর্বেই সেখানে ছিল, আর কলোম্বাস তা পূর্বকৃত সুকৃতির প্রভাবে ভগবান কর্তৃক আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করার কৃতিত্ব অর্জন করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউই কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, যেহেতু সকলেই তার ক্ষমতা অনুসারে দর্শন করে। সেই ক্ষমতাও জীবের ভগবানকে সেবা করার বাসনা অনুসারে ভগবান দান করে থাকেন। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করা এবং তার ফলে ভগবান তার চরণে সেই সেবকের শরণাগতি অনুসারে শক্তি প্রদান করবেন। ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের মহান্ ভক্ত ; তাই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে ভগবান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন বা শক্তি প্রদান করেছেন। ভগবান অর্জুনকেও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন—

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব
নিমিত্ত-মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ।। (গীঃ ১১/৩৩)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হোক, কিংবা যে কোন স্থানে, বা যে কোন সময়ে অন্য যে কোন যুদ্ধই হোক, তা ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সংঘটিত হয়, কেননা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কখনো এত বড় জনসংহার কেউই আয়োজন করতে পারে না। দুর্যোধনের গোষ্ঠী শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, এবং দ্রৌপদী তখন ভগবান তথা সেখানে উপস্থিত সমস্ত নীরব দর্শকদের এই অযাচিত অপমানের প্রতিবাদ করার জন্য আবেদন করেছিলেন, সেই জন্যই ভগবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, এবং অর্জুনকে যুদ্ধ করে যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে দুর্যোধন এবং তার অনুগামীরা এমনিতেই নিহত হত। তাই তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ রূপে ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখ মহান্ সেনানায়কদের সংহার করার কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

কঠ উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানকে সর্বভূত অন্তরাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি সকলের শরীরে বিরাজ করেন এবং যারা তাঁর শরণাগত, তাদের তিনি পরিচালনা করেন। যারা ভগবানের শরণাগত নয়, তাদের জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে রাখা হয় *(ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া)*; তাই, তাদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করতে দেওয়া হয় এবং তার ফলে তারা তার ফল ভোগ করে। ব্রহ্মা, অর্জুন প্রমুখ ভক্তরা কখনো তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে কোন কিছু করেন না। তাঁরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত আত্মা, এবং সর্বদাই তাঁরা ভগবানের নির্দেশের অপেক্ষা করেন; তাই তাঁরা এমন কিছু করার প্রয়াস করেন যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে প্রতীত হয়।

ভগবানের একটি নাম হচ্ছে উরুক্রম, যার অর্থ হচ্ছে যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত এবং জীবের কল্পনার অতীত। তাই ভগবানের ভক্তের কার্যকলাপও কখনো কখনো অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হয়, কেননা তার পিছনে ভগবানের নির্দেশনা থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত প্রতিটি জীবের বুদ্ধিমত্তার তত্ত্বাবধান ভগবান করেন, এবং অপ্রাকৃত স্তর থেকে তিনি তাদের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষেরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রভাবে চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছার প্রভাব অধ্যয়ন করতে পারেন, তাঁরা ভগবানের সূক্ষ্ম উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন।

শ্লোক ১৮

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এই সমস্ত; **নির্গুণস্য**—গুণাতীত চিন্ময় বস্তুর; **গুণাঃ-ত্রয়ঃ**—তিনটি গুণ; **স্থিতি**—পালন; **সর্গ**—সৃষ্টি; **নিরোধেষু**—ধ্বংস; **গৃহীতাঃ**—স্বীকৃত; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **বিভোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় এবং তা সমস্ত জড় গুণের অতীত, তথাপি জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের জন্য তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে সত্ত্ব, রজো এবং তমো নামক প্রকৃতির তিনটি গুণ স্বীকার করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজো এবং তমো, এই ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তির প্রভু, এবং এই শক্তির প্রভু রূপে তিনি কখনো এই মোহিনী শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হন না। জীবেরা কিন্তু জড়া প্রকৃতির এই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় অথবা প্রভাবিত হওয়ার

প্রবণতা থাকে—এইটি হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের পার্থক্য, জীব যদিও গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তথাপি জীব প্রকৃতির এই গুণগুলির অধীন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ভগবানের শক্তিসম্ভূত হওয়ার ফলে অবশ্যই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তবে সেই সম্পর্কটি ঠিক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা, কিন্তু জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব প্রভু নয় অথবা নিয়ন্তাও নয়। পক্ষান্তরে তারা প্রকৃতির অধীন অথবা প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিৎশক্তির প্রভাবে নিত্য প্রকাশিত, ঠিক মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য বা সূর্য কিরণের মতো, কিন্তু সূর্য যেমন আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনই ভগবান জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন। সূর্য যেমন কখনোই মেঘের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই অনন্ত ভগবানও তাঁর অসীম ব্রহ্মজ্যোতিতে সাময়িকভাবে প্রকাশিত নগণ্য জড়া শক্তির দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ১৯

কার্যকারণকর্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥ ১৯ ॥

কার্য—কার্য ; **কারণ**—কারণ ; **কর্তৃত্বে**—কর্তৃত্বে ; **দ্রব্য**—জড় পদার্থ ; **জ্ঞান**— জ্ঞান ; **ক্রিয়াশ্রয়াঃ**—এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত ; **বধ্নন্তি**—আবদ্ধ করে ; **নিত্যদা**—নিত্য ; **মুক্তম্**—চিন্ময় ; **মায়িনম্**—জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা ; **পুরুষম্**—জীব ; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ।

অনুবাদ

প্রকৃতির এই তিনটি গুণ দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়ে নিত্য শাশ্বত জীবকে তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দায়ী করে তাকে কার্য এবং কারণের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্তী হওয়ার ফলে নিত্য শাশ্বত জীবকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, জীবের জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত অভিমানের ফলে সে এই শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের বিশুদ্ধ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে, এবং এই আবরণ এতই গভীর যে, মনে হয় যেন বদ্ধ জীব চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাব এমনই অদ্ভুত যে, মনে হয় যেন জড় জগৎ থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে। জড়া প্রকৃতির আবরণাত্মিকা

শক্তির প্রভাবে জড় বৈজ্ঞানিকেরা জড়জাগতিক কারণের ঊর্ধ্বে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের প্রকাশের পিছনে রয়েছে অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব ক্রিয়া যা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবেরা দর্শন করতে পারে না। অধিভূত প্রকাশের ফলে জরা এবং ব্যাধি সমন্বিত জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে জীব আবর্তিত হয়, অধ্যাত্ম প্রকাশের ফলে চিন্ময় আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং অধিদৈব প্রকাশের ফলে জীব প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এইগুলি জড় জগতে আবদ্ধ অভিনেতার কার্য, কারণ এবং কর্তৃত্বের প্রকাশ। এগুলি বদ্ধ অবস্থার অভিব্যক্তি, এবং যে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই জীবের সর্বোত্তম প্রাপ্তি।

শ্লোক ২০

স এষ ভগবাল্লিঁঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিত গতির্ব্রহ্মন্ সর্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি; **এষ**—এই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিন প্রকার; **এতৈঃ**—এই সবকিছুর দ্বারা; **অধোক্ষজঃ**—ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত পরম দ্রষ্টা; **সু-অলক্ষিত**—বিশেষরূপে অগোচর; **গতিঃ**—গতিবিধি; **ব্রহ্মন্**—হে নারদ; **সর্বেষাম্**—সকলের; **মম**—আমার; **চ**—ও; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ নারদ! সেই পরম দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি সকলের, এমনকি আমারও নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৪-২৫) ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যারা ব্রহ্মজ্যোতির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং মনে করে যে চরমে পরম সত্য নির্বিশেষ এবং তা প্রয়োজনের বশেই কেবল রূপ পরিগ্রহ করে, তারা সবিশেষবাদীদের তুলনায় অত্যন্ত মূর্খ। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা যতই বেদান্ত পাঠ করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারা জড়া প্রকৃতির উল্লিখিত তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত; তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভে অক্ষম। যে কেউ ভগবানের কাছে যেতে পারে না কেননা তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। কিন্তু ভ্রান্তিবশত কারোরই মনে করা উচিত নয় যে,ভগবান পূর্বে অব্যক্ত ছিলেন এবং সম্প্রতি নররূপে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ভগবানের নিরাকার হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা ভগবানকে আবৃত করে যে যোগমায়ার যবনিকা তারই প্রভাব, এবং বদ্ধ জীব যখন ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সেই আবরণ উন্মোচিত হয়। ভগবানের যে সমস্ত

ভক্ত উল্লিখিত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত, তারা শুদ্ধভক্তি যোগে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগবানের নিত্য আনন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ২১

কালং কর্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ২১ ॥

কালম্—নিত্যকাল; **কর্ম**—জীবের অদৃষ্ট; **স্বভাবম্**—প্রকৃতি; **চ**—ও; **মায়া**—শক্তি; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **আত্মন্**—(আত্মনি)নিজেকে; **যদৃচ্ছয়া**—স্বতন্ত্রভাবে; **প্রাপ্তম্**—অবস্থিত হয়ে; **বিবুভূষুঃ**—ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে; **উপাদদে**—পুনরায় সৃষ্ট হওয়ার জন্য গৃহীত।

অনুবাদ

সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা ভগবান, তাঁর শক্তির দ্বারা নিত্যকাল, সমস্ত জীবের অদৃষ্ট এবং তাদের স্বভাব সৃষ্টি করেন, এবং তিনি পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ জীবদের তাঁর অধীনে রেখে কর্ম করতে দেন, পুনঃ পুনঃ প্রলয়ের পর তার সৃষ্টি হয়। জড় সৃষ্টি অন্তহীন আকাশে একখণ্ড মেঘের মতো। প্রকৃত আকাশ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতির কিরণে নিত্য পূর্ণ চিদাকাশ। এই অন্তহীন আকাশের একটি অংশ জড় সৃষ্টিরূপী মহত্তত্ত্বের মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত, যেখানে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আধিপত্য করতে অভিলাষী বদ্ধ জীবেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাদের বাসনা অনুসারে আচরণ করার জন্য প্রক্ষিপ্ত হয়। ঠিক যেমন নিয়মিতভাবে বর্ষাঋতুর আগমন এবং অন্তর্ধান হয়, ঠিক তেমন ভগবানের নিয়ন্ত্রণে জড় জগতের সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়। সে কথা ভগবদ্গীতায় (৮/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয় ভগবানের নিয়মিত কার্য, যার মাধ্যমে জীবের নিজ ইচ্ছা অনুসারে আচরণ পূর্বক আপন ভাগ্য রচনা করে প্রলয়ের সময় স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। এইভাবে, কোন এক ঐতিহাসিক সময়ে সৃষ্টি হয় (আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা অনুসারে আমরা মনে করি যে সব কিছুরই আদি রয়েছে)। সৃষ্টি এবং প্রলয়ের প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনাদি। তার যে কখন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই, কেননা আংশিক সৃষ্টিরও স্থিতি হচ্ছে ৮,৬৪,০০,০০,০০০ বৎসর। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত সৃষ্টির নিয়ম হচ্ছে যে, তা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কিছু সময়ের পর পুনরায় ধ্বংস হয়ে যায়। সমগ্র জড় সৃষ্টি এমনকি চিন্ময় জগতও ভগবানের শক্তির প্রকাশ, ঠিক

যেমন তাপ এবং আলো আগুনের শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। ভগবান তাই তাঁর শক্তির বিস্তারের মাধ্যমে নির্বিশেষ রূপে বিরাজ করেন এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নির্বিশেষ রূপের আশ্রয়ে অবস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গৌণরূপে নিজেকে পৃথক রাখেন। তাই ভ্রান্তভাবে কখনো মনে করা উচিত নয় যে,তাঁর অন্তহীন নির্বিশেষ প্রকাশ রয়েছে বলে তাঁর সবিশেষ রূপ নেই। তাঁর নির্বিশেষ রূপ তাঁর শক্তির প্রকাশ, এবং তাঁর অন্তহীন নির্বিশেষ শক্তিতে নিজেকে বিস্তার করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সবিশেষ রূপে নিত্য বিরাজমান *(ভগবদ্গীতা ৯/৫-৭)*। সমগ্র সৃষ্টি যে কিভাবে ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে বর্তমান তা ধারণা করা ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় ভগবান একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, বায়ু এবং পরমাণু সমস্ত জড় সৃষ্টির বিশাল আকাশের আধার-স্বরূপ আশ্রিত হলেও আকাশ তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বতন্ত্র ও অবিকৃত থাকে, তেমনই ভগবান তাঁর শক্তির দ্বারা সৃষ্ট সবকিছুর আশ্রয় হলেও সর্বদা তাদের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। নির্বিশেষবাদীর মহান্ সমর্থক শঙ্করাচার্য সে কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ* অর্থাৎ নারায়ণ তাঁর নির্বিশেষ সৃষ্টি শক্তির অতীত। সেইভাবে প্রলয়ের সময় সমগ্র সৃষ্টি নারায়ণের দিব্য শরীরে লীন হয়ে যায়, এবং সৃষ্টির সময় পুনরায় অদৃষ্ট এবং স্বতন্ত্র স্বভাব নিয়ে তাঁর শরীর থেকে সৃষ্টির উদ্ভব হয়। ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে সেই জীবদের কখনো কখনো আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ গুণগতভাবে জীবও চিন্ময়। কিন্তু জড় সৃষ্টি কর্তৃক সক্রিয়ভাবে এবং অধ্যাত্ম রুচিগতভাবে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা থাকার ফলে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ২২

কালাদগুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ২২ ॥

কালাৎ—নিত্যকাল থেকে; **গুণব্যতিকরঃ**—প্রতিক্রিয়ার দ্বারা গুণের রূপান্তর; **পরিণামঃ**—রূপান্তর; **স্বভাবতঃ**—স্বভাব থেকে; **কর্মণঃ**—কর্মের; **জন্ম**—সৃষ্টি; **মহতঃ**—মহত্তত্ত্বের; **পুরুষাধিষ্ঠিতাৎ**—ভগবানের পুরুষাবতারের কারণ; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রথম পুরুষাবতারের (কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু) পর মহত্তত্ত্ব বা জড় সৃষ্টির তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তারপর কাল প্রকট হয়, এবং কালক্রমে তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে তিনটি গুণের অভিব্যক্তি। সেগুলি কার্যে রূপান্তরিত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে রূপান্তর এবং প্রতিক্রিয়ার পন্থায় ক্রমে ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং তার সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে ভগবান পুনরায় তাঁর দেহে তা সংবরণ করে নেন। কাল, সমস্ত প্রকৃতিরই অপর সংজ্ঞা এবং তা জড় সৃষ্টির মূল উপাদান মহৎ তত্ত্বেরই বিকার। সেই সূত্রে কালকে সমগ্র সৃষ্টির প্রথম কারণ বলে মনে করা যেতে পারে, এবং প্রকৃতির রূপান্তরের ফলে জড় জগতে বিভিন্ন কার্যকলাপ দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ জীবের অথবা জড় পদার্থের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে মনে করা যেতে পারে, এবং কর্মের প্রকাশের পর জীবের স্বভাব থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল প্রকাশ হতে দেখা যায়। মূলত পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন এই সবকিছুর কারণ। তাই বেদান্ত সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত পরম সত্যকে সমস্ত সৃষ্টির মূল বলে সর্বপ্রথমে ঘোষণা করেছে (*জন্মাদস্য যতঃ*)।

শ্লোক ২৩

মহতস্তু বিকুর্বাণাদ্রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ২৩ ॥

মহতঃ—মহত্তত্ত্বের; **তু**—কিন্তু; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হয়ে; **রজঃ**—প্রকৃতির রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **উপবৃংহিতাৎ**—বর্ধিত হওয়ার ফলে; **তমঃ**—তমোগুণ; **প্রধান ঃ**—প্রাধান্য; **তু**—কিন্তু; **অভবৎ**—হয়েছিল; **দ্রব্য**—পদার্থ; **জ্ঞান**—জড় জ্ঞান; **ক্রিয়াত্মকঃ**—প্রধানত জড়জাগতিক কার্যকলাপ।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে জড় কার্যকলাপের উদ্ভব হয়। প্রথমে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণের রূপান্তর হয় এবং তারপর তমোগুণের প্রভাবে দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য

সব রকম জড় সৃষ্টি কমবেশি রজোগুণের বিকার থেকেই হয়। মহত্তত্ত্ব জড় সৃষ্টির মূল কারণ, এবং তা যখন ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সর্বপ্রথমে রজো এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার জড়জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা উৎপন্ন রজোগুণ প্রাধান্য লাভ করে, এবং এইভাবে জীবেরা কমবেশি তমোগুণে লিপ্ত হয়। ব্রহ্মা রজোগুণের প্রতিনিধি, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রতিনিধি, এবং জড় কার্যকলাপের জনক শিব তমোগুণের প্রতিনিধি। জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় মাতা এবং জড়জাগতিক জীবনের প্রবর্তক শিব হচ্ছেন পিতা।

এইভাবে জীব কর্তৃক জড় সৃষ্টির প্রবর্তন হয় রজোগুণ থেকে। কোন বিশেষ যুগে জীবনের প্রগতির ফলে বিভিন্ন গুণের ক্রমবিকাশ হয়। কলিযুগে (যাতে রজোগুণের প্রভাব সবচাইতে অধিক) মানব সভ্যতার প্রগতির নামে নানা প্রকার জড় কার্যকলাপের আচরণ হয়, এবং জীব তার চিন্ময় স্বরূপ ক্রমেই বিস্মৃত হয়।

কিন্তু এই যুগে সত্ত্বগুণের স্বল্প অনুশীলনের ফলে চিৎজগৎ দর্শন করা যায়, কিন্তু রজোগুণের প্রাধান্যের ফলে সত্ত্বগুণ অপমিশ্রিত হয়। তাই জীবের পক্ষে প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করা সম্ভব হয় না, এবং বিভিন্ন ভাবে সত্ত্বগুণের অনুশীলন করার ফলে সমস্ত গুণের অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ স্থূল জড় পদার্থ হচ্ছে *অধিভূতম্*, তাদের পালন *অধিদৈবম্*, এবং জড় কার্যকলাপের প্রবর্তক হচ্ছে *অধ্যাত্মম্*। জড় জগতের প্রধান অবয়ব হচ্ছে এই তিনটি তত্ত্ব, যথা উপাদান সামগ্রী, তার নিয়মিত সরবরাহ, এবং মোহগ্রস্ত জীবের ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য নানা বৈচিত্র্যে তার ব্যবহার।

শ্লোক ২৪

**সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্বণ্ সমভূৎত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো ॥ ২৪ ॥**

সঃ—সেই বস্তু; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **ইতি**—এইভাবে; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়; **বিকুর্বণ্**—রূপান্তরিত হয়ে; **সমভূৎ**—প্রকাশিত হয়ে; **ত্রিধা**—তিনরূপে; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণে; **তৈজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণে; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যা হয়; **ভিদা**—বিভক্ত; **দ্রব্যশক্তিঃ**—পদার্থকে বিকশিত করার শক্তি; **ক্রিয়াশক্তিঃ**—সৃষ্টির প্রেরণা; **জ্ঞানশক্তিঃ**—পথ প্রদর্শনকারী বুদ্ধিমত্তা; **ইতি**—এইভাবে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কার তিন রূপে রূপান্তরিত হয়ে বৈকারিক, তৈজস এবং তামস অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার এই তিন প্রকারে উদ্ভূত হয়। তামস অহঙ্কার থেকে দ্রব্য শক্তি, রাজস অহঙ্কার থেকে ক্রিয়া শক্তি এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জ্ঞানশক্তি প্রকাশ হয়। হে নারদ, তুমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

অহঙ্কার, বা জড় পদার্থে নিজের পরিচিতি স্থাপন করার প্রবণতা প্রবলভাবে আত্মকেন্দ্রিক, এবং ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় স্পষ্ট জ্ঞান রহিত। জড় বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবের এই আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কার জগতের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের দ্বারা জীবের বদ্ধ

হওয়ার কারণ। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে (শ্লোক ২৪-২৭) অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কারের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান রহিত, আত্মকেন্দ্রিক নির্বিশেষবাদী, সিদ্ধান্ত করে যে পরমেশ্বর ভগবান কোন বিশেষ কার্য সাধনের জন্য তার স্বরূপগত নির্বিশেষ চিন্ময় রূপ থেকে জড় রূপ পরিগ্রহ করেন। এবং এই সমস্ত আত্মকেন্দ্রিক নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মসূত্র এবং জ্ঞানের অতি উন্নত আধার স্বরূপ বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী হলেও পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত অজ্ঞানেরই প্রকাশ। তাই নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে ভগবান অভক্তদের কাছে তাঁর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন না, এবং তাই তারা ভগবদ্গীতা আদি পাঠ করা সত্ত্বেও তাদের জেদীভাবের ফলে নির্বিশেষবাদী থেকে যায়। ভগবানের স্বীয়শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে এই প্রকার জেদ প্রকাশ পায়। যোগমায়া হচ্ছেন ভগবানের সহকারী যিনি জেদী নির্বিশেষবাদীদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখেন। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন মানুষদের বলা হয় মূঢ়, কেননা তারা ভগবানের অজ এবং অপরিবর্তনীয় দিব্য রূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম।

ভগবান যদি তাঁর মূল নির্বিশেষ রূপ থেকে জড় রূপ ধারণ করতেন, তাহলে তার অর্থ হত যে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি নির্বিশেষ থেকে সবিশেষে রূপান্তরিত হন। কিন্তু তিনি অপরিবর্তনীয়। এবং তিনি বদ্ধ জীবেদের মতো কখনো জন্মগ্রহণ করেন না। বদ্ধ জীব জড় জগতে তার বদ্ধ অবস্থার ফলে একদেহ থেকে আর এক দেহে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নির্বিশেষবাদীরা তাদের গভীর অজ্ঞানের ফলে, তথাকথিত বেদান্ত দর্শনে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে ভগবানও তাদের মতো একজন। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত জীবদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তার শাশ্বত স্বরূপে তাকে কদাচিৎ উপলব্ধি করতে পারে। তাই, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত জড় সৃষ্টির অতীত তাঁর নিত্য শাশ্বত নারায়ণ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে।

জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা কৃত্রিমভাবে ক্রমবর্ধমান জড়জাগতিক চাহিদাগুলি মেটাবার ব্যাপারে নিরন্তর ব্যস্ত থাকে বলে তারা এই প্রকার গভীর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে। পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে যে সত্ত্বগুণ বা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহায়ক, এবং তাই বদ্ধ জীবের জ্ঞানশক্তির স্তর, দ্রব্যশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি থেকে তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ। জড় পদার্থের বিশাল সংগ্রহের মাধ্যমে জড় সভ্যতার প্রকাশ হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে বিরাট বিরাট কলকারখানা এবং সেখানে উৎপাদনের জন্য যে উপাদান সরবরাহ

হয় (ক্রিয়াশক্তি) তার কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে জীবের গভীর অজ্ঞতা। দ্রব্য শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি ভিত্তিক জড় সভ্যতার বিড়ম্বনা সংশোধন করতে হলে কর্মযোগের ভিত্তিতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) বলা হয়েছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

"হে কুন্তীপুত্র! তুমি যা কিছু করো, যা খাও, যজ্ঞে যা নিবেদন করো, দান করো, এবং তপস্যা করো, তা সবই তুমি আমাকে অর্পণ কর।"

শ্লোক ২৫

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ॥ ২৫॥

তামসাৎ—তামস অহঙ্কার থেকে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূত-আদেঃ**—জড় উপাদানসমূহের; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হওয়ার ফলে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **নভঃ**—আকাশ; **তস্য**—তার; **মাত্রা**—সূক্ষ্মরূপ; **গুণঃ**—গুণ; **শব্দঃ**—শব্দ; **লিঙ্গম্**—বৈশিষ্ট্য; **যৎ**—যার; **দ্রষ্টৃ**—দ্রষ্টা; **দৃশ্যয়োঃ**—দৃশ্য।

অনুবাদ

তামস অহঙ্কার থেকে প্রথমে পঞ্চ মহাভূতের প্রথম উপাদান আকাশের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আকাশের সূক্ষ্মরূপ হচ্ছে শব্দ, ঠিক যেমন দ্রষ্টার সঙ্গে দৃশ্যের সম্পর্ক।

তাৎপর্য

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটি এই পঞ্চমহাভূত তামস অহঙ্কারের বিভিন্ন গুণ। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বরূপে অহঙ্কার ভগবানের তটস্থা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার এই মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে জীবের মিথ্যা ভোগের জন্য সমস্ত উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়েছে। জীব ভোক্তারূপে জড় উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব করে যদিও তার পটভূমিতে থাকেন পরমেশ্বর ভগবান। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান ছাড়া আর কেউ ভোক্তা হতে পারে না, কিন্তু ভ্রান্তিবশত জীব ভোক্তা হওয়ার বাসনা করে। এইটিই হচ্ছে অহঙ্কারের উৎস। বিভ্রান্ত জীব যখন সেই বাসনা করে তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে ছায়ারূপী উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়, এবং বদ্ধ জীব মরীচিকার পিছনে ধাবিত হওয়ার মতো সেগুলির পিছনে ধাবিত হয়।

শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,প্রথমে তন্মাত্র শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারপর আকাশ এবং এই শ্লোকে সেকথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু শব্দ হচ্ছে আকাশের সূক্ষ্মরূপ, এবং তাদের পার্থক্য দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেই রকম। কোন বস্তু

সম্পর্কে কথা বললে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা থেকে বস্তুটির বিষয়ে একটি ধারণা এনে দেয় বলে ধ্বনি হল প্রকৃত বস্তুর প্রতিরূপ। তাই শব্দ হচ্ছে বস্তুর সূক্ষ্ম লক্ষণ। তেমনই ভগবানের গুণাবলীর দ্যোতক শব্দরূপে ভগবানের যে প্রকাশ তা ভগবানেরই পূর্ণ প্রকাশ, যা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের পিতা বসুদেব এবং মহারাজ দশরথ দর্শন করেছিলেন। ভগবানের শব্দরূপ স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন কেননা ভগবান এবং তার শব্দরূপ উভয়ই পরম তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে,ভগবানের দিব্য নামে, ভগবানের শব্দরূপে, ভগবানের সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়েছে। তাই ভগবানের শুদ্ধ নাম উচ্চারণের ফলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, এবং তখন ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সম্মুখে ভগবান প্রকাশিত হন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এক পলকের জন্যও ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। তাই যে ভক্ত নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে চান,শাস্ত্রে তাঁকে ভগবানের দিব্য নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—নিরন্তর উচ্চারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যিনি এভাবে ভগবানের সঙ্গ করতে সক্ষম,তিনি অবশ্যই মিথ্যা অহঙ্কার প্রসূত জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবেন (*তমসি মা জ্যোতির্গম*)।

শ্লোক ২৬-২৯

নভসোঽথ বিকুর্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরন্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥ ২৬ ॥

বায়োরপি বিকুর্বাণাৎ কালকর্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত তেজো বৈ রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥ ২৭ ॥

তেজসস্তু বিকুর্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥২৮॥

বিশেষস্তু বিকুর্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূ ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

নভসঃ—আকাশের; **অথ**—এইভাবে; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হয়ে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **গুণঃ**—গুণ; **অনিলঃ**—বায়ু; **পর**—পূর্ববর্তী; **অন্বয়াৎ**—ক্রমান্বয়ে; **শব্দবান্**—ধ্বনির দ্বারা পূর্ণ; **চ**—ও; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **সহঃ**—মেদ; **বলম্**—বল; **বায়োঃ**—বায়ুর; **অপি**—ও; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরের ফলে; **কাল**—কাল; **কর্ম**—পূর্বকৃত কর্মের ফল; **স্বভাবতঃ**—প্রকৃতির ভিত্তিতে; **উদপদ্যত**—উৎপন্ন হয়েছে; **তেজঃ**—অগ্নি; **বৈ**—যথাক্রমে; **রূপবৎ**—রূপসহ; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **শব্দবৎ**—শব্দসহ; **তেজসঃ**—অগ্নির; **তু**—কিন্তু; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হওয়ার ফলে; **আসীৎ**—হয়েছে; **অম্ভঃ**—জল;

রসাত্মকম্—রস দ্বারা নির্মিত; **রূপবৎ**—রূপসহ; **স্পর্শবৎ**—স্পর্শসহ; **চ**—এবং; **অম্ভ**—জল; **ঘোষবৎ**—শব্দসহ; **চ**—এবং; **পর**—পূর্ববর্তী; **অন্বয়াৎ**—ক্রমান্বয়ে; **বিশেষঃ**—বৈচিত্র্য; **তু**—কিন্তু; **বিকুর্বাণাৎ**— রূপান্তরের দ্বারা; **অম্ভসঃ**—জলের; **গন্ধবান্**—গন্ধময়; **অভূৎ**—হয়েছে; **পর**— পূর্ববর্তী; **অন্বয়াৎ**—ক্রমান্বয়ে; **রস**—রস; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **শব্দ**—শব্দ; **রূপ-গুণ-অন্বিতঃ**—রূপ এবং গুণ সমন্বিত।

অনুবাদ

আকাশের রূপান্তরের ফলে স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে, এবং কারণরূপে তাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে বায়ুতেও শব্দগুণ রয়েছে। বায়ুই দেহধারণ, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, মানসিক বল ও শরীরের শক্তির হেতু কাল, কর্ম ও স্বভাববশত বায়ুর বিকারের ফলে আগুন উৎপন্ন হয়। আগুনের গুণ রূপ। আকাশ ও বায়ু তেজের কারণ হওয়াতে তেজেও রূপসহ শব্দ ও স্পর্শ গুণ বিরাজিত। আগুনের বিকারের ফলে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হয়। জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্তমান। জলের বিকার থেকে মাটি উৎপন্ন হয়। মাটির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। এই মাটিতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে মাটিতে সেগুলির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্তমান।

তাৎপর্য

সমগ্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এক উপাদান থেকে আর এক উপাদানের বিবর্তন এবং বিকাশ যা ক্রমান্বয়ে বৃক্ষ, লতা, পর্বত, নদী, সরীসৃপ, পক্ষী, জীবজন্তু এবং বিভিন্ন প্রকার মানুষ আদি বহুরূপে পৃথিবীর বৈচিত্র্যে পর্যবসিত হয়। ইন্দ্রিয় অনুভূতির গুণও ক্রমবিকাশশীল। যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে শব্দ থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে রূপ, রূপ থেকে রস এবং রস থেকে গন্ধের উৎপত্তি হয়। তারা একে অপরের কারণ এবং কার্য, কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে ভগবানের অংশ অবতার কারণ সমুদ্রে শয়ান মহাবিষ্ণু। ব্রহ্ম-সংহিতাতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং ভগবদ্গীতাতেও (১০/৮) সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ ॥

ইন্দ্রিয় অনুভূতির সমস্ত গুণ মাটিতে পূর্ণরূপে রয়েছে, এবং অন্যান্য সমস্ত উপাদানে তা অল্পমাত্রায় রয়েছে। আকাশে কেবল শব্দের গুণ, কিন্তু বায়ুতে শব্দ এবং স্পর্শের গুণ, অগ্নিতে শব্দ-স্পর্শ এবং রূপ, এবং জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস রয়েছে। কিন্তু মাটিতে এই সবকটি গুণ তো রয়েছে উপরন্তু গন্ধ গুণ রয়েছে। অতএব মাটিতে জীবনের পূর্ণ বৈচিত্র্যের প্রদর্শন হয়, যা মূলত বায়ুর ভিত্তিতে শুরু হয়। শরীরের রোগ

জীবের জড়জাগতিক শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর বিশৃঙ্খলার ফলে উৎপন্ন হয়। দেহের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর বিশেষ বিশৃঙ্খলার ফলে মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব যোগ ব্যায়াম বায়ুর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষ লাভপ্রদ, এবং তার ফলে শরীরের রোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায়। যথাযথভাবে তার অভ্যাসের ফলে বায়ু বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুকে পর্যন্ত বশ করা যায়। সিদ্ধযোগী মৃত্যুকে বশ করে সূক্ষ্মলোকে স্থানান্তরিত হওয়ার উপযুক্ত সময়ে দেহ ত্যাগ করতে পারেন। ভক্তিযোগী কিন্তু তাঁর ভক্তির প্রভাবে এই সমস্ত যোগীদের অতিক্রম করেছেন, এবং তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে জড়া প্রকৃতির অতীত চিৎ জগতের কোন একটি গ্রহে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৩০

বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥ ৩০ ॥

বৈকারিকাৎ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে; **মনঃ**—মন; **জজ্ঞে**—উদ্ভূত হয়েছে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **বৈকারিকা**—সাত্ত্বিক অহঙ্কারে; **দশ**—দশ; **দিক্**—দিকসমূহের নিয়ন্তা; **বাত**—বায়ুর নিয়ন্তা; **অর্ক**—সূর্য; **প্রচেতঃ**—প্রচেত; **অশ্বি**—অশ্বিনী কুমারদ্বয়; **বহ্নী**—অগ্নিদেবতা; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **উপেন্দ্র**—স্বর্গের শ্রীবিগ্রহ; **মিত্র**—দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম; **কাঃ**—প্রজাপতি ব্রহ্মা।

অনুবাদ

বৈকারিক অহঙ্কার থেকে মন উদ্ভূত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে শরীরের গতি নিয়ন্ত্রক দশটি দেবতাও প্রকট হয়েছেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন দিকসমূহের নিয়ন্তা, বায়ুর নিয়ন্তা পবনদেব, সূর্যদেব, দক্ষ প্রজাপতির পিতা, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের শ্রীবিগ্রহ উপেন্দ্র, আদিত্যদেবগণের প্রধান মিত্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

বৈকারিক হল সৃষ্টির নিরপেক্ষ অবস্থা এবং তেজস হল সৃষ্টির প্রবর্তক, আর তমস হচ্ছে অজ্ঞানের প্রভাবে সেই জড় সৃষ্টির পূর্ণ প্রদর্শন। কলকারখানায় 'জীবনের আবশ্যকতা সমূহ' নির্মাণ কলিযুগের বা যান্ত্রিক যুগে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে, এবং তা হচ্ছে তমোগুণের সর্বোচ্চ অবস্থা। মানব সমাজের এই প্রকার নির্মাণকারী উদ্যোগ তমোগুণে সম্পন্ন হয় কেননা প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত নির্মিত সামগ্রীর কোন প্রয়োজন নেই। মানব সমাজের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে জীবন ধারণের জন্য আহার, নিদ্রার জন্য গৃহ বা আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়, এবং ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বস্তু সমূহ।

ইন্দ্রিয়গুলি জীবনের বাস্তব লক্ষণ, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করা, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সরবরাহ আবশ্যকতা অনুসারে হওয়া উচিত, কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়গুলির আবশ্যকতা বৃদ্ধি করার জন্য নয়।

আহার, আশ্রয়, আত্মরক্ষা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—এগুলি জড় জীবনের আবশ্যকতা। তা না হলে, শুদ্ধ নির্মল স্বরূপে জীবের এগুলির প্রয়োজন হয় না। তাই এই সমস্ত প্রয়োজনগুলি কৃত্রিম, এবং জীবনের শুদ্ধ অবস্থায় সেগুলির কোন প্রয়োজন নেই।

প্রকৃতপক্ষে, কৃত্রিমভাবে প্রয়োজনগুলি বৃদ্ধি করা, যা জড় সভ্যতার স্বাভাবিক বৃত্তি, তা অজ্ঞান তামসিক কার্যকলাপ। এই প্রকার কার্যকলাপের ফলে মানুষের শক্তির অপচয় হয় কেননা মানবিক শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য ইন্দ্রিয় সমূহকে পবিত্র করা।

পরমেশ্বর ভগবান অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পরম অধীশ্বর হওয়ার ফলে তিনি হচ্ছেন ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশ। হৃষীক শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সমূহ, এবং ঈশ মানে ঈশ্বর। ভগবান ইন্দ্রিয়ের দাস নন, অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হন না, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা ইন্দ্রিয়ের দাস। তারা ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়, তাই জড় সভ্যতা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা মাত্র।

ইন্দ্রিয় তৃপ্তিরূপী রোগের নিরাময় সাধন করা মানব সভ্যতার মানদণ্ড হওয়া উচিত, এবং ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমূহের সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত হওয়ার মাধ্যমে অনায়াসে তা সম্পাদন করা সম্ভব।

ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের কার্যকলাপ থেকে বিরত করা যায় না, কিন্তু সেগুলিকে হৃষীকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের শুদ্ধ সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে পবিত্র করা যায়। এইটিই হচ্ছে সমগ্র ভগবদ্গীতার উপদেশ।

অর্জুন প্রথমে তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করে তাঁর চেতনাকে পবিত্র করে তাঁর ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাসনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলেন।

বেদ নির্দেশ দিয়েছে অজ্ঞতাচ্ছন্ন জীবন থেকে আলোকের পথে গমন করতে *(তমসো মা জ্যোতির্গময়)।* এই আলোকের পথ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করা। বিভ্রান্ত অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অর্জুন এবং অন্যান্য ভগবদ্ভক্ত কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থায় পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টা না করে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করতে চায়। ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করার পরিবর্তে তারা কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ স্তব্ধ করতে চায় (যোগ প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে), অথবা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে (জ্ঞানের পন্থার মাধ্যমে)।

ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু এই সমস্ত যোগী এবং জ্ঞানীদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করেন না; তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করতে চান। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলেই কেবল যোগী এবং জ্ঞানীরা ভগবানের ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করে এবং কৃত্রিমভাবে তাদের রোগগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সংযত করার চেষ্টা করে। রোগগ্রস্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি জড়জাগতিক প্রয়োজনগুলি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় হয়।

কেউ যখন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বর্ধিত করার কুফল দর্শন করতে পারেন, তখন তাঁকে বলা হয় জ্ঞানী এবং কেউ যখন যৌগিক প্রথার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন, তাঁকে বলা হয় যোগী, কিন্তু যখন কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমূহের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করেন, তাঁকে বলা হয় ভগবদ্ভক্ত।

ভগবদ্ভক্তেরা কখনো ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলিকে অস্বীকার করেন না, অথবা কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যিনি ঈশ্বর তাঁরই সেবায় যুক্ত হন, ঠিক যেভাবে অর্জুন যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা অনায়াসে সমস্ত পূর্ণতার চরম লক্ষ্য ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৩১

তৈজসাত্তু বিকুর্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্‌ঘ্রাণদৃগ্‌জিহ্বা-বাগ্‌দোর্মেঢ্রাহঙ্ঘ্রি-পায়বঃ ॥ ৩১ ॥

তৈজসাৎ—রাজস অহঙ্কার থেকে; **তু**—কিন্তু; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **দশ**—দশ; **অভবন্**—উৎপত্তি হয়েছে; **জ্ঞানশক্তিঃ**—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; **ক্রিয়াশক্তিঃ**—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **প্রাণঃ**—জীবনী শক্তি; **চ**—ও; **তৈজসৌ**—তৈজস অহঙ্কারপ্রসূত সমস্ত বস্তু; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **ত্বক্**—ত্বকেন্দ্রিয়; **ঘ্রাণ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **দৃগ্**—দর্শনেন্দ্রিয়; **জিহ্বাঃ**—রসনেন্দ্রিয়; **বাগ্**—বাক্-ইন্দ্রিয়; **দোঃ**—হস্ত; **মেঢ্র**—উপস্থ; **অঙ্ঘ্রি**—পাদ; **পায়বঃ**—পায়ু।

অনুবাদ

রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হলে তা থেকে জ্ঞানশক্তি, বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রাণসহ কর্ণ, ত্বক, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, বাক্, পাণি, উপস্থ, পাদ এবং পায়ু এই দশটি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবন কমবেশি বুদ্ধি এবং প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কঠোর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য বুদ্ধিকে সহায়তা করে, এবং প্রাণশক্তি হস্ত, পদ আদি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে জীবন ধারণ করে। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে জীবন সংগ্রাম রজোগুণের কার্য। তাই বুদ্ধি এবং প্রাণসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি রজোগুণ নামক প্রকৃতির দ্বিতীয় গুণটি থেকে উৎপন্ন হয়। এই রজোগুণটি কিন্তু বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩২

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম্ ॥ ৩২ ॥

যদা—যতক্ষণ পর্যন্ত ; **এতে**—এই সমস্ত ; **অসঙ্গতাঃ**—মিলিত না হয়ে ; **ভাবাঃ**—এইভাবে অবস্থান করে ; **ভূত**—উপাদান সমূহ ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহ ; **মনঃ**—মন ; **গুণাঃ**—প্রকৃতির গুণসমূহ ; **যদা**—যতক্ষণ পর্যন্ত ; **আয়তন**—শরীর ; **নির্মাণে**—নির্মাণ ব্যাপারে ; **ন-শেকুঃ**—সম্ভব নয় ; **ব্রহ্ম-বিত্তম্**—হে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নারদ।

অনুবাদ

হে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নারদ! এই সমস্ত সৃষ্ট অংশগুলি, যথা পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়-সমূহ, মন এবং প্রকৃতির গুণগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিত হয়, ততক্ষণ শরীর সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য

জীবের বিভিন্ন প্রকার শরীর কারখানায় বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ের ফলে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার মোটর গাড়ির মতো। মোটর গাড়ি যখন প্রস্তুত হয়, তখন ড্রাইভার সেই গাড়ির আসনে বসে তার ইচ্ছা অনুসারে গাড়িটিকে চালায়। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে। জীব দেহরূপ যন্ত্রে বসে আছে, এবং সেই দেহরূপী যানটি চালিত হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, ঠিক যেমন একটি রেলগাড়ি যা চালকের পরিচালনায় চালিত হয়।

জীব কিন্তু তার শরীর নয় ; তার দেহরূপী যন্ত্রটি থেকে ভিন্ন। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জড় বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না কিভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ মন এবং প্রকৃতির গুণের সমন্বয়ে দেহটির সৃষ্টি হয়। প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এক-একটি চিৎ স্ফুলিঙ্গ, এবং পিতা যেমন তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তেমনই পরম পিতা ভগবানের কৃপার প্রভাবে জীব জড় জগতের উপর তাঁর ইচ্ছানুসারে আধিপত্য করার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

পিতা যেমন ক্রন্দনরত পুত্রকে শান্ত করার জন্য খেলনা দেন, তেমনই মোহাচ্ছন্ন জীবদের বাসনা অনুসারে আধিপত্য করার জন্য ভগবান তাঁর ইচ্ছা শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এবং এখানে জীব ভগবানের প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে।

বদ্ধ জীবদের অবস্থা ঠিক ভগবানের দাসীর (প্রকৃতির) অধীনে জড় জগতরূপী উদ্যানে ক্রিয়াশীল শিশুদের মতো। তারা মায়াকে, ভগবানের দাসীকে, সর্বেসর্বা বলে মনে করে এবং ভ্রান্তভাবে ধারণা করে যে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন প্রকৃতি (দুর্গা দেবী ইত্যাদি)।

মূর্খ শিশু সদৃশ জড়বাদীরা ভগবানের দাসীরূপা জড়া প্রকৃতির অতীত কোন ধারণা পোষণ করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা ভালভাবে জানেন যে, জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক যেমন একজন দাসী অপরিণত শিশুদের পিতারূপ কোন প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

দেহের বিভিন্ন অংশগুলি, যেমন ইন্দ্রিয়-সমূহ, মহত্তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট, এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে যখন সেগুলি মিলিত হয়, তখন জড় শরীরের সৃষ্টি এবং জীবকে তার ইচ্ছা অনুসারে কার্য করার জন্য সেটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে।

শ্লোক ৩৩

তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ৩৩ ॥

তদা—সেই সমস্ত; **সংহত্য**—মিলিত হয়ে; **চ**—ও; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **শক্তি**—শক্তি; **চোদিতাঃ**—প্রযুক্ত হয়ে; **সদসত্ত্বম্**—মুখ্যত এবং গৌণত; **উপাদায়**—স্বীকার করে; **চ**—ও; **উভয়ম্**—উভয়; **সসৃজুঃ**—সৃষ্ট হয়েছে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অদঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা এইগুলি একত্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির মুখ্য এবং গৌণ কারণসমূহ স্বীকার করে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকট হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির জন্য তাঁর বিভিন্ন শক্তি প্রযুক্ত করেন। এমন নয় যে, তিনি স্বয়ং জড় সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হন। তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তিতে নিজেকে বিস্তার করে, এবং বিভিন্ন অংশে নিজেকে বিস্তার করে

এই জড় জগতকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মজ্যোতির চিদাকাশে এক কোণে কখনো কখনো এক চিন্ময় মেঘের প্রকাশ হয় এবং সেই আচ্ছাদিত অংশটিকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব। ভগবান তখন মহাবিষ্ণুরূপে কারণ জল নামক মহত্তত্ত্বের জলে শয়ন করেন। মহাবিষ্ণু যখন সেই কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন তখন তাঁর নিশ্বাসের প্রভাবে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডগুলি কারণ-সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মতো ভাসছে এবং সেগুলি কারণ-সমুদ্রের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির অস্তিত্ব কেবল মহাবিষ্ণুর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় পর্যন্ত। সেই মহাবিষ্ণু তারপর প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের গোলোকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন এবং শেষনাগরূপী তাঁর অবতার কর্তৃক নির্মিত শয্যায় শায়িত হন। তাঁর নাভিদেশ থেকে একটি পদ্ম তখন উত্থিত হয় এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বিভিন্ন জীবদের বাসনা অনুসারে তাদের বিভিন্ন প্রকার রূপ প্রদান করেন। তিনি সূর্য, চন্দ্র তথা অন্য দেবতাদেরও সৃষ্টি করেন।

তাই জড় সৃষ্টির মুখ্য শিল্পী স্বয়ং ভগবান, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি জড়া প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার স্থাবর এবং জঙ্গম সৃষ্টির জন্য নির্দেশ দেন।

জড় সৃষ্টি দুই প্রকার—মহাবিষ্ণুর দ্বারা সমষ্টিগত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং একক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। উভয় সৃষ্টিই ভগবান কর্তৃক সম্পাদিত হয়, এবং তার ফলে আমাদের গোচরীভূত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হয়।

শ্লোক ৩৪

বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
কালকর্মস্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবয়ৎ॥ ৩৪॥

বর্ষপূগ—বহু বছর; **সহস্রান্তে**—হাজার হাজার বছরের পর; **তৎ**—তা; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **উদকে**—কারণ বারিতে; **শয়ম্**—নিমজ্জিত হয়ে; **কাল**—নিত্য কাল; **কর্ম**—কর্ম; **স্বভাবস্থঃ**—প্রকৃতির গুণ অনুসারে; **জীবঃ**—জীবের ঈশ্বর; **অজীবম্**—জড়কে; **অজীবয়ৎ**—জীবিত করেছেন।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ হাজার হাজার বছর কারণ-সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল। তারপর সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান তাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলিকে পূর্ণরূপে সজীব করেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে জীব বলে বর্ণনা করা হয়েছে কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবদের ঈশ্বর। বেদে তাঁকে অন্য সমস্ত *নিত্যদের* মধ্যে *পরম নিত্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক পুত্রের সঙ্গে পিতার সম্পর্কের মতো। গুণগতভাবে পিতা এবং পুত্র সমান, কিন্তু তা হলেও পিতা কখনো পুত্র নন, অথবা পুত্র কখনো তার জন্মদাতা পিতা নন। অতএব, পূর্বকৃত বর্ণনা অনুসারে, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু বা হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীবেদের সঞ্চার করে ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে সজীব করেন, যে কথা ভগবদ্গীতায় (১৪/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রলয়ের পর সমস্ত জীব ভগবানের শরীরে লীন হয়ে যায় এবং পুনরায় যখন সৃষ্টি হয়, তখন জড়া প্রকৃতির গর্ভে তারা সঞ্চারিত হয়। তাই জড় জগতে জড়া প্রকৃতি জীবের মাতা সদৃশ এবং ভগবান হচ্ছেন পিতা। কিন্তু জীব যখন জড় জগতে সক্রিয় হয়, তখন তারা কাল এবং মায়াশক্তির বশীভূত হয়ে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করতে শুরু করে এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার জীবের প্রকাশ হয়। তাই ভগবান হচ্ছেন জড় জগতে সমস্ত সজীবতার পরম কারণ।

শ্লোক ৩৫

স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্বঙ্ঘ্রি বাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ ৩৫ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান) ; **এব**—স্বয়ং ; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **তস্মাৎ**— ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর থেকে ; **অণ্ডম্**—হিরণ্যগর্ভ ; **নির্ভিদ্য**—বিভাজিত করে ; **নির্গতঃ**— নির্গত হয়েছে ; **সহস্র**—হাজার হাজার ; **উরু**—জঙ্ঘা ; **অঙ্ঘ্রি**—পা ; **বাহু**—হস্ত ; **অক্ষঃ**—অক্ষি ; **সহস্র**—সহস্র ; **আনন**—মুখ ; **শীর্ষবান্**—মস্তক সহ।

অনুবাদ

যদিও ভগবান (মহাবিষ্ণু) কারণ সমুদ্রে শায়িত রয়েছেন, তথাপি তিনি তার থেকে নির্গত হয়ে নিজেকে হিরণ্যগর্ভরূপে বিভক্ত করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং শত-সহস্র পাদ, হস্ত, মুখ, অক্ষি, মস্তক ইত্যাদি সহ বিরাটরূপ পরিগ্রহ করেছেন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর যে ভুবনের বিস্তার হয়েছে তা ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। তার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্ধ্বং জঘনাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যার ; **ইহ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের ; **অবয়বৈঃ**—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ; **লোকান্**—সমস্ত লোকসমূহ ; **কল্পয়ন্তি**—কল্পনা করে ; **মনীষিণঃ**—বড় বড়

দার্শনিকেরা ; **কটি-আদিভিঃ**—কোমরের নীচে ; **অধঃ**—নিম্নভাগে ; **সপ্ত**—সাতটি ; **সপ্ত-ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধভাগে সাতটি ; **জঘনাদিভিঃ**—সামনের অংশ।

অনুবাদ

বড় বড় দার্শনিকেরা কল্পনা করে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকসমূহ ভগবানের বিরাটরূপে ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন ভাগের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রদর্শন।

তাৎপর্য

এখানে কল্পয়ন্তি বা 'কল্পনা করে' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে সমস্ত কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত দ্বিভুজ রূপ স্বীকার করতে অক্ষম, ভগবানের বিরাট রূপ হচ্ছে তাদের কল্পনা। যদিও মহান্ দার্শনিকদের কল্পিত বিরাট রূপ ভগবানেরই একটি স্বরূপ, তথাপি তা কল্পনাপ্রসূত। কথিত হয় যে সাতটি ঊর্ধ্ব লোক বিরাট রূপের কটিদেশের উপরিভাগে অবস্থিত, এবং সাতটি নিম্ন লোক তাঁর কটি দেশের নিম্নভাগে অবস্থিত। এখানে এই ধারণা প্রদান করা হয়েছে যে,পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন, এবং এই সৃষ্টিতে কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের অতীত নয়।

শ্লোক ৩৭

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত ॥ ৩৭ ॥

পুরুষস্য—পরমেশ্বর ভগবানের ; **মুখম্**—মুখ ; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণ ; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয় বর্ণ ; **এতস্য**—তাঁর ; **বাহবঃ**—বাহুদ্বয় ; **ঊর্বোঃ**—উরুদ্বয় ; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য সম্প্রদায় ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **পদ্ভ্যাম্**—পদযুগল থেকে ; **শূদ্রঃ**—শ্রমিক সম্প্রদায় ; **ব্যজায়ত**—প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মুখ, ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বাহু, বৈশ্যরা তাঁর জঙ্ঘা এবং শূদ্রেরা তাঁর পদ যুগল থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

সমস্ত জীবদের ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এই শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিভাবে তা নির্ণয় করা হয়। মানব সমাজের চারটি বর্ণ, যথা বুদ্ধিমান সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণ), পরিচালক বর্গ (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (বৈশ্য), এবং শ্রমিক সম্প্রদায় (শূদ্র) হচ্ছে ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ।

প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। স্বরূপত দেহের মুখ এবং পা দেহ থেকে অভিন্ন, কিন্তু গুণগতভাবে মস্তক পা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে মুখ, পা, হাত এবং জঙ্ঘা সবই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। ভগবানের শরীরের এই সমস্ত অঙ্গগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ ভগবানের সেবা করা। মুখের উদ্দেশ্য কথা বলা, হাতের উদ্দেশ্য দেহকে রক্ষা করা, পায়ের উদ্দেশ্য দেহকে বহন করে নিয়ে যাওয়া, এবং উদরের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে পালন করা।

তাই সমাজের বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের উদ্দেশ্যে কথা বলা এবং ভগবানের তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্ন গ্রহণ করা। ভগবানের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় যজ্ঞের ফল গ্রহণের ফলে। ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এই সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করা, এবং ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই প্রকার যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করা।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কথা বলার অর্থ হচ্ছে যথাযথভাবে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিচার করার মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। তার ফলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলে অবগত হতে পারে। তাই ব্রাহ্মণদের কর্তব্য বৈদিক জ্ঞান বা পরম জ্ঞান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া।

বেদের অর্থ জ্ঞান, এবং অন্ত মানে তার শেষ। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর উৎস *(অহং সর্বস্য প্রভবঃ)*, এবং সেই সূত্রে সমস্ত জ্ঞানের অন্ত (বেদান্ত) হচ্ছে ভগবানকে জানা, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সেই সম্পর্ক অনুসারেই কেবল আচরণ করা।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে দেহ সম্পর্কিত ; তেমনই, প্রতিটি জীবের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া। বিশেষ করে মনুষ্য জীবনে সেইটি হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যথাযথভাবে প্রতিটি জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত না হলে মনুষ্য জীবন ব্যর্থ হয়।

বুদ্ধিমান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণদের, তাই বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে জীবের সঙ্গে ভগবানের এই সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচার করে আদর্শ পথে জনসাধারণকে পরিচালিত করা। ক্ষত্রিয় বর্গের কর্তব্য জীবেদের রক্ষা করা যাতে তারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে ; ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে খাদ্য শস্য উৎপাদন করে তা সমগ্র মানব সমাজকে বিতরণ করা যাতে জনসাধারণ সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করে মানব জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর একটি কর্তব্য হচ্ছে গাভীদের রক্ষা করা। গাভী যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রদান করে যা পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে উপযুক্ত সভ্যতার পালন পোষণের জন্য যে বুদ্ধিমত্তা এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজন তা প্রদানে সমর্থ। আর শ্রমিক সম্প্রদায়, যারা

বুদ্ধিমান নয় অথবা শক্তিশালী নয়, তারা তাদের দৈহিক শ্রমের দ্বারা উচ্চতর বর্ণের সেবা করার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে।

এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সম্পর্কে সম্পর্কিত একটি পূর্ণ একক, এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে সমগ্র মানব সমাজ শান্তি এবং সমৃদ্ধি রহিত হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বেদে বলা হয়েছে—*ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।*

শ্লোক ৩৮

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

ভূঃ—পৃথিবীর স্তর পর্যন্ত নিম্নলোক; **লোকঃ**—লোক; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয় অথবা কথিত হয়; **পদ্ভ্যাম্**—পদযুগল থেকে; **ভুবঃ**—উর্ধ্ব; **লোকঃ**—লোক; **অস্য**—তাঁর (ভগবানের); **নাভিতঃ**—নাভি থেকে; **হৃদা**—হৃদয় থেকে; **স্বর্লোকঃ**—দেবলোক; **উরসা**—বক্ষঃস্থল থেকে; **মহর্লোকঃ**—মহান ঋষি এবং মহাত্মাদের লোক; **মহাত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পৃথিবীর স্তর পর্যন্ত সমস্ত অধঃলোক তাঁর পদযুগলে অবস্থিত। তার উর্ধ্বে ভুবর্লোক তাঁর নাভিদেশে অবস্থিত। তারও উর্ধ্বে দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গলোক তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত এবং মহান্ মুনি-ঋষিরা যেখানে বিরাজ করেন সেই মহর্লোক তাঁর বক্ষে অবস্থিত বলে কথিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দটি গ্রহলোক রয়েছে। নিম্নবর্তী গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় ভূর্লোক, মধ্যবর্তী গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় ভুবর্লোক, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উর্ধ্ববর্তী গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় স্বর্লোক। এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি ভগবানের শরীরে অবস্থিত। অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোন গ্রহলোক নেই।

শ্লোক ৩৯

গ্রীবায়াং জনলোকঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

গ্রীবায়াম্—গ্রীবাদেশ; **জনলোকঃ**—জনলোক; **অস্য**—তাঁর; **তপোলোকঃ**—তপলোক; **স্তনদ্বয়াৎ**—স্তনদ্বয়; **মূর্ধভিঃ**—মস্তক দ্বারা; **সত্যলোকঃ**—সত্যলোক; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্মলোকঃ**—বৈকুণ্ঠ বা চিন্ময় লোকসমূহ; **সনাতনঃ**—নিত্য।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের গ্রীবাদেশে জনলোক অবস্থিত, স্তনদ্বয় তপোলোক এবং মস্তকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোক অবস্থিত। তার উর্ধ্বে যে বৈকুণ্ঠলোক তা নিত্য (অর্থাৎ এই সৃষ্ট জগতের অন্তর্বর্তী নয়)।

তাৎপর্য

এই গ্রন্থে বহুবার আমরা জড়াকাশের অতীত বৈকুণ্ঠলোকের কথা আলোচনা করেছি; এবং এই শ্লোকে সেই বর্ণনা সত্য বলে সমর্থন করা হয়েছে। এখানে *সনাতন* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবদ্গীতাতেও (৮/২০) নিত্যত্বের এই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এই জড় জগতের অতীত চিদাকাশে সবকিছুই নিত্য। কখনো কখনো ব্রহ্মার নিবাসস্থল সত্যলোককেও ব্রহ্মলোক বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু এখানে যে ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্যলোক নয়। এই ব্রহ্মলোক নিত্য, কিন্তু সত্যলোক নিত্য নয়।

এই দুয়ের পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্য এখানে *সনাতন* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই ব্রহ্মলোক ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবানের আলয়। চিদাকাশে সবকটি গ্রহলোকই সাক্ষাৎ ভগবানেরই মতো। ভগবান সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং তাঁর নাম, যশ, মহিমা, গুণাবলী, লীলা ইত্যাদি তাঁর থেকে অভিন্ন কেননা তিনি হচ্ছেন পরম তত্ত্ব। তাই ভগবানের পরা প্রকৃতির সবকটি গ্রহলোকই তাঁর থেকে অভিন্ন। সেই সমস্ত গ্রহলোকে দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং সেখানে এই জড় জগতের মতো কালের প্রভাব নেই। এইভাবে কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে ব্রহ্মলোকের চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোক সমূহের কখনো বিনাশ হয় না। বৈকুণ্ঠলোকের সমস্ত বৈচিত্র্যও ভগবান থেকে অভিন্ন এবং তাই বৈদিক সূত্র *একমেবাদ্বিতীয়ম্* পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয় সেই সনাতন পরিবেশের চিন্ময় বৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

এই জড় জগৎ ভগবানের চিন্ময় ধামের বিকৃত প্রতিবিম্ব। তাই তা অলীক, এবং প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে তা কখনোই নিত্য নয়। দ্বৈত ভাব (চেতন এবং জড়) সমন্বিত এই জড় জগতের যে বৈচিত্র্য, চিৎ জগতের সঙ্গে তার কোন তুলনা হয় না। জ্ঞানের অভাবে অল্পবুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা কখনো কখনো প্রতিবিম্বিত জগতের অবস্থাকে চিৎ জগতের অবস্থার সমান বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা ভগবানকে একজন সাধারণ বদ্ধ জীব বলে মনে করে এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ

জীবের কার্যকলাপের মতো বলে মনে করে। এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ভর্ৎসনা করে ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১)* বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥

ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পূর্ণ অন্তরঙ্গা শক্তি (আত্ম-মায়া) সহ অবতীর্ণ হন, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত তাকে জড় সৃষ্টির অন্তর্গত বলে মনে করে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাই এই শ্লোকের ভাষ্যে যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন যে এখানে যে ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোক, যা সনাতন, এবং তাই তা পূর্বে বর্ণিত জড় সৃষ্টির মতো নয়। ভগবানের বিরাটরূপ জড় জগতের কল্পনা। চিৎ জগৎ বা ভগবৎ ধামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ৪০-৪১

তৎকট্যাং চাতলং ক্লিপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাস্তু তলাতলম্॥ ৪০॥
মহাতলন্তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥ ৪১॥

তৎ—তাঁর; **কট্যাম্**—কোমরে; **চ**—ও; **অতলম্**—পৃথিবীর নিম্নবর্তী প্রথমলোক; **ক্লিপ্তম্**—অবস্থিত; **উরুভ্যাম্**—জঙ্ঘায়; **বিতলম্**—নিম্নবর্তী দ্বিতীয়লোক; **বিভোঃ**—ভগবানের; **জানুভ্যাম্**—জানুদ্বয়; **সুতলম্**—নিম্নবর্তী তৃতীয়লোক; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **জঙ্ঘাভ্যাম্**—জঙ্ঘাদ্বয়; **তু**—কিন্তু; **তলাতলম্**— নিম্নবর্তী চতুর্থলোক; **মহাতলম্**—নিম্নবর্তী পঞ্চমলোক; **তু**—কিন্তু; **গুল্ফাভ্যাম্**—গুল্ফদ্বয়ে অবস্থিত; **প্রপদাভ্যাম্**—পায়ের সম্মুখ ভাগে; **রসাতলম্**—নিম্নবর্তী ষষ্ঠলোক; **পাতালম্**—নিম্নবর্তী সপ্তমলোক; **পাদতলত**—পায়ের তলদেশে; **ইতি**—এইভাবে; **লোকময়ঃ**—লোকে পূর্ণ; **পুমান্**—ভগবান।

অনুবাদ

হে পুত্র নারদ, আমার থেকে অবগত হও যে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে সাতটি হচ্ছে অধঃলোক। অতল নামক প্রথম লোকটি সেই বিরাট পুরুষের কটিদেশে অবস্থিত; দ্বিতীয়লোক বিতল তাঁর উরুদ্বয়ে অবস্থিত, তৃতীয়লোক সুতল তাঁর জানুদ্বয়ে অবস্থিত, চতুর্থলোক তলাতল তাঁর জঙ্ঘাদ্বয়ে অবস্থিত, পঞ্চমলোক মহাতল তাঁর গুলফদ্বয়ে অবস্থিত; ষষ্ঠ রসাতল তাঁর পদদ্বয়ের অগ্রভাগে অবস্থিত এবং সপ্তমলোক পাতাল তাঁর পদতলে অবস্থিত। এইভাবে ভগবানের বিরাট রূপ সমস্ত লোকে পূর্ণ।

তাৎপর্য

আধুনিক উদ্যোক্তারা (যে সমস্ত মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন) শ্রীমদ্ভাগবত থেকে মহাকাশের চতুর্দশ ভুবন সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহ করতে পারেন। ভূলোক নামক এই পৃথিবী থেকে তাঁর স্থিতি পরিগণিত হয়। ভূলোকের ঊর্ধ্বে ভুবর্লোক, তার উপর যথাক্রমে রয়েছে স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে সত্যলোক। এগুলি সপ্ত ঊর্ধ্বলোক। তেমনই সাতটি অধোলোক রয়েছে, যেগুলির নাম হচ্ছে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। এই সমস্ত লোকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যার বিস্তার হচ্ছে দুই হাজার কোটি গুণ দুই হাজার কোটি বর্গমাইল।

আধুনিক মহাকাশচারীরা কেবল পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ভ্রমণ করতে পারে, এবং তাই আকাশে তাদের ভ্রমণ করার প্রচেষ্টা অনেকটা বিশাল মহাসাগরের তীরে শিশুর খেলার মতো। চন্দ্র ঊর্ধ্বলোকের তৃতীয় স্তরে স্থিত, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ থেকে বিশাল জড় আকাশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব আমরা জানতে পারি। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছি সেটি ছাড়া আরো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, আর এই সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি, উল্লিখিত সনাতন ব্রহ্মলোক নামক চিদাকাশের কেবল একটি নগণ্য অংশ মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে ভগবদ্গীতার (৮/১৬) নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে বুদ্ধিমান মানুষদের তাদের নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন—

আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

সনাতন ব্রহ্মলোকের ঠিক নীচে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোক থেকে শুরু করে, যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে, সমস্ত লোকগুলি জড়। এই জড়লোকগুলির যে কোন একটিতে জীবের অবস্থান প্রকৃতির নিয়ম অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অধীন। কিন্তু কেউ যখন সনাতন ভগবদ্ধাম ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্বোল্লিখিত জড় ক্লেশগুলি থেকে মুক্ত হন। তাই মনোধর্মী এবং যোগীদের কল্পিত মুক্তি তখনই লাভ করা সম্ভব হয় যখন কেউ ভগবানের ভক্ত হন। যে ভগবানের ভক্ত নয়, সে কখনো ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারে না। চিন্ময় স্তরে সেবাবৃত্তি অর্জন করার ফলেই কেবল ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়। তাই প্রকৃত মুক্তি লাভের জন্য মনোধর্মী জ্ঞানী এবং যোগীদের সর্বপ্রথমে ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে।

শ্লোক ৪২

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকহস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা॥ ৪২॥

ভূর্লোকঃ—পাতাল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্তলোক; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয়েছে; **পদ্ভ্যাম্**—পদযুগলে স্থিত; **ভুবর্লোকঃ**—ভুবর্লোক; **অস্য**—ভগবানের এই বিশ্বরূপের; **নাভিতঃ**—নাভিদেশ থেকে; **স্বর্লোকঃ**—স্বর্গলোক থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বলোক সমূহ; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয়েছে; **মূর্ধ্না**—বক্ষঃস্থল থেকে মস্তক পর্যন্ত; **ইতি**—এইভাবে; **বা**—অথবা; **লোক**—লোকসমূহ; **কল্পনা**—কল্পনা।

অনুবাদ

অন্যেরা ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র লোকসমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারে। যথা, ভগবানের বিরাট রূপের পদযুগলে অবস্থিত পাতাল লোক থেকে শুরু করে এই পৃথিবী পর্যন্ত ভূর্লোক, নাভিদেশে অবস্থিত ভুবর্লোক, এবং বক্ষ থেকে শুরু করে মস্তক পর্যন্ত স্বর্গলোক নামক ঊর্ধ্বলোকসমূহ।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যেরা ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দশ ভুবন সমন্বিত বলে কল্পনা করে। এখানে তারও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইতি 'সর্বকারণের কারণ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরুষ-সূক্তের স্বীকৃতি

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ।
হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্বরসস্য চ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মাজী বললেন; **বাচাম্**—বাণীর; **বহ্নেঃ**—অগ্নির; **মুখম্**—মুখ; **ক্ষেত্রম্**—জননস্থল; **ছন্দসাম্**—গায়ত্রী আদি বৈদিক মন্ত্রের; **সপ্ত**—সাত; **ধাতবঃ**—ত্বক এবং অন্য ছটি স্তর; **হব্যকব্য**—দেবতা এবং পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু; **অমৃত**—মানুষদের আহার; **অন্নানাম্**—সর্বপ্রকার খাদ্যের; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **সর্ব**—সমস্ত; **রসস্য**—সর্বপ্রকার স্বাদের; **চ**—ও।

অনুবাদ

ব্রহ্মাজী বললেনঃ সেই বিরাট পুরুষের মুখ বাক্ ইন্দ্রিয় এবং তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির উৎপত্তি স্থান, তাঁর ত্বক আদি সপ্তধাতু গায়ত্রী আদি বেদের সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র। তাঁর জিহ্বা হব্য (দেবতাদের অন্ন), কব্য (পিতৃদের অন্ন), অমৃত (মনুষ্যদের অন্ন), মধুরাদি ষড়বিধ রসের উৎপত্তিস্থান।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের বিরাট রূপের ঐশ্বর্যের বর্ণনা হয়েছে। এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাঁর মুখ হচ্ছে সর্বপ্রকার বাণীর এবং তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নিদেবের উৎপত্তি-স্থল। ত্বক আদি তাঁর দেহের সপ্ত আবরণ গায়ত্রী আদি বেদের সপ্ত-ছন্দের উৎপত্তি-স্থল। গায়ত্রী সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের শুভারম্ভ; সেকথা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন জনন-কেন্দ্রগুলি হচ্ছে ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এবং যেহেতু ভগবানের রূপ জড় সৃষ্টির অতীত, তাই বুঝতে হবে যে বাগিন্দ্রিয়, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের অপ্রাকৃত রূপেও এগুলি রয়েছে। জড় বাগিন্দ্রিয় অথবা আহার করার ক্ষমতা, প্রকৃতপক্ষে ভগবান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষমতাগুলি সবকিছুই আদি উৎসের বিকৃত

প্রতিফলন, এবং অপ্রাকৃত জগৎ চিদ্বৈচিত্র্যরহিত নয়। জড় জগতের সমস্ত বিকৃত বৈচিত্র্য তাদের প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপে চিজ্জগতে পূর্ণরূপে বিরাজমান। তার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে জড় কার্যকলাপ প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু চিৎ জগতের সমস্ত আচরণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; কেননা সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অনন্য ভক্তিসহকারে ভগবানের সেবা করা।

চিৎজগতে পরমেশ্বর ভগবান সবকিছুর পরম ভোক্তা, এবং সেখানে সমস্ত জীব ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাদের আচরণে প্রকৃতির গুণের কলুষের লেশমাত্র নেই। চিৎজগতের কার্যকলাপ জড় জগতের উন্মত্ততা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। মায়াবাদীদের কল্পিত যে নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদ চিৎজগতে তার কোন প্রশ্নই উঠে না।

নারদ পঞ্চরাত্রে ভগবদ্ভক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।

যেহেতু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়ের উৎস ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাই জড় জগতের কামোদ্দীপক কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ করতে হয়, এবং এইভাবে আমাদের বর্তমান অবস্থার জড়জাগতিক কার্যকলাপকে পবিত্র করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা লাভ করা যায়। এই শুদ্ধিকরণের পন্থা শুরু হয় বিভিন্ন প্রকার উপাধির ধারণা থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর থেকে।

প্রতিটি জীবই তার নিজের অথবা তার পরিবারের অথবা সমাজের, দেশের ইত্যাদি কারো না কারো সেবায় সব সময় যুক্ত, কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, এই সমস্ত সেবা সম্পাদিত হয় জড় আসক্তির ফলে। ভগবানের সেবার মাধ্যমে জড় আসক্তি পরিবর্তন করা সম্ভব এবং তার ফলে আপনা থেকেই ভবরোগ নিরাময়ের চিকিৎসার শুরু হয়। তাই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন মুক্তিলাভের অন্যান্য সমস্ত পন্থা থেকে অনেক সহজ। ভগবদ্গীতায় (১২/৫) তাই বলা হয়েছে যারা অব্যক্তরূপের প্রতি আসক্ত তাদের কেবল অধিক থেকে অধিকতর ক্লেশই লাভ হয়—*ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।*

শ্লোক ২

সর্বাসূনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়ণে।
অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ ঘ্রাণো মোদপ্রমোদয়োঃ ॥ ২ ॥

সর্ব—সমস্ত; **অসূনাম্**—বিভিন্ন প্রকার প্রাণবায়ু; **চ**—এবং; **বায়োঃ**—বায়ুর; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **নাসে**—নাকে; **পরমায়ণে**—দিব্য জননকেন্দ্রে; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের; **ওষধীনাম্**—ওষধিসমূহের; **চ**—ও; **ঘ্রাণঃ**—তাঁর ঘ্রাণশক্তি; **মোদ**—আনন্দ; **প্রমোদয়োঃ**—বিশেষ ক্রীড়া।

অনুবাদ

তাঁর নাসারন্ধ্রদ্বয় সমস্ত জীবের প্রাণের ও বায়ুর উৎপত্তিস্থল, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে অশ্বিনী কুমারদ্বয় এবং সর্বপ্রকার ওষধি উৎপন্ন হয়েছে এবং শ্বাসশক্তি থেকে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দিবঃ সূর্যস্য চাক্ষিণী।
কর্ণৌ দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশশব্দয়োঃ ॥ ৩ ॥

রূপাণাম্—সর্বপ্রকার রূপের; **তেজসাম্**—সর্বপ্রকার প্রকাশমান বস্তুর; **চক্ষুঃ**—চোখ; **দিবঃ**—দেবলোকের; **সূর্যস্য**—সূর্যের; **চ**—ও; **অক্ষিণী**—অক্ষিগোলক; **কর্ণৌ**—কর্ণদ্বয়; **দিশাম্**—সমস্ত দিকসমূহের; **চ**—এবং; **তীর্থানাম্**—সমস্ত বেদের; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **আকাশ**—আকাশ; **শব্দয়োঃ**—সর্বপ্রকার শব্দের।

অনুবাদ

তাঁর নেত্র রূপসমূহের এবং রূপ প্রকাশক বস্তুসমূহের উৎপত্তিস্থল। তাঁর নেত্রগোলকদ্বয় স্বর্গ এবং সূর্যের উৎপত্তিস্থল। তাঁর কর্ণদ্বয় দিকসমূহ এবং সমস্ত বেদের উৎপত্তি স্থান, এবং তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ এবং সর্বপ্রকার শব্দের উৎপত্তিস্থল।

তাৎপর্য

তীর্থানাম্ শব্দটি কখনো কখনো তীর্থস্থানরূপে ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে তার অর্থ হচ্ছে বৈদিক দিব্য জ্ঞানের আহরণ। বৈদিক জ্ঞানের প্রচারককেও তীর্থ বলা হয়।

শ্লোক ৪

তদগাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্।
ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্বমেধস্য চৈব হি ॥ ৪ ॥

তৎ—তাঁর; **গাত্রম্**—শরীর; **বস্তুসারাণাম্**—সমস্ত বস্তুর সার; **সৌভগস্য**—সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের সুযোগ; **চ**—এবং; **ভাজনম্**—উৎপত্তিস্থল; **ত্বক্**—ত্বক্; **অস্য**—তাঁর; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **বায়োঃ**—গতিশীল বায়ুর; **চ**—ও; **সর্ব**—সর্বপ্রকার; **মেধস্য**—যজ্ঞের; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—সঠিক।

অনুবাদ

তাঁর শরীর বস্তুশক্তি সমূহের এবং সৌভাগ্যের স্থান। তাঁর ত্বক গতিশীল বায়ু, স্পর্শ এবং সর্বপ্রকার যজ্ঞের উৎপত্তিস্থল।

তাৎপর্য

বায়ু সমস্ত লোক সমূহের গতিশীল তত্ত্ব, এবং তাই ঈপ্সিতলোকে উন্নীত হওয়ার প্রকৃত উপায়। যজ্ঞসমূহ তাঁর শরীর এবং তাই স্বাভাবিকভাবে সমস্ত সৌভাগ্যের উৎস।

শ্লোক ৫

রোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্বা যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ।
কেশশ্মশ্রুনখান্যস্য শিলালোহাভ্রবিদ্যুতাম্ ॥ ৫ ॥

রোমাণি—দেহের লোম; **উদ্ভিজ্জ**—বনস্পতি; **জাতীনাম্**—জাতি সমূহের; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তু**—কিন্তু; **সম্ভৃতঃ**—বিশেষরূপে সেবিত; **কেশ**—কেশ; **শ্মশ্রু**—দাড়ি; **নখানি**—নখ সমূহ; **অস্য**—তাঁর; **শিলা**—পাথর; **লোহা**—লৌহ ধাতু; **অভ্র**—মেঘ; **বিদ্যুতাম্**—তড়িৎ।

অনুবাদ

তাঁর রোমসমূহ সমস্ত বনস্পতির উৎপত্তিস্থল। তাঁর কেশদাম ও শ্মশ্রুসমূহ মেঘসমূহের উৎপত্তি স্থান এবং তাঁর নখসমূহ বিদ্যুতের, শিলা ও ধাতুর উৎপত্তি স্থান।

তাৎপর্য

ভগবানের মসৃণ নখসমূহ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং কেশদামে মেঘ বিরাজ করে। তাই ভগবানের শরীর থেকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা যায়। তাই বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে সবকিছুই ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৬

বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্মণাম্ ॥ ৬ ॥

বাহবঃ—বাহুযুগল; **লোকপালানাম্**—লোকসমূহের অধিপতি দেবতাগণ; **প্রায়শঃ**—প্রায় সর্বদা; **ক্ষেমকর্মণাম্**—যারা জনসাধারণের নেতা এবং রক্ষক।

অনুবাদ

ভগবানের বাহুদ্বয় মহান্ দেবতা এবং জনসাধারণের রক্ষক নেতাদের উৎপত্তিস্থল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটির ভাব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১০/৪১-৪২) ব্যক্ত হয়েছে এবং সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

সমস্ত শক্তিশালী রাজা, নেতা, বিদ্বান পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, যন্ত্রবিদ্, আবিষ্কর্তা, পুরাতত্ত্ববিদ্, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ্, অর্থনীতিবিদ্, বিশাল ব্যবসায়ী, তথা ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, মরুৎ আদি শক্তিশালী দেবতা, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তিশালী অংশ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত জীবের পরম পিতা যাঁরা তাঁদের বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ এবং নিম্নপদে অধিষ্ঠিত। তাঁদের কেউ কেউ,উপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন।

প্রতিটি প্রকৃতিস্থ মানুষের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে জীব, তা সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কখনোই পরম পুরুষ নয় এবং স্বতন্ত্র নয়। সমস্ত জীবকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের বিশেষ শক্তি, যা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, তার উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তারা যদি যথাযথভাবে আচরণ করে, তাহলে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমেই কেবল তারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে, অর্থাৎ তারা নিত্য জীবন, পূর্ণজ্ঞান এবং অন্তহীন আনন্দ লাভ করতে পারবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর শক্তিশালী মানুষেরা তাদের শক্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মায়ার মোহময়ী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। মায়ার প্রভাব এমনই যে শক্তিশালী মানুষেরাও তার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্তিবশত নিজেদের সর্বেসর্বা বলে মনে করে এবং তাই ভগবচ্চেতনা বিকাশ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, অহঙ্কারের প্রভাব (আমি এবং আমার) এই পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকটিত হয়েছে, এবং মানব সমাজে তাই জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর হয়েছে। বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের তাই অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত শক্তির চরম উৎস বলে স্বীকার করা এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার জন্য তাঁর বন্দনা করা।

পরমেশ্বর ভগবানকে সবকিছুর অধীশ্বর বলে স্বীকার করার মাধ্যমে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্থান যেখানেই হোক না কেন, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা অবগত হয়ে তাঁর প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের ঈপ্সিত পরম শান্তি লাভ করতে পারবেন।

মনের শান্তি বা মনের সুস্থ অবস্থা তখনই কেবল লাভ করা যায়, যখন মন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। ভগবানের বিভিন্ন অংশ ভগবানের সেবা করার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, ঠিক যেমন বিরাট ব্যবসায়ীর পুত্রেরা তাদের পিতার কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করে। পিতার বাধ্য পুত্র কখনো পিতার ইচ্ছার বিরোধিতা করে না এবং তার ফলে সে পরিবারের অধ্যক্ষ পিতার অনুগামী হয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। তেমনই, সমস্ত জীবের কর্তব্য হচ্ছে পরমপিতা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে পিতার বিশ্বস্ত পুত্রের মতো সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করা। এই মনোভাব অচিরেই মানব সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনয়ন করবে।

শ্লোক ৭

বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ।
সর্বকামবরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্ ॥ ৭ ॥

বিক্রমঃ—পদক্ষেপ; **ভূঃ-ভুবঃ**—অধো এবং ঊর্ধ্ব লোকের; **স্বঃ**—স্বর্গলোকের; **চ**—ও; **ক্ষেমস্য**—আমাদের কাছে যা কিছু আছে তার সুরক্ষা করা; **শরণস্য**—নির্ভয়তার; **চ**—ও; **সর্বকাম**—আমাদের যা কিছু প্রয়োজন; **বরস্য**—সর্বপ্রকার বরের বা আশীর্বাদের; **অপি**—ঠিক ঠিক; **হরেঃ**—ভগবানের; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্ম; **আস্পদম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

সেই পুরুষের পদক্ষেপ ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোকের আশ্রয়। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে রক্ষা করে, সর্বপ্রকার ভয় থেকে রক্ষা করে এবং সর্ববিধ কাম ও সকল প্রকার বর আশীর্বাদের আশ্রয়স্থল।

তাৎপর্য

সর্বপ্রকার ভয় থেকে পূর্ণ সুরক্ষার জন্য এবং জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূরণের জন্য আমাদের অবশ্যই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, এবং তা কেবল এই লোকেই নয় সমস্ত ঊর্ধ্ব, অধো এবং স্বর্গলোকেও। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এই পূর্ণ শরণাগতিকে বলা হয় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি, এবং এই শ্লোকে তা সরাসরিভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে কারোরই কোনপ্রকার সংশয় পোষণ করা উচিত নয় অথবা অন্য দেবদেবীদের সাহায্যও প্রার্থনা করা উচিত নয়, কেননা তাঁরাও কেবল ভগবানের উপর নির্ভরশীল। ভগবান ব্যতীত সকলেই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। এমনকি সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মাও পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৮

অপাং বীর্যস্য সর্গস্য পর্জন্যস্য প্রজাপতেঃ ।
পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ ॥ ৮ ॥

অপাম্—জলের ; **বীর্যস্য**—বীর্যের ; **সর্গস্য**—সৃষ্টির ; **পর্জন্যস্য**—বৃষ্টির ; **প্রজাপতেঃ**—স্রষ্টার ; **পুংসঃ**—ভগবানের ; **শিশ্নঃ**—জননেন্দ্রিয় ; **উপস্থস্তু**—যে স্থানে জননেন্দ্রিয় অবস্থিত ; **প্রজাতি**—জন্ম দেওয়ার জন্য ; **আনন্দ**—আনন্দ ; **নির্বৃতেঃ**—কারণ।

অনুবাদ

ভগবানের জননেন্দ্রিয় থেকে জল, বীর্য, জনন, বৃষ্টি এবং প্রজাপতিদের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর জননেন্দ্রিয় সমস্ত সুখের কারণ যা জননের ক্লেশকে লাঘব করে।

তাৎপর্য

জননেন্দ্রিয় এবং জননের সম্ভোগ পারিবারিক ভার বহনরূপ ক্লেশের প্রতিকার করে। ভগবানের কৃপায় যদি জননেন্দ্রিয়ের উপর এক আনন্দ প্রদায়ক বস্তুর আবরণ না থাকত, তা হলে জীব সম্পূর্ণরূপে জনন কার্য থেকে বিরত হত। এই বস্তুটি এমনই এক তীব্র আনন্দ প্রদান করে, যার ফলে পারিবারিক দুঃখ-দুর্দশার ভার সম্পূর্ণরূপে প্রতিকার হয়। মানুষ এই আনন্দদায়ক বস্তুটির দ্বারা এমনই মোহিত হয় যে,কেবল একটি সন্তান লাভ করে সে সন্তুষ্ট হয় না, তাদের ভরণ পোষণের বিরাট দায়িত্ব সত্ত্বেও, কেবলমাত্র এই আনন্দ লাভের জন্য বহু সন্তান উৎপাদন করে।

এই আনন্দদায়ক বস্তুটি যেহেতু ভগবানের অপ্রাকৃত দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাই তা মিথ্যা নয়। অর্থাৎ এই আনন্দদায়ক বস্তুটি বাস্তব, কিন্তু কলুষিত জড় জগতের প্রভাবে তা এক বিকৃত রূপ গ্রহণ করেছে।

জড় জগতে, জড় বস্তুর সংসর্গের ফলে যৌন জীবন বহু দুঃখ দুর্দশার কারণ। তাই, জড় জগতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যৌন জীবন উপভোগের ব্যাপারে চেষ্টা করা উচিত নয়। জড় জগতে সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেই কার্য পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে সম্পাদন করা উচিত।

এই জড় জগতে জীবনের পারমার্থিক মূল্যায়ন কেবল মনুষ্য শরীরেই উপলব্ধি করা যায়, এবং মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক মূল্যের ভিত্তিতেই পরিবার-পরিকল্পনা করা, অন্য কোনও ভাবে নয়। গর্ভনিরোধক বস্তু ইত্যাদির দ্বারা পরিবার-নিয়ন্ত্রণ জঘন্যতম জড় কলুষ। যে সমস্ত জড়বাদী এই সমস্ত প্রক্রিয়ার উপযোগ করে, তারা পারমার্থিক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে কৃত্রিম উপায়ে জননেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়িনী আবরণের পূর্ণ উপভোগ করতে চায়। পারমার্থিক মূল্যায়নের বিষয়ে অজ্ঞ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কেবল জননেন্দ্রিয়ের সুখ উপভোগেরই চেষ্টা করে।

শ্লোক ৯

পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ।
হিংসায়ানির্ঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্য গুদং স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

পায়ুঃ—গুহ্যেন্দ্রিয়; **যমস্য**—মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা যমের; **মিত্রস্য**—মিত্রের; **পরিমোক্ষস্য**—মলত্যাগের স্থান; **নারদ**—হে নারদ; **হিংসায়াঃ**—হিংসার; **নির্ঋতেঃ**—দুর্ভাগ্যের; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **নিরয়স্য**—নরকের; **গুদম্**—পায়ু স্থান; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

হে নারদ, সেই পুরুষের গুহ্যেন্দ্রিয় হচ্ছে যম, মিত্র ও মলত্যাগের স্থান, এবং তাঁর পায়ু হিংসা, দুর্ভাগ্য, মৃত্যু এবং নরকের আশ্রয় বলে খ্যাত।

শ্লোক ১০

পরাভূতেরধর্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ।
নাড্যো নদ-নদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥ ১০ ॥

পরাভূতেঃ—পরাজয়ের; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **তমসঃ**—অজ্ঞানের; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **পশ্চিমঃ**—পৃষ্ঠদেশ; **নাড্যঃ**—অন্ত্রের; **নদ**—মহান নদী; **নদীনাম্**—নদী সমূহের; **চ**—ও; **গোত্রানাম্**—পর্বতের; **অস্থি**—অস্থি; **সংহতি**—সংকলন।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ পরাভব, অধর্ম ও অজ্ঞানের স্থান, তাঁর নাড়ীসমূহ নদ-নদীর এবং তাঁর অস্থিরাজি পর্বতসমূহের অধিষ্ঠান।

তাৎপর্য

ভগবানের নিরাকার ধারণা খণ্ডন করার জন্য এখানে ভগবানের দিব্য অঙ্গের গঠন প্রণালীর সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবানের অঙ্গের (বিশ্বরূপের) যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে ভগবানের দিব্য রূপ জড় অবস্থাগত রূপ থেকে ভিন্ন। কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাকার বা নির্বিশেষ নন। অজ্ঞানতা হচ্ছে ভগবানের পৃষ্ঠদেশ, এবং তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের অজ্ঞানতাও ভগবানের শারীরিক ধারণা থেকে পৃথক নয়। যেহেতু তাঁর অঙ্গ সমস্ত বস্তুর সমগ্র রূপ, তাই কেউই দাবী করতে পারে না যে তিনি নির্বিশেষ।

পক্ষান্তরে বলা যায় যে ভগবানের প্রকৃত বর্ণনা হচ্ছে যে তিনি একাধারে সবিশেষ এবং নির্বিশেষ। তাঁর সবিশেষ রূপ তাঁর প্রকৃত রূপ, এবং তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশ তাঁর

দিব্য শরীরের প্রতিবিম্বমাত্র। যাঁরা ভগবানকে সম্মুখ থেকে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁর সবিশেষ রূপ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা তাদের দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের অজ্ঞান পক্ষে রয়েছে, অর্থাৎ যারা পশ্চাদ্দেশ থেকে ভগবানকে দর্শন করেছে, তারা তাঁর নির্বিশেষ রূপ দর্শন করে।

শ্লোক ১১

অব্যক্তরসসিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্য চ।
উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥ ১১ ॥

অব্যক্ত—নির্বিশেষ রূপ ; **রসসিন্ধূনাম্**—সাগর এবং মহাসাগরের ; **ভূতানাম্**—যারা জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেছে ; **নিধনস্য**—সংহারের জন্য ; **চ**—ও ; **উদরম্**—তাঁর উদর ; **বিদিতম্**—বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন ; **পুংসঃ**—মহাপুরুষের ; **হৃদয়ম্**—হৃদয় ; **মনসঃ**—সূক্ষ্ম শরীর ; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের নির্বিশেষ রূপ মহাসাগর সমূহের আশ্রয়স্থল। তাঁর উদর ভৌতিক দৃষ্টিতে নিহত জীবদের আশ্রয়। তাঁর হৃদয় জীবদের সূক্ষ্ম শরীরের আলয়। বুদ্ধিমান মানুষেরা এইভাবে তাঁকে জানেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৭-১৮) বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষের গণনা অনুসারে ব্রহ্মার একদিন এক সহস্র চতুর্যুগ (১০০০ × ৪৩,০০,০০০ বৎসর) এবং তাঁর রাত্রির দৈর্ঘ্যও সমপরিমাণ। এই পরিমাণ অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু একশত বৎসর এবং তারপর ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। তারপর ব্রহ্মা, যিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ড (যা ব্রহ্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি বিশাল গোলক) ব্রহ্মার মৃত্যুর সময় লয়প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের সমস্ত জীবেরাও লয়প্রাপ্ত হয়।এই শ্লোকে উল্লিখিত *অব্যক্ত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মার রাত্রি। যখন আংশিক প্রলয় হয়, তখন মহাসাগর ইত্যাদি সহ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সেই লয়প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব বিরাট পুরুষের উদরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রহ্মার রাত্রির শেষে পুনরায় সৃষ্টি শুরু হয় এবং বিরাট পুরুষের উদরে স্থিত সমস্ত জীব সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা অবলম্বন করে। যেহেতু জীবের কখনো বিনাশ হয় না, তাই ভৌতিক জগতে প্রলয়ের পর জীবের অস্তিত্বও বিনষ্ট হয় না। কিন্তু মুক্তিলাভ করা পর্যন্ত জীবকে পুনঃ পুনঃ এক জড় দেহ থেকে আর এক জড় দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দেহান্তরিত হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় চিজ্জগতে স্থান লাভ করা।

অর্থাৎ, জীবের সূক্ষ্ম শরীর পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয়ে উৎপন্ন হয় এবং সৃষ্টির সময় তা রূপ পরিগ্রহ করে।

শ্লোক ১২

ধর্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্য চ।
বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

ধর্মস্য—ধর্মীয় অনুশাসনের বা যমরাজের ; **মম**—আমার ; **তুভ্যম্**—তোমার ; **চ**—এবং ; **কুমারাণাম্**—চার কুমারদের ; **ভবস্য**—শিবের ; **চ**—এবং ; **বিজ্ঞানস্য**—দিব্য জ্ঞানের ; **চ**—ও ; **সত্ত্বস্য**—সত্যের ; **পরস্য**—মহান পুরুষের ; **আত্মা**—চেতনা ; **পরায়ণম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

সেই মহান পুরুষের চেতনা ধর্মের, আমার, তোমার এবং সনক, সনাতন, সনৎ কুমার এবং সনন্দন, এই চার কুমারদের আশ্রয়স্থল। সেই চেতনা সত্য এবং দিব্য জ্ঞানেরও আশ্রয়।

শ্লোক ১৩-১৬

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুরনরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ ॥ ১৩ ॥

গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্যে চ বিবিধা জীবা জলস্থলনভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ১৫ ॥

সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

অহম্—আমি ; **ভবান্**—তুমি ; **ভবঃ**—শিব ; **চ**—ও ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **তে**—তারা ; **ইমে**—সমস্ত ; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ ; **অগ্রজাঃ**—তোমার পূর্বে যাদের জন্ম হয়েছে ; **সুর**—দেবতাগণ ; **অসুর**—অসুরগণ ; **নরাঃ**—মানবগণ ; **নাগাঃ**—নাগলোকের অধিবাসীগণ ; **খগাঃ**—পক্ষীগণ ; **মৃগ**—পশুগণ ; **সরীসৃপাঃ**—সরীসৃপগণ ; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ, যক্ষাঃ, রক্ষঃ, ভূতগণ-উরগাঃ, পশবঃ, পিতরঃ, সিদ্ধাঃ, বিদ্যাধ্রাঃ,চারণাঃ**—বিভিন্ন লোকের সমস্ত অধিবাসীগণ ; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষরাজি ; **অন্যে**—অন্য অনেকে ; **চ**—

ও ; **বিবিধাঃ**—বিভিন্ন প্রকারের ; **জীবাঃ**—জীবগণ ; **জল**—জল ; **স্থল**—ভূমি ; **নভ-ওকসঃ**—আকাশের অধিবাসী বা পক্ষীগণ ; **গ্রহ**—গ্রহ-নক্ষত্র ; **ঋক্ষ**—প্রভাবশালী নক্ষত্রগণ ; **কেতবঃ**—ধূমকেতুসমূহ ; **তারাঃ**—তারকাবলী ; **তড়িতঃ**—বিদ্যুৎ ; **স্তনয়িত্নবঃ**—মেঘের গর্জন ; **সর্বম্**—সবকিছু ; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **এব ইদম্**—নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত ; **ভূতম্**—সৃষ্ট ; **ভব্যম্**—যা কিছু সৃষ্টি হবে ; **ভবৎ**—এবং যা কিছু পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে ; **চ**—ও ; **যৎ**—যা কিছু ; **তেন**—তার দ্বারা ; **ইদম্**—এই সমস্ত ; **আবৃতম্**—আবৃত ; **বিশ্বম্**—বিশ্ব ; **বিতস্তিম্**—আধ হাত দীর্ঘ বা এক বিঘৎ ; **অধিতিষ্ঠতি**—অবস্থিত।

অনুবাদ

আমার (ব্রহ্মা) থেকে শুরু করে তুমি, ভব (শিব), তোমার অগ্রজ মহান ঋষিগণ, দেবতাগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ, নাগসমূহ, পক্ষীকুল, জন্তুগণ, সরীসৃপগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষসমূহ, রাক্ষসগণ, ভূতগণ, উরগ(সর্পাদি), পশুসমূহ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর গণ, চারণগণ, বৃক্ষরাজি এবং জল, স্থল ও অন্তরীক্ষচারী অন্যান্য বিবিধ প্রাণীসমূহ এবং গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারকা, তড়িৎ, মেঘমালা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যে কিছু সকলেই সেই পুরুষ। অর্থাৎ তাঁর থেকে কিছুরই ভিন্ন সত্তা নেই। যদিও তিনি এক বিঘৎ পরিমাণ (নয় ইঞ্চি) স্থানমাত্রে অধিষ্ঠিত, তথাপি তিনি এই বিশ্বকে আবৃত করে আছেন।

তাৎপর্য

আংশিক প্রকাশ পরমাত্মারূপে যাঁর আয়তন নয় ইঞ্চি থেকে অধিক নয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে বিরাটরূপে নিজেকে বিস্তার করে সজীব এবং নির্জীব বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত বস্তুকে আবৃত করে আছেন। বিভিন্ন প্রকার স্বর্ণালঙ্কার যেমন স্বর্ণরাশি থেকে ভিন্ন নয়, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৈচিত্র্য ভগবান থেকে ভিন্ন নয়।পক্ষান্তরে বলা যায় যে এই জড় জগতে সবকিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান জড় সৃষ্টির সমস্ত প্রকাশ থেকে পৃথকরূপে তাঁর পরম ভিন্ন সত্তা বজায় রাখেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৪-৫) তাই তাঁকে যোগেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সবকিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির আশ্রয়ে আশ্রিত, এবং তা সত্ত্বেও ভগবান সব কিছু থেকে ভিন্ন এবং সব কিছুর অতীত। বৈদিক *ঋগ্*-মন্ত্রের *পুরুষ-সূক্তেও* তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব* ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করে গেছেন।

ব্রহ্মা, নারদ এবং অন্য সকলে একাধারে ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। আমরা সকলেই তাঁর থেকে অভিন্ন, ঠিক যেমন গুণগত ভাবে সোনার গহনা স্বর্ণরাশি থেকে অভিন্ন, কিন্তু তা হলেও আয়তনগতভাবে একটি সোনার গহনা সমগ্র স্বর্ণরাশির সমান

নয়। অসংখ্য গহনা তৈরী হলেও স্বর্ণ রাশি কখনো শেষ হয়ে যায় না, কেননা তা হচ্ছে জাগতিক বিচারে পূর্ণ।

যদি *পূর্ণ* থেকে *পূর্ণও* নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলেও *পূর্ণই* অবশিষ্ট থাকে ; এই তত্ত্ব আমাদের বর্তমান ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের ধারণার অতীত। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এই দর্শন *অচিন্ত্য* বলে বর্ণনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* তত্ত্ব পরম সত্যের পূর্ণ নিদর্শন।

শ্লোক ১৭

স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্বহিঃ পুমান্ ॥ ১৭ ॥

স্ব-ধিষ্ণ্যম্—বিকিরণ ; **প্রতপন্**—বিস্তারের দ্বারা ; **প্রাণঃ**—প্রাণশক্তি ; **বহিঃ**— বাহ্য ; **চ**—ও ; **প্রতপতি**—আলোকিত করে ; **অসৌ**—সূর্য ; **এবম্**—এইভাবে ; **বিরাজম্**—বিশ্বরূপ ; **প্রতপন্**—বিস্তারের দ্বারা ; **তপতি**—সঞ্জীবিত করে ; **অন্তঃ**—অন্তরে ; **বহিঃ**—বাহিরে ; **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সূর্য যেমন বিকিরণের মাধ্যমে অন্তর এবং বাহির উভয়ই আলোকিত করে, তেমনই সেই পরম পুরুষ বিরাট রূপ প্রকাশ করে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং বাহিরে সবকিছু পালন করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিরাট রূপ অথবা *ব্রহ্মজ্যোতি* নামক তাঁর নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং এই প্রসঙ্গে তাঁদের সূর্যের আলোক বিকিরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যরশ্মি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচ্ছুরিত হতে পারে, কিন্তু তার উৎস হচ্ছে সূর্যমণ্ডল বা *সূর্য-নারায়ণ* নামক সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির উৎস। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবানের বিরাট রূপ ভগবানের নির্বিশেষ রূপের গৌণ কল্পনা, কিন্তু ভগবানের মুখ্য রূপ হচ্ছে দ্বিভুজ মুরলীবাদক শ্যামসুন্দর রূপ। ভগবানের প্রকাশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ (*ত্রিপাদ-বিভূতি*) চিদাকাশে প্রকাশিত হয়, আর বাকি শতকরা পঁচিশ ভাগ সমগ্র জড় জগতকে প্রকাশিত করে। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ভগবানের প্রকাশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বিস্তার হচ্ছে তাঁর *অন্তরঙ্গা শক্তি*, আর শতকরা পঁচিশ ভাগ বিস্তারকে বলা হয় তাঁর *বহিরঙ্গা শক্তি*। জড় এবং চিৎ, উভয় জগতেই অবস্থান করতে সক্ষম জীব হচ্ছে তাঁর *তটস্থা শক্তি*, এবং তারা বহিরঙ্গা অথবা অন্তরঙ্গা উভয় শক্তিতেই অবস্থান করতে

সক্ষম। যে সমস্ত জীব ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত, তাদের বলা হয় *মুক্ত-আত্মা,* আর যারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে বাস করে, তাদের বলা হয় *বদ্ধ-জীব*। আমরা জড় জগতের অধিবাসীদের গণনাপ্রসূত সংখ্যার তুলনায় চিজ্জগতের অধিবাসীদের সংখ্যা অনুমান করার মাধ্যমে সহজেই স্থির করতে পারি যে মুক্ত জীবের সংখ্যা বদ্ধ জীবদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

শ্লোক ১৮

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **অমৃতস্য**—অমরত্বের; **অভয়স্য**—নির্ভয়তার; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **মর্ত্যম্**—মরণশীল; **অন্নম্**—সকাম কর্ম; **যৎ**—যার; **অত্যগাৎ**—উত্তীর্ণ হয়েছেন; **মহিমা**—যশ; **এষঃ**—তাঁর; **ততঃ**—অতএব; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ নারদ; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **দুরত্যয়ঃ**—অসীম।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ নারদ, সেই পরমেশ্বর ভগবান অমৃত এবং অভয়ের নিয়ন্তা। তিনি মৃত্যু এবং জড় জগতের সকাম কর্মের অতীত। তাই সেই পরমেশ্বরের মহিমা অসীম।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির শতকরা পঁচাত্তর ভাগের মহিমা *পদ্ম-পুরাণে (উত্তর খণ্ড)* বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,যে চিদাকাশে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির শতকরা পঁচাত্তর ভাগে, যে সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে তা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ব্রহ্মাণ্ড সমূহের লোকগুলি থেকে অনেক অনেক বিশাল। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে একটি সরিষার বস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাতে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড এক-একটি সরিষার দানার মতো। যে ব্রহ্মাণ্ড আমরা এখন বাস করছি, তাতে যে কত লোক রয়েছে বা গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে, তা মানুষের পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়। অতএব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের, যা সরিষার একটি বস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তার গণনা করা কি করে আমাদের পক্ষে সম্ভব? আর চিদাকাশের গ্রহলোকসমূহ অন্তত‌পক্ষে জড় আকাশের থেকে তিনগুণ বেশি। সেই সমস্ত লোকগুলি চিন্ময় হওয়ার ফলে জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; তাই সেগুলি কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে রচিত হয়েছে। সেই সমস্ত লোকে চিন্ময়-আনন্দ (*ব্রহ্মানন্দ*) পূর্ণরূপে বর্তমান। সেই সব কয়টি গ্রহলোক নিত্য, অবিনাশী এবং জড় জগতের সমস্ত উন্মাদনা থেকে মুক্ত। সেখানকার প্রতিটি গ্রহলোকই স্বতঃপ্রকাশিত এবং কোটি কোটি সূর্যের থেকেও অধিক উজ্জ্বল।

সেই সমস্ত গ্রহলোকে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থেকে মুক্ত, এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। তাঁরা সকলে দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত এবং সবরকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ যিনি হচ্ছেন সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের প্রধান শ্রীবিগ্রহ, তাঁর প্রেমময়ী সেবা করা ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ নেই। সেই সমস্ত *মুক্তাত্মারা* নিরন্তর *সামবেদের* গীতসমূহ গান করেন (*বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ*)। তাঁরা সকলেই পঞ্চোপনিষদের মূর্ত বিগ্রহ। *ত্রিপাদ-বিভূতি*, যা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ, তা ভগবানের ধাম, যা জড় আকাশের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

আর আমরা যখন *একপাদ-বিভূতির* কথা বলি, যা ভগবানের শক্তির শতকরা পঁচিশ ভাগ দ্বারা রচিত যে বহিরঙ্গা শক্তি, তা হচ্ছে জড় জগৎ।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে *ত্রিপাদ-বিভূতি* সমন্বিত যে ভগবদ্ধাম তা চিন্ময়, কিন্তু *একপাদ-বিভূতি* জড় ; *ত্রিপাদ-বিভূতি* নিত্য, কিন্তু *একপাদ-বিভূতি* অনিত্য। চিজ্জগতে ভগবান এবং তাঁর নিত্য সেবকদের রূপ নিত্য, যা শুভ, অচ্যুত, চিন্ময় এবং নিত্য যৌবনসম্পন্ন। অর্থাৎ সেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই এবং ব্যাধি নেই। সেই নিত্য ধাম চিন্ময় আনন্দ এবং সৌন্দর্যে পূর্ণ। এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে, চিন্ময় প্রকৃতিকে *অমৃত* বলে বর্ণনা করার মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে।

বেদে বর্ণনা করা হয়েছে, *উতামৃতত্বস্যেশানঃ*—পরমেশ্বর ভগবান অমৃতত্বের নিয়ন্তা, অর্থাৎ ভগবান অমর, এবং যেহেতু তিনি অমরত্বের নিয়ন্তা, তাই তিনি তাঁর ভক্তদের অমরত্ব দান করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে কেউ যদি তাঁর নিত্য ধামে একবার গমন করেন, তাহলে আর তাঁকে সেখান থেকে এই ত্রিতাপ-দুঃখ সমন্বিত মর্তলোকে ফিরে আসতে হবে না। ভগবান এই জড় জগতের প্রভুর মতো নন। জড় জগতের প্রভু বা মালিক কখনো তার অধীনস্থদের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করে না ; তারা অমর নয় এবং তারা তাদের অধীনস্থদের অমরত্ব দান করতে পারে না।

কিন্তু সমস্ত জীবের নায়ক পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজের সমস্ত গুণাবলী তাঁর ভক্তদের প্রদান করেন, এমনকি তাদের অমরত্ব এবং চিন্ময় আনন্দও দান করেন। জড় জগতে সমস্ত জীবের হৃদয় সর্বদা উৎকণ্ঠা এবং ভয়ে পূর্ণ, কিন্তু ভগবান পরম অভয় বলে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরও অভয়ত্ব দান করেন।

জড় অস্তিত্ব স্বতই ভয়াবহ, কেননা সমস্ত জড় শরীরে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির প্রভাব থাকার ফলে জীবেরা সর্বদা ভয়ে ভীত থাকে। জড় জগতে কালের প্রভাব সর্বদা সবকিছুকে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় রূপান্তরিত করে, এবং জীব যদিও তার স্বরূপে *অবিকার* বা পরিবর্তনহীন, তথাপি কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে নানারকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

কিন্তু শাশ্বত কালের পরিবর্তনশীল প্রভাব ভগবদ্ধামে অনুপস্থিত, তাই বুঝতে হবে যে সেখানে কালের কোন প্রভাব নেই, যার ফলে সেখানে কোন প্রকার ভয়ের লেশমাত্রও নেই। জড় জগতে তথাকথিত সুখ জীবের স্বীয় কর্মের ফল। কঠোর পরিশ্রম করার ফলে কেউ প্রভূত ধন সংগ্রহ করতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও সর্বদা তার ভয় এবং আশঙ্কা থাকে যে কতদিন তার সেই সুখ স্থায়ী হবে।

কিন্তু ভগবদ্ধামে আনন্দলাভের জন্য কাউকে কোন রকম প্রয়াস করতে হয় না। আনন্দ হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, সে সম্বন্ধে *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*—আত্মা স্বভাবতই আনন্দময়। চিজ্জগতে আত্মার এই আনন্দ সর্বদাই বর্ধিত হয় এবং সেখানে আনন্দের হ্রাস পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এইপ্রকার অনাবিল আনন্দ এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এমনকি জনলোক, মহর্লোক বা সত্যলোকেও পাওয়া যায় না, কেননা ব্রহ্মাও কর্ম এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন। তাই এখানে *দুরত্যয়ঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভগবানের নিত্য ধামের চিন্ময় আনন্দ মহান ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী, যাঁরা স্বর্গলোকেরও ঊর্ধ্বে যেতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন না। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা এমনই অসীম যে তা মহান ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন না, কিন্তু ভগবানের অনন্য ভক্ত ভগবানের কৃপায় যথাযথভাবে সেই আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু ॥ ১৯ ॥

পাদেষু—এক-চতুর্থাংশে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **পুংসঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **স্থিতিপদঃ**—সমস্ত জড় ঐশ্বর্যের উৎস; **বিদুঃ**—তোমার জানা উচিত; **অমৃতম্**—অমৃতত্ব; **ক্ষেমম্**—জরা, ব্যাধি ইত্যাদি উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত সমগ্র সুখ; **অভয়ম্**—নির্ভয়তা; **ত্রি-মূর্ধ্নঃ**—তিন উচ্চতর লোকের অতীত; **অধায়ি**—বিদ্যমান; **মূর্ধসু**—জড় আবরণের অতীত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক-চতুর্থাংশের দ্বারা এই জড় জগৎ প্রকাশ করেছেন, যেখানে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা বিরাজ করে। কিন্তু তিনটি উচ্চতর লোকের এবং জড় জগতের আবরণের ঊর্ধ্বে স্থিত ভগবদ্ধাম অমরতা, নির্ভয়তা এবং জরা ও ব্যাধির উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত নিত্য নিবাস।

তাৎপর্য

ভগবানের *সন্ধিনী-শক্তির* এক-চতুর্থাংশ জড় জগৎরূপে প্রদর্শিত হয়, আর তিন-চতুর্থাংশ চিজ্জগতে প্রকাশিত হয়। ভগবানের শক্তির তিনটি অঙ্গ হচ্ছে সন্ধিনী,

সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী । অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দের মূর্ত প্রকাশ। জড় জগতে এই সৎ, চিদ্ এবং আনন্দ অতি অল্প পরিমাণে প্রদর্শিত হয়, এবং সমস্ত জীব, যারা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্নাংশ, মুক্ত অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে এই সৎ, চিদ্ এবং আনন্দের অনুভূতি আস্বাদন করতে পারে; কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় যথাযথভাবে এই সৎ, চিৎ এবং শুদ্ধ আনন্দ তাদের পক্ষে আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

মুক্ত-আত্মারা, যাঁদের সংখ্যা জড় জগতের বদ্ধ জীবদের থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক, তাঁরা বাস্তবিকভাবে অমরত্ব, অভয়ত্ব লাভ করার মাধ্যমে এবং জরা ও ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ভগবানের সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী শক্তি যথাযথভাবে আস্বাদন করেন।

জড় জগতের গ্রহলোক সমূহ ত্রিলোক বা স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল, এই তিনটি স্তরে অবস্থিত ; এবং সমগ্র জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের সন্ধিনী শক্তির এক-চতুর্থাংশ। তার ঊর্ধ্বে, প্রকৃতির সপ্ত আবরণের অতীত চিদাকাশ, যেখানে অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। ত্রিলোকের অন্তর্গত কেউই অমরত্ব, পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারে না। ঊর্ধ্বতন তিনটি গ্রহলোককে বলা হয় *সাত্ত্বিক লোক,* কেননা সেখানে দীর্ঘ আয়ু, জরা ও ব্যাধির থেকে আপেক্ষিক মুক্তি এবং নির্ভয়তা লাভ হয়।

মহান ঋষি এবং মহাত্মারা স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে মহর্লোকে উন্নীত হন ; কিন্তু সেখানেও সম্পূর্ণরূপে নির্ভয়তা লাভ হয় না, কেননা কল্পান্তে মহর্লোকও বিনষ্ট হয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা তখন তার থেকেও উচ্চতর লোকে স্থানান্তরিত হন। এই সমস্ত গ্রহলোকেও কেউই মৃত্যুর অতীত নয়। সেখানে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ আয়ু লাভ হতে পারে, জ্ঞান বৃদ্ধি হতে পারে এবং আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অমরত্ব, নির্ভয়তা এবং জরা, ব্যাধি ইত্যাদি থেকে মুক্তি কেবল জড় জগতের অতীত চিদাকাশেই সম্ভব। এই সমস্ত বস্তু জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত (*অধায়ি মূর্ধসু*)।

শ্লোক ২০

পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদব্রতঃ ॥ ২০ ॥

পাদাঃ-ত্রয়ঃ—ভগবানের ত্রিপাদ-বিভূতি সমন্বিত জগৎ; **বহিঃ**—বাহিরে অবস্থিত; **চ**—তথা; **আসন**—ছিল; **অপ্রজানাম্**—যাদের পুনর্জন্ম হয় না; **যে**—যারা; **আশ্রমাঃ**—জীবনের অবস্থা ; **অন্তঃ**—ভিতরে ; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের ; **তু**—কিন্তু ; **অপরঃ**—অন্য ; **গৃহমেধঃ**—পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত ; **অবৃহৎ-ব্রতঃ**—কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন না করে।

অনুবাদ

চিজ্জগত, যা ভগবানের শক্তির তিন-চতুর্থাংশ, তা জড় জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং সেই স্থান তাদের জন্য যাদের কখনো পুনর্জন্ম হবে না। আর যারা সংসার-জীবনের

প্রতি আসক্ত এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে না, তাদের জড় জগতের ত্রিলোকের মধ্যেই থাকতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে *বর্ণাশ্রম-ধর্ম* বা *সনাতন-ধর্মের* চরম লক্ষ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানব জীবনের সর্বোচ্চ লাভ হচ্ছে যৌন-জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করা, কেননা মৈথুনের প্রতি আসক্তির ফলে জন্ম-জন্মান্তরে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়।

যে সভ্যতা মানুষকে যৌন-জীবন নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয় না, তা নিকৃষ্টতম সভ্যতা। কেননা সেই পরিবেশে জড় দেহের বন্ধন থেকে আত্মার কখনো মুক্তি লাভ সম্ভব হয় না।

জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি জড় দেহের সঙ্গেই কেবল সম্পর্কিত, তাদের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-সুখভোগের দৈহিক আসক্তি বর্তমান থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা জড় দেহে জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে বাধ্য হয়। জড় দেহকে বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যা কালক্রমে জীর্ণ হয়ে যায়।

মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ লাভ প্রদান করার জন্য *বর্ণাশ্রম* প্রথায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনের শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারী জীবন ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট, যাদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালনের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

যে সমস্ত নব যুবক কখনো যৌন-জীবনের স্বাদ আস্বাদন করেনি, তারা অনায়াসে ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করতে পারে, এবং একবার এই আশ্রমে স্থির হলে তখন তার পক্ষে সর্বোচ্চ সিদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের তিন-চতুর্থাংশ শক্তি সমন্বিত চিজ্জগতে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভগবানের *ত্রিপাদ-বিভূতি* সমন্বিত গ্রহলোকে মৃত্যু নেই, ভয় নেই, এবং তা নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়। যদি গৃহস্থ ব্রহ্মচারী জীবনের শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে বৈষয়িক জীবন পরিত্যাগ করতে পারেন।

গৃহস্থদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে বনে গমনপূর্বক বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করতে (*পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*)। তারপর পরিবারের প্রতি আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হলে তখন তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন।

যে ধর্মে মানুষকে ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করার শিক্ষা দেওয়া হয়, তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর; কেননা সেই শিক্ষা লাভ করার ফলেই কেবল জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেব যে নির্বাণের কথা বলেছেন তারও অর্থ হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জীবনের সমাপ্তি। আর সেই বিধি সর্বোৎকৃষ্টরূপে এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা

হয়েছে, যদিও এই বিষয়ে বৌদ্ধ, শঙ্করবাদী এবং বৈষ্ণব বিধির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সিদ্ধির চরম অবস্থায় উন্নীত হতে হলে, অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, উৎকণ্ঠা এবং ভয়ের থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে এই বিধিগুলির কোনটিতেই অনুসরণকারীকে ব্রহ্মচর্য-ব্রত ভঙ্গ করতে দেওয়া হয় না।

গৃহমেধীরা এবং যে সমস্ত ব্যক্তিরা জ্ঞাতসারে ব্রহ্মচর্যের ব্রত ভঙ্গ করেছে, তারা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারে না। পুণ্যবান গৃহস্থ অথবা ভ্রষ্টযোগী বা পতিত অধ্যাত্মবাদী এই জড় জগতের (ভগবানের *একপাদ-বিভূতি*) উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু তারা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারবে না। *অবৃহদ্বত* হচ্ছে তারা, যারা ব্রহ্মচর্যের ব্রত ভঙ্গ করেছে। *বানপ্রস্থী* বা যাঁরা সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, ও *সন্ন্যাসী* বা যাঁরা ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যদি সেই বিধিতে সফলতা লাভ করতে চান, তাহলে কখনো এই ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ করতে পারবেন না।

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে চান না (*অপ্রজ*), এবং তাঁদের পক্ষে কখনোই গোপনে যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁদের যদি এই প্রকার অধঃপতন হয়, তাহলে তাঁরা পুনরায় বিদ্বান ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার আর একটি সুযোগ পেলেও পেতে পারেন, তবে মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই অমৃতত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করাই শ্রেয়স্কর ; তা না হলে মানব জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগামীদের ব্রহ্মচর্য পালনের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর এক সেবক ছোট হরিদাস ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন না করতে পারার ফলে তিনি তাকে কঠোর দণ্ড দিয়েছিলেন। তাই যে পরমার্থবাদী জড় দুঃখ-দুর্দশার অতীত পরলোকে উন্নীত হতে চান, তাঁর পক্ষে জেনেশুনে যৌন-জীবনে লিপ্ত হওয়া আত্মহত্যার থেকেও ক্ষতিকর, বিশেষ করে সন্ন্যাস আশ্রমীদের।

সন্ন্যাস আশ্রমে থেকে যৌন-জীবনে লিপ্ত হওয়া ধার্মিক জীবনের সবচাইতে বিকৃত রূপ, এবং এই প্রকার ভ্রষ্টাচারী ব্যক্তির রক্ষা তখনই সম্ভব, যদি তিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন শুদ্ধ ভক্তের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

শ্লোক ২১

সৃতী বিচক্রমে বিশ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

সৃতী—জীবের গতি ; **বিচক্রমে**—উপলব্ধি সহকারে বিরাজ করে ; **বিশ্বঙ্**— সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান ; **সাশন**—প্রভুত্ব করার কার্যকলাপ ; **অনশনে**—ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ ; **উভে**—উভয় ; **যৎ**—যা ; **অবিদ্যা**—অজ্ঞান ; **চ**—ও ; **বিদ্যা**—বাস্তবিক জ্ঞান ; **চ**—এবং ; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ ; **তু**—কিন্তু ; **উভয়**—তাদের উভয়ের জন্য ; **আশ্রয়ঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে, যারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায় এবং যারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, উভয়েরই পরম নিয়ন্তা। তিনি সর্বাবস্থাতেই অজ্ঞান এবং বাস্তবিক জ্ঞান উভয়েরই পরম প্রভু।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিশ্বঙ্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি কার্যের সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্ণ দক্ষতা সহকারে বিচরণ করেন, তাঁকে বলা হয় *পুরুষ* বা *ক্ষেত্রজ্ঞ*। এই দুটি শব্দ, *ক্ষেত্রজ্ঞ* এবং *পুরুষ,* আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥

ক্ষেত্র মানে হচ্ছে স্থান, এবং যিনি সেই স্থানটি সম্বন্ধে জানেন, তাঁকে বলা হয় *ক্ষেত্রজ্ঞ*। আত্মা তাঁর সীমিত কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অবগত, কিন্তু পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান অন্তহীন কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অবগত। আত্মা কেবল তাঁর নিজের চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা সম্বন্ধে জানে, কিন্তু পরমাত্মা বা পরম নিয়ন্তা সর্বত্র উপস্থিত থাকার ফলে সকলের চিন্তা, অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষার কথা জানেন। আর জীব হচ্ছে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্ষুদ্র প্রভু, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ব্যাপারের প্রভু (*বেদাহং সমতীতানি*), ইত্যাদি। মূর্খ ব্যক্তিরাই কেবল জীবাত্মা এবং ভগবানের এই পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত নয়। জীব অচেতন জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে গুণগতভাবে চৈতন্য-স্বরূপ ভগবানের সঙ্গে এক হতে পারে, কিন্তু জীব কখনো অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না।

জীব যেহেতু আংশিকভাবে চেতন, তাই সে কখনো কখনো তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। এই বিস্মৃতি ভগবানের *একপাদ-বিভূতি* বা জড় জগতে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু *ত্রিপাদ-বিভূতি* বা চিজ্জগতে জীবের বিস্মৃতি নেই, এবং সেখানে বিস্মৃতিজনিত কলুষতা থেকে জীবেরা সর্বতোভাবে মুক্ত।

জড় দেহ স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিস্মৃতির প্রতীক ; তাই জড় জগতকে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান, কিন্তু চিজ্জগতকে বলা হয় বিদ্যা বা পূর্ণজ্ঞান। অবিদ্যার বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এবং তাদের বলা হয় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি বা মোক্ষের যে ধারণা অদ্বৈতবাদীরা পোষণ করে, তা হচ্ছে জড়বাদ বা অবিদ্যার চরম অবস্থা।

গুণগতভাবে আত্মা এবং পরমাত্মার এক হওয়ার যে জ্ঞান তা হচ্ছে আংশিক জ্ঞান এবং আংশিক অজ্ঞানও, কেননা পরিমাণগতভাবে ভিন্ন হওয়ার জ্ঞান তাদের নেই, যা

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জীবাত্মা কখনো জ্ঞানের বিষয়ে ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না ; তা হলে সে কখনো বিস্মৃতির কবলগ্রস্ত হত না।

জীব যেহেতু অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে, তাই জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, ঠিক যেমন অংশ এবং পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অংশ কখনোই পূর্ণের সমান নয়। তাই ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে সমান হওয়ার যে ধারণা তাও অজ্ঞান।

অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে যে কার্যকলাপ তা জড় সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত। জড় জগতে তাই সকলেই জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার জন্য জড় ঐশ্বর্য আহরণ করার কার্যে ব্যস্ত। তাই সর্বদা সংঘাত এবং নৈরাশ্য দেখা যায়, যা হচ্ছে অজ্ঞানতার লক্ষণ। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবল ভগবানের সেবা করার কার্য (ভক্তি), তাই সেখানে ভগবদ্ভক্তিযুক্ত কার্যকলাপের মুক্ত স্তরে কখনো অজ্ঞান বা অবিদ্যার দ্বারা কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে ভগবান হচ্ছেন অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয় ক্ষেত্রেরই প্রভু, এবং জীবের স্বতন্ত্র রুচির উপর নির্ভর করে সে এই দুটি স্থানের কোন্‌টিতে অবস্থান করবে।

শ্লোক ২২

যস্মাদণ্ডং বিরাড় জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ।
তদ্‌দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য ইবাতপন্ ॥ ২২ ॥

যস্মাৎ—যাঁর থেকে ; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **বিরাট্**—এবং বিরাট রূপ ; **জজ্ঞে**—প্রকট হয়েছেন ; **ভূত**—উপাদানসমূহ ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **গুণাত্মকঃ**—গুণাত্মক ; **তৎ-দ্রব্যম্**—ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরাটরূপ ইত্যাদি ; **অত্যগাৎ**—অতিক্রম করেছে ; **বিশ্বম্**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ; **গোভিঃ**—কিরণের দ্বারা ; **সূর্যঃ**—সূর্য ; **ইব**—মতো ; **আতপন্**—কিরণ এবং তাপ বিতরণ করেছে।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং জড় উপাদান, গুণ এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত বিরাটরূপ উদ্ভূত হয়েছে। তথাপি তিনি এই সমস্ত জড় প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণ এবং তাপ থেকে ভিন্ন থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পরম সত্যকে *পুরুষ* বা *পুরুষোত্তম* বলা হয়েছে। পরম পুরুষ হচ্ছেন, তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে, *ঈশ্বর* বা পরম নিয়ন্তা। ভগবানের *একপাদ-বিভূতি* জড়া-প্রকৃতি ভগবানের বহু দাসীদের মধ্যে অন্যতম, যার প্রতি ভগবান ততটা আকৃষ্ট নন যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আলোচনা করা হয়েছে (*ভিন্না প্রকৃতিঃ*) । কিন্তু

ভগবানের *ত্রিপাদ-বিভূতি*, তাঁর শক্তির শুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশ হওয়ার ফলে, তাঁর কাছে অধিক আকর্ষণীয়। ভগবান জড়া প্রকৃতিতে গর্ভসঞ্চার করে জড় জগতকে প্রকাশিত করে তারপর সেই প্রকাশের মধ্যে বিশ্বরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। অর্জুনকে তিনি যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তা ভগবানের প্রকৃত রূপ নয়। ভগবানের প্রকৃত রূপ হচ্ছে চিন্ময় পুরুষোত্তম বা স্বয়ং কৃষ্ণরূপ।

এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে তিনি নিজেকে ঠিক সূর্যের মতো বিস্তার করেন। সূর্য তাঁর প্রচণ্ড তাপ এবং কিরণের দ্বারা নিজেকে বিস্তার করেন, তথাপি সূর্য সেই কিরণ এবং তাপ থেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র থাকেন। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার চিন্তায় মগ্ন থাকে, কিন্তু ভগবানের সৎ, চিৎ, আনন্দময় রূপ সম্বন্ধে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত, তাদের কোন ধারণাই নেই। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের পরম সবিশেষ রূপ নির্বিশেষবাদীদের বিভ্রান্ত করে। তারা কেবল ভগবানের বিরাট রূপকেই মেনে নিতে পারে। তাদের জানা উচিত যে সূর্যের কিরণ সূর্যের গৌণ প্রকাশ, এবং তেমনই ভগবানের নির্বিশেষ বিরাটরূপ ভগবানের সবিশেষ পুরুষোত্তম রূপের থেকে গৌণ। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৭) এই তত্ত্বটি প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়াকলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"পরমেশ্বর ভগবান, গোবিন্দ, যিনি তাঁর সবিশেষ রূপের কিরণের দ্বারা সকলের ইন্দ্রিয়সমূহকে উজ্জীবিত করেন, তিনি গোলোক নামক তাঁর স্বীয় অপ্রাকৃত ধামে সর্বদা বিরাজ করেন। তথাপি তিনি তাঁর হ্লাদিনী-শক্তির তুল্য আনন্দময় দিব্য কিরণের প্রসারের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান।" তাই তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিশেষ, বা তিনি জড় এবং চেতন জগতে বিচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ ঐক্যপ্রদর্শনকারী অদ্বিতীয় পরম পুরুষ। তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন, তথাপি কোন কিছু তাঁর থেকে পৃথক নয়।

শ্লোক ২৩

যদাস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞ সম্ভারান্ পুরুষাবয়বানৃতে॥ ২৩॥

যদা—যখন; অস্য—তাঁর; নাভ্যাৎ—নাভি থেকে; **নলিনাৎ**—পদ্ম থেকে; **অহম্**—আমি; **আসম্**—জন্মগ্রহণ করেছিলাম; **মহাত্মনঃ**—মহাপুরুষের; **ন-অবিদম্**—

জানতাম না; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **সম্ভারান্**—সামগ্রী; **পুরুষ**—ভগবানের; **অবয়বান্**—শরীরের অঙ্গ; **ঋতে**—ব্যতীত।

অনুবাদ

আমি যখন মহাপুরুষের (মহা বিষ্ণু) নাভি পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন আমার কাছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই মহাপুরুষের অবয়ব ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রী ছিল না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূ নামে পরিচিত, অর্থাৎ তিনি পিতা-মাতা ব্যতীতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সঙ্গমের ফলে জীবের জন্ম হয়, কিন্তু প্রথম সৃষ্ট জীব, ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের অংশ অবতার মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাবিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত সেই পদ্মটি তাঁর শরীরের একটি অঙ্গ, এবং সেই নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রহ্মাও ভগবানের শরীরের একটি অঙ্গ। ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শূন্যে আবির্ভূত হওয়ার পর ব্রহ্মা অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু দেখতে পাননি। তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন, এবং তাঁর হৃদয় থেকে ভগবান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তপস্যা করার জন্য, এবং তার ফলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সামগ্রীসমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন মহাবিষ্ণু এবং ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের দেহ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নানাপ্রকার সামগ্রীর প্রয়োজন, বিশেষ করে পশু। যজ্ঞে পশু উৎসর্গ করার অর্থ পশু হত্যা করা নয়, পক্ষান্তরে যজ্ঞের সাফল্য লাভের জন্য। যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গীকৃত পশু যদিও বিনষ্ট হয়, কিন্তু পর মুহূর্তে দক্ষ পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের ফলে তা নবজীবন লাভ করে এই প্রকার সুদক্ষ পুরোহিত না থাকলে যজ্ঞাগ্নিতে পশু উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ।

এইভাবে ব্রহ্মা যজ্ঞের সামগ্রীসমূহ গর্ভোদক্‌শায়ী বিষ্ণুর অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাই এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি করা যায় না, প্রকৃতপক্ষে সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের শরীর থেকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৮) ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*। "সবকিছুই আমার অঙ্গ থেকে নির্মিত, তাই আমি সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস।"

নির্বিশেষবাদীরা তর্ক করে যে সবকিছুই যেহেতু ভগবানের অতিরিক্ত আর কিছু নয়, তাই ভগবানের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সবিশেষবাদীরা ভগবানের শরীরের অঙ্গ থেকে উদ্ভূত সমস্ত সামগ্রীর যথাযথ সদ্ব্যবহার করে, তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে ভগবানের আরাধনা করেন। ফল এবং ফুল পৃথিবীর শরীর থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি বুদ্ধিমান ভক্তরা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর দ্বারা

মাতা ধরিত্রীর পূজা করেন। তেমনই, যদিও গঙ্গা জলের দ্বারা মা গঙ্গার পূজা হয়, তথাপি পূজক সেই পূজার ফল লাভ করেন। ভগবানের পূজাও ভগবানের দেহ থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি পূজক, যিনি ভগবানেরই অংশ, ভগবদ্ভক্তির ফল লাভ করেন। নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তিবশত সিদ্ধান্ত করে যে তারাই হচ্ছে ভগবান, কিন্তু সবিশেষবাদীরা ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতাবশত ভক্তিসহকারে ভগবানের আরাধনা করেন, যদিও তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে কোন কিছুই ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। ভগবদ্ভক্ত সবকিছুই ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেন, কেননা তিনি জানেন যে সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি এবং কোন কিছুর উপরই কেউ তার মালিকানা দাবী করতে পারে না। এই শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান ভগবদ্ভক্তকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা মিথ্যা অহঙ্কারের গর্বে গর্বিত হয়ে চিরকাল অভক্তই থেকে যায়, এবং ভগবান কখনো তাদের গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ২৪

তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ।
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥

তেষু—এই প্রকার যজ্ঞে; **যজ্ঞস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের; **পশবঃ**—পশু বা উৎসর্গের সামগ্রী; **স-বনস্পতয় ঃ**—পুষ্প এবং পত্র সহ; **কুশাঃ**—কুশঘাস; **ইদম্**—এই সমস্ত; **চ**—ও; **দেবযজনম্**—যজ্ঞ বেদী; **কালঃ**—উপযুক্ত সময়; **চ**—ও; **উরু**—মহান; **গুণ-অন্বিতঃ**—গুণসম্পন্ন।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যথোপযুক্ত কালসহ (বসন্ত) পুষ্প, পত্র, কুশ ও যজ্ঞভূমি—এই সমস্ত যজ্ঞ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়।

শ্লোক ২৫

বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহা রসলোহমৃদো জলম্।
ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২৫ ॥

বস্তূনি—পাত্র; **ওষধয়ঃ**—শস্য; **স্নেহাঃ**—ঘৃত; **রস-লোহ-মৃদঃ**—মধু, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা; **জলম্**—জল; **ঋচঃ**—ঋগ্বেদ; **যজূংষি**—যজুর্বেদ; **সামানি**—সামবেদ; **চাতুর্হোত্রম্**—যজ্ঞ সম্পাদনকারী চারজন পুরোহিত; **চ**—সবকিছুর; **সত্তম**—হে পরম পুণ্যবান।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অন্য সমস্ত উপকরণগুলি হচ্ছে পাত্র, শস্য, ঘৃত, মধু, স্বর্ণ, মৃত্তিকা, জল, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং যজ্ঞ সম্পাদনকারী চারজন পুরোহিত।

তাৎপর্য

যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য কমপক্ষে চার জন সুদক্ষ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়—হোতা, যিনি আহুতি প্রদান করেন, উদ্‌গাতা, যিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেন, অধ্বর্যু, যিনি পৃথক অগ্নির সাহায্য ব্যতীত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ব্রহ্মা, যিনি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রথম সৃষ্ট জীব, ব্রহ্মার জন্মের সময় থেকে এই প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কলহ এবং ভ্রষ্টাচারের যুগে এই প্রকার সুদক্ষ ব্রাহ্মণ পুরোহিত অত্যন্ত দুর্লভ, এবং তাই এই যুগে কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্লোক ২৬

নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥ ২৬ ॥

নামধেয়ানি—দেবতাদের নাম উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁদের আহ্বান করা ; **মন্ত্রাঃ**—বিশেষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত মন্ত্র ; **চ**—ও ; **দক্ষিণাঃ**—দক্ষিণা ; **চ**—এবং ; **ব্রতানি**—ব্রত ; **চ**—এবং ; **দেবতা-অনুক্রমঃ**—একে একে বিভিন্ন দেবতাদের ; **কল্পঃ**—বিশেষ শাস্ত্র গ্রন্থ ; **সংকল্পঃ**—বিশেষ সংকল্প ; **তন্ত্রম্**—বিশিষ্ট-বিধি ; **এব**—এই প্রকার ; **চ**—ও।

অনুবাদ

যজ্ঞের অন্যান্য প্রয়োজনগুলি হচ্ছে বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট মন্ত্র, ব্রত এবং দক্ষিণার দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের আহ্বান করা। এই আহ্বান বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং বিশিষ্ট বিধির দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, এবংএই প্রকার কর্ম অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। তা প্রধানত নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করার পদ্ধতির উপর। এটি একটি মহান বিজ্ঞান, এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে গত চার হাজার বছর ধরে যথাযথভাবে তা ব্যবহার হয়নি বলে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান এখন আর ফলপ্রসূ হয় না ; এবং এই অধঃপতিত যুগে তা অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এই যুগে লোক দেখানোর জন্য অনুষ্ঠিত এইপ্রকার যজ্ঞ চতুর পুরোহিতদের প্রতারণা মাত্র। এইপ্রকার লোক দেখানো যজ্ঞ কোন অবস্থাতেই কার্যকরী হয় না। জড়

বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং স্বল্প পরিমাণে স্থূল জড় উপায়ে যদিও আজকাল সকাম কর্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তথাপি জড়বাদীরা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করার সূক্ষ্মতর প্রগতির প্রতীক্ষা করছে, যা হচ্ছে বৈদিক মন্ত্রের ভিত্তি। স্থূল জড় বিজ্ঞান মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে না। তারা কেবল জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধান না করে কৃত্রিমভাবে জীবনের আবশ্যকতাগুলি কেবল বৃদ্ধি করতে পারে ; তাই জড়জাগতিক জীবন মানব সভ্যতাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। যেহেতু জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি করা, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক বিশেষভাবে নির্দেশিত ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে সরাসরিভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করার পন্থাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই যুগের মানুষেরা অনায়াসে এই অতি সরল পন্থাটির সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন যা এই জটিল সমাজ-ব্যবস্থার অত্যন্ত উপযুক্ত।

শ্লোক ২৭

গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ২৭ ॥

গতয়ঃ—চরম লক্ষ্য শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অগ্রসর ; **মতয়ঃ**—দেবদেবীর পূজা ; **চ**—ও ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রায়শ্চিত্ত ; **সমর্পণম্**—চরম নিবেদন ; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **অবয়বৈঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অঙ্গ থেকে ; **এতে**—এই সমস্ত ; **সম্ভারাঃ**—সামগ্রীসমূহ ; **সম্ভৃতা**—আয়োজিত হয়েছে ; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ থেকে আমি যজ্ঞের এই সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ক্রমশঃ চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করা যায়, এবং এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত এবং চরম আহুতি পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন সবকিছুর উৎস, তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি নয়। পরমেশ্বর ভগবান, নারায়ণ যজ্ঞের চরম লক্ষ্য, এবং তাই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া। এইভাবে নারায়ণের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণের সান্নিধ্য লাভ করাই হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা।

শ্লোক ২৮

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবায়জমীশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **সম্ভৃত**—সম্পাদিত; **সম্ভারঃ**—যথাযথভাবে সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করে; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অবয়বৈঃ**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **তমেব**—তাঁকে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ্ঞম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **তেন এব**—সেগুলির দ্বারা; **অয়জম্**—আরাধনা করেছিলাম; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

এইভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অঙ্গ থেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত সামগ্রী এবং সম্ভার সৃষ্টি করে তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ সর্বদাই মনের শান্তি বা বিশ্বশান্তির জন্য উৎকণ্ঠিত, কিন্তু তারা জানে না বিশেষ এই শান্তি কিভাবে লাভ করা যায়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং তপশ্চর্যার মাধ্যমেই কেবল এই শান্তি লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) নিম্নলিখিত পদ্ধতিটির অনুমোদন করা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"কর্মযোগীরা জানেন যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ এবং তপশ্চর্যার প্রকৃত ভোক্তা এবং পালক। তাঁরা জানেন যে ভগবান হচ্ছেন এই জগতের সবকিছুর পরম অধীশ্বর এবং সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ। এই জ্ঞান ধীরে ধীরে কর্মযোগীকে অনন্য ভক্তের সঙ্গের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করে এবং তার ফলে তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন।"

ব্রহ্মা, এই জড় জগতের আদি জীব, আমাদের যজ্ঞের বিধি শিক্ষা দিয়েছেন। 'যজ্ঞ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে অন্যের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ। সমস্ত কার্যেরই এই বিধি। প্রতিটি মানুষই অন্যের জন্য নিজের স্বার্থ উৎসর্গ করে, হয় পরিবারের জন্য নয়ত সমাজের জন্য, কিংবা সম্প্রদায়ের জন্য বা দেশের জন্য অথবা সমগ্র মানব সমাজের জন্য। কিন্তু এই উৎসর্গ তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যখন তা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর অধীশ্বর, সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ্ এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর পালক ও যজ্ঞের সমস্ত উপাদান সরবরাহকারী, তাই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা উচিত, অন্য কারো নয়।

সারা বিশ্ব বিদ্যা অর্জন, সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য শক্তি উৎসর্গ করছে, কিন্তু কেউই ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে আগ্রহী

নয়। মানুষ যদি প্রকৃত বিশ্বের শান্তি চায়, তা হলে তাদের অবশ্যই পরম ঈশ্বর এবং সকলের পরম বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হবে।

শ্লোক ২৯

ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব।
অয়জন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **তে**—তোমার; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **ইমে**—এই সমস্ত; **প্রজানাম্**—প্রাণীদের; **পতয়ঃ**—প্রভুগণ; **নব**—নয়; **অয়জন্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ব্যক্তম্**—প্রকাশিত; **অব্যক্তম্**—অপ্রকাশিত; **পুরুষম্**—ব্যক্তিদের; **সুসমাহিতাঃ**—যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে পুত্র! তারপর তোমার নয়জন ভ্রাতা, যারা হচ্ছে প্রজাপতি, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুইপ্রকার পুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিল।

তাৎপর্য

ব্যক্ত পুরুষেরা হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁর পার্ষদ দেবতাগণ; আর অব্যক্ত পুরুষ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ব্যক্ত পুরুষেরা জড়জাগতিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক, কিন্তু অব্যক্ত ভগবান জড়া প্রকৃতির অতীত *অধোক্ষজ*। কলিযুগে ব্যক্ত দেবতাদেরও দেখা যায় না, কেননা অন্তরীক্ষ ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই শক্তিশালী দেবতা ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই আধুনিক যুগের মানুষের দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছেন। আধুনিক যুগের মানুষেরা সবকিছুই তাদের চোখের দ্বারা দর্শন করতে চায়, যদিও তাদের যথেষ্ট যোগ্যতা নেই। তার ফলে তারা দেবতা বা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তাদের কর্তব্য হচ্ছে কেবল তাদের অযোগ্য দৃষ্টিশক্তির উপর বিশ্বাস না করে প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে দর্শন করা। ভগবানকে আজও প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত দৃষ্টির মাধ্যমে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৩০

ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—ও; **মনবঃ**— মানবজাতির পিতা মনুগণ, **কালে**—যথাসময়ে; **ঈজিরে**—পূজা করেছিলেন; **ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অপরে**—অন্যেরা; **পিতরঃ**—

পিতৃগণ; **বিবুধাঃ**—বিদ্বান পণ্ডিতগণ; **দৈত্যাঃ**—দেবতাদের মহান ভক্তগণ; **মনুষ্যাঃ**—মানুষগণ; **ক্রতুভির্বিভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর মনুষ্য জাতির পিতা মনুগণ, মহান ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবতাগণ, বিদ্বান পণ্ডিতগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ এবং মানবগণ যজ্ঞের দ্বারা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

দৈত্যরা দেবতাদের ভক্ত, কেননা তারা তাদের কাছ থেকে যথাসাধ্য জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করতে চায়। ভগবানের ভক্তেরা হচ্ছেন একনিষ্ঠ, অর্থাৎ তাঁরা ভগবানের সেবাতেই সর্বতোভাবে আসক্ত। তাই তাঁদের জাগতিক সুযোগ-সুবিধা চাওয়ার কোন সময় নেই। তাঁরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত বলে জাগতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে পারমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে অধিক আগ্রহী।

শ্লোক ৩১

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩১ ॥

নারায়ণে—নারায়ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **তদিদম্**—এই সমস্ত ভৌতিক প্রকাশ; **বিশ্বম্**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **আহিতম্**—অবস্থিত; **গৃহীত**—স্বীকার করে; **মায়া**—ভৌতিক শক্তিসমূহ; **উরু-গুণঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **সর্গ-আদৌ**— সৃজন, পালন এবং সংহার; **অগুণঃ**—প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্তিরহিত; **স্বতঃ**—আত্মনির্ভরতাপূর্বক।

অনুবাদ

ভগবানের শক্তিশালী জড়া প্রকৃতিতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান স্বয়ং অগুণ হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি কার্য, পালন কার্য এবং বিনাশকার্য সাধনের জন্য প্রকৃতির গুণসমূহ গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

নারদ ব্রহ্মাকে জড় সৃষ্টির পালন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জড় বৈজ্ঞানিকেরা আপাতদৃষ্টিতে যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দর্শন করে তা প্রকৃতপক্ষে সৃজন, পালন এবং সংহারের চরম তত্ত্ব নয়। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের শক্তি, যা কালক্রমে প্রকাশিত হয়, এবং ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিবরূপে যথাক্রমে

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণ স্বীকার করেন। জড়া-প্রকৃতি এইভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণে কার্য করে, যদিও তিনি সর্বদা এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত।

একজন ধনী ব্যক্তি তাঁর সম্পদরূপী শক্তি ব্যয় করে এক বিরাট গৃহ নির্মাণ করেন, এবং তেমনই তিনি সেই গৃহটিকে ভেঙেও ফেলেন তাঁর সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে, কিন্তু তাঁর পালন কার্য তিনি করেন ব্যক্তিগতভাবে। ভগবান হচ্ছেন সবচাইতে ধনী, কেননা তিনি সর্বদা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁকে কখনো ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু করতে হয় না, পক্ষান্তরে তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং নির্দেশনায় জড় জগতে সবকিছু সম্পাদিত হয়; তাই সমগ্র জড় জগৎ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণে অবস্থিত।

জ্ঞানের অভাববশত মানুষ পরম সত্যকে নির্বিশেষ বলে মনে করে, এবং ব্রহ্মাজী, যিনি হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপের স্রষ্টা, সে কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রহ্মাজী বৈদিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, অতএব এই বিষয়ে তাঁর অভিমত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

শ্লোক ৩২

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩২ ॥

সৃজামি—সৃষ্টি করি; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **নিযুক্ত**—নিযুক্ত হয়ে; **অহম্**—আমি; **হরঃ**—শিব; **হরতি**—নাশ করেন; **তৎ-বশঃ**—তাঁর অধীনে; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্ব; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রূপেণ**—তাঁর নিত্য রূপের দ্বারা; **পরিপাতি**—পালন করেন; **ত্রি-শক্তি-ধৃক্**—তিন শক্তির নিয়ন্তা।

অনুবাদ

তাঁর ইচ্ছায় আমি সৃষ্টি করি, শিব সংহার করেন এবং তিনি স্বয়ং নিত্য ভগবানস্বরূপে সবকিছু পালন করেন। তিনি এই তিন শক্তির শক্তিমান নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

এখানে *'একমেবাদ্বিতীয়ম্'* ধারণা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বাসুদেব এক, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি ও অংশের দ্বারা জড় জগতে এবং চিন্ময় জগতে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেই সবই তিনি পালন করেন।

জড় জগতেও ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন সবকিছু, যে কথা শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*—সবকিছুই কেবল বাসুদেব। বৈদিক মন্ত্রেও বাসুদেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে *বাসুদেবাৎ পরোব্রহ্মন্নচান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ*—প্রকৃতপক্ষে বাসুদেব ছাড়া পরম সত্য আর কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/৭) সেই সত্যই প্রতিপন্ন করেছেন—*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—আমার থেকে (শ্রীকৃষ্ণের থেকে) শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।

অতএব অদ্বৈতবাদের ধারণা, যার প্রতি নির্বিশেষবাদীরা অত্যন্ত আসক্ত, তাও ভগবানের সবিশেষ ভক্ত কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। পার্থক্য কেবল এই যে নির্বিশেষবাদীরা চরমে তাঁর সবিশেষত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু ভক্তরা ভগবানের সবিশেষ ভগবত্তার অধিক গুরুত্ব দেন। এই সত্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—ভগবান বাসুদেব এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি নিজেকে বিস্তার করে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন।

এখানে ভগবানকে তিনটি শক্তির দ্বারা সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*ত্রিশক্তিধৃক্*)। প্রধানত তাঁর তিনটি শক্তি হচ্ছে অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা। বহিরঙ্গা শক্তিও সত্ত্ব, রজো এবং তমো এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

তেমনই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিও সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী, এই তিনটি চিন্ময় গুণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তিও চিন্ময়, যা ভগবানের পরা-প্রকৃতিসম্ভূত (*প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্*)।

কিন্তু জীব কখনোই ভগবানের সমান নয়। ভগবান *নিরস্তসাম্যঅতিশয়*; অর্থাৎ, কেউই ভগবানের থেকে মহৎ নয় এবং ভগবানের সমান নয়। অতএব সমস্ত জীব, এমনকি ব্রহ্মা এবং শিব আদি মহান ব্যক্তিরা পর্যন্ত সকলেই ভগবানের অধীন। জড় জগতেও, তাঁর নিত্য বিষ্ণুরূপে তিনি ব্রহ্মা শিব আদি সমস্ত দেবতাদের পালন করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৩

ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতম্**—বিশ্লেষণ করেছি; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **যথা**—যেমন; **ইদম্**—এই সমস্ত; **অনুপৃচ্ছসি**—যেভাবে তুমি প্রশ্ন করেছ; **ন**—কখনোই না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের অতীত; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছুই নয়; **ভাব্যম্**—চিন্তনীয়; **সৎ**—কারণ; **অসৎ**—কার্য; **আত্মকম্**—বিষয়ে।

অনুবাদ

হে পুত্র! তুমি আমার কাছে যা কিছু প্রশ্ন করেছ, আমি তা তোমাকে এইভাবে বললাম। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে (জড় এবং চেতন জগতে) কার্য এবং কারণরূপে যা কিছু বর্তমান, তাদের কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়।

তাৎপর্য

ভগবানের জড়া এবং পরা উভয় প্রকৃতিতেই প্রকাশিত সমগ্র জগৎ প্রথমে কারণ এবং তারপর কার্যরূপে সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু আদি কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আদি

কারণের কার্য অন্য কার্যের কারণ হয়, এবং এইভাবে নিত্য বা অনিত্য সবকিছুই কারণ এবং কার্যরূপে ক্রিয়াশীল। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ব্যক্তি এবং সমস্ত শক্তির আদি কারণ, তাই তাঁকে বলা হয় সর্বকারণের পরম কারণ, যে কথা ব্রহ্ম-সংহিতা এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৮) বলা হয়েছে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

সুতরাং মূল কারণ হচ্ছেন বিগ্রহ এবং তা সবিশেষ, আর নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিও হচ্ছে পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের একটি কারণ (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)।

শ্লোক ৩৪

ন ভারতী মেহঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

ন—কখনোই না; **ভারতী**—বিবৃতি; **মে**—আমার; **অঙ্গ**—হে নারদ; **মৃষা**— মিথ্যা; **উপলক্ষ্যতে**—প্রমাণিত হয়; **ন**—কখনোই না; **বৈ**—অবশ্যই; **ক্বচিৎ**— কখনো; **মে**—আমার; **মনসঃ**—মনের; **মৃষা**—মিথ্যা; **গতিঃ**—প্রগতি; **ন**—না; **মে**—আমার; **হৃষীকাণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **পতন্তি**—অধঃপতিত হয়; **অসৎ পথে**— অনিত্য বস্তুতে; **যৎ**—যেহেতু; **মে**—আমার; **হৃদা**—হৃদয়; **উৎকণ্ঠ্যবতা**—মহান ঐকান্তিকতার দ্বারা; **ধৃতঃ**—ধারণ করা হয়েছে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে নারদ! যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ধারণ করেছি, তাই আমি যা কিছু বলি তা কখনোই মিথ্যা হয় না। আমার মনের প্রগতিও কখনো অবরুদ্ধ হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনো বিষয়ের অনিত্য আসক্তিতে অধঃপতিত হয় না।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞানের আদি বক্তা হচ্ছেন ব্রহ্মাজী, এবং তিনি সেই জ্ঞান নারদকে দান করেছিলেন। আর নারদ সেই দিব্য জ্ঞান পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করেছেন ব্যাসদেব প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে। বৈদিক জ্ঞানের অনুগামীরা ব্রহ্মাজীর বাণীকে পরম সত্য বলে

মনে করেন, এবং সৃষ্টির আদি থেকে অনাদি কাল ধরে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় পৃথিবীর সর্বত্র এই দিব্য জ্ঞান বিতরিত হচ্ছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন এই জড় জগতে পূর্ণ মুক্ত জীব, এবং পারমার্থিক তত্ত্বের নিষ্ঠাবান জিজ্ঞাসুর কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মাজীর বাণীকে অচ্যুত বলে গ্রহণ করা।

বৈদিক জ্ঞান অচ্যুত, কেননা তা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে ব্রহ্মাজীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তাই তাঁর বাণী সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত। তার কারণ হচ্ছে ব্রহ্মাজী হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, যিনি নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মা রচিত ব্রহ্ম-সংহিতায় তিনি সেই সূত্রের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, *গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি*—"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি।" পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকার ফলে তিনি যা কিছু বলেন, যা কিছু ভাবেন এবং যা কিছু করেন, তা সত্য বলে গ্রহণীয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩১) ভগবান ঘোষণা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি*—"হে কুন্তীপুত্র, তুমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর।" ভগবান অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছেন কেন? কেননা, কখনো কখনো গোবিন্দের নিজের প্রতিশ্রুতি জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে অসত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের প্রতিশ্রুতি কখনো ব্যর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্ত বিশেষভাবে ভগবান কর্তৃক রক্ষিত হন, যাতে তিনি অচ্যুত থাকতে পারেন।

তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা শুরু হয় পরম্পরার ধারায় অবস্থিত শুদ্ধ ভক্তের সেবার মাধ্যমে। ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা নিরাকার। ভগবান নিত্য সবিশেষ, এবং ভগবদ্ভক্তও নিত্য সবিশেষ। যেহেতু মুক্ত অবস্থাতেও ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ থাকে, তাই তিনি সর্বাবস্থাতেই সবিশেষ। যেহেতু ভগবান সর্বতোভাবে আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করেন, তাই ভগবানও তাঁর পূর্ণ চিন্ময় সত্তায় সবিশেষ।

ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকার ফলে মিথ্যা জড় সুখভোগের আকর্ষণে কখনো বিভ্রান্ত হয় না। ভগবদ্ভক্তের পরিকল্পনা কখনো ব্যর্থ হয় না, এবং তার কারণ হচ্ছে ভগবানের সেবায় ভক্তের শ্রদ্ধাপূর্ণ আসক্তি। এইটি হচ্ছে সিদ্ধি এবং মুক্তির মানদণ্ড। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকলেই আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে আসক্ত হওয়ার ফলেই কেবল তৎক্ষণাৎ মুক্তির পথে অগ্রসর হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) ভগবান বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

অতএব, কেউ যখন সর্বান্তঃকরণে দিব্য প্রেমভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বাসনা করেন, তাঁর কর্ম এবং বাণী সর্বদাই অভ্রান্ত হয়। তার কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম সত্য, এবং কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত

হন, তখন তিনিও সেই দিব্য গুণাবলী লাভ করেন। পক্ষান্তরে, পরম সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ভৌতিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর আধারিত মানসিক জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত হবে এবং ব্যর্থ হবে। পরম সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য এইপ্রকার ভগবদ্বিহীন অশ্রদ্ধাপূর্ণ বচন এবং কার্যকলাপ ভৌতিক দৃষ্টিতে যতই সমৃদ্ধিশালী বলে মনে হোক না কেন, কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মহত্ত্বপূর্ণ এই শ্লোকের এটিই তাৎপর্য। ভক্তির এক কণা পর্বত-প্রমাণ অশ্রদ্ধার থেকেও অধিক মূল্যবান।

শ্লোক ৩৫

সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ
প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত-
স্তং নাধ্যগচ্ছং যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥

সঃ-অহম্—আমি (মহান ব্রহ্মা) ; **সমাম্নায়-ময়ঃ**—বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরা-ধারায় ; **তপঃ-ময়ঃ**—সাফল্য সহকারে সমস্ত তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করার ফলে ; **প্রজাপতীনাম্**—সমস্ত প্রজাপতিদের ; **অভিবন্দিতঃ**—আরাধ্য ; **পতিঃ**—প্রভু ; **আস্থায়**—সাফল্য সহকারে অনুশীলন করা হয়েছে ; **যোগম্**—যোগসিদ্ধি ; **নিপুণম্**—অত্যন্ত সুদক্ষ ; **সমাহিতঃ**—একাগ্র চিত্ত ; **তম্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ন**—করেননি ; **অধ্যগচ্ছম্**—যথাযথভাবে বুঝতে পারে ; **যতঃ**—যাঁর কাছ থেকে ; **আত্ম**—স্বয়ং ; **সম্ভবঃ**—উৎপন্ন।

অনুবাদ

বেদময়, তপোময় এবং প্রজাপতিদের দ্বারা পূজিত প্রভু একাগ্র চিত্তে নিপুণতা সহকারে যোগ সমাশ্রয় করেও যখন জন্মদাতার সম্বন্ধে জানতে পারিনি, তখন আমার সৃষ্ট অন্যান্য জীবেরা কিভাবে সেই পুরুষকে জানতে পারবে ?

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জীবেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাজী বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও, তপশ্চর্যা, যোগসিদ্ধি, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং মহান প্রজাপতিদের পূজিত প্রভু হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করছেন। পরমেশ্বর ভগবানকে জানার জন্য এই সমস্ত গুণাবলী যথেষ্ট নয়। ব্রহ্মাজী যখন আকুল আকাঙ্ক্ষা সহকারে (*হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা*) তাঁর সেবা করার চেষ্টা করছিলেন, তখনই কেবল তিনি তাঁকে স্বল্প পরিমাণে জানতে পেরেছিলেন। তাই নিষ্ঠাপূর্ণ ঐকান্তিকতা সহকারে ভগবানের সেবার দ্বারাই তাঁকে জানা যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দার্শনিক চিন্তা, যোগ সিদ্ধি ইত্যাদি জাগতিক যোগ্যতার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪-৫৫) স্পষ্টভাবে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

বৈদিক জ্ঞান, তপশ্চর্যা ইত্যাদি আত্ম-উপলব্ধির পন্থা ভগবদ্ভক্তির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মানুষ আত্ম উপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হলেও সে অপূর্ণ থাকে, কেননা সে তাতে যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। আত্ম-উপলব্ধি হলে বা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে ভগবদ্ভক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়, এবং ভগবদ্ভক্ত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন।

এখানে ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে *বিশতে* (প্রবেশ করে) শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়া। এই জড় জগতেও মানুষ ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে আছে। কোন জড়বাদী জড় পদার্থ থেকে আত্মাকে পৃথক করতে পারে না, কেননা আত্মা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিতে লীন হয়ে আছে। সাধারণ মানুষ যেমন দুধ থেকে মাখন আলাদা করতে পারে না,তেমনি কতকগুলি জড় যোগ্যতা অর্জন করার মাধ্যমে জড় পদার্থে লীন হয়ে আছে যে আত্মা, তাকে জড় পদার্থ থেকে পৃথক করা যায় না।

ভক্তির দ্বারা এই *বিশতে* শব্দের অর্থ হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবানের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হওয়া। ভক্তির অর্থ হচ্ছে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের মতো হয়ে ভগবানের ধামে প্রবেশ করা। ব্যক্তিগত সত্তার বিনাশ ভক্তিযোগের বা ভগবদ্ভক্তের লক্ষ্য নয়। মুক্তি পাঁচ প্রকার, এবং তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে সাযুজ্য মুক্তি বা ভগবানের অস্তিত্বে বা দেহে লীন হয়ে যাওয়া। অন্য চার প্রকার মুক্তিতে আত্মার ব্যক্তিগত সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকে। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় *বিশতে* শব্দটি সেই ভক্তদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যারা কোনপ্রকার মুক্তিলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত নয়। ভগবদ্ভক্তেরা কোন পরিস্থিতির অপেক্ষা না করে কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েই সন্তুষ্ট হয়।

ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম সৃষ্ট জীব, যিনি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন (*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*)। তাই বেদান্ত বিষয়ে ব্রহ্মার থেকে অধিক জ্ঞানী আর কে আছে? কিন্তু তিনি এখানে স্বীকার করছেন যে পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি ভগবানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হননি। যেহেতু ব্রহ্মার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, তাই তথাকথিত বৈদান্তিকেরা কিভাবে পরম সত্যকে পূর্ণরূপে জানতে পারবে? তথাকথিত বৈদান্তিকেরা তাই ভক্তিবেদান্ত, বা ভক্তিযুক্ত বেদান্তের শিক্ষা লাভ না করে ভগবানের অস্তিত্বে প্রবেশ করতে পারে না।

বেদান্তের অর্থ হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি, এবং ভক্তির অর্থ হচ্ছে কিছু পরিমাণে ভগবদ্-উপলব্ধি। কেউই পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, কিন্তু

আত্মনিবেদন এবং সেবাবৃত্তির মাধ্যমে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে কিছু পরিমাণে জানা যায়।

ব্রহ্ম-সংহিতাতেও বলা হয়েছে, *বেদেষু দুর্লভম্*, অর্থাৎ শুধু বেদান্ত চর্চা করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন *অদুর্লভম্ আত্মভক্তৌ*, কিন্তু তাঁর ভক্তেরা তাঁকে অনায়াসে লাভ করতে পারেন। শ্রীল ব্যাসদেব তাই বেদান্ত-সূত্র রচনা করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তাঁর গুরুদেব নারদমুনির উপদেশে তিনি বেদান্তের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে জানার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

শ্লোক ৩৬

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্ ।
যো হ্যাত্মমায়াবিভবং স্ম পর্যগাদ্
যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ॥ ৩৬ ॥

নতঃ—প্রণত ; **অস্মি**—হই ; **অহম্**—আমি ; **তৎ**—ভগবানের ; **চরণম্**— শ্রীপাদপদ্ম ; **সমীয়ুষাম্**—শরণাগতের ; **ভবৎ-ছিদম্**—যা জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করে ; **স্বস্তি-অয়নম্**—সমস্ত সুখের অনুভূতি ; **সুমঙ্গলম্**—সর্ব মঙ্গলময় ; **যঃ**—যিনি ; **হি**—নিশ্চিতভাবে ; **আত্ম-মায়া**—স্বীয় শক্তি ; **বিভবম্**—শক্তি ; **স্ম**—অবশ্যই ; **পর্যগাদ্**—অনুমান করতে পারে না ; **যথা**—যেভাবে ; **নভঃ**—আকাশ ; **স্ব-অন্তম্**—তার সীমা ; **অথ**—অতএব ; **অপরে**—অন্যেরা ; **কুতঃ**—কিভাবে।

অনুবাদ

তাই জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ থেকে উদ্ধারকারী তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। এই আত্ম-সমর্পণ সর্বমঙ্গলময় এবং তার ফলে সর্বপ্রকার সুখ লাভ হয়। আকাশ যেমন নিজেই নিজের অন্ত পায় না, তেমনই ভগবানও তাঁর সীমা অনুমান করতে পারেন না। অতএব অন্যেরা কিভাবে তা করতে পারে?

তাৎপর্য

জীবেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্বী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপসিদ্ধ যোগী সমস্ত জীবের পরম গুরুরূপে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন সর্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভের জন্য এবং জড় জগতের সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বমঙ্গলময় পারমার্থিক জীবন লাভের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হতে।

ব্রহ্মাকে বলা হয় পিতামহ অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন পিতাদেরও পিতা। যারা নবীন, তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অভিজ্ঞ পিতার সঙ্গে পরামর্শ করে। পিতা স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। কিন্তু ব্রহ্মা হচ্ছেন পিতাদেরও পিতা। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মনুষ্যদের পিতা মনুর পিতারও পিতা। তাই এই নগণ্য গ্রহের মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শক্তির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অবধি অনুমান করার চেষ্টা না করে ব্রহ্মাজীর উপদেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া।

বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবানের শক্তি অসীম। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬/৮)*। তিনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, তিনি মহতের থেকেও মহীয়ান, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাজীও স্বীকার করেছেন যে তাঁর শরণাগত হওয়াই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে শ্রেয়স্কর।

যাদের কোন প্রকার জ্ঞান নেই, তারাই কেবল দাবী করে যে তারাই সবকিছুর অধীশ্বর। আর তাদের ক্ষমতা কতটুকু ? তারা একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আকাশের পরিধি পর্যন্ত মাপতে পারে না। তথাকথিত জড় বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে স্পুটনিকের সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক যেতে চল্লিশ হাজার বছর লাগবে। তাদের এই অনুমানটিও কাল্পনিক, কেননা কেউই চল্লিশ হাজার বছর বাঁচার প্রত্যাশা করে না। আর তা ছাড়া মহাকাশচারী বৈমানিক যখন তার ভ্রমণের শেষে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে, তখন শ্রেষ্ঠ মহাকাশচারীরূপে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য তার কোন বন্ধুই এখানে উপস্থিত থাকবে না, যা আধুনিক মোহাচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিকদের লোক-দেখানো হালচালে পরিণত হয়েছে।

জড়জাগতিক জীবন সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে অত্যন্ত উৎসাহী একজন নাস্তিক বৈজ্ঞানিক জীবদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি হাসপাতাল খোলে, কিন্তু তার ছ মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। অতএব এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম যাতে ব্যর্থ না হয় সে সম্বন্ধে সব সময় সতর্ক থাকা চাই। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়েছে, তাই অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নামে কৃত্রিমভাবে জীবনের প্রয়োজনগুলি বর্ধিত করে জড় সুখভোগের চেষ্টা করা উচিত নয়।

পক্ষান্তরে জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে সেই উপদেশ দিয়েছেন, এবং সমস্ত জীবের পিতামহ ব্রহ্মাজীও শ্রীমদ্ভাগবতে সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত এই শরণাগতির পন্থা যে অস্বীকার করে—এক কথায় যে সমস্ত প্রামাণিক তত্ত্ব অস্বীকার করে, সে জড়া প্রকৃতির নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। জীব তার স্বরূপে স্বতন্ত্র নয়। তাকে হয় ভগবানের

কাছে নয়তো জড়া প্রকৃতির কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। জড়া প্রকৃতিও ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র নয়।

ভগবান নিজে জড়া প্রকৃতিকে *মম মায়া* বা "আমার মায়া" *(ভঃ গীঃ ৭/১৪)* এবং *মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা,* বা "আটটি উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশিত আমার ভিন্ন প্রকৃতি" *(ভঃ গীঃ ৭/৪)* বলে বর্ণনা করেছেন। তাই জড়া প্রকৃতিও ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, এ সম্বন্ধে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"আমার অধ্যক্ষতাতে জড়া প্রকৃতি ক্রিয়া করে এবং তার ফলে সব কিছু সক্রিয় হয়।" আর জীব জড়া প্রকৃতি থেকে উন্নততর শক্তি সম্ভূত বলে তার বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে যে, সে ভগবানের শরণাগত হবে, না, জড়া প্রকৃতির শরণাগত হবে।

ভগবানের শরণাগত হলে জীব সুখী হয় এবং এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় ; কিন্তু তা না করে সে যদি জড়া প্রকৃতির শরণাগত হয়, তা হলে তাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তির অর্থ হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া, কেন না, শরণাগতির এই পন্থাটি *ভবচ্ছিদম্* (সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি), *স্বস্ত্যয়নম্* (সর্বপ্রকার সুখের অনুভূতি) এবং *সুমঙ্গলম্* (সব প্রকার মঙ্গলের উৎস)।

অতএব, কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলেই মুক্তি, আনন্দ এবং সৌভাগ্য লাভ করা যায়, কেননা তিনি হচ্ছেন মুক্তিপ্রদ, আনন্দময় এবং মঙ্গলময়। এই প্রকার মুক্তি এবং আনন্দও অসীম, এবং তা আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; যদিও প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তি এবং আনন্দ আকাশের থেকেও বহুগুণ অধিক।

আমাদের বর্তমান অবস্থায় কোন কিছুর বিশালতার পরিমাণ আমরা অনুমান করতে পারি আকাশের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে। আকাশের পরিধি আমরা মাপতে পারি না তবে ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে যে মুক্তি ও আনন্দ লাভ হয় তা আকাশের থেকেও অনেক অনেক গুণ অধিক। সেই চিন্ময় আনন্দ এতই অসীম যে তা মাপা যায় না। এমনকি ভগবান নিজেও তা পারেন না, অতএব অন্যের কি কথা ?

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *ব্রহ্ম সৌখ্যং ত্বনন্তম্*—চিন্ময় আনন্দ অন্তহীন। এখানে বলা হয়েছে যে, সেই আনন্দ ভগবান পর্যন্ত মাপতে পারেন না। তার অর্থ এই নয় যে ভগবান মাপতে অক্ষম এবং তাই তা ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তা মাপতে পারেন, কিন্তু ভগবানের যে আনন্দ তাও পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবান যখন এই আনন্দ মাপতে যান, তখন তা বর্ধিত হয়, এবং ভগবান যখন পুনরায় তা মাপতে যান তখন তা আরও অধিক গুণে বর্ধিত হয় ; এইভাবে ভগবানের মাপা এবং আনন্দের আয়তনের মধ্যে নিত্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে এবং এই প্রতিযোগিতার কখনো শেষ হয় না।

চিন্ময় আনন্দ *আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্,* বা এক আনন্দের সমুদ্র যা নিয়ত বর্ধিত হয়। জড় সমুদ্র রুদ্ধ, কিন্তু আনন্দের সমুদ্র নিত্য বর্ধমান। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদিলীলা ৪র্থ*

অধ্যায়) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী-শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশ শ্রীমতী রাধারাণীতে এই আনন্দের সমুদ্র অন্তহীনভাবে বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৩৭

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে আমার পুত্রেরা; **যৎ**—যাঁর; **ঋতাম্**—বাস্তবিক; **গতিম্**—গতি; **বিদুঃ**—জান; **ন**—না; **বামদেবঃ**—শিব; **কিম্**—কি; **উত**—অন্য কিছু; **অপরে**—অন্যেরা; **সুরাঃ**—দেবতারা; **তৎ**—তা; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **মোহিত**—মুগ্ধ; **বুদ্ধয়ঃ**—এইপ্রকার বুদ্ধির দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **ইদম্**—এই; **বিনির্মিতম্**—যা সৃষ্ট হয়েছে; **চ**—ও; **আত্ম-সমম্**—স্বীয় ক্ষমতার দ্বারা; **বিচক্ষ্মহে**—দর্শন করে।

অনুবাদ

যেহেতু আমি, তুমি এবং শিব সেই চিন্ময় আনন্দের অবধি অনুমান করতে পারি না, অন্য দেবতারা তা কিভাবে জানবে? যেহেতু আমরা সকলেই ভগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত, তাঁর মায়া বিনির্মিত এই বিশ্বকে আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে দর্শন করি।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা বহুবার দ্বাদশ মহাজনের নাম উল্লেখ করেছি, যাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, নারদ এবং শিব ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। অন্যান্য দেবতা, উপদেবতা, গন্ধর্ব, চারণ, বিদ্যাধর, মনুষ্য এবং অসুরদের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়। দেবতা, উপদেবতা, গন্ধর্ব ইত্যাদি সকলে উচ্চতর লোকের উন্নততর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীব, মানুষেরা হচ্ছে মধ্যবর্তী লোকের জীব, আর অসুরেরা নিম্নবর্তী লোকের অধিবাসী। তাদের সকলেরই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বীয় ধারণা রয়েছে, ঠিক যেমন মানব সমাজের বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিকদের ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে। এই সব জীবেরা জড়া প্রকৃতির প্রাণী এবং তারা প্রকৃতির গুণের অদ্ভুত প্রকাশের দ্বারা বিমোহিত।

এই প্রকার মোহ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৩) বলা হয়েছে, *ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ*—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত

প্রতিটি জীব প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত। প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুসারে মনে করে যে তার দর্শন-শক্তির অন্তর্গত এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডই সব কিছু। তাই বিংশ শতাব্দীর মানব সমাজের বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং অন্ত গণনা করে। কিন্তু এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা কি জানে?

ব্রহ্মাও এক সময় নিজেকে ভগবানের একমাত্র পুত্র বলে মনে করে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে ভগবানের কৃপায় তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত আরও অনেক অনেক গুণ বড় ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেখানে তাঁর থেকে অনেক অনেক গুণ শক্তিশালী ব্রহ্মারা রয়েছেন। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একত্রে ভগবানের *একপাদ-বিভূতি,* যা ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। তাঁর শক্তির অন্য তিন-চতুর্থাংশ চিজ্জগৎরূপে প্রকাশিত, অতএব ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিকেরা তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি জানতে পারে?

ভগবান তাই বলেছেন, *মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্*—জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমোহিত হয়ে তারা জানতে পারে না যে, এই ব্যক্ত জগতের অতীত পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম নিয়ন্তা।

ব্রহ্মা, নারদ এবং শিব পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে জানেন, এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষমতায় সন্তুষ্ট না হয়ে এবং মহাকাশযান ও আধুনিক বিজ্ঞানের এই প্রকার শিশুসুলভ আবিষ্কারে মোহিত না হয়ে ব্রহ্মা, নারদ, শিব আদি মহাজনদের নির্দেশ অনুসরণ করা। পিতার পরিচয় জানার ব্যাপারে যেমন মাতার বাণীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তেমনই ব্রহ্মা, নারদ, শিব প্রমুখ মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত বেদরূপী মাতাই হচ্ছেন পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৩৮

যস্যাবতারকর্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

যস্য—যাঁর; **অবতার**—অবতার; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **গায়ন্তি**—মহিমা কীর্তন করেন; **হি**—অবশ্যই; **অস্মৎ-আদয়ঃ**—আমাদের মতো ব্যক্তিরা; **ন**—করে না; **যম্**—যাঁকে; **বিদন্তি**—জানে; **তত্ত্বেন**—স্বরূপত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর অবতার এবং কার্যসমূহ আমরা মহিমা কীর্তনের জন্য গান করি, যদিও তাঁর স্বরূপে তাঁকে পূর্ণরূপে জানা প্রায় অসম্ভব।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয় যে, ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ যখন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনার মাধ্যমে পবিত্র হয়, তখন ভগবান ভক্তের ভক্তির মাত্রা অনুসারে নিজেকে প্রকাশ করেন (*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*)। ভগবানকে আজ্ঞাবহ মাল-জোগানদার মনে করা উচিত নয়, যাঁকে আমাদের দেখতে চাওয়ার বাসনা করা মাত্রই আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে হবে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মা, নারদ প্রমুখ মহাজনদের গুরু-পরম্পরার ধারায়, পূর্ববর্তী আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে আমাদের ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে যখন ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রমশ শুদ্ধ হয়, তখন ভক্তের পারমার্থিক প্রগতির মাত্রা অনুসারে ভগবান তার কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।

কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, তারা কেবল তাদের দার্শনিক অনুমানের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। এইপ্রকার কঠোর পরিশ্রমকারীরা শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে শব্দজাল বিন্যাস করতে পারে, কিন্তু কখনো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সবিশেষ স্বরূপে জানতে পারে না। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, কেবল ভক্তির মাধ্যমেই তাঁকে জানা যায়। কোনরকম গর্বোদ্ধত জড় পন্থায় তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায় না, পক্ষান্তরে বিনম্র ভক্ত ঐকান্তিক সেবার মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং তার ফলে ভগবান সেই ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

একজন সদ্‌গুরুরূপে ব্রহ্মা তাই তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন এবং আমাদের উপদেশ দিয়েছেন শ্রবণ এবং কীর্তনের পন্থা অনুসরণ করতে। কেবল এই পন্থার মাধ্যমে অথবা ভগবানের অবতারের মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে, অবশ্যই অন্তরের অন্তঃস্থলে ভগবানকে দর্শন করা যায়। আমরা ইতিপূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (১/২/১২) সে বিষয়ে আলোচনা করেছি—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

অর্থাৎ, কোন প্রকারেই পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানা যায় না, কিন্তু শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ভগবদ্ভক্তির পন্থায় তাঁকে আংশিকভাবে দর্শন করা এবং উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ৩৯

স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ॥ ৩৯॥

সঃ—তিনি ; **এষঃ**—এই ; **আদ্যঃ**—আদিপুরুষ ভগবান ; **পুরুষঃ**—গোবিন্দ বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার মহাবিষ্ণু ; **কল্পে কল্পে**—প্রতি কল্পে ; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন ; **অজঃ**—অজন্মা ; **আত্মা**—স্বয়ং ; **আত্মনি**—আপনাতে ; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা ; **আত্মানম্**—নিজেকে ; **সঃ**—তিনি ; **সংযচ্ছতি**-সংবরণ করেন ; **পাতি**—পালন করেন ; **চ**—ও।

অনুবাদ

সেই আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অবতার মহাবিষ্ণু রূপে নিজেকে বিস্তার করে এই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করেন। তাঁর মধ্যেই অবশ্য সৃষ্টি প্রকাশিত হয়, এবং জড় পদার্থ ও জড় অভিব্যক্তি সবই তিনি স্বয়ং। কিছুকালের জন্য তিনি তাদের পালন করেন এবং তারপর তিনি পুনরায় তাদের আত্মসাৎ করে নেন।

তাৎপর্য

এই সৃষ্টি ভগবান থেকে অভিন্ন, কিন্তু তথাপি এই সৃষ্টিতে তিনি নেই। এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৪) বিশ্লেষিত হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।।

পরম সত্যের নির্বিশেষ ধারণাও পরমেশ্বর ভগবানের একটি রূপ এবং তাঁকে বলা হয় *অব্যক্ত-মূর্তি*। *মূর্তি* মানে হল রূপ, কিন্তু তাঁর নির্বিশেষরূপ যেহেতু আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের ধারণার অতীত, তাই তিনি অব্যক্ত মূর্তি এবং ভগবানের সেই অব্যক্তরূপে সমগ্র সৃষ্টি আশ্রিত ; অথবা পক্ষান্তরে বলা যায়, সমগ্র সৃষ্টিই ভগবান স্বয়ং, এবং সেই সূত্রে এই জড় সৃষ্টি ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি এই সৃষ্টি থেকে পৃথক। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের নিরাকার রূপের উপর জোর দেয়, কিন্তু তারা সবিশেষ আদিরূপে বিশ্বাস করে না।

বৈষ্ণবেরা কিন্তু ভগবানের সেই আদি রূপ স্বীকার করেন, যার একটি প্রকাশ হচ্ছে এই নির্বিশেষ রূপ। ভগবানের সাকার এবং নিরাকার ধারণা যুগপৎ বর্তমান, এবং সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানব বুদ্ধির অকল্পনীয় এই বিচার শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে স্বীকার করা উচিত এবং ভগবদ্ভক্তির প্রগতির মাধ্যমে কেবল ব্যবহারিকভাবে সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব, মানসিক জল্পনা-কল্পনা বা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তাকে জানা কখনই সম্ভব নয়।

নির্বিশেষবাদীরা আরোহী-পন্থার উপর নির্ভর করে এবং তাই তারা আদি-পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, যদিও সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে সবকিছু

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের অল্প জ্ঞানের মাধ্যমে তারা ধারণা করতে পারে না যে ভগবান তাঁর স্বরূপে কিভাবে সবকিছুর মধ্যে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। তাদের এই অপূর্ণতার কারণ, তাদের এই জড় ধারণা যে, কোন বস্তু বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হলে তার মূল রূপটি আর বর্তমান থাকে না।

আদিপুরুষ ভগবান (*আদ্যঃ*) গোবিন্দ মহাবিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করে তাঁর সৃষ্ট কারণ-সমুদ্রে শয়ন করেন। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৪৭) সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এখানে ব্রহ্মাজী বলেছেন, "আমি সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশাবতার মহাবিষ্ণুরূপে কারণ-সমুদ্রে যোগনিদ্রায় শায়িত, এবং তাঁর দিব্য শরীরের রোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে।"

এই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন এই সৃষ্টিতে প্রথম অবতার ; তাঁর থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় এবং একে একে সব ভৌতিক অভিব্যক্তির প্রকাশ হয়। মহত্তত্ত্বরূপে ভগবান কারণ-সমুদ্র সৃষ্টি করেন, যা চিদাকাশে ঠিক এক খণ্ড মেঘের মতো এবং তা তাঁর বিভিন্ন প্রকাশের একটি অংশ মাত্র। চিদাকাশ হচ্ছে তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার বিস্তার, এবং তিনি মহত্তত্ত্বরূপী মেঘও। তিনি কারণ-সমুদ্রে শয়ন করে তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, এবং তারপর প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পালনের জন্য ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের সৃষ্টি করেন এবং অবশেষে তাঁদের সকলকে তাঁর শরীরে লীন করে নেন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৭) বলা হয়েছে—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥

"হে কুন্তীপুত্র, কল্পান্তে অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সমগ্র সৃষ্টি আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। তারপর পুনরায় যখন আমি ইচ্ছা করি, তখন আমার স্বীয় শক্তির দ্বারা সেই সৃষ্টি প্রকাশিত হয়।"

অর্থাৎ, সর্বত্রই কেবল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিরই প্রকাশ, যার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়। এই বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

শ্লোক ৪০-৪১

**বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্ ।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥**

**ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ ॥ ৪১ ॥**

বিশুদ্ধম্—জড় কলুষরহিত; **কেবলম্**—শুদ্ধ এবং পূর্ণ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **প্রত্যক্**—সর্বব্যাপ্ত; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **অবস্থিতম্**—স্থিত; **সত্যম্**—সত্য; **পূর্ণম্**—পরম; **অনাদি**—যাঁর আদি নেই; **অন্তম্**—অন্ত; **নির্গুণম্**—জড় গুণরহিত; **নিত্যম্**—নিত্য; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়; **ঋষে**—হে ঋষি নারদ; **বিদন্তি**—তাঁরা কেবল বুঝতে পারেন; **মুনয়ঃ**—মহান মনীষীগণ; **প্রশান্ত**—শান্ত চিত্ত; **আত্ম**—স্বয়ং; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আশয়াঃ**—আশ্রিত; **যদা**—যখন; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অসৎ**—অনিত্য; **তর্কৈঃ**—তর্কের দ্বারা; **তিরঃ-ধীয়েত**—হারিয়ে যায়; **বিপ্লুতম্**—বিকৃত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ শুদ্ধ এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। তিনি পরম সত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সর্বব্যাপ্ত, অদ্বিতীয়, অনাদি এবং অনন্ত। হে মহর্ষি নারদ, মহান মুনিরা সবরকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যখন অবিচলিত ইন্দ্রিয়ের শরণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে জানতে পারেন। অন্যথা, বৃথা তর্কের দ্বারা সবকিছু বিকৃত হয়ে যায় এবং ভগবান আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান।

তাৎপর্য

এখানে অনিত্য জড় সৃষ্টিতে ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ বহির্ভূত বিষয়ে মূল্যাঙ্কন করা হয়েছে। মায়াবাদ দর্শন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে যে ভগবান যখন জড় জগতে অবতরণ করে রূপ পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি জড় শরীরের দ্বারা কলুষিত হন। সর্বাবস্থায় ভগবানের পূর্ণ শুদ্ধতা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সেই অপসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে।

মায়াবাদ দর্শনে বলা হয় যে আত্মা যখন অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তখন সে জীব এবং যখন সে অজ্ঞানের বা অবিদ্যার আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে নির্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে ভগবান পূর্ণতা এবং পরম জ্ঞানের নিত্য প্রতীক। এইটি হচ্ছে তাঁর বৈশিষ্ট্য—তিনি সর্বাবস্থাতেই জড় কলুষ থেকে মুক্ত। এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ জীব থেকে ভগবানের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে, কেননা জীবের

মধ্যে অজ্ঞানের বশীভূত হওয়ার প্রবৃত্তি থাকে এবং তার ফলে সে বিভিন্ন প্রকার জড় উপাধি গ্রহণ করে।

বেদে বলা হয়েছে যে ভগবান *বিজ্ঞানমানন্দম্*, অর্থাৎ তিনি জ্ঞান এবং আনন্দে পূর্ণ। তাঁর সঙ্গে বদ্ধ জীবের তুলনা করা চলে না। কেননা জীবের মধ্যে কলুষিত হওয়ার প্রবৃত্তি থাকে, কিন্তু ভগবান কখনো জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হন না; যদিও মুক্তির পর জীবও ভগবানের গুণাবলীতে বিভূষিত হয়। কিন্তু কলুষিত হওয়ার প্রবৃত্তির ফলে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন।

বেদে বলা হয়েছে, *শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্*—জীবাত্মা পাপের দ্বারা কলুষিত হয়, কিন্তু ভগবান কখনো কলুষিত হন না। ভগবানের তুলনা শক্তিশালী সূর্যের সঙ্গে করা হয়েছে। সূর্য এতই শক্তিমান যে কোনরকম সংক্রমণের দ্বারা সে কখনো কলুষিত হয় না। পক্ষান্তরে, সূর্য কিরণের প্রভাবে সংক্রামিত বস্তু বীজাণুমুক্ত হয়ে যায়। তেমনই, ভগবান কখনো পাপের দ্বারা কলুষিত হন না; পক্ষান্তরে ভগবানের সংস্পর্শে আসার ফলে পাপীরা নিষ্পাপ হয়ে যায়।

ভগবানও সূর্যের মতো সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই এই শ্লোকে *প্রত্যক্* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কিছুই ভগবানের অস্তিত্বের বহির্ভূত নয়। সবকিছুর অন্তরেই ভগবান বিরাজমান, এবং জীবের কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি সবকিছুকে আচ্ছাদনও করেন। তাই তিনি অনন্ত, এবং জীব অণুসদৃশ। বেদে বলা হয়েছে যে কেবল ভগবানেরই অস্তিত্ব আছে আর অন্য সকলেই তাঁর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। তিনি সকলের অস্তিত্ব ক্ষমতার উৎস। তিনি সমস্ত নিরপেক্ষ সত্যের পরম সত্য। তিনি সকলের সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস, এবং তাই কেউই তাঁর সমান ঐশ্বর্যশালী হতে পারে না। ধন, যশ, বীর্য, সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আদি সমস্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ হওয়ার ফলে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। আর যেহেতু তিনি পুরুষ, তাই তাঁর বহু গুণাবলী রয়েছে, তবে তিনি সবরকম জড় গুণেরই অতীত।

আমরা *ইত্থং-ভূত-গুণো হরিঃ* (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৭/১০) উক্তিটির আলোচনা পূর্বে করেছি। তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলী এতই আকর্ষণীয় যে মুক্ত পুরুষেরাও (আত্মারামেরাও) তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট। যদিও তিনি সর্বপ্রকার সবিশেষ গুণের দ্বারা গুণান্বিত, তা সত্ত্বেও তিনি সর্বশক্তিমান। তাই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কিছু করণীয় নেই, কেননা তাঁর সর্বশক্তিমান শক্তির দ্বারা সবকিছুই সম্পাদিত হয়ে যায়।

বৈদিক মন্ত্রে সে কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*। এর দ্বারা ভগবানের বিশিষ্ট চিন্ময় রূপের সংকেত পাওয়া যায়, যা ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনো অনুভূত হয় না। তাঁকে দর্শন করা তখনই সম্ভব হয় যখন ইন্দ্রিয়সমূহ ভক্তির দ্বারা শুদ্ধ হয় (*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*)। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং জীবের মধ্যে বহু বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ভগবানের সঙ্গে কারোরই তুলনা করা চলে না, যে বিষয়ে বেদে ঘোষণা করা হয়েছে (*একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, দ্বৈতাদ্বৈভয়ং ভবতি*)। ভগবানের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং তাই তিনি কারো ভয়ে ভীত নন, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। যদিও তিনিই হচ্ছেন অন্য সমস্ত জীবেদের উৎস, তবুও তাঁর এবং জীবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তা না হলে পূর্ববর্তী শ্লোকের উক্তি, *ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন*—অর্থাৎ কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না, এই উক্তিটির কোন প্রয়োজন ছিল না। কেউই যে তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না সে-কথা এই শ্লোকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে কিছু পরিমাণে তাঁকে জানার যোগ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশান্তরাই, অর্থাৎ ভগবানের অনন্য ভক্তরাই কেবল তাঁকে বিশদভাবে জানতে পারে। তার কারণ হচ্ছে, ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক হওয়া ব্যতীত ভক্তদের আর কোন কামনা নেই। কিন্তু অন্যেরা যথা জ্ঞানী, দার্শনিক, যোগী এবং সকাম কর্মী, নানারকম কামনা-বাসনাযুক্ত, এবং তাই তারা শান্ত হতে পারে না।

সকাম কর্মীরা তাদের কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, যোগীরা সিদ্ধি লাভ করতে চায় এবং জ্ঞানীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনা থাকে, ততক্ষণ তার শান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না; পক্ষান্তরে অর্থহীন শুষ্ক মনোধর্মী তর্কের দ্বারা সবকিছু বিকৃত হয়ে যায় এবং তার ফলে ভগবান তাদের উপলব্ধি থেকে আরও দূরে সরে যান।

শুষ্ক জ্ঞানীরা, তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করেন বলে কিছু পরিমাণে ভগবানের নির্বিশেষরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে তাঁর চরম রূপ গোবিন্দকে জানার কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা *অমলাত্মন* বা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ব্যক্তিরাই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেত পারেন এবং তার ফলে তাঁর স্বরূপে তাঁকে জানতে পারেন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

শ্লোক ৪২

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ৪২॥

আদ্যঃ—প্রথম; **অবতারঃ**—অবতার; **পুরুষঃ**—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু; **পরস্য**—ভগবানের; **কালঃ**—কাল; **স্বভাবঃ**—স্থান; **সৎ**—ফল; **অসৎ**—কারণ; **মনঃ**—মন; **চ**—ও; **দ্রব্যম্**—উপাদানসমূহ; **বিকারঃ**—জড় অহঙ্কার; **গুণঃ**—প্রকৃতির গুণসমূহ;

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **বিরাট্**—পূর্ণ শরীর ; **স্বরাট্**—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ; **স্থাস্নু**—স্থাবর ; **চরিষ্ণু**—জঙ্গম ; **ভূম্নঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবানের প্রথম অবতার, এবং তিনি নিত্যকাল, স্বভাব, কার্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মন, মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, প্রকৃতির গুণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বিরাটরূপ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, স্থাবর, জঙ্গম আদি সমস্ত জীব সমষ্টির ঈশ্বর।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে জড় সৃষ্টি নিত্য নয়। জড় সৃষ্টি সর্বশক্তিমান ভগবানের জড়া প্রকৃতির ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। যে সমস্ত বদ্ধ জীব অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে অনিচ্ছুক, তাদের একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য এই জড়া প্রকৃতির প্রয়োজন। এই প্রকার বদ্ধ জীবাত্মারা চিন্ময় ধামে মুক্ত জীবন লাভ করতে পারে না কেননা তারা তাদের হৃদয়ে ভগবানকে সেবা করতে চায় না, পক্ষান্তরে কৃত্রিমভাবে ভগবান সেজে ভোগ করতে চায়।

জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের স্বাতন্ত্র্যের অসদ্ব্যবহার করে ভগবানের সেবা করতে চায় না ; তাই মায়া নামক এই জড় জগতে তাদের ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। একে বলা হয় মায়া, কেননা ভগবানের মোহময়ী শক্তির প্রভাবে ভোক্তা না হওয়া সত্ত্বেও জীব নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে।

এই প্রকার মায়াচ্ছন্ন জীবদের পুনঃ পুনঃ সুযোগ দেওয়া হয় বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়ে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*) জড়া প্রকৃতির ভোক্তা হওয়ার বিকৃত মনোভাব সংশোধন করার।

অনিত্য জড় সৃষ্টি ভগবানের জড়া প্রকৃতির প্রদর্শন, এবং তার ব্যবস্থাপনার জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু রূপে অবতরণ করেন, ঠিক যেমন রাষ্ট্র-সরকার অস্থায়ী কার্যকলাপের দেখাশোনার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে নিযুক্ত করে। এই কারণোদকশায়ী বিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে (*সঐক্ষত*) এই অনিত্য জড় জগতকে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে *জগৃহে পৌরুষং রূপম্* শ্লোকটির আলোচনার মাধ্যমে সেই বিষয়টি ইতিপূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। জড় সৃষ্টির মায়িক প্রকাশের স্থিতিকে বলা হয় কল্প, এবং আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কিভাবে কল্প-কল্পান্তরে সৃষ্টির প্রকাশ হয়। ভগবান তাঁর অবতার এবং শক্তিময় কার্যকলাপের মাধ্যমে জড় জগতের সমস্ত উপাদান সৃষ্টি করেন, যথা কাল, অন্তরীক্ষ, কারণ, কার্য, মন, স্থূল এবং সূক্ষ্ম পদার্থ, এবং প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণের সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়া ; এবং তারপর ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাদের মূল উৎস, দ্বিতীয় অবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে বিরাট বিশ্বরূপ এবং দ্বিতীয় পুরুষাবতার থেকে উৎপন্ন স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব।

সৃষ্টির এই সমস্ত উপাদান এবং পূর্ণ জড় সৃষ্টি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ ; কোনকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বতন্ত্র নয়। জড় জগতে ভগবানের প্রথম অবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, যে সম্বন্ধে ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৪৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর একটি নিশ্বাসের মাধ্যমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ প্রকাশিত হয়, আর সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের একটি অংশ মাত্র।

শ্লোক ৪৩-৪৫

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা
দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা
নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ ॥ ৪৩ ॥
গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-চারণেশা
যে যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং
দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ ।
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত—
কুষ্মাণ্ডযাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ ॥ ৪৪ ॥
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্ব-
দোজঃসহস্বদ্বলবৎক্ষমাবৎ ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং
তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্ ॥ ৪৫ ॥

অহম্—আমি (ব্রহ্মাজী) ; **ভবঃ**—শিব ; **যজ্ঞঃ**—ভগবান বিষ্ণু ; **ইমে**—এই সমস্ত ; **প্রজা-ঈশাঃ**—সমস্ত জীবের পিতা ; **দক্ষ-আদয়ঃ**—দক্ষ, মরীচি, মনু ইত্যাদি ; **যে**—যারা ; **ভবৎ**—তুমি ; **আদয়ঃ চ**—এবং কুমারগণ (সনৎ কুমার এবং তাঁর ভাইয়েরা) ; **স্বর্লোক-পালাঃ**— স্বর্গলোকের নায়কগণ ; **খগলোক-পালাঃ**—অন্তরীক্ষে

বিচরণকারীদের নায়কগণ ; **নৃলোক-পালাঃ**—মনুষ্যদের নেতাগণ ; **তললোক-পালাঃ**—নিম্নলোকসমূহের নায়কগণ ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বলোকের অধিবাসীগণ ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর লোকের অধিবাসীগণ ; **চারণ-ঈশাঃ**—চারণদের নায়কগণ ; **যে**—অন্যেরা ; **যক্ষ**—যক্ষদের নায়কগণ ; **রক্ষ**—রাক্ষসগণ ; **উরগ**—সর্পগণ ; **নাগ-নাথাঃ**—(পৃথিবীর নীচে) নাগ-লোকের নায়কগণ ; **যে**—অন্যেরা ; **বা**—ও ; **ঋষীনাম্**—ঋষিদের ; **ঋষভাঃ**—প্রমুখ ; **পিতৃণাম্**—পিতৃপুরুষদের ; **দৈত্য-ইন্দ্র**—দৈত্যদের নায়কগণ ; **সিদ্ধ-ঈশ্বর**—সিদ্ধলোকের নায়কগণ ; **দানব-ইন্দ্রাঃ**—দানবদের নায়কগণ ; **অন্যে**—তারা ছাড়া ; **চ**—ও ; **যে**—যারা ; **প্রেত**—প্রেতাত্মা ; **পিশাচ**—পিশাচ ; **ভূত**—ভূত ; **কুষ্মাণ্ড**—কুষ্মাণ্ড নামক প্রেতাত্মা ; **যাদঃ**—জলচর ; **মৃগ**—পশু ; **পক্ষ্যধীশাঃ**—পক্ষীশ্রেষ্ঠগণ ; **যৎ**—যা কিছু ; **কিঞ্চ**—এবং অন্য সব কিছু ; **লোকে**—সংসারে ; **ভগবৎ**—অসাধারণ ঐশ্বর্য বা শক্তিসমন্বিত ; **মহস্বৎ**—বিশেষ মাত্রায় ; **ওজঃ-সহস্বৎ**—বিশিষ্ট মানসিক এবং ইন্দ্রিয়ের দক্ষতা সমন্বিত ; **বলবৎ**—শক্তিসমন্বিত ; **ক্ষমাবৎ**—ক্ষমাযুক্ত ; **শ্রী**—সৌন্দর্য ; **হ্রী**—পাপকর্ম সাধনে লজ্জিত ; **বিভূতি**—ঐশ্বর্য ; **আত্মবৎ**—বুদ্ধিসম্পন্ন ; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক ; **অর্ণম্**—জাতি ; **তত্ত্বম্**—বিশিষ্ট সত্য ; **পরম**—দিব্য ; **রূপবৎ**—রূপসম্পন্ন ; **অস্বরূপম্**—ভগবানের রূপ নয়।

অনুবাদ

আমি স্বয়ং (ব্রহ্মা), শিব, ভগবান বিষ্ণু, দক্ষ আদি প্রজাপতি, তোমরা (নারদ তথা কুমারগণ) ইন্দ্র, চন্দ্র আদি স্বর্গলোকের অধিপতিগণ, ভূবর্লোকের অধিপতিগণ, মনুষ্যলোকের অধিপতিগণ, পাতালাদির অধিপতিগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও চারণলোকের অধিপতিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প ও নাগকুলের নায়কগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্রগণ, অন্যান্য যে সমস্ত প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলচর, পশু এবং পক্ষীকুলের অধিপতিগণ এবং এই জগতে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, তেজযুক্ত, ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত, মনোশক্তিযুক্ত, বলবান, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্যজনক, রূপবান ও অরূপ তা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত শক্তির এক অংশ মাত্র।

তাৎপর্য

উপরের তালিকায়, ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মাজী থেকে শুরু করে, শিব, বিষ্ণু, নারদ, দেবতা, মানুষ, অতিমানব, মুনি, ঋষি, অসাধারণ শক্তি এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন নিম্নস্তরের প্রাণী যথা প্রেত, পিশাচ, ভূত, শয়তান, জলচর, পক্ষী এবং পশু এদের সকলকে পরমেশ্বর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের কেউই পরমেশ্বর ভগবান নন ; তারা সকলেই কেবল ভগবানের মহাশক্তির এক অংশমাত্রের অধিকারী। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা জড় জগতের আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ দর্শন করে বিস্মিত হয়, ঠিক যেমন আদিবাসীরা বজ্রপাত, বিশাল বটবৃক্ষ, অথবা অরণ্যে উত্তুঙ্গ পর্বত দর্শন করে

ভয়ে ভীত হয়। এই প্রকার অনুন্নত মানুষেরা ভগবানের শক্তির এক নগণ্য অংশ দর্শন করে মোহিত হয়। তাদের থেকে যারা একটু উন্নত তারা দেবদেবীদের শক্তি দর্শন করে মোহিত হয়।

তাই, যারা ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে, কেবল তাঁর সৃষ্টির যে কোন বস্তুর শক্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়, তাদের বলা হয় শাক্ত বা মহাশক্তির উপাসক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও প্রাকৃত ঘটনার আশ্চর্যজনক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দর্শন করে মোহিত হয়, তাই তারাও শাক্ত। এই সমস্ত নিম্নস্তরের মানুষেরা ধীরে ধীরে সৌরীয় স্তরে (সূর্যদেবতার উপাসক) অথবা গাণপত্য স্তরে (জনতা-জনার্দন বা দরিদ্র-নারায়ণ ইত্যাদি রূপে জনসাধারণের বা গণপতির পূজক) উন্নীত হয়; তারপর নিত্য আত্মার অনুসন্ধানে শৈব স্তরে উন্নীত হয়, এবং তারপর আদি বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে না জেনেই বিষ্ণু, পরমাত্মা ইত্যাদির পূজকের স্তরে উন্নীত হয়।

অপরপক্ষে কেউ কেউ জাতি, রাষ্ট্র, পশু পক্ষী, ভূত, প্রেত, ইত্যাদির পূজা করে। দুঃখ-দুর্দশার দেবতা শনি, বসন্ত রোগের দেবতা শীতলাদেবী ইত্যাদির পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, এবং বহু মূর্খ মানুষ জনসাধারণের অথবা দরিদ্র মানুষদের পূজা করে। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী, ইত্যাদি ভ্রান্তিবশত বিভিন্ন শক্তিশালী বস্তুকে ভগবান বলে মনে করে ভগবানের শক্তির প্রকাশের পূজা করে।

কিন্তু এই শ্লোকে ব্রহ্মাজী উপদেশ দিয়েছেন যে তাদের কেউই পরমেশ্বর ভগবান নয়; তারা কেবল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান তাঁর বিভিন্ন অংশ মাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান যখন উপদেশ দিয়েছেন কেবল তাঁরই পূজা করতে, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর পূজা করা হলে অন্য সকলেরই পূজা হয়ে যায়। কেননা তিনি, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই পরম উৎস, তাই সকলেই তার অন্তর্ভুক্ত।

বৈদিক শাস্ত্রে যখন ভগবানকে নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়, তখন বুঝতে হবে, উপরে যে সমস্ত রূপগুলি বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি সব জাগতিক জ্ঞানে অনুভবের অন্তর্গত ভগবানের দিব্য শক্তিরই বিভিন্ন প্রদর্শন এবং তাদের কেউই ভগবানের চিন্ময় রূপের বাস্তবিক প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু ভগবান যখন প্রকৃতই এই পৃথিবীতে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনখানে অবতরণ করেন, তখন অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁকে তাদেরই মতো একজন বলে ভুল করে এবং কল্পনা করে যে চিন্ময় মানে হচ্ছে নিরাকার অথবা নির্বিশেষ।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান নিরাকার নন, অথবা বিরাটরূপের অন্তর্গত সমস্ত রূপের মধ্যে কোন একটি রূপ নন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান সম্বন্ধে জানতে হলে ব্রহ্মাজীর নির্দেশ অনুসারে তাঁর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

শ্লোক ৪৬

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি
লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষা—
ননুক্রমিষ্যে তে ইমান্‌সুপেশান্ ॥ ৪৬ ॥

প্রাধান্যতঃ—প্রধানত ; **যান্**—এই সমস্ত ; **ঋষে**—হে নারদ ; **আমনন্তি**—পূজা করে ; **লীলা**—লীলা ; **অবতারান্**—অবতারগণ ; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **ভূম্নঃ**—পরম ; **আপীয়তাম্**—তোমার আস্বাদনের জন্য ; **কর্ণ**—কর্ণ ; **কষায়ঃ**—কলুষ ; **শোষান্** —শোষণ করে ; **অনুক্রমিষ্যে**—ক্রমশ বলব ; **তে**—তারা ; **ইমান্**—যেইভাবে তারা আমার হৃদয়ে রয়েছে ; **সুপেশান্**—শ্রুতিমধুর ।

অনুবাদ

হে নারদ, সেই পরম পুরুষের লীলাবতারদের কথা শ্রবণ করলে অন্য কথা শ্রবণ করার বাসনারূপ কলুষ বিদূরিত হয়। সেই সমস্ত লীলা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং আস্বাদনীয়। তাই তারা আমার হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৫/৮) শুরুতেই বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ শ্রবণ করার সুযোগ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রবণেন্দ্রিয় পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। তাই ব্রহ্মাজী এই শ্লোকে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহের বর্ণনা করার মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রত্যেক জীবের শ্রুতিমধুর বাণী শ্রবণ করার প্রবণতা রয়েছে, এবং আমাদের সকলেরই বেতারের খবর এবং অন্যান্য বার্তা শ্রবণ করার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত খবর শুনে আমাদের হৃদয় কখনো তৃপ্ত হয় না। এই অতৃপ্তির কারণ হচ্ছে আত্মার অন্তরতম প্রদেশের যে চাহিদা,তার সঙ্গে এই সমস্ত সংবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব এই অপ্রাকৃত শাস্ত্রটি (শ্রীমদ্ভাগবত) নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে জনসাধারণের পরম পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছেন।

ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথমটি জড় সৃজনাত্মক শক্তির জাগতিক প্রকাশ এবং অন্যটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভগবানের বিভিন্ন অবতারে লীলাবিলাসের বর্ণনা। নদীর অসংখ্য তরঙ্গের মতো ভগবানের অসংখ্য অবতার রয়েছে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা জড় জগতে ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তি সম্বন্ধে অধিক উৎসাহী, এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়ার ফলে তারা

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় নানা রকম মতবাদ প্রস্তুত করে। ভগবানের ভক্তেরা কিন্তু ভালভাবেই জানেন কিভাবে ভগবানের জড়া শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়। তাই তাঁরা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান যে অপ্রাকৃত লীলা বিলাস করেন তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপের ইতিহাস, এবং যে সমস্ত মানুষ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণে উৎসাহী তাদের হৃদয়ের সঞ্চিত কলুষ অচিরেই বিদূরিত হয়। বাজারে হাজার হাজার আবর্জনাসদৃশ গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে যার রুচি হয়েছে,তিনি এই সমস্ত নোংরা গ্রন্থের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হয়ে পড়েন। এইভাবে ব্রহ্মাজী ভগবানের প্রধান প্রধান অবতারদের বর্ণনা করার প্রয়াস করেছেন যাতে নারদমুনি দিব্য অমৃতের মতো সেগুলি পান করতে পারেন।

ইতি "পুরুষ-সূক্তের স্বীকৃতি" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতারসমূহ

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **যত্র**—সেই সময় (যখন); **উদ্যতঃ**—অনুষ্ঠানে তৎপর; **ক্ষিতিতল**—পৃথিবী; **উদ্ধরণায়**—উদ্ধারের জন্য; **বিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **ক্রৌড়ীম্**—লীলা; **তনুম্**—রূপ; **সকল**—সমগ্র; **যজ্ঞময়ীম্**—সমস্ত যজ্ঞ যুক্ত; **অনন্তঃ**—অন্তহীন; **অন্তর**—ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে; **মহা-অর্ণবে**—বিশাল গর্ভসমুদ্রে; **উপাগতম্**—উপস্থিত হয়ে; **আদি**—প্রথম; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **তম্**—তাকে; **দংষ্ট্রয়া**—দন্ত দ্বারা; **অদ্রিম্**—মৈনাক পর্বতকে; **ইব**—মতো; **বজ্রধরঃ**—বজ্রধারী ইন্দ্র; **দদার**—বিদীর্ণ করেছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, যখন অনন্ত শক্তিশালী ভগবান গর্ভ-সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য লীলাচ্ছলে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আদি দৈত্য (হিরণ্যাক্ষ) সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং ভগবান তাকে তাঁর দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির শুরু থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলিতে সব সময় অসুর এবং দেবতা বা বৈষ্ণব, এই দুই শ্রেণীর জীব দেখা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম দেবতা এবং হিরণ্যাক্ষ হচ্ছে প্রথম অসুর। কতকগুলি বিশেষ অবস্থায়ই কেবল সমস্ত গ্রহগুলি ভারহীন গোলকের মতো মহাশূন্যে ভাসে এবং যখনই সেই পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা হয় তখন

গ্রহগুলি গর্ভোদক্-সমুদ্রে পতিত হতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ গর্ভোদক-সমুদ্রে পূর্ণ এবং বাকী অর্ধাংশ একটি গম্বুজের মতো যেখানে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থিত। মহাশূন্যে গ্রহগুলির ভারহীন অবস্থায় ভাসার ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর। আধুনিক যুগের অসুরেরা যে পৃথিবীর বক্ষে ছিদ্র করে তৈল আহরণ করছে, তার ফলে পৃথিবীর ভাসমান অবস্থায় এক বিরাট ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পুরাকালে (স্বর্ণলোভী) হিরণ্যাক্ষ প্রমুখ দৈত্যরা এই প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফলে পৃথিবী তার সাম্যভার হারিয়ে গর্ভোদক-সমুদ্রে পতিত হয়েছিল। তখন সমগ্র সৃষ্টির পালন কর্তা, পরমেশ্বর ভগবান এক বিশাল বরাহরূপ ধারণ করে গর্ভোদক্ সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই কাহিনী বর্ণনা করে মহান বৈষ্ণব কবি শ্রী জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন—

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না
কেশব ধৃত শূকররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

"হে কেশব! হে বরাহরূপধারী পরমেশ্বর ভগবান! আপনি পৃথিবীকে আপনার দশন-শিখরে ধারণ করেছিলেন, এবং তখন তাকে কলঙ্কযুক্ত চন্দ্রের মতো মনে হয়েছিল।"

এমনই হচ্ছে ভগবানের অবতারের লক্ষণ। ভগবানের অবতার কোন মানুষের মনগড়া কল্পনা নয়। যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভগবান অবতরণ করেন তার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে, এবং ভগবানের অবতার এমন কার্য সম্পাদন করেন যা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের কল্পনারও অতীত। আজকাল যারা সস্তা অবতার সৃষ্টি করে, তাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ভগবানের প্রকৃত অবতার এমনই এক বিরাট শূকরের রূপ পরিগ্রহ করেন যে, তাঁর দন্তের দ্বারা তিনি পৃথিবীকে বহন করতে পারেন।

ভগবান যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য ভগবানের সেই কার্যে বাধা দানের চেষ্টা করে, এবং তখন ভগবান তাকে তাঁর দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করে সংহার করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ভগবানের হস্তের দ্বারা নিহত হয়েছিল। তাই তাঁর মতে, হস্তের দ্বারা নিহত করার পর ভগবান সেই দৈত্যকে তাঁর দন্তের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই মতবাদ সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ২

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুয়মান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াম্।

লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ ॥ ২ ॥

জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **রুচেঃ**—রুচি নামক প্রজাপতির পত্নীর; **অজনয়ৎ**—জন্ম হয়েছিল; **সুয়মান্**— সুয়ম প্রমুখ; **সুযজ্ঞঃ**—সুযজ্ঞ; **আকূতি-সূনুঃ**—আকূতির পুত্রের; **অমরান্**—দেবতাগণ; **অথ**—এইভাবে; **দক্ষিণায়াম্**—দক্ষিণা নামক পত্নীকে; **লোক**—লোক; **ত্রয়স্য**—তিন; **মহতীম্**—অত্যন্ত বিশাল; **অহরৎ**—লাঘব করেছিলেন; **যৎ**—এই সমস্ত; **আর্তিম্**—ক্লেশ; **স্বায়ম্ভুবেন**—স্বায়ম্ভু নামক মনু কর্তৃক; **মনুনা**—মানব জাতির পিতা; **হরিঃ**—হরি; **ইতি**—এইভাবে; **অনূক্তঃ**—নামকরণ হয়েছিল।

অনুবাদ

সর্বপ্রথমে প্রজাপতি রুচির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর সুযজ্ঞ তাঁর পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুয়ম প্রমুখ দেবতাদের উৎপাদন করেছিলেন। সুয়ম ইন্দ্রদেবরূপে ত্রিলোকের (ঊর্ধ্ব, অধো এবং মধ্যবর্তী) মহান দুঃখভার হরণ করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখভার হরণ করেছিলেন বলে মানব জাতির পিতা স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে হরি নামে অভিহিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, খামখেয়ালী মানুষদের মনগড়া ভগবানের অবতার সৃষ্টি করার অবৈধ কার্যকলাপ নিরস্ত করার জন্য প্রামাণিক শাস্ত্রে ভগবানের প্রকৃত অবতারের পিতার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তাই শাস্ত্রে যদি পিতার নাম, এমনকি যে গ্রামে তিনি আবির্ভূত হবেন সেই গ্রামের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করা হয় তা হলে তাকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। ভাগবত-পুরাণে কল্কি অবতারের পিতার নাম এবং যে গ্রামে তিনি আবির্ভূত হবেন সেই গ্রামের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তাঁর আবির্ভাব হবে আজ থেকে চার লক্ষ বছরেরও পরে। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা কখনো প্রামাণিক শাস্ত্রের উল্লেখ ব্যতীত কোন সস্তা অবতারকে স্বীকার করেন না।

শ্লোক ৩

জজ্ঞে চ কর্দমগৃহে দ্বিজ দেবহূত্যাং
স্ত্রীভিঃ সমং নবভিরাত্মগতিং স্বমাত্রে।
ঊচে যয়াত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্ক—
মস্মিন্ বিধূয় কপিলস্য গতিং প্রপেদে ॥ ৩ ॥

জজ্ঞে—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **চ**—ও; **কর্দম**—কর্দম নামক প্রজাপতি; **গৃহে**—গৃহে; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **দেবহূত্যাম্**—দেবহূতির গর্ভে; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রী সমূহের দ্বারা;

সমম্—সঙ্গে ; **নবভিঃ**—নয় ; **আত্ম-গতিম্**—অধ্যাত্ম উপলব্ধি ; **স্বমাত্রে**—তাঁর মাতাকে ; **উচে**—বলেছিলেন ; **যয়া**—যার দ্বারা ; **আত্মশমলম্**—আত্মার আবরণ ; **গুণ সঙ্গ**—প্রকৃতির গুণসহ ; **পঙ্কম্**—পাঁক ; **অস্মিন্**—এই জীবনে ; **বিধূয়**—বিধৌত হয়ে ; **কপিলস্য**—ভগবান কপিলদেবের ; **গতিম্**—মুক্তি ; **প্রপেদে**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান তারপর কপিলদেব রূপে প্রজাপতি কর্দম এবং তাঁর পত্নী দেবহূতির পুত্ররূপে নয়জন রমণীসহ (ভগ্নী) অবতরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাতাকে আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি এই জন্মেই প্রকৃতির গুণরূপ পঙ্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়ে কপিলদেবের প্রদর্শিত পন্থায় মুক্তিলাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে (অধ্যায় ২৫-৩২) পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং যিনি এই উপদেশ অনুসরণ করেন তিনি দেবহূতির মতো মুক্তিলাভ করেন। ভগবান অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শুনিয়েছিলেন এবং তার ফলে অর্জুন আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং আজও কেউ যদি অর্জুনের পথের অনুসরণ করেন তাহলে তিনিও অর্জুনেরই গতি লাভ করতে পারবেন। এইটি হচ্ছে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। মূর্খ, বুদ্ধিহীন মানুষেরা তাদের কল্পনা মতো মনগড়া অর্থ তৈরি করে তাদের অনুগামীদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে এবং তার ফলে তারা সংসারের অন্ধকূপেই পড়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা কপিলদেবের উপদেশ পালন করেন তা হলে তিনি পরম মঙ্গল লাভ করতে পারেন। এমনকি আজও এটি সম্ভব।

পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভের বিষয়ে *আত্মগতিম্* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল জীব এবং ঈশ্বরের গুণগত সাম্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। আমাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে যতটুকু জানা সম্ভব ততটুকুই জানার চেষ্টা করা উচিত। ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানা কখনোই সম্ভব নয়। শিব অথবা ব্রহ্মা আদি মহান মুক্ত পুরুষদেরও পক্ষে তা সম্ভব নয়, সুতরাং অন্য দেবতা অথবা এই পৃথিবীর মানুষদের কি কথা! তথাপি, মহান ভক্ত এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে ভগবান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। ভগবানের অবতার, কপিলদেব তাঁর মাতাকে ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তার ফলে দেবহূতি দেবী ভগবানের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে কপিলদেব বিরাজ করেন। ভগবানের প্রত্যেক অবতারের পরব্যোমে নিজস্ব ধাম রয়েছে। তাই কপিলদেবেরও পৃথক বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। চিজ্জগত শূন্য নয়। সেখানে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠে ভগবান

তাঁর অসংখ্য বিস্তারের দ্বারা বিরাজমান, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাও সেখানে ভগবান এবং তাঁর পার্ষদদের মতো জীবনযাপন করেন।

ভগবান যখন স্বয়ং অথবা তাঁর স্বাংশরূপে অবতরণ করেন, তখন সেই অবতারদের বলা হয় অংশ, কলা, গুণাবতার, যুগাবতার এবং মন্বন্তরাবতার ইত্যাদি, এবং ভগবানের পার্ষদেরা যখন ভগবানের আদেশে অবতরণ করেন তখন তাঁদের বলা হয় শক্ত্যাবেশাবতার। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্ত অবতারদের আবির্ভাবের উল্লেখ প্রামাণিক শাস্ত্রে অকাট্য বিবরণাদির মাধ্যমেই সমর্থিত হয়ে থাকে, তা কোনও স্বার্থবাদী অপপ্রচারকের কল্পনার দ্বারা হয় না। উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার অবতারদের সকলেই সর্বদা ঘোষণা করেন যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম সত্য। পরম তত্ত্বের প্রচলিত জড়জাগতিক ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে পরমেশ্বরের রূপটিকে নস্যাৎ করে দেবারই নিতান্ত একটা পন্থা হল পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ধারণা।

জীব তার স্বরূপে গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন। তবে জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে ভগবান সর্বদাই জড়া-প্রাকৃতিক কলুষ থেকে মুক্ত, শুদ্ধ এবং পরম, কিন্তু জীবের মধ্যে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলুষিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণের এই কলুষ থেকে জীব পূর্ণরূপে বিধৌত হতে পারে জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির দ্বারা। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি ; তাই যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি কেবল পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই লাভ করেন না, অধিকন্তু তিনি জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং এইভাবে পূর্ণমুক্তির স্তর লাভ করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

জীব বদ্ধ অবস্থাতেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর অংশস্বরূপ রাম এবং নৃসিংহ আদি অবতারের দিব্য প্রেমভক্তিতে সরাসরি নিয়োজিত হতে পারেন। এইভাবে এমনই দিব্য ভক্তির দ্বারা ভক্ত ক্রমশঃ *ব্রহ্মগতিম্* বা *আত্ম-গতিম্* এর সমানুপাতিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমে অবশেষে *কপিলস্যগতিম্*, অর্থাৎ ভগবানের নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তির মধ্যে কলুষ-মুক্তির শক্তি এতই প্রবল যে, তা ভক্তের ইহকালের ভবরোগের সংক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। পূর্ণ মুক্তিলাভের জন্য ভক্তকে আর পরকালের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

শ্লোক ৪

অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো
দত্তো ময়াহমিতি যদ্ ভগবান্ স দত্তঃ।

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ॥ ৪ ॥

অত্রেঃ—ঋষি অত্রির ; **অপত্যম্**—সন্তান ; **অভিকাঙ্ক্ষত**—আকাঙ্ক্ষা করে ; **আহ**—বলেছিলেন ; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে ; **দত্তঃ**—প্রদান করেছিলেন ; **ময়া**—আমার দ্বারা ; **অহম্**—আমি ; **ইতি**—এইভাবে ; **যৎ**—যেহেতু ; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান ; **সঃ**—তিনি ; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয় ; **যৎ-পাদ**—যাঁর চরণ ; **পঙ্কজ**—পদ্ম ; **পরাগ**—রেণু ; **পবিত্র**—বিশুদ্ধ ; **দেহা**—দেহ ; **যোগ**—যৌগিক ; **ঋদ্ধিম্**—ঐশ্বর্য ; **আপুঃ**—লাভ করেছিলেন ; **উভয়ীম্**—উভয় জগতের ; **যদু**—যদু বংশের পিতা ; **হৈহয়াদ্যাঃ**—রাজা হৈহয় আদি।

অনুবাদ

অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করলাম।" তার ফলে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হয়েছিল। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের পরাগ দ্বারা পবিত্র হয়ে যদু, হৈহয় আদি নৃপতিগণ ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জীব এবং ভগবানের চিন্ময় সম্পর্ক পাঁচটি রসের মাধ্যমে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সেই রসগুলি হচ্ছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। অত্রি ঋষি ভগবানের সঙ্গে বাৎসল্য রসে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই তাঁর ভক্তির শুদ্ধ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে কামনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর পুত্ররূপে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে এই প্রকার বাৎসল্য ভাবের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ভগবান যেহেতু অনন্ত, তাই তাঁর অসংখ্য পিতামাতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পিতা, কিন্তু ভক্তের প্রেমের বশবর্তী হয়ে ভগবান পিতা হওয়ার পরিবর্তে তাঁর ভক্তের পুত্র হওয়ার মাধ্যমে অধিক আনন্দ লাভ করেন। বস্তুত পিতা পুত্রের সেবা করেন আর পুত্র পিতার কাছে সবরকম সেবা দাবী করে ; তাই সর্বদা ভগবানের সেবা করতে উৎসুক শুদ্ধ ভক্তও ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে কামনা করেন, পিতারূপে নয়। ভগবানও ভক্তের এই প্রকার সেবা স্বীকার করেন, এবং তার ফলে ভক্ত ভগবান থেকে বড় হয়ে যান। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভক্তেরা সবচাইতে বড় অদ্বৈতবাদীদেরও বাসনা অতিক্রম করে ভগবানের থেকেও বড় হয়ে যান। ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাঁর পিতা-মাতা আদি আত্মীয়-স্বজনেরা আপনা থেকেই সবরকম যৌগিক ঐশ্বর্য লাভ করেন। সর্বপ্রকার জড় সুখ, মুক্তি এবং

যোগসিদ্ধি এই ঐশ্বর্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই ভগবদ্ভক্ত তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করে পৃথকভাবে সেগুলির অন্বেষণ করেন না। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জীবনের মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তখন অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলি আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্ত প্রাপ্তি লাভের পরেও সর্বদা ভগবদ্ভক্তের চরণে যাতে অপরাধ না হয়ে যায় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হৈহয়, যিনি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে এই সমস্ত সিদ্ধি লাভ করা সত্ত্বেও একজন ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করার ফলে পরশুরাম কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। ভগবান মহর্ষি অত্রির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত হন।

শ্লোক ৫

তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে
আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্কল্পসম্প্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং
সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্ ॥ ৫ ॥

তপ্তম্—তপস্যা করে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বিবিধ-লোক**—বিভিন্ন লোক; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টি করার বাসনা করে; **মে**—আমার; **আদৌ**—প্রথমে; **সনাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **স্ব-তপসঃ**—আমার তপস্যার দ্বারা; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **চতুঃসনঃ**—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন এবং সনাতন নামক চার কুমার; **অভূৎ**—আবির্ভূত হন; **প্রাক্**—পূর্বে; **কল্প**—সৃষ্টি; **সম্প্লব**—প্লাবনে; **বিনষ্টম্**—ধ্বংস; **ইহ**—এই জড় জগতে; **আত্ম**—আত্মা; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **জগাদ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **যৎ**—যা; **অচক্ষত**—স্পষ্টরূপে দর্শন করেছিলেন; **আত্মন্**—আত্মাকে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করার বাসনা করে আমি তপস্যা করেছিলাম, এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তখন চতুঃসন রূপে (সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন) আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্বকল্পে প্রলয়ে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু চতুঃসনেরা তা এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে মুনিগণ তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু-সহস্রনাম স্তোত্রে ভগবানের *সনাৎ* এবং *সনাতনতম* নাম দুটির উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান এবং জীব উভয়েই গুণগতভাবে সনাতন বা নিত্য, কিন্তু ভগবান

হচ্ছেন *সনাতনতম*। জীবেরাও সনাতন, কিন্তু সনাতনতম নয়, কেননা জীবের অনিত্য জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাই আয়তনগতভাবে জীব *সনাতনতম* ভগবান থেকে ভিন্ন।

দান অর্থেও *সন* শব্দটির ব্যবহার হয়; তাই ভক্ত যখন ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেন, তখন ভগবান তার বিনিময়ে নিজেকে ভক্তের কাছে সমর্পণ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৪/১১) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*। ব্রহ্মাজী পূর্ব কল্পের মতো পুনরায় সৃষ্টি করার বাসনা করেছিলেন, এবং যেহেতু পূর্ববর্তী প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড থেকে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি পুনরায় সেই জ্ঞান প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন; তা না হলে সৃষ্টির কোন অর্থই থাকে না। যেহেতু দিব্য জ্ঞান হচ্ছে পরম প্রয়োজন, তাই সৃষ্টির প্রতিকল্পে বদ্ধ জীবদের মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মাজীর এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল যখন চতুঃসন সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই চতুঃসন হচ্ছেন ভগবানের জ্ঞানাবতার, তাই তাঁরা এমন স্পষ্টভাবে দিব্য জ্ঞান বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, সমস্ত ঋষিরা তৎক্ষণাৎ অনায়াসে তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চতুঃসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তৎক্ষণাৎ অন্তরে ভগবানকে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৬

ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং
নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ।
দৃষ্ট্বাত্মনো ভগবতো নিয়মাবলোপং
দেব্যস্ত্বনঙ্গপৃতনা ঘটিতুং ন শেকুঃ ॥ ৬ ॥

ধর্মস্য—ধর্মের (ধর্মনীতির নিয়ন্তা); **দক্ষ**—দক্ষ প্রজাপতি; **দুহিতরি**—কন্যাকে; **অজনিষ্ট**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **মূর্ত্যাম্**—মূর্তি নামক; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **নরঃ**—নর; **ইতি**—এইপ্রকার; **স্ব-তপঃ**—স্বীয় তপস্যা; **প্রভাবঃ**—শক্তি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **নিয়ম-অবলোপম্**—ব্রতভঙ্গ; **দেব্যঃ**—অপ্সরাগণ; **তু**—কিন্তু; **অনঙ্গ-পৃতনাঃ**—কামদেবের সহচর; **ঘটিতুম্**—হওয়ার জন্য; **ন**—কখনই নয়; **শেকুঃ**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের নিজস্ব পন্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি ধর্মের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে নর এবং নারায়ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কামদেবের সঙ্গিনী অপ্সরাগণ তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে যখন দেখল যে তাদের মতো বহু সুন্দরীগণ তাঁর দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে, তখন তারা বিফল মনোরথ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান সব কিছুর উৎস হওয়ার ফলে তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনেরও উৎস। ঋষিরা আত্মজ্ঞান লাভে সাফল্য অর্জন করার জন্য কঠোর তপস্যা করার ব্রত গ্রহণ করেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান ব্রহ্মচর্যের ব্রত সহকারে এই প্রকার তপস্যা করা। তপস্যার জীবনে কোনরকম স্ত্রী-সঙ্গের স্থান নেই। মানব জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা করা, তাই সনাতন-ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্মের তিনটি আশ্রমেই স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্রম অনুসারে জীবনকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। জীবনের প্রথম অবস্থায়, পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সদ্‌গুরুর নির্দেশে শিক্ষা লাভ করতে হয়, যার ফলে বোঝা যায় যে জড় জগতের প্রকৃত বন্ধন হচ্ছে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি। কেউ যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই স্ত্রীলোকের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে হবে। জীবের পক্ষে স্ত্রীলোকেরা হচ্ছে মোহিনী-তত্ত্ব ; আর পুরুষরূপ হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, বিশেষ করে মানুষদের ক্ষেত্রে। স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণের মোহে সমস্ত জগৎ আবর্তিত হচ্ছে, এবং পুরুষ যখন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তৎক্ষণাৎ সে জড় জগতের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যখন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই প্রভুত্ব করার মিথ্যা গর্বে মত্ত হয়ে এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনা বিকশিত হতে শুরু করে। বাড়ি, জমি, সন্তান, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ, জাতি ও জন্মভূমির প্রতি প্রেম, ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষা—এই সমস্ত মায়িক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়, যা মানুষকে ভারাক্রান্ত করে এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্ম-উপলব্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য আদি উচ্চ বর্ণের বালককে পাঁচ বছর বয়স থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করার মাধ্যমে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করে জীবনের মূল্য এবং জীবিকা অর্জনের বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ করতে হয় এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। তারপর ব্রহ্মচারী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে উপযুক্ত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু অনেক ব্রহ্মচারী আছেন যাঁরা গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করে, স্ত্রী-সঙ্গ না করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেন। স্ত্রী-সঙ্গ জনিত অনর্থক বোঝা যে আত্ম উপলব্ধির প্রতিবন্ধক, তা ভালভাবে উপলব্ধি করে তাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। জীবনের বিশেষ কোন স্তরে কাম-বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয় বলে গুরুদেব ব্রহ্মচারী শিষ্যকে বিবাহ করতে অনুমতি দেন। যে সমস্ত ব্রহ্মচারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের জীবন যাপনে অক্ষম, তাদেরই এই অনুমতি দেওয়া হয় এবং সদ্‌গুরু তা বিচার করতে পারেন। তথাকথিত পরিবার পরিকল্পনা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা লাভ করার পর যিনি গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করেছেন, তিনি

শাস্ত্রানুমোদিত রীতি অনুসারে স্ত্রী-সঙ্গ করেন। তিনি কুকুর-বিড়ালের মতো গৃহস্থ হন না। এমনই গৃহস্থ পঞ্চাশ বছর বয়সের পর স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে একাকী বাস করার অভ্যাস করেন। সেই অনুশীলন পূর্ণ হলে তিনি কঠোরতা সহকারে সবরকম স্ত্রী-সঙ্গ, এমন কি তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। স্ত্রী-সঙ্গ বর্জনে সমগ্র পদ্ধতি বিবেচনা করে মনে হয়, আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধির পথে নারী এক বিশাল প্রতিবন্ধক, এবং ভগবান তাই নর-নারায়ণরূপে আবির্ভূত হয়ে স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করার ব্রত শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই কঠোর ব্রহ্মচারীদ্বয়ের তপস্যাদর্শন করে স্বর্গের দেবতারা ঈর্ষা পরায়ণ হয়েছিলেন এবং কামদেবের সৈন্যদের তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ব্রত ভঙ্গ করার জন্য। কিন্তু কামদেবের সহচরী সেই সমস্ত দিব্যাঙ্গনারা যখন দেখল যে ভগবান তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে তাদের মতো অসংখ্য সুন্দরীদের সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং তাই তাদের প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই, তখন তারা বিফল মনোরথ হয়েছিল। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে ময়রা কখনো মিষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সর্বক্ষণ মিষ্টি তৈরী করছে যে ময়রা তার মিষ্টি খাওয়ার কোন বাসনা থাকে না; তেমনই ভগবান তাঁর হ্লাদিনী-শক্তির প্রভাবে অসংখ্য চিন্ময় সুন্দরীদের সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাই তাঁর জড় সৃষ্টির মায়িক সুন্দরীদের প্রতি লেশমাত্র আকর্ষণ নেই। যারা সেকথা জানে না তারা মূর্খের মতো অভিযোগ করে যে ভগবান বৃন্দাবনে রাসলীলায় অথবা দ্বারকায় ষোলহাজার মহিষীদের সঙ্গে স্ত্রী-সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত ॥ ৭ ॥

কামম্—কাম; **দহন্তি**—দগ্ধ করেন; **কৃতিনঃ**—মহা বলবান ব্যক্তিগণ; **ননু**— কিন্তু; **রোষদৃষ্ট্যা**—রোষপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা; **রোষম্**—ক্রোধ; **দহন্তম্**—অভিভূত হয়ে; **উত**—যদিও; **তে**—তারা; **ন**—পারে না; **দহন্তি**—বশীভূত করতে; **অসহ্যম্**—দুঃসহ; **সঃ**—তা; **অয়ম্**—তাঁকে; **যৎ**—যেহেতু; **অন্তরম্**—ভিতরে; **অলম্**—তা সত্ত্বেও; **প্রবিশন্**—প্রবেশ করে; **বিভেতি**— ভয়ভীত হয়; **কামঃ**—কাম; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **পুনঃ**—পুনরায়; **অস্য**—তাঁর; **মনঃ**—মন; **শ্রয়েত**—শরণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

শিবের মতো মহাবলবান ব্যক্তিরা তাঁদের রোষযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের ক্রোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু ক্রোধের অতীত ভগবানের অমল অন্তঃকরণে ক্রোধ কখনো প্রবেশ করতে পারে না, অতএব তাঁর মনে কিভাবে কাম আশ্রয় গ্রহণ করবে?

তাৎপর্য

শিব যখন কঠোর তপস্যা সহকারে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তখন কামদেব তাঁর প্রতি কামবাণ নিক্ষেপ করেন। মহাদেব তখন ক্রুদ্ধ হয়ে কামদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ফলে তৎক্ষণাৎ কামদেবের দেহ তাঁর ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায়। শিব যদিও অত্যন্ত শক্তিমান, তথাপি তিনি তাঁর ক্রোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর আচরণে কখনো এই প্রকার ক্রোধ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ভগবানের সহনশক্তি পরীক্ষা করার জন্য ভৃগুমুনি তাঁর বক্ষে পদাঘাত করেন। কিন্তু ভৃগু মুনির প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে ভগবান ভৃগুমুনির কাছে এই বলে ক্ষমা ভিক্ষা করেন যে, তাঁর অতীব কঠোর বক্ষে চরণাঘাত করার ফলে ভৃগুমুনির চরণে ব্যথা লেগে থাকতে পারে। ভগবানের বক্ষঃস্থলে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন তাঁর সহিষ্ণুতার প্রতীক। এইভাবে ভগবান কখনো ক্রোধের দ্বারা প্রভাবিত হন না, সুতরাং তাঁর অন্তরে ক্রোধের থেকে কম শক্তিশালী কাম-বাসনা কিভাবে স্থান পেতে পারে? কাম-বাসনা চরিতার্থ না হওয়ার ফলে ক্রোধের উদয় হয়, কিন্তু ক্রোধ যদি না থাকে তখন কামের উদয় হবে কি করে? তাই ভগবানের আর এক নাম *আত্মকাম,* অর্থাৎ যিনি স্বয়ং তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ভগবান অনন্ত এবং তাই তাঁর বাসনাসমূহও অনন্ত। ভগবান ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবই সর্বতোভাবে সীমিত ; অতএব সসীম কিভাবে অসীমের বাসনা চরিতার্থ করতে পারে? চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পরমেশ্বর ভগবানের কাম এবং ক্রোধ কোনটিই নেই, এবং যদিও কখনো কখনো ভগবানের মধ্যে কাম এবং ক্রোধের প্রদর্শন হতে দেখা যায়, তবে তা পরম আশীর্বাদ বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৮

বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো
বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্যধস্তাৎ ॥ ৮ ॥

বিদ্ধঃ—আহত হয়ে ; **সপত্নী**—সপত্নী ; **উদিত**—উক্ত ; **পত্রিভিঃ**—তীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা ; **অন্তি**—সমীপে ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার ; **বালঃ**—বালক ; **অপি**—যদিও ; **সন্**—হয়ে ;

উপগতঃ—গমন করেছিল; **তপসে**—কঠোর তপস্যা; **বনানি**—গভীর অরণ্যে; **তস্মৈ**—অতএব; **অদাৎ**—পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন; **ধ্রুবগতিম্**—ধ্রুবলোকে নিত্যগতি; **গৃণতে**—প্রার্থিত হয়ে; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **দিব্যাঃ**—উচ্চলোকের অধিবাসীগণ; **স্তুবন্তি**—স্তব করেন; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **যৎ**—যার ফলে; **উপরি**—উপরিস্থিত; **অধস্তাৎ**—নীচের।

অনুবাদ

রাজার সমক্ষে ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে অপমানিত বোধ করেছিলেন, এবং বালক হওয়া সত্ত্বেও কঠোর তপস্যা করার জন্য বনে গমন করেছিলেন। ভগবান তখন ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন, উপরিস্থিত এবং অধঃস্থিত মহর্ষিগণ যাঁর স্তব করে থাকেন।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত রাজপুত্র ধ্রুব যখন পাঁচ বছর বয়সের বালক ছিলেন, তখন একদিন তাঁর পিতার কোলে বসে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিমাতা তাঁর প্রতি রাজার এই স্নেহ প্রদর্শন সহ্য করতে পারেনি। তাই সে এই বলে তাঁকে রাজার কোল থেকে নামিয়ে দেয় যে তার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করার ফলে তাঁর রাজার কোলে বসার অধিকার নেই। বিমাতার এই আচরণে ধ্রুব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন, এবং তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মাও এই অপমানের কোন প্রতিকার করতে সক্ষম না হয়ে কেবল ক্রন্দন করেছিলেন। বালক ধ্রুব তখন তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিভাবে তিনি তাঁর পিতার সিংহাসনের থেকেও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন; দুঃখিনী রানী তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে ভগবানই কেবল তাঁর সেই আশা পূর্ণ করতে পারেন। বালক তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোথায় ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, এবং রানী উত্তর দেন যে মহান ঋষিরা কখনো কখনো গভীর অরণ্যে ভগবানের দর্শন লাভ করে থাকেন। তাঁর ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তখন সেই বালক রাজপুত্র কঠোর তপস্যা করার জন্য অরণ্যে গমন করতে মনস্থ করেন।

রাজকুমার ধ্রুব ভগবান কর্তৃক প্রেরিত তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। নারদ মুনি ধ্রুবকে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং ভগবান বাসুদেব পৃশ্নিগর্ভ নামক চতুর্ভুজ রূপে অবতরণ করে রাজকুমার ধ্রুবকে সপ্তর্ষিমণ্ডলেরও ঊর্ধ্বে এক বিশেষ গ্রহলোক প্রদান করেছিলেন। ঈপ্সিত ফল লাভের পর রাজকুমার ধ্রুব ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পান, এবং তাঁর সমস্ত অভাব পূরণে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

ধ্রুব মহারাজকে পুরস্কারস্বরূপ যে লোক প্রদান করা হয়েছিল তা হচ্ছে এক অবিচল বৈকুণ্ঠলোক, যা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ইচ্ছায় জড় আকাশে স্থাপন করা

হয়েছিল। এই লোকটি জড় জগতে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রলয়ের সময়ে ধ্বংস না হয়ে অবিচলিতভাবে একই জায়গায় থাকবে। এই লোকটি বৈকুণ্ঠলোক হওয়ার ফলে অবিনাশী। এই ধ্রুব লোকের নিম্নে অবস্থিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিগণ এবং এই লোকের উপরে অবস্থিত ভৃগু আদি মহর্ষিগণ এই লোকের স্তব করে থাকেন।

শুদ্ধভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান পৃশ্নিগর্ভরূপে অবতরণ করেছিলেন। রাজকুমার ধ্রুব শুদ্ধভক্ত নারদমুনি কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে উপরোক্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করার ফলেই কেবল সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যখন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁর সমক্ষে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পথ প্রদর্শন করেন, এবং কেবল শুদ্ধভক্ত কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার ফলে তিনি ভগবানকে দর্শন করার সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে আমরা ধ্রুব মহারাজের উপাখ্যান বিশদভাবে পাঠ করব।

শ্লোক ৯

যদ্বেনমুৎপথগতং দ্বিজবাক্যবজ্র-
নিষ্প্লুষ্টপৌরুষভগং নিরয়ে পতন্তম্।
ত্রাত্বার্থিতো জগতি পুত্রপদং চ লেভে
দুগ্ধা বসূনি বসুধা সকলানি যেন ॥ ৯ ॥

যৎ—যখন; বেনম্—বেন রাজাকে; **উৎপথ-গতম্**—উন্মার্গগামী; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **বাক্য**—অভিশাপ; **বজ্র**—বজ্র; **নিষ্প্লুষ্ট**—দগ্ধ; **পৌরুষ**—মহান কার্যাবলী; **ভগম্**—ঐশ্বর্য; **নিরয়ে**—নরকে; **পতন্তম্**—অধঃপতিত হয়ে; **ত্রাত্বা**—উদ্ধার করে; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **জগতি**—জগতে; **পুত্রপদম্**—পুত্রের পদ; **চ**—ও; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দুগ্ধা**—দহন করেছিলেন; **বসূনি**—উৎপাদন; **বসুধা**—পৃথিবী; **সকলানি**—সর্বপ্রকার; **যেন**—যার দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ বেন উৎপথগামী হয়েছিল এবং তখন ব্রাহ্মণদের বজ্র-কঠোর শাপবাক্যে তার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য দগ্ধ হয়। সে নরকে পতিত হতে থাকলে ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় এবং তাকে পরিত্রাণ করার জন্য ভগবান পৃথু অবতারে তার পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং সর্বপ্রকার শস্য পৃথিবী থেকে দোহন করেন।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রথায় পুণ্যবান এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন সমাজের প্রকৃত অভিভাবক। সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা রাজাদের উপদেশ দিতেন কিভাবে ধর্মের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করতে হয়, এবং তার ফলে পূর্ণ কল্যাণকারী রাজ্যের

স্থাপনা হত। রাজা অথবা ক্ষত্রিয় প্রশাসক সর্বদা বিদ্বান ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাঁরা কখনই স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের প্রজাদের শাসন করতেন মনু-সংহিতা এবং মহর্ষিগণ রচিত অন্যান্য প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে এবং তাই তখন প্রজাতন্ত্রের নামে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আইন প্রণয়ন করতে হত না। যেমন একটি শিশুর নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণেরও নিজেদের কল্যাণের বিষয়ে জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। অভিজ্ঞ পিতা যেমন তাঁর অবোধ শিশুপুত্রকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান, তেমনই শিশুসদৃশ জনসাধারণের এই প্রকার পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। মনু-সংহিতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে জন সাধারণের কল্যাণ সাধনের পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে, এবং সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রগ্রন্থের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণেরা স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে রাজাদের উপদেশ দিতেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার বেতনভোগী সেবক ছিলেন না, এবং তাই শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে রাজাকে আদেশ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। এই পদ্ধতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং ব্রাহ্মণ চাণক্য তাঁর অবৈতনিক মন্ত্রী ছিলেন।

মহারাজ বেন শাসনের এই নিয়ম পালন করেনি। সে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করেছিল। উদারচিত্ত ব্রাহ্মণদের কোন রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, পক্ষান্তরে তাঁরা কেবল জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁরা বেন রাজাকে তার অসৎ আচরণের জন্য দণ্ড দান করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন এবং রাজাকে অভিশাপ দেন।

মহাপুরুষদের অবজ্ঞা করার ফলে আয়ু, আজ্ঞানুবর্তিতা, যশ, পুণ্য, উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা এবং মহাত্মাদের আশীর্বাদ—এই সমস্ত বিনষ্ট হয়ে যায়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। মহারাজ বেন যে তার পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে রাজা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যেহেতু সে জেনে শুনে মহাত্মাদের অবজ্ঞা করেছিলেন, তাই তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল এবং উল্লিখিত সমস্ত গুণগুলি সে হারায়।

বামন-পুরাণে মহারাজ বেনের অধঃপতনের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ পৃথু যখন জানতে পারেন যে তাঁর পিতা বেন এক ম্লেচ্ছ পরিবারে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাক্তন রাজাকে কলুষমুক্ত করার জন্য কুরুক্ষেত্রে নিয়ে আসেন এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে তাকে মুক্ত করেন।

পৃথিবীর বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য ব্রাহ্মণদের প্রার্থনার ফলে ভগবান মহারাজ পৃথুরূপে অবতরণ করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার শস্য উৎপাদন করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি পুত্রের কর্তব্যও সম্পাদন করে তাঁর পিতাকে নারকীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। *পুত্র* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পুৎ নামক নরক থেকে যিনি

তাঁর পিতাকে উদ্ধার করেন। এই কর্তব্য সম্পাদনে যিনি সমর্থ, তিনিই হচ্ছেন যোগ্য পুত্র।

শ্লোক ১০

নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনু-
র্যো বৈ চচার সমদৃগ্ জড়যোগচর্যাম্।
যৎ পারমহংস্যমৃষয়ঃ পদমামনন্তি
স্বস্থঃ প্রশান্তকরণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

নাভেঃ—মহারাজ নাভির দ্বারা; **অসৌ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **আস**—হয়েছিলেন; **সুদেবিসূনুঃ**—সুদেবীর পুত্র; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **চচার**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **সমদৃক্**—সমদর্শী; **জড়**—ভৌতিক; **যোগচর্যাম্**—যোগ অনুশীলন; **যৎ**—যা; **পারমহংস্যম্**—সিদ্ধির পরম অবস্থা; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **পদম্**—পদ; **আমনন্তি**—স্বীকার করেন; **স্বস্থঃ**—স্বরূপস্থিত; **প্রশান্ত**—স্থির; **করণঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **পরিমুক্ত**—পূর্ণরূপে মুক্ত; **সঙ্গঃ**—জড় কলুষ।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি এবং তাঁর পত্নী সুদেবীর পুত্ররূপে ভগবান আবির্ভূত হয়ে ঋষভদেব নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মনের সাম্যভাব লাভের জন্য জড়-যোগ অনুশীলন করেছিলেন। এই অবস্থাকে পারমহংসপদ বা মুক্তির চরম সিদ্ধ অবস্থা বলে মনে করা হয়, যে স্তরে জীব তার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে পূর্ণরূপে প্রশান্ত চিত্ত হয়।

তাৎপর্য

আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধির যত প্রকার যোগের পন্থা রয়েছে, তার মধ্যে জড়-যোগ হচ্ছে একটি। এই জড়-যোগ অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাথরের মতো জড় হয়ে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে অবিচল থাকা। পাথর যেমন সব রকম বাহ্য ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি উদাসীন থাকে, তেমনই জড়-যোগের অনুশীলনকারী দেহের সমস্ত কষ্টের প্রতি উদাসীন থাকেন।

এই প্রকার যোগীরা নিজের দেহকে নানাভাবে পীড়ন করেন এবং এই রকম পীড়ন করার বহু পন্থার মধ্যে একটি পন্থা হচ্ছে ক্ষুরের সাহায্যে দাড়ি এবং চুল কাটার পরিবর্তে হাত দিয়ে চুল ছেঁড়ার অভ্যাস। এই প্রকার জড়-যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়া। মহারাজ ঋষভদেব তাঁর জীবনের শেষ ভাগে, সমস্ত দৈহিক নির্যাতনের প্রতি উদাসীন হয়ে নির্বাক উন্মাদের মতো ঘুরতেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত ঋষভদেবকে উন্মাদ বলে

মনে করে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু এবং মানুষেরা তাঁকে নানাভাবে উৎপীড়ন করত, কখনো কখনো তাঁর দেহে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করত অথবা প্রস্রাব করত। ঋষভদেবও কখনো কখনো তাঁর নিজের মলের উপর নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর মল ছিল সুরভিত পুষ্পের মতো সুগন্ধযুক্ত, এবং মহাত্মারা তাঁকে মানব-জীবনের চরম সিদ্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত এক পরমহংসরূপে চিনতে পারতেন। কেউ যদি তার মলকে ফুলের মতো সুরভিত করতে না পারে, তা হলে তার মহারাজ ঋষভদেবের অনুকরণ করা উচিত হবে না। মহারাজ ঋষভদেব এবং যাঁরা তাঁর মতো সিদ্ধির চরম স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদেরই পক্ষে জড়-যোগের অনুশীলন করা সম্ভব, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ধরনের অসাধারণ যোগাভ্যাস অসম্ভব।

এই শ্লোকে জড়-যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল *প্রশান্তকরণঃ* বা ইন্দ্রিয়াদি দমন। যোগসাধনায় সমগ্র পন্থা, তা যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন, তা হল অসংযত জড় ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করে আত্ম-উপলব্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার পন্থা। বিশেষ করে এই যুগে এই জড়-যোগের কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে না, বরং ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব, কেননা তা এই যুগের ঠিক উপযোগী। যথাযথ সূত্রে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার অত্যন্ত সরল পন্থা মানুষকে যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাবে।

ঋষভদেব ছিলেন মহারাজ নাভির পুত্র এবং মহারাজ আগ্নীধ্রর পৌত্র। তিনি ছিলেন মহারাজ ভরতের পিতা, যে ভরতের নাম অনুসারে এই পৃথিবীকে বলা হত ভারতবর্ষ। এখানে যদিও ঋষভদেবের মাতাকে সুদেবী নামে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মেরুদেবী নামেও পরিচিত ছিলেন। কখনো বা বলা হয়ে থাকে যে, সুদেবী ছিলেন মহারাজ নাভির অন্য পত্নী, কিন্তু অন্যান্য স্থানে যেহেতু মহারাজ ঋষভদেবকে মেরুদেবীর পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই মেরুদেবী এবং সুদেবী যে একই জনের দুটি নাম, তা সুস্পষ্ট।

শ্লোক ১১

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ॥ ॥ ১১ ॥

সত্রে—যজ্ঞ-উৎসবে; **মম**—আমার; **আস**—প্রকট হয়েছিল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হয়শীরষা**—অশ্বের শির সমন্বিত; **অথঃ**—এইভাবে; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **স**—তিনি; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে যিনি সন্তুষ্ট হন; **তপনীয়**—স্বর্ণময়; **বর্ণঃ**—রং; **ছন্দঃ-ময়ঃ**—বৈদিক মন্ত্রের মূর্তিমান প্রকাশ; **মখ-ময়ঃ**—যজ্ঞের মূর্তিমান প্রকাশ; **অখিল**—সবকিছু; **দেবতাত্মা**—দেবতাদের আত্মা; **বাচঃ**—শব্দ; **বভূবুঃ**—

শোনা গিয়েছিল; **উশতীঃ**—অত্যন্ত শ্রুতিমধুর; **শ্বসতঃ**—শ্বাস গ্রহণ করার সময়; অস্য—তাঁর; **নস্তঃ**—নাসিকার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান আমার (ব্রহ্মার) অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হয়গ্রীব অবতার রূপে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি সুবর্ণস্বরূপ। তিনি সাক্ষাৎ বেদ এবং সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। যখন তিনি শ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে সমস্ত মধুর বৈদিক স্তোত্র ধ্বনিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যে সমস্ত কর্মীরা সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে রত, বৈদিক স্তোত্র সমূহ সাধারণত তাদের জন্য। তারা দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে তাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে চায়। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বৈদিক স্তোত্র। তাই কেউ যখন সরাসরিভাবে ভগবানের ভক্ত হন, তার মাধ্যমে আপনা থেকেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান সম্পাদিত হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্তেরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করতে পারেন অথবা দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা না করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবদ্ভক্তেরা সকাম কর্মী এবং বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসক থেকে অনেক উন্নত স্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ১২

মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষোণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥ ১২ ॥

মৎস্যঃ—মৎস্যাবতার; **যুগ-অন্ত**—কল্পান্তে; **সময়ে**—সময়ে; **মনুনা**—ভাবী বৈবস্বত মনুর দ্বারা; **উপলব্ধঃ**—অনুভূত; **ক্ষোণীময়ঃ**—পৃথিবী পর্যন্ত; **নিখিল**— সমস্ত; **জীব**—জীব; **নিকায়কেতঃ**—আশ্রয়; **বিস্রংসিতান্**—উদ্ভূত; **উরু**—মহান; **ভয়ে**—ভয় থেকে; **সলিলে**—জলে; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **মে**—আমার; **আদায়**—নিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **বিজহার**—উপভোগ করেছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **বেদমার্গান্**—সমস্ত বেদের পন্থা।

অনুবাদ

কল্পান্তে সত্যব্রত নামক ভাবী বৈবস্বত মনু দেখতে পাবেন যে মৎস্যাবতাররূপে ভগবান পৃথিবী পর্যন্ত সর্বপ্রকার জীবাত্মাদের আশ্রয়। কেননা কল্পান্তে প্রলয়-বারির

ভয়ে ভীত হয়ে বেদ-সমূহ আমার (ব্রহ্মার) মুখ থেকে নির্গত হয়, এবং ভগবান তখন সেই বিশাল জল রাশি দর্শন করে উৎফুল্ল হন এবং বেদসমূহকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়, এবং প্রত্যেক মনুর অন্তে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। সেই বিশাল জলরাশি ব্রহ্মারও ভীতিজনক। তাই ভাবী বৈবস্বত মনু শুরুতে এই ধ্বংস-লীলা দর্শন করবেন। অন্য বহু ঘটনাও ঘটবে, যেমন শঙ্খাসুর বধ। ব্রহ্মা তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কেননা তিনি জানতেন যে সেই ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর ঘটনার সময় তাঁর মুখ থেকে বেদসম্ভার তাঁর মুখনিঃসৃত হবে, এবং মৎস্যাবতারে ভগবান কেবল দেবতা, মনুষ্য, পশু, ঋষি প্রমুখ সমস্ত জীবদেরই উদ্ধার করবেন তাই নয়, পক্ষান্তরে তিনি বেদকেও রক্ষা করবেন।

শ্লোক ১৩

ক্ষীরোদধাবমরদানবযূথপানা-
মুন্মথ্নতামমৃতলব্ধয় আদিদেবঃ।
পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপুর্বিদধার গোত্রং
নিদ্রাক্ষণোঽদ্রিপরিবর্তকষাণকণ্ডূঃ ॥ ১৩ ॥

ক্ষীর—দুধ; **উদধৌ**—সমুদ্রে; **অমর**—দেবতাগণ; **দানব**—অসুরগণ; **যূথপানাম্**—দুই দলের নায়কদের; **উন্মথ্নতাম্**—মন্থন করার সময়; **অমৃত**—অমৃত; **লব্ধয়**—লাভের জন্য; **আদিদেবঃ**—আদিপুরুষ ভগবান; **পৃষ্ঠেন**—পৃষ্ঠের দ্বারা; **কচ্ছপ**—কূর্ম; **বপুঃ**—দেহ; **বিদধার**—ধারণ করেছিলেন; **গোত্রম্**—মন্দর পর্বত; **নিদ্রাক্ষণঃ**—অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়; **অদ্রি-পরিবর্ত**—পর্বতের ঘূর্ণন; **কষাণ**—ঘর্ষণসুখ; **কণ্ডূঃ**—কণ্ডূয়ন।

অনুবাদ

আদিদেব ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতলাভের জন্য ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনকারী দেবতা ও দানবদের মন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেই পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ভগবান কণ্ডূয়ন সুখ অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা অনুভব না করতে পারলেও এই ব্রহ্মাণ্ডে একটি ক্ষীর-সমুদ্র রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন যে মহাকাশে শত-সহস্র লোক রয়েছে, এবং প্রতিটি লোকের জলবায়ু ভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত সে সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব প্রদান করে যা আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। ভারতের মুনি-ঋষিরা জ্ঞান লাভ করতেন

বৈদিক শাস্ত্র থেকে, এবং মহাজনেরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের পৃষ্ঠা থেকে (*শাস্ত্রচক্ষুবৎ*)। অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণশীল সমস্ত গ্রহগুলি দর্শন না করা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ক্ষীর-সমুদ্রের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যেহেতু সেই প্রকার গবেষণা সম্ভব নয়, তাই আমাদের স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা যথাযথভাবে স্বীকার করতে হবে, কেননা শ্রীধর স্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ মহান আচার্যগণ তা স্বীকার করেছেন। বৈদিক পন্থা হচ্ছে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, এবং যা আমাদের কল্পনার অতীত তাকে জানার এইটিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। আদিদেব ভগবান সর্বশক্তিমান হওয়ার ফলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, এবং তাই তাঁর পক্ষে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কূর্মরূপ বা মৎস্যরূপ ধারণ করে অবতরণ করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের বর্ণনা স্বীকার করতে কখনো দ্বিধা করা উচিত নয়।

দেবতা এবং দানবদের যৌথ প্রচেষ্টায় ক্ষীর-সমুদ্রে মন্থনের বিশাল প্রয়াসে মন্থন দণ্ডরূপ মন্দর পর্বতকে ধারণ করার জন্য এক বিশাল আধারের আবশ্যকতা ছিল। তাই দেবতাদের সাহায্য করার জন্য আদিদেব ভগবান এক বিশাল কূর্মরূপে অবতরণ করে ক্ষীর-সমুদ্রে বিচরণ করেছিলেন। সেই সময় মন্দর পর্বতের ঘর্ষণের ফলে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ভগবান কণ্ডূয়ন সুখ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

ত্রৈপিষ্টপোরুভয়হা স নৃসিংহরূপং
কৃত্বা ভ্রমদ্ভ্রূকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রম্।
দৈত্যেন্দ্রমাশু গদয়াভিপতন্তমারা-
দূরৌ নিপাত্য বিদদার নখৈঃ স্ফুরন্তম ॥ ১৪ ॥

ত্রৈ-পিষ্টপ—দেবতাগণ; **উরুভয়-হা**—মহাভয় হরণকারী; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **নৃসিংহ-রূপম্**—নৃসিংহরূপ ধারণ করে; **কৃত্বা**—করে; **ভ্রমৎ**—ঘূর্ণনের দ্বারা; **ভ্রূকুটি**—ভ্রূকুটি; **দংষ্ট্র**—দন্ত; **করাল**—অত্যন্ত ভয়ানক; **বক্ত্রম্**—মুখ; **দৈত্য-ইন্দ্রম্**—দৈতরাজকে; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **গদয়া**—হস্তধৃত গদার দ্বারা; **অভিপতন্তম্**—যখন পতিত হচ্ছিল; **আরাৎ**—নিকটে; **উরৌ**—উরুতে; **নিপাত্য**—স্থাপন করে; **বিদদার**—বিদীর্ণ করেছিলেন; **নখৈঃ**—নখের দ্বারা; **স্ফুরন্তম্**—গর্জন করতে করতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের মহাভয় দূর করার জন্য ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, দন্ত ও ভীষণ বদনযুক্ত নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক গদা হস্তে আক্রমণকারী দৈত্যরাজকে

(হিরণ্যকশিপুকে) তাঁর উরুদেশে স্থাপন করে নখ দ্বারা তার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু এবং তার পুত্র মহাভাগবত প্রহ্লাদের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। কঠোর তপস্যার প্রভাবে জড় উপায়ে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং সে মনে করেছিল যে ব্রহ্মার বরে সে অমরত্ব লাভ করেছে। ব্রহ্মাজী তাকে অমর হওয়ার বর দান করতে অস্বীকার করেন, কেননা তিনি নিজেও অমর নন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ছলনাপূর্বক ব্রহ্মাজীর কাছ থেকে এমন কতগুলি বর লাভ করে যার ফলে সে প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিল। হিরণ্যকশিপু নিশ্চিত ছিল যে কোন মানুষ অথবা দেবতার দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, কোন অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, দিনে অথবা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। ভগবান কিন্তু জড়বাদী দৈত্য হিরণ্যকশিপুর কল্পনারও অতীত অর্ধমানব এবং অর্ধ সিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মাজীর বরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। তিনি হিরণ্যকশিপুকে তাঁর উরুদেশে স্থাপনপূর্বক বধ করেছিলেন, যার ফলে সে আকাশে অথবা ভূমিতে বা জলে নিহত হয় নি। ভগবান তাঁর নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করেছিলেন, যা ছিল হিরণ্যকশিপুর সবরকম অস্ত্রের কল্পনারও অতীত। হিরণ্যকশিপু শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'যে স্বর্ণ ও নরম শয্যার প্রতি আকাঙ্ক্ষী', যা সমস্ত জড়বাদী মানুষদের চরম লক্ষ্য। ভগবানের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক রহিত এই প্রকার আসুরিক মানুষেরা তাদের জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ভগবদ্ভক্তদের নির্যাতন করে। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন হিরণ্যকশিপুর পুত্র, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, তাই তাঁর পিতা তাঁকে সর্বতোপ্রকারে নির্যাতন করে। সেই পরিস্থিতি যখন চরমে পৌঁছায় তখন ভগবান নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবতাদের শত্রু হিরণ্যকশিপুকে এমনভাবে বধ করেন যে তা ছিল সেই অসুরের কল্পনারও অতীত। সর্বশক্তিমান ভগবান ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরদের সবরকম জাগতিক পরিকল্পনা সর্বদা ব্যর্থ করে থাকেন।

শ্লোক ১৫

অন্তঃসরস্যুরুবলেন পদে গৃহীতো
গ্রাহেণ যূথপতিরম্বুজহস্ত আর্তঃ।
আহেদমাদিপুরুষাখিললোকনাথ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ॥ ১৫ ॥

অন্তঃ-সরসি—নদীর ভিতর; **উরুবলেন**—শ্রেষ্ঠশক্তির দ্বারা; **পদে**—পা; **গৃহীতঃ**—গ্রহণ করে; **গ্রাহেণ**—কুমীরের দ্বারা; **যূথ-পতিঃ**—হস্তীদের নেতা; **অম্বুজ-**

হস্ত—পদ্মফুল হস্তে; **আর্তঃ**—অত্যধিক পীড়িত; **আহঃ**—বলেছিলেন; **ইদম্**—এইভাবে; **আদিপুরুষ**—আদি ভোক্তা; **অখিল-লোকনাথ**—ব্রহ্মাণ্ডের পতি; **তীর্থশ্রবঃ**—তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত; **শ্রবণ মঙ্গল**—যাঁর নাম শ্রবণ করা মাত্রই সর্বকল্যাণ সাধিত হয়; **নামধেয়**—যাঁর পবিত্র নাম কীর্তনের যোগ্য।

অনুবাদ

অধিক বলশালী কুমীর যখন জলের মধ্যে যূথপতি গজরাজের পদ ধারণ করে, তখন সেই গজরাজ অত্যন্ত কাতর হয়ে তার শুণ্ডের দ্বারা একটি পদ্ম ধারণ করে ভগবানকে সম্বোধন করে বলেছিল, "হে আদি পুরুষ, আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি! হে পরিত্রাণকারী, আপনি তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত। আপনার দিব্য নাম স্মরণ করা মাত্রই সকলে পবিত্র হয়, তাই আপনার নাম কীর্তনীয়।"

তাৎপর্য

নদীতে অধিকতর বলবান কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্রকে উদ্ধার করার কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু ভগবান পরম-জ্ঞানস্বরূপ, তাই তাঁর দিব্য নাম এবং তাঁর চিন্ময় স্বরূপে কোন পার্থক্য নেই। কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গজেন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল। সাধারণত হাতী যদিও কুমীরের থেকে অধিক শক্তিশালী, কিন্তু জলে কুমীর হাতীর থেকে অধিক শক্তিশালী, গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ভগবানের এক মহান ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর পূর্বকৃত সুকৃতির প্রভাবে তিনি দিব্য নাম উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই সর্বদা দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত, কেননা এই জগতটি এমনই যে প্রতি পদক্ষেপেই প্রত্যেককে কোন না কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কিন্তু কারো যদি পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকে, তাহলে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন; সেকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে। যারা দুষ্কৃতকারী এবং পাপী তারা দুঃখ-দুর্দশায় আর্ত হলেও ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। সে কথাও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। গজেন্দ্র যখন আর্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন তখন ভগবান তাঁর নিত্য বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেন।

গজেন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি ভগবানকে *আদিপুরুষ* বা *পরম ভোক্তা* বলে সম্বোধন করেন। ভগবান এবং জীব উভয়ই চেতন এবং তাই উভয়ই ভোক্তা; কিন্তু ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, কেননা তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। একটি পরিবারে যেমন পিতা এবং পুত্র উভয়ই নিঃসন্দেহে ভোক্তা, কিন্তু পিতা হচ্ছেন মুখ্য ভোক্তা এবং পুত্র গৌণ ভোক্তা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই ভগবানের সম্পত্তি এবং জীব তার জন্য বরাদ্দ অংশটুকুই কেবল ভোগ করতে পারে। যা তার জন্য বরাদ্দ করা হয়নি, তা জীব

স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। *ঈশোপনিষদে* ভগবানের পরম ভোক্তা হওয়ার ধারণা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য যিনি অবগত তিনি ভগবানকে প্রথমে নিবেদন না করে কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

গজেন্দ্র ভগবানকে *অখিল-লোক-নাথ* বা সমগ্র জগতের প্রভু বলে সম্বোধন করেছেন, সেই সূত্রে তিনি গজেন্দ্ররও প্রভু। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত গজেন্দ্র কুমীরের আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের বিশেষ যোগ্য ছিলেন, এবং ভগবান যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর ভক্ত কখনো বিনষ্ট হবেন না, তাই গজেন্দ্রের পক্ষে রক্ষা লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা যথার্থই উপযুক্ত ছিল এবং ভগবানও তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছিলেন। ভগবান সকলেরই পালক, তবে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার দাবী করার পরিবর্তে যাঁরা তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হন, তাঁদের তিনি সর্বপ্রথমে রক্ষা করেন। ভগবান সর্বদাই পরম উৎকৃষ্ট। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত বলে ভগবান তাঁকে প্রথম সুযোগ দেন। কিন্তু যারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে, সেই সমস্ত অসুরদের ভগবান কিছু সীমিত শক্তি অনুমোদন করেন যার প্রভাবে তারা আত্ম-রক্ষা করে। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর পূর্ণতাও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পূর্ণতা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

গজেন্দ্র ভগবানকে *তীর্থশ্রবঃ* বা "তীর্থ স্থানের মতো বিখ্যাত" বলে সম্বোধন করেছেন। অজ্ঞাত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ তীর্থ স্থানে যায়। কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করার ফলেই কেবল সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই ভগবান পবিত্র তীর্থস্থানেরই মতো। তবে পবিত্র তীর্থস্থানের প্রভাবে সব কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হলে তীর্থস্থানেই যেতে হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম ঘরে থেকেই অথবা যে কোন স্থানে থেকে কীর্তন করা যায় এবং তার ফলে সেই সুফল লাভ করা যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে তাই তীর্থস্থানে যেতে হয় না। তিনি কেবল নিষ্ঠা সহকারে ভগবানকে স্মরণ করার ফলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনো কোন পাপ কর্ম করেন না, তবে সারা পৃথিবী যেহেতু পাপ-পঙ্কিল পরিবেশে পূর্ণ, তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও কখনো কখনো অজ্ঞাতসারে কোন পাপ করে ফেলতে পারেন। যারা জ্ঞাতসারে পাপকর্ম করে তারা ভগবানের ভক্ত হওয়ার যোগ্য নয়; কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যদি অজ্ঞাতসারে কোন পাপকর্ম করে ফেলেন তাঁকে ভগবান অবশ্যই রক্ষা করেন, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করেন।

ভগবানের দিব্য নামকে বলা হয় *শ্রবণ-মঙ্গল*। অর্থাৎ, ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করার ফলেই সমস্ত মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র ভগবানের দিব্য নামকে *পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের বিষয়ে কীর্তন এবং শ্রবণ করাই

পুণ্য কর্ম। ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন যাতে মানুষদের শ্রবণের জন্য কিছু অপ্রাকৃত কার্যকলাপের সৃষ্টি হয়; তা না হলে ভগবানের এই জগতে কিছুই করণীয় নেই এবং কোন কর্তব্যও নেই। তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এখানে এসে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করেন। বেদ এবং পুরাণে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা রয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করতে বা পাঠ করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগে মানুষের মূল্যবান সময়ের অধিকাংশই অপচয় হয় গল্প এবং উপন্যাস পাঠ করে। এই সমস্ত সাহিত্য কারোরই কোনপ্রকার মঙ্গল সাধন করতে পারে না; পক্ষান্তরে তা শুধুই যুবকদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করে রজো এবং তমো গুণের প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং তাদের দৃঢ়ভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। শ্রবণ এবং পাঠ করার এই প্রবণতা ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ এবং পাঠ করার মাধ্যমে সদ্ব্যবহার করা যায়। তার ফলে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন হয়।

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে ভগবানের দিব্য নাম এবং তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা সর্বদাই শ্রবণ করা উচিত, এবং তাই এই শ্লোকে তাঁকে *নামধেয়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

শ্রুত্বা হরিস্তমরণার্থিনমপ্রমেয়-
শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজভুজাধিরূঢ়ঃ।
চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মা-
দ্ধস্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ ১৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তম্**—তাঁকে; **অরণার্থিনম্**—সাহায্যপ্রার্থী; **অপ্রমেয়ঃ**—অমিত শক্তিশালী ভগবান; **চক্র**—চক্র; **আয়ুধঃ**—অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **পতগরাজ**—পক্ষীরাজ (গরুড়); **ভুজ-অধিরূঢ়ঃ**—পৃষ্ঠে আরোহণ করে; **চক্রেণ**—চক্রের দ্বারা; **নক্রবদনম্**—কুমীরের মুখ; **বিনিপাট্য**—দ্বিখণ্ডিত করে; **তস্মাৎ**—সেই কুমীরের মুখ থেকে; **হস্তে**—হাতে; **প্রগৃহ্য**—তার শুঁড় ধরে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **উজ্জহার**—তাকে উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

চক্রপাণি শ্রীহরি সেই শরণার্থী গজরাজের আর্তনাদ শ্রবণ করে পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তাঁর চক্রের দ্বারা কুমীরের বদন দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন এবং কৃপাপূর্বক গজরাজের শুঁড় ধরে তাকে কুমীরের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন। কেউই অনুমান করতে পারে না সেই লোক এখান থেকে কতদূরে। তথাপি বলা হয় যে কেউ যদি মনের গতিতে ভ্রমণশীল রথে চড়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভ্রমণ করেন, তা হলেও তিনি সেখানে পৌঁছাতে পারবেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে বায়ুযান সৃষ্টি করেছেন তা জড়, কিন্তু যোগীরা তার থেকেও সূক্ষ্ম মানস যানে চড়ে ভ্রমণ করেন। এই মানস যানের সাহায্যে যোগীরা অতি শীঘ্র যে কোন দূরবর্তী স্থানে পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু বায়ুযান অথবা মানস যান কোনটিই জড় আকাশের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে না। তাহলে ভগবান কিভাবে গজরাজের প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং কিভাবেই বা তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ? মানুষের পক্ষে কল্পনার দ্বারা তা অনুমান করা সম্ভব নয়। তা সম্ভব হয়েছিল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, এবং তাই এখানে ভগবানকে *অপ্রমেয়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা সবচাইতে বুদ্ধিমান মানুষও তার মস্তিষ্কের দ্বারা অঙ্ক কষে ভগবানের শক্তির হিসাব করতে পারে না। এতদূর থেকে ভগবান শ্রবণ করতে পারেন, তিনি সেখান থেকে আহার করতে পারেন এবং তিনি নিমেষের মধ্যে সমস্ত স্থানে যুগপৎ প্রকট হতে পারেন। এমনই হচ্ছে ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা।

শ্লোক ১৭

জ্যায়ান্ গুণৈরবরজোঽপ্যদিতেঃ সুতানাং
লোকান্ বিচক্রম ইমান্ যদথাধিযজ্ঞঃ।
ক্ষ্মাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন
যাচ্ঞামৃতে পথিচরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ ॥ ১৭ ॥

জ্যায়ান্—সর্বশ্রেষ্ঠ ; **গুণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা ; **অবরজঃ**—চিন্ময় ; **অপি**—যদি তিনি তেমন ; **অদিতেঃ**—অদিতির ; **সুতানাম্**—পুত্রদের (যাঁরা আদিত্য নামে পরিচিত) ; **লোকান্**—সমস্ত লোক ; **বিচক্রমে**—অতিক্রম করে ; **ইমান্**—এই ব্রহ্মাণ্ডে ; **যৎ**—যিনি ; **অথ**—অতএব ; **অধিযজ্ঞঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ক্ষ্মাম্**—সমস্ত স্থলভাগ ; **বামনেন**—বামন অবতারে ; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন ; **ত্রি-পদ**—ত্রিপাদ ; **ছলেন**—ছলনার দ্বারা ; **যাচ্ঞাম্**—ভিক্ষা করে ; **ঋতে**—বিনা ; **পথিচরন্**—সত্য মার্গে বিচরণ করে ; **প্রভুভিঃ**—মহাজনদের দ্বারা ; **ন**—কখনোই না ; **চাল্যঃ**—বিচ্যুত।

অনুবাদ

গুণাতীত ভগবান অদিতি-পুত্র আদিত্যদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হলেও গুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ভগবান বিষ্ণু পদনিক্ষেপের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক অতিক্রম করেন। ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার ছলে তিনি

বামনরূপে বলি মহারাজের অধিকৃত সমগ্র ভুবন অধিগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষার ছলে তা গ্রহণ করেছিলেন, কেননা নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করতে সমর্থ জনেরা সব কিছু করতে পারলেও যাচ্ঞা ব্যতিরেকে সৎপথচারী ব্যক্তিকে ঐশ্বর্যভ্রষ্ট করা তাদেরও কর্তব্য নয়।

তাৎপর্য

বলি মহারাজের চরিত এবং বামনদেবকে তাঁর দান করার কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। বলি মহারাজ বলপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলি জয় করেছিলেন। একজন রাজা অপর রাজাকে বলপূর্বক জয় করতে পারেন এবং এই প্রকার অধিকার ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে বলি মহারাজ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাই ভগবান ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশে তাঁর কাছে এসে ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা করেন। সব কিছুর অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান বলি মহারাজের অধিকৃত সমস্ত ভূমি নিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি কেননা বলি মহারাজ ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজার অধিকাররূপে সেই সমস্ত ভূমি অধিকার করেছিলেন। ভগবান বামনদেব যখন বলি মহারাজের কাছে এত ক্ষুদ্র একটি দান ভিক্ষা করেন, তখন বলি মহারাজের গুরু শুক্রাচার্য তাঁকে বাধা দেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বামনদেব হচ্ছেন ভিক্ষুবেশী স্বয়ং বিষ্ণু। বলি মহারাজ যখন বুঝতে পারেন যে সেই ভিক্ষুকটি হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু, তখন তিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং তৎক্ষণাৎ বামনদেবকে তাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করতে সম্মত হন। বামনদেব তখন দুই পদনিক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত করেন এবং যখন তিনি বলি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে কোথায় তিনি তাঁর তৃতীয় পদ স্থাপন করবেন, বলি মহারাজ তখন আনন্দের সঙ্গে তাঁর মস্তকে ভগবানের অবশিষ্ট পদ স্থাপন করতে অনুরোধ করেন। এভাবে বলি মহারাজ সবকিছু হারাবার পরিবর্তে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন এবং ভগবান তাঁর নিত্য সঙ্গী এবং দ্বাররক্ষক হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন করলে কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে তিনি সব কিছু লাভ করেন যা প্রত্যাশা করা যায় না।

শ্লোক ১৮

নার্থো বলেরয়মুরুক্রমপাদশৌচ—
মাপঃ শিখাধৃতবতো বিবুধাধিপত্যম্।
যো বৈ প্রতিশ্রুতমৃতে ন চিকীর্ষদন্য-
দাত্মানমঙ্গ মনসা হরয়েঽভিমেনে ॥ ১৮ ॥

ন—কখনোই না; **অর্থঃ**—তুলনামূলক মূল্যের; **বলেঃ**—শক্তিতে; **অয়ম্**—এই; **উরুক্রম-পাদ-শৌচম্**—পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম ধৌত; **আপঃ**—জল; **শিখা-**

ধৃতবতঃ—মস্তকে ধারণকারী; **বিবুধ-অধিপত্যম্**—দেবতাদের রাজ্যের উপর আধিপত্য; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রতিশ্রুতম্**—যা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে; **ঋতে ন**—তার অতিরিক্ত; **চিকীর্ষৎ**—চেষ্টা করা হয়েছে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **আত্মানম্**—এমনকি তাঁর স্বীয় শরীর; **অঙ্গ**—হে নারদ; **মনসা**—তাঁর মনে; **হরয়ে**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অভিমেনে**—সমর্পিত।

অনুবাদ

বলি মহারাজ, যিনি তাঁর মস্তকে ভগবানের পদধৌত জল ধারণ করেছিলেন, তাঁর গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করেননি। ভগবানের তৃতীয় চরণ রাখবার জন্য তিনি তাঁর দেহ নিবেদন করেছিলেন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে স্বর্গরাজ্যও মূল্যহীন, যা তিনি স্বীয় বলের দ্বারা অধিকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ তাঁর মহান ত্যাগের জন্য ভগবানের অপ্রাকৃত কৃপা লাভ করার ফলে বৈকুণ্ঠলোকে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করার যোগ্য হয়েছিলেন। তাই তাঁর বাহুবলে অধিকৃত স্বর্গরাজ্য উৎসর্গ করার ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। অর্থাৎ ভগবান যখন কারো কষ্টার্জিত সম্পদ বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন এবং তার পরিবর্তে তাঁর ব্যক্তিগত সেবা, আনন্দ এবং জ্ঞান প্রদান করেন, তখন বুঝতে হবে যে তা হচ্ছে ভগবানের বিশেষ কৃপা।

জড় সম্পদ, যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, কখনোই চিরস্থায়ী নয়। তাই স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করা উচিত, তা না হলে জড় দেহ ত্যাগ করার সময় তা ত্যাগ করতে হবে। প্রকৃতিস্থ মানুষ জানেন যে সমস্ত ভৌতিক সম্পত্তি অনিত্য এবং তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা হচ্ছে সেগুলি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা, যাতে ভগবান তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তাঁর পরমধামে চিরকাল নিবাস করার অনুমতি প্রদান করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/৫-৬) ভগবানের পরম ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

এই জড় জগতে বাড়ি, জমি, সন্তান-সন্ততি, সমাজ, বন্ধু, ধনসম্পদ ইত্যাদিরূপে মানুষের যে সম্পত্তি তা সবই ক্ষণস্থায়ী। মায়াসৃষ্ট এই সমস্ত মোহময়ী সামগ্রী চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। এইপ্রকার সম্পত্তির উপর মালিকানা যত বৃদ্ধি পায় আত্ম উপলব্ধির প্রতিবন্ধকরূপ মোহ তত বৃদ্ধি পায়; তাই জড় প্রতিষ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়ার

জন্য এই সমস্ত সম্পত্তি যতখানি সম্ভব কম অথবা একেবারেই কিছু না সঞ্চয় করা উচিত। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংস্পর্শে আমরা কলুষিত হয়েছি। তাই অনিত্য সম্পত্তির বিনিময়ে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমরা যত পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে পারি, ততই আমরা জড় জগতের মোহময়ী আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারি। জীবনের এই স্তর লাভ করতে হলে পারমার্থিক অস্তিত্ব এবং তার নিত্যত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে হবে। চিন্ময় অস্তিত্বের নিত্যত্ব যথাযথভাবে জানতে হলে স্বেচ্ছায় যতখানি সম্ভব কম সঞ্চয় এবং জীবিকা-নির্বাহের জন্য ন্যূনতম আবশ্যকতা পূর্ণ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সঞ্চয় করা উচিত। কৃত্রিমভাবে জীবনের আবশ্যকতাগুলি বৃদ্ধি না করে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কৃত্রিম আবশ্যকতা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ। মানব সভ্যতার বর্তমান প্রগতি এই ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ এটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনের সভ্যতা। প্রকৃত সভ্যতা হচ্ছে আত্মার সভ্যতা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ভিত্তিতে যে মানব সভ্যতা তা পশুদের সমতুল্য, কেননা পশুরা তাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের অধিক আর কিছু জানে না। ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে মন। মনোধর্মভিত্তিক যে সভ্যতা তাও সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট স্তর নয়, কেননা মনের ঊর্ধ্বে রয়েছে বুদ্ধি। আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের এই বুদ্ধির সভ্যতা সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রদান করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়ের সভ্যতা, মনের সভ্যতা, বুদ্ধির সভ্যতা এবং আত্মার সভ্যতার ভিত্তিতে মানব সভ্যতা সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মুখ্যত মানুষের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা মানুষকে চিন্ময় আত্মার বিকাশের পথে পরিচালিত করেছে। আর শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পূর্ণ মানব সভ্যতা যা আত্মার সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব প্রদান করছে। মানুষ যখন আত্মার সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়, তখন সে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করে, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপরোক্ত শ্লোক দুটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবদ্ধামের প্রাথমিক তত্ত্ব হচ্ছে যে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতের মতো সেই জগতকে আলোকিত করার জন্য সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। আর দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক সভ্যতা অনুসরণ করার ফলে বা ভক্তিযোগের অনুশীলন করার ফলে জীবনের পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। তখন মানুষ আত্মার স্থায়ী রূপে স্থিত হয়ে ভগবানের দিব্য প্রেমভক্তির পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত ভৌতিক সম্পত্তির বিনিময়ে আত্মার সভ্যতা লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। স্বর্গের আধিপত্য, যা তিনি তাঁর জাগতিক শক্তির দ্বারা লাভ করেছিলেন, ভগবানের সাম্রাজ্যের তুলনায় তা তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন।

যারা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড় সভ্যতার আরাম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য বলি মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা, যিনি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করে তাঁর জড়জাগতিক বলবীর্যের বিনিময়ে ভগবদ্ধাম লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তুভ্যং চ নারদ ভৃশং ভগবান বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধুপরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানং চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥ ১৯ ॥

তুভ্যম্—তোমাকে; **চ**—ও; **নারদ**—হে নারদ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে; **ভগবান**—শ্রীভগবান; **বিবৃদ্ধ**—বিকশিত; **ভাবেন**—দিব্য প্রেমের দ্বারা; **সাধু**—সাধুরূপ তুমি; **পরিতুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **উবাচ**—বর্ণনা করেছ; **যোগম্**—সেবা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; চ—ও; **ভাগবতম্**—ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান; **আত্ম**—আত্মা; **সতত্ত্ব**—সমস্ত বিবরণসহ; **দীপম্**—অন্ধকারে আলোকের মতো; **যৎ**—যা; **বাসুদেব-শরণা**; যাঁরা বাসুদেবের শরণাগত; **বিদুঃ**—তাদের জানেন; **অঞ্জসা**—খুব ভালভাবে; **এব**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

হে নারদ! সেই ভগবান হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিযোগ এবং ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বিশ্লেষণ করেছিলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক ভক্তরাই কেবল সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভক্ত এবং ভক্তি পদ দুটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ভগবানের ভক্ত না হলে ভক্তির সম্পূর্ণ রহস্য জানা যায় না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সমন্বিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিশ্লেষণ করেছিলেন; কেননা অর্জুন তাঁর বন্ধু ছিলেন বলে নয়, পক্ষান্তরে তাঁর এক মহান ভক্ত ছিলেন বলে। সমস্ত জীব স্বরূপত পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে আংশিকভাবে তাদের মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে কর্ম করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্তির মার্গে প্রবেশ করার প্রাথমিক যোগ্যতা হচ্ছে যাঁরা ইতিমধ্যে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করা। এই প্রকার ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতা করার ফলে ভগবদ্ভক্তি লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে জানতে পারেন, এবং তা জানার মাত্রা অনুসারে তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই বিশুদ্ধিকরণের পন্থা ভক্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করায় এবং ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্বাদ প্রদান করে। এইভাবে তিনি ভগবদ্ভক্তির প্রতি প্রকৃত আসক্তি লাভ করেন এবং তার ফলে তিনি ভগবৎ-প্রেমের পূর্ববর্তী স্তর *ভাবদশা* প্রাপ্ত হন।

ভগবদ্ভক্তির এই জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ভগবদ্ভক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তা সম্পাদন করার জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ভগবান, তাঁর সৌন্দর্য, যশ, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা এবং যে সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী প্রেম বিনিময়ের জন্য তাঁর প্রতি জীবকে আকৃষ্ট করে, তার বর্ণনা করা হয়েছে। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে এই স্বাভাবিক প্রবণতা কৃত্রিমভাবে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, শ্রীমদ্ভাগবত এই কৃত্রিম আবরণ উন্মোচন করার জন্য যথাযথভাবে সাহায্য করেন। তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত জ্ঞানের বর্তিকাস্বরূপ ক্রিয়া করে। চিন্ময় জ্ঞানের এই দুটি বিভাগ বৈষ্ণবের শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে যে বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত সেই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

শ্লোক ২০

চক্রং চ দিক্ষ্ববিহতং দশসু স্বতেজো
মন্বন্তরেষু মনুবংশধরো বিভর্তি।
দুষ্টেষু রাজসু দমং ব্যদধাৎ স্বকীর্তিং
সত্যে ত্রিপৃষ্ঠ উশতীং প্রথয়ংশ্চরিত্রৈঃ ॥ ২০ ॥

চক্রম্—ভগবানের সুদর্শন চক্র; **চ**—ও; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **অবিহতম্**—বাধপ্রাপ্ত না হয়ে; **দশসু**—দশদিক; **স্বতেজঃ**—স্বীয়শক্তি; **মন্বন্তরেষু**—বিভিন্ন মন্বন্তর অবতারে; **মনু-বংশ-ধরঃ**—মনুর বংশধররূপে; **বিভর্তি**—শাসন করেন; **দুষ্টেষু**—দুষ্কৃতকারীদের; **রাজসু**—সেইপ্রকার রাজাদের; **দমম্**—দমন; **ব্যদধাৎ**—অনুষ্ঠান করেছেন; **স্বকীর্তিম্**—স্বীয় কীর্তি; **সত্যে**—সত্যলোকে; **ত্রি-পৃষ্ঠে**—ত্রিভুবনে; **উশতীম্**—মহিমান্বিত; **প্রথয়ন্**—প্রতিষ্ঠিত ; **চরিত্রৈঃ**—চারিত্রিক গুণাবলী।

অনুবাদ

মন্বন্তর অবতারে ভগবান মনুর বংশধররূপে তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা দুষ্কৃতকারী রাজাদের দমন করেন। সর্বাবস্থায় অপ্রতিহতভাবে তাঁর রাজ্য শাসনের মহিমা এবং তাঁর কীর্তি ত্রিভুবনেরও ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক সত্যলোকেও বিস্তার লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

আমরা ইতিপূর্বে প্রথম স্কন্ধে মন্বন্তর অবতারের কথা আলোচনা করেছি। ব্রহ্মার একদিনে একে একে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এইভাবে ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ জন মনু এবং এক বছরে ৫,০৪০ জন মনুর আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মার আয়ু তাঁর গণনায় একশ' বছর, অর্থাৎ একজন ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪,০০০ জন মনু আসেন। অসংখ্য ব্রহ্মা

রয়েছেন এবং তাঁদের আয়ুষ্কাল কেবল মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস মাত্র। অতএব আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি সমগ্র জড় জগতে, যা হচ্ছে ভগবানের শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র, ভগবানের অবতারেরা কিভাবে কার্য করছেন।

মন্বন্তর অবতারেরা চক্রধারী শ্রীভগবানেরই সমান শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁরা বিভিন্ন লোকের দুষ্ট শাসকদের দণ্ডদান করেন। মন্বন্তর অবতারেরা ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা বিস্তার করেন।

শ্লোক ২১

ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্তি-
র্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধ
আয়ুষ্যবেদমনুশাস্ত্যবতীর্য লোকে ॥ ২১ ॥

ধন্বন্তরিঃ—ধন্বন্তরি নামক ভগবানের অবতার; **চ**—এবং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়মেব**—তিনি স্বয়ং; **কীর্তিঃ**—মূর্তিমান যশ; **নাম্না**—নামক; **নৃণাম্পুরুরুজাং**—রোগগ্রস্ত জীবদের; **রুজঃ**—রোগ; **আশু**—অতি শীঘ্র; **হন্তি**—নিরাময় করে; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **চ**—ও; **ভাগম্**—ভাগ; **অমৃত**—অমৃত; **আয়ুঃ**—আয়ুষ্কাল; **অব**—থেকে; **অবরুন্ধে**—লাভ করেন; **আয়ুষ্য**—আয়ুর; **বেদম্**—জ্ঞান; **অনুশাস্তি**—পরিচালনা করে; **অবতীর্য**—অবতীর্ণ হয়ে; **লোকে**—এই ব্রহ্মাণ্ডে।

অনুবাদ

ভগবান ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিরন্তর রুগ্ন জীবদের তাঁর স্বীয় কীর্তির দ্বারা অচিরেই রোগ নিরাময় করেন এবং তার প্রভাবেই দেবতারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নিরন্তর মহিমান্বিত হন। পূর্বে দৈত্যদের দ্বারা যে যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ হয়েছিল, তাও তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে আয়ুর বিষয়ক বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র প্রবর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবান থেকে সবকিছু প্রকাশিত হয়েছে; এবং এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভগবান ধন্বন্তরি অবতারে চিকিৎসা-শাস্ত্র বা আয়ুর্বেদেরও প্রবর্তন করেছেন এবং এই জ্ঞান বেদে সংরক্ষিত হয়েছে। বেদ হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং তাই জীবের রোগ নিরাময়ের জ্ঞানও আয়ুর্বেদ রূপে তাতে রয়েছে। দেহধারী জীব তার দেহের গঠনমাত্রই রোগাক্রান্ত। দেহ হচ্ছে রোগের প্রতীক। বিভিন্ন ব্যক্তির রোগ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর মতো রোগও প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরমেশ্বর

ভগবানের কৃপায় কেবল দেহ এবং মনের রোগেরই নিরাময় হয় না, পক্ষান্তরে আত্মাও জন্ম-মৃত্যুর আবর্তরূপী ভবরোগ থেকে মুক্ত হতে পারে। ভগবানের আর এক নাম ভবৌষধি, অর্থাৎ সমস্ত ভবরোগ নিরাময়ের উৎস হচ্ছেন তিনি।

শ্লোক ২২

ক্ষত্রং ক্ষয়ায় বিধিনোপভৃতং মহাত্মা
ব্রহ্মধ্রুগুজ্‌ঝিতপথং নরকার্তিলিপ্সু।
উদ্ধন্ত্যসাববনিকণ্টকমুগ্রবীর্য-
স্ত্রিঃসপ্তকৃত্ব উরুধারপরশ্বধেন ॥ ২২ ॥

ক্ষত্রম্—ক্ষত্রিয়; **ক্ষয়ায়**—ক্ষয় সাধন করার জন্য; **বিধিনা**—দৈবের দ্বারা; **উপভৃতম্**—আয়তনে বর্ধিত হয়েছিল; **মহাত্মা**—মহান ঋষি পরশুরামরূপী ভগবান; **ব্রহ্মধ্রুক্**—ব্রহ্মের পরম সত্য; **উজ্‌ঝিত-পথম্**—পরম সত্যের মার্গ ত্যাগকারী; **নরকার্তি- লিপ্সু**—নরক যাতনা ভোগাকাঙ্ক্ষী; **উদ্ধন্তি**—সংশোধন করেন; **অসৌ**—এই সমস্ত; **অবনিকণ্টকম্**—পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ; **উগ্রবীর্যঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ত্রিঃ-সপ্ত**—একুশবার; **কৃত্বঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **উরুধার**—তীক্ষ্ণধার; **পরশ্বধেন**—কুঠারের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন ক্ষত্রিয় নামধারী শাসকেরা পরম সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগের অভিলাষী হয়েছিল, তখন পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ সেই সমস্ত রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা একুশবার ক্ষত্রিয়দের বিনাশ সাধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন অংশে, এই গ্রহে অথবা অন্যান্য গ্রহে, ক্ষত্রিয় বা শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে প্রজাদের ভগবদুপলব্ধির পথে পরিচালিত করা। প্রতিটি রাষ্ট্র এবং তার শাসকবর্গের শাসন-ব্যবস্থা নির্বিশেষে, তা রাজতন্ত্র হোক বা গণতন্ত্র হোক অথবা যৌথ শাসন বা এক নায়কত্ব বা স্বৈরতন্ত্র হোক, প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে প্রজাদের ভগবদুপলব্ধির পথে পরিচালিত করা। এটি মানুষের পক্ষে অপরিহার্য এবং পিতা, গুরু এবং চরমে রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রজাদের পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই, পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে যে সমস্ত জীব অধঃপতিত হয়েছে তাদের পুনরায় চিজ্জগতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। জড়া প্রকৃতির শক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে নিরন্তর দুঃখ-কষ্টের নারকীয় অবস্থায় নিয়ে

যায়। যারা বদ্ধ জীবনের নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের বলা হয় *ব্রহ্মোজ্ঝিতপথ* বা পরম সত্যের পন্থা বিরোধী, এবং তাই তারা দণ্ডনীয়। ভগবানের অবতার পরশুরাম এইরকমই বিকট পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং একুশবার এই সমস্ত দুষ্কৃতকারী রাজাদের সংহার করেছিলেন। বহু ক্ষত্রিয় রাজা তখন ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পালিয়ে গিয়েছিল। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে মিশরের রাজারা হচ্ছে পরশুরামের ভয়ে ভারতবর্ষ থেকে পলায়নকারী প্রবাসী ক্ষত্রিয়। রাজা বা শাসকবর্গ যখন ভগবদ্বিমুখ হয়ে নাস্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করে, তখন তারা এইভাবে দণ্ড ভোগ করে। সেইটি হচ্ছে সর্বশক্তিমান ভগবানের ব্যবস্থা।

শ্লোক ২৩

অস্মৎ প্রসাদসুমুখঃ কলয়া কলেশ
ইক্ষ্বাকুবংশ অবতীর্য গুরোর্নিদেশে।
তিষ্ঠন্ বনং সদয়িতানুজ আবিবেশ
যস্মিন্ বিরুধ্য দশকন্ধর আর্তিমার্চ্ছৎ ॥ ২৩ ॥

অস্মৎ—আমাদের, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত ; **প্রসাদ**—অহৈতুকী কৃপা ; **সমুখঃ**—এইভাবে সদয় হয়ে ; **কলয়া**—তাঁর অংশের বিস্তারের দ্বারা ; **কলেশঃ**—সমস্ত শক্তির অধীশ্বর ; **ইক্ষ্বাকু**—সূর্য বংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকু ; **বংশে**—বংশে ; **অবতীর্য**—অবতরণ করে ; **গুরোঃ**—পিতা বা গুরুর ; **নিদেশে**—নির্দেশ অনুসারে ; **তিষ্ঠন্**—অবস্থান করেছিলেন ; **বনম্**—বনে ; **স-দয়িতা-অনুজঃ**—তাঁর পত্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন ; **যস্মিন্**—যাঁকে ; **বিরুধ্য**—বিরুদ্ধাচরণ করে ; **দশকন্ধর**—দশমুণ্ড রাবণ ; **আর্তিম**—মহাকষ্ট ; **আর্চ্ছৎ**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর অংশসহ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশে অন্তরঙ্গা-শক্তি সীতাদেবীর পতিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আজ্ঞানুসারে তিনি তাঁর পত্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ বনে গমন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী দশমুণ্ড রাবণ তাঁর প্রতি মহা অপরাধ করেছিল এবং তার ফলে চরমে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর ভাই ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন হচ্ছেন তাঁর অংশ। এই চার ভাই হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব এবং তাঁরা কোন অবস্থাতেই সাধারণ মানুষ

নন। রামায়ণের বহু অসৎ এবং অজ্ঞানী টীকাকার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সাধারণ জীবাত্মা বলে বর্ণনা করে। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সবচাইতে প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর ভাইয়েরা হচ্ছেন তাঁর অংশ-প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন বাসুদেবের অবতার, লক্ষ্মণ সঙ্কর্ষণের অবতার, ভরত প্রদ্যুম্নের অবতার এবং শত্রুঘ্ন অনিরুদ্ধের অবতার। এইভাবে তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ। লক্ষ্মী সীতাদেবী ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি। তিনি কোন সাধারণ স্ত্রী নন অথবা দুর্গার অবতার নন। দুর্গা হচ্ছেন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এবং তিনি শিবের সঙ্গিনী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৭) উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন ভগবান অবতরণ করেন, তেমনই এক পরিস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অন্তরঙ্গা-শক্তির প্রকাশ, ভ্রাতাদের এবং লক্ষ্মীদেবী সীতাদেবীকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে গৃহত্যাগ করে বনে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন, এবং ভগবান তাঁর পিতার আদর্শ পুত্ররূপে, অযোধ্যার যুবরাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ঠিক পরেই তাঁর সেই আজ্ঞা পালন করেছিলেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং তাঁর নিত্য সঙ্গিনী সীতাদেবী তাঁর সঙ্গে বনবাসী হতে বাসনা করেছিলেন। ভগবান তাঁদের উভয়েরই ইচ্ছার সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের নিয়ে দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দ বছর বনবাসী হয়েছিলেন। বনে বাস করার সময় রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের কলহ হয় এবং তার ফলে রাবণ ভগবানের নিত্য সহচরী সীতাদেবীকে অপহরণ করে। চরমে মহাশক্তিশালী রাবণ তার রাজ্য এবং পরিবারসহ বিনষ্ট হয় এবং এইভাবে সেই কলহের সমাপ্তি হয়।

সীতাদেবী হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী, এবং কোন অবস্থাতেই তিনি কোন জীবের ভোক্তা নন। জীবের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্র সহ তাঁর পূজা করা। রাবণের মতো জড়বাদী মানুষেরা এই মহান সত্য বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা রামচন্দ্রের কাছ থেকে সীতাদেবীকে হরণ করার বাসনা করে মহা অপরাধ করে এবং তার ফলে গভীর দুঃখকষ্ট ভোগ করে। যে সমস্ত জড়বাদীরা জড় ঐশ্বর্য ও জড় সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তাদের রামায়ণ থেকে এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে পরমেশ্বর ভগবানের পরম পদ অস্বীকার করে তাঁর প্রকৃতিকে শোষণ করার পন্থা হচ্ছে রাবণের পন্থা। জাগতিক বিচারে রাবণ এতই উন্নত ছিল যে সে তার রাজধানী লঙ্কাকে সোনা দিয়ে বানিয়েছিল। কিন্তু সে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পরমেশ্বরত্ব স্বীকার না করে তাঁকে অবমাননা করে তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করেছিল ও তার ফলে রাবণ ভগবানের হস্তে নিহত হয় এবং তার সমস্ত ঐশ্বর্য এবং পরাক্রম নষ্ট হয়ে যায়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার, এবং তাই এই শ্লোকে তাঁকে *কলেশঃ* বা সমস্ত ঐশ্বর্যের ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

যস্মা অদাদুদধিরূঢ়ভয়াঙ্গবেপো
মার্গং সপদ্যরিপুরং হরবদ্দিধক্ষোঃ ।
দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা
তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ ॥ ২৪ ॥

যস্মৈ—যাকে ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন ; **উদধিঃ**—বিশাল ভারত মহাসাগর ; **উঢ়-ভয়**—ভয় ভীত হয়ে ; **অঙ্গ-বেপঃ**—কম্পিত কলেবরে ; **মার্গম্**—পথ ; **সপদি**—শীঘ্র ; **অরিপুরম্**—শত্রু নগরী ; **হর-বৎ**—হরের (মহাদেবের) ; **দিধক্ষোঃ**—ভস্মীভূত করার অভিপ্রায় ; **দূরে**—বহুদূরে ; **সুহৃৎ**—অন্তরঙ্গ বন্ধু ; **মথিত**—পীড়িত ; **রোষ**—ক্রুদ্ধ ; **সুশোন**—আরক্তিম ; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টির দ্বারা ; **তাতপ্যমান**—তাপের দ্বারা দগ্ধ ; **মকর**—মকর ; **উরগ**—সর্প ; **নক্র**—কুমীর ; **চক্রঃ**—বৃত্ত ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর প্রিয়তমা সীতার বিরহে ব্যথিত হয়ে (ত্রিপুর দগ্ধ করতে ইচ্ছুক) মহাদেবের মতো ক্রোধে আরক্তিম নয়নে রাবণের নগরী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তখন সমুদ্র ভয়ে কম্পমান হয়ে তাঁকে পথ প্রদান করেছিলেন, কেননা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, জলচর মকর, সর্প, কুমীর প্রভৃতি ভগবানের ক্রোধাগ্নির তাপে দগ্ধ হচ্ছিল।

তাৎপর্য

অন্যান্য জীবের মতো ভগবানেরও আবেগ রয়েছে, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম উৎস এবং সমস্ত জীবেদের মধ্যে মুখ্য এবং আদি। তিনি সমস্ত নিত্যের মধ্যে নিত্য। তিনি হচ্ছেন প্রধান, এবং অন্য সকলে তাঁর উপর নির্ভরশীল। বহু নিত্য এক নিত্যের আশ্রিত, এবং সেই সূত্রে উভয় নিত্যই গুণগতভাবে এক। এই প্রকার ঐক্যের ফলে, উভয় নিত্যেরই স্বরূপে আবেগের সমস্ত অনুভূতি রয়েছে, কিন্তু মুখ্য নিত্যের আবেগের পরিমাণ আশ্রিত নিত্যের আবেগ থেকে ভিন্ন। শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে যখন তাঁর চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হয়েছিল তখন তার তাপে সমগ্র সমুদ্র এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে সেই মহাসাগরের সমস্ত জলচর প্রাণীরা দগ্ধ হচ্ছিল এবং মূর্তিমান সমুদ্র ভয়ে কম্পমান হয়ে ভগবানকে শত্রুর নগরীতে যাওয়ার পথ করে দিয়েছিল। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের এই উগ্রভাব অস্বীকার করবে, কেননা তারা ভগবানের পূর্ণতা স্বীকার করতে চায় না। ভগবান যেহেতু পরম তত্ত্ব তাই নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে জড় অনুভূতির অনুরূপ ক্রোধের আবেগ তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না। তাদের অল্প জ্ঞানের ফলে তারা বুঝতে পারে না যে পরম পুরুষের আবেগ সমস্ত জড় গুণ এবং আয়তনের ধারণার

অতীত। শ্রীরামচন্দ্রের আবেগ যদি প্রাকৃত হত তা হলে তা কিভাবে সমগ্র সমুদ্র এবং তার অধিবাসী সমস্ত প্রাণীদের এইভাবে বিচলিত করত? এই জগতের কোন মানুষের ক্রোধে আরক্তিম দৃষ্টিপাতের ফলে কি কখনো মহাসাগর উত্তপ্ত হয়? পরতত্ত্বের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ ধারণার পার্থক্য এই সমস্ত বিচারের দ্বারা নিরূপণ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরম সত্য হচ্ছেন সবকিছুর উৎস, তাই অনিত্য জড় জগতে যে আবেগসমূহ প্রতিবিম্বিত হয় পরম পুরুষ সেই সমস্ত আবেগবিহীন হতে পারেন না। পক্ষান্তরে ক্রোধই হোক বা কৃপাই হোক, পরম পুরুষের যে বিভিন্ন ভাবের আবেগ দেখা যায় তা জড় জগতের প্রতিবিম্ব আবেগের থেকে গুণগতভাবে অভিন্ন, কেননা এই সমস্ত আবেগগুলি চিন্ময় স্তরের অনুভূতি। এই প্রকার আবেগসমূহ অবশ্যই পরম পুরুষে অনুপস্থিত নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা জড়জাগতিক বিচারের মাধ্যমে চিন্ময় জগতকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে গিয়ে করে থাকে।

শ্লোক ২৫

বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহ-
দন্তৈর্বিড়ম্বিতককুব্জুষ উঢ়হাসম্।
সদ্যোঽসুভিঃ সহ বিনেষ্যতি দারহর্তুর্-
বিস্ফূর্জিতৈর্ধনুষ উচ্চরতোঽধিসৈন্যে ॥ ২৫ ॥

বক্ষঃস্থল—বক্ষস্থল; **স্পর্শ**—স্পর্শের দ্বারা; **রুগ্ন**—ভগ্ন; **মহা-ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বাহ**—বাহন; **দন্তৈঃ**—দন্তের দ্বারা; **বিড়ম্বিত**—আলোকিত; **ককুব্জুষঃ**—দিক সমূহ সেবিত হয়েছিল; **উঢ়হাসম্**—গর্বসূচক হাস্য; **সদ্যঃ**—সহসা; **অসুভিঃ**—প্রাণের দ্বারা; **সহ**—সহ; **বিনেষ্যতি**—সংহার করেছিলেন; **দার-হর্তুঃ**—পত্নী অপহরণকারী; **বিস্ফূর্জিতৈঃ**—ধনুকের টঙ্কারের দ্বারা; **ধনুষঃ**—ধনুক; **উচ্চরতঃ**—দ্রুত বিচরণশীল; **অধিসৈন্যে**—উভয় পক্ষের সৈন্য দলের মধ্যে।

অনুবাদ

রাবণ যখন যুদ্ধ করছিল তখন তার বক্ষঃস্থলের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তীর দন্তরাজি ভগ্ন হয়েছিল, এবং তাদের ভগ্ন অংশসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় দিকসমূহ আলোকিত হয়েছিল। রাবণ তখন তার শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অট্টহাস্য করতে করতে বিচরণ করেছিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সেই পরস্ত্রী হরণকারী রাবণের সেই হাস্যকে তাঁর ধনুকের টঙ্কার মাত্রই প্রাণের সঙ্গে বিনাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জীব যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ভগবান যখন তাকে দণ্ড দেন তখন কেউই তাকে

রক্ষা করতে পারে না। তেমনই জীব যতই দুর্বল হোক না কেন, ভগবান যদি তাকে রক্ষা করেন তাহলে কেউই তাকে বিনাশ করতে পারে না।

শ্লোক ২৬

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ২৬ ॥

ভূমেঃ—সারা পৃথিবীর; **সুর-ইতর**—অসুর; **বরূথ**—সৈন্য সমূহ; **বিমর্দিতায়াঃ**—ভারের দ্বারা পীড়িত; **ক্লেশ**—দুঃখ দুর্দশা; **ব্যয়ায়**—অপনোদন করার জন্য; **কলয়া**—তার অংশসহ; **সিতকৃষ্ণ**—কেবল সুন্দরই নয় উপরন্তু কৃষ্ণবর্ণ; **কেশঃ**—চুল; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **করিষ্যতি**—করবেন; **জন**—জনসাধারণ; **অনুপলক্ষ্য**—কদাচিৎ যা দর্শন করা যায়; **মার্গঃ**—পথ; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **আত্ম মহিমা**—ভগবানের স্বীয় মহিমা; **উপনিবন্ধনানি**—সম্পর্কে।

অনুবাদ

পৃথিবী যখন অসুরস্বরূপ নৃপতিদের সৈন্যসমূহের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তখন সে ভার অপনোদনের জন্য ভগবান তাঁর অংশসহ আবির্ভূত হন। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশদামসহ ভগবান তাঁর আদিরূপে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা বিস্তার করেন। তাঁর মহিমা কেউই যথাযথভাবে অনুমান করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রথম অবতার বলদেবের আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব উভয়েই এক পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর সেই সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি নিজেকে অসংখ্যরূপে এবং শক্তিতে বিস্তার করতে পারেন; এবং সেই সমগ্র একককে বলা হয় পরম-ব্রহ্ম। ভগবানের এই প্রকার বিস্তার দুইভাগে বিভক্ত, যথা স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ। তাঁর নিজস্ব অংশকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং বিভিন্ন অংশকে বলা হয় জীবতত্ত্ব। এই প্রকার অংশবিস্তারে বলদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার।

বিষ্ণু-পুরাণ এবং *মহাভারতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েরই প্রবীণ বয়সেও সুন্দর কালো চুল ছিল। ভগবানকে বলা হয় *অনুপলক্ষ্য-মার্গঃ* বা বৈদিক পরিভাষা অনুসারে *অবাঙ্-মনসা-গোচরঃ*, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বাক্য, মন বা দৃষ্টির সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁকে কখনো দেখা যায় না বা উপলব্ধি করা যায় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৫) ভগবান বলেছেন, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ*— অর্থাৎ তিনি সকলের সমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করেন না। তাঁর শুদ্ধ ভক্তই কেবল তাঁকে তাঁর বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন, এবং এইরকম অসংখ্য লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণের উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে; সেই লক্ষণটি হচ্ছে ভগবান *সিতকৃষ্ণকেশঃ*, বা সর্বাবস্থাতেই তাঁর কেশদাম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েরই এইপ্রকার কেশ রয়েছে, এবং জাগতিক বিচারে প্রবীণ অবস্থাতেও তাঁদের রূপ ঠিক ষোল বছর বয়স্ক নবযুবকের মতো। সেইটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ লক্ষণ। *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ বা পুরাণ-পুরুষ, তথাপি সর্বদাই তাঁকে দেখতে ঠিক একজন নব যুবকেব মতো। চিন্ময় শরীরের এইটি হচ্ছে লক্ষণ। জড় দেহ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু চিন্ময় শরীরে সেই লক্ষণগুলি অবর্তমান। বৈকুণ্ঠলোকে বাস করে যে সমস্ত জীবাত্মা, তাদেরও এই প্রকার সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় শরীর রয়েছে যা কখনো বার্ধক্যের কোন লক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (ষষ্ঠ স্কন্ধে) বর্ণনা করা হয়েছে, যে সমস্ত বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে যমদূতদের কবল থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তাঁদের সকলেরই রূপ ছিল এই শ্লোকের বর্ণনার অনুরূপ, নবকিশোর রূপ। এইভাবে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে বৈকুণ্ঠে ভগবান এবং সেখানকার অন্য সমস্ত অধিবাসীদের শরীর চিন্ময়, এবং এই জগতের মানুষদের শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর আত্ম-মায়ার প্রভাবে চিন্ময় শরীরসহ আবির্ভূত হন যা বহিরঙ্গা মায়া স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। যারা বলে যে নির্গুণ ব্রহ্ম জড় দেহ ধারণ করে এই সংসারে প্রকট হন, তাদের সেই উক্তি অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়দেহ ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে চিন্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন। নির্গুণ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা, এবং ভগবানের দেহ এবং ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে গুণগতভাবে কোন পার্থক্য নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সর্বশক্তিমান ভগবান কেন এই পৃথিবীতে দুষ্কৃতকারী রাজন্যবর্গের ভার অপনোদন করার জন্য অবতরণ করেন? অবশ্যই এইপ্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের আসার কোন প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আসেন তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস প্রদর্শন করতে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১৩-১৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের মহান ভক্ত, মহাত্মারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে আনন্দ অনুভব করেন। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের চেতনার বৃত্তিকে ভগবান এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের অভিমুখী করা। এইভাবে জাগতিক জীবেদের সঙ্গে সম্বন্ধিত ভগবানের কার্যকলাপ শুদ্ধ ভক্তদের আলোচনার বিষয় হয়।

শ্লোক ২৭

তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াস্-
ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥ ২৭ ॥

তোকেন—একটি শিশুর দ্বারা; **জীবহরণম্**—একটি জীবের সংহার; **যৎ**—যা; **উলূকিকায়াঃ**—বিশাল রাক্ষসী রূপ ধারণ করে; **ত্রৈমাসিকস্য**—তিনমাস বয়স্ক; **চ**—ও; **পদা**—পায়ের দ্বারা; **শকটঃ অপবৃত্তঃ**—শকট উল্টে ফেলেছিল; **যৎ**—যিনি; **রিঙ্গতা**—হামাগুড়ি দেবার সময়; **অন্তরগতেন**—মধ্যে প্রবেশ করে; **দিবি**—গগন স্পর্শী; **স্পৃশোঃ**—স্পর্শ করে; **বা**—অথবা; **উন্মূলনম্**—উৎপাটিত করেছিলেন; **তু**—কিন্তু; **ইতরথা**—অন্য আর কে; **অর্জুনয়োঃ**—যমলার্জুনের; **ন ভাব্যম্**—সম্ভব ছিল না।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মাতৃক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র শিশুরূপে বিশাল শরীরা পুতনা রাক্ষসীর প্রাণবধ, তিনমাসের শিশু অবস্থায় পদাঘাতে শকট ভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়ে গমনপূর্বক গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুনবৃক্ষযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের উৎপাটন, এই সমস্ত কার্য স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব?

তাৎপর্য

মনের জল্পনা-কল্পনা দ্বারা অথবা ভোট দিয়ে ভগবান তৈরি করা যায় না, যা আজকাল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা করছে। ভগবান চিরকালই ভগবান, এবং জীব সর্বাবস্থাতেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জীব অসংখ্য। এই সমস্ত জীবেরা ভগবান কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, এবং সেটি হচ্ছে বেদের বাণী। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাতৃক্রোড়স্থ শিশু, তখন পুতনা রাক্ষসী তাঁর মায়ের কাছে এসে শিশু কৃষ্ণকে তার কোলে নিতে চায়। পুতনা এসেছিল এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে, তাই মা যশোদা তার কোলে শিশুটিকে দিতে কোনরকম ইতস্তত করেননি। পুতনা এসেছিল তার স্তনে বিষ মাখিয়ে শিশুটিতে হত্যা করতে। কিন্তু ভগবানকে সে যখন তার স্তন দান করে তখন ভগবান তার স্তন পান করার মাধ্যমে তার প্রাণবায়ু শুষে নেন, এবং প্রচণ্ড আর্তনাদ করে সেই রাক্ষসীর দেহটি তখন ভূপতিত হয়। কথিত হয় যে তার দেহটি ছিল তিন ক্রোশ দীর্ঘ। শ্রীকৃষ্ণ যদিও তিন ক্রোশ থেকেও দীর্ঘরূপে নিজেকে বিস্তার করতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি পুতনা রাক্ষসীকে বধ করার জন্য তাঁকে তার মতো দীর্ঘ দেহ ধারণ করতে হয়নি। বামন অবতারে তিনি এক ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত

হয়েছিলেন, কিন্তু বলি মহারাজের প্রদত্ত ভূমি অধিকার করার জন্য তিনি তাঁর এক পদ লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তার করে ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে পদক্ষেপ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁর দেহের গঠন বিস্তার করার মতো একটি অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা মোটেই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তাঁর মাতৃপ্রেমের জন্য তিনি তা করেননি। যশোদা যদি পুতনার ক্রোড়ে তাঁর পুত্রটিকে তিনক্রোশ বিস্তৃত হতে দেখতেন তা হলে তাঁর বাৎসল্য প্রেম আহত হত, কেননা তা হলে যশোদা দেবী জানতে পারতেন যে তাঁর তথাকথিত পুত্র কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণকে ভগবানরূপে জানতে পারলে যশোদা মায়ের কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক বাৎসল্য প্রেম বিনষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতৃক্রোড়ে শিশু অবস্থায় অথবা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আচ্ছাদনকারী বামনদেবরূপে সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। তাঁকে কঠোর তপস্যা করে ভগবান হতে হয় না, যদিও কিছু মানুষ সেইভাবে ভগবান হতে চায়। কঠোর তপস্যা করে কখনো ভগবান হওয়া যায় না বা ভগবানের সমকক্ষ হওয়া যায় না, তবে ভগবানের দিব্য গুণাবলী বহুলাংশে অর্জন করা যায়। জীব বহুল পরিমাণে দিব্য গুণাবলী অর্জন করতে পারে, কিন্তু সে কখনো ভগবান হতে পারে না। অথচ শ্রীকৃষ্ণ কোনরকম তপস্যা না করেই তাঁর মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপেই হোন অথবা পরিণত বয়সে অথবা তাঁর বৃদ্ধির যে কোন স্তরেই, সর্বাবস্থাতেই ভগবান।

তাঁর বয়স যখন মাত্র তিনমাস তখন তিনি শকটাসুরকে বধ করেছিলেন, যে যশোদা মায়ের গৃহে একটি শকটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আর তিনি যখন শিশু অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, সেই সময় একদিন তাঁর মাকে গৃহকার্য সম্পাদনে বিরক্ত করার ফলে তাঁর মা তাঁকে একটি উদুখলে বেঁধে রেখেছিলেন; কিন্তু সেই দুরন্ত শিশুটি হামাগুড়িদিতে দিতে সেই উদুখলটিকে টানতে টানতে যশোদা মায়ের অঙ্গনে দুটি অতি উচ্চ অর্জুন বৃক্ষের মাঝখানে নিয়ে যান এবং সেই উদুখলটি গাছ দুটির মাঝখানে যখন আটকে যায় তখন তার টানে প্রচণ্ড শব্দ করে সেই গাছ দুটি ভূপতিত হয়। মা যশোদা যখন সেই ঘটনাটি ঘটতে দেখেন তখন তিনি মনে করেন যে ভগবানের কৃপায় সেই বিরাট গাছ দুটি ভূপতিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শিশুটি রক্ষা পেয়ে গেছে। তাঁর কোন ধারণাই ছিল না যে তাঁর শিশু সন্তানটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর অঙ্গনে হামাগুড়ি দিয়ে সে এই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এমনই হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের বিনিময়। মা যশোদা ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে চেয়েছিলেন এবং ভগবান ঠিক একটি শিশুর মতো তাঁর ক্রোড়ে লীলাবিলাস করেছিলেন, কিন্তু যখনই প্রয়োজন হয়েছিল তখনই তিনি সর্বশক্তিমান ভগবানের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। এইপ্রকার লীলার মাধুর্য হচ্ছে যে ভগবান সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। সেই বিশাল অর্জুন বৃক্ষ দুটি উৎপাটনের উদ্দেশ্য ছিল নারদমুনি কর্তৃক অভিশপ্ত কুবেরের দুই পুত্রকে উদ্ধার করা, এবং সেই সঙ্গে মা যশোদার অঙ্গনে একটি হামাগুড়িরত শিশুর মতো খেলা

করা। তাঁর অঙ্গনে ভগবানের এইপ্রকার কার্যকলাপ দর্শন করে মা যশোদা দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন।

ভগবান সর্ব অবস্থাতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিরাটরূপে অথবা ক্ষুদ্র রূপে লীলা-বিলাস করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূন বিষতোয়পীতান্
পালাংস্ত্বজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্যবিলোলজিহ্বম্
উচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **ব্রজপশূন**—সেখানকার পশুদের; **বিষ-তোয়**—বিষাক্ত জল; **পীতান্**—যারা পান করেছিল; **পালাম্**—গোপালগণ; **তু**—ও; **অজীবয়ৎ**—পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; **অনুগ্রহদৃষ্টি**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; **বৃষ্ট্যা**—বর্ষণের দ্বারা; **তৎ**—তা; **শুদ্ধয়ে**—পবিত্রীকরণেরজন্য; **অতি**—অত্যন্ত; **বিষবীর্য**—অত্যন্ত তীব্র বিষ; **বিলোল**—লৌল; **জিহ্বম্**—জিহ্বা; **উচ্চাটয়িষ্যৎ**—কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত; **উরগম্**—সর্পকে; **বিহরন্**—বিহার করতে করতে; **হ্রদিন্যাম্**—নদীতে।

অনুবাদ

যখন গোপ বালকেরা এবং তাদের পশুরা যমুনার বিষাক্ত জল পান করেছিল, ভগবান (তাঁর বাল্য অবস্থায়) তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। যমুনার জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য তাতে ঝাঁপ দিয়ে তিনি খেলার ছলে বিষের তরঙ্গ উদগীরণকারী কালীয় নাগকে দণ্ড দান করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত কে এইপ্রকার অসম্ভব কার্য সম্পাদন করতে পারে?

শ্লোক ২৯

তৎ কর্মদিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং
নেত্রে পিধাপ্য সবলোঽনধিগম্যবীর্য ॥ ২৯ ॥

তৎ—তা; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **দিব্য**—অলৌকিক; **ইব**—মতো; **যৎ**—যা; **নিশি**—রাত্রে; **নিঃশয়ানম্**—নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল; **দাবাগ্নিনা**—দাবানলের দ্বারা;

শুচিবনে—শুষ্ক অরণ্যে ; **পরিদহ্যমানে**—দগ্ধ হচ্ছিল ; **উন্নেষ্যতি**—উদ্ধার করবেন ; **ব্রজম্**—সমস্ত ব্রজবাসীদের ; **অতঃ**—অতএব ; **অবসিত**—নিশ্চিতভাবে ; **অন্তকালম্**—জীবনের অন্তিম সময়ে ; **নেত্রে**—চোখে ; **পিধাপ্য**—কেবল নিমীলনের দ্বারা ; **সবল**—বলদেব সহ ; **অনধিগম্য**—অগাধ ; **বীর্য**—পরাক্রম।

অনুবাদ

কালীয় নাগকে দণ্ড দান করার পর সেই রাত্রেই যখন ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা মগ্ন ছিলেন, তখন শুষ্ক পাতা থেকে বনে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ার জন্য ব্রজবাসীদের জীবন সংশয় হয়ে উঠলে ভগবান বলদেবসহ কেবলমাত্র তাঁর চক্ষু নিমীলন করার মাধ্যমে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এমনই অলৌকিক ভগবানের কার্যকলাপ।

তাৎপর্য

যদিও এই শ্লোকে ভগবানের কার্যকলাপ অলৌকিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তথাপি আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই অলৌকিক এবং এখানেই সাধারণ জীবের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। বিশাল অর্জুন বৃক্ষদ্বয় উৎপাটন এবং কেবলমাত্র তাঁর চক্ষু নিমীলনের দ্বারা দাবানল নির্বাপণ, অবশ্য যে কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ কেবল আশ্চর্যজনকই নয়, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই অলৌকিক, এবং সেকথা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। যিনি ভগবানের দিব্য এবং অলৌকিক কার্যকলাপ বুঝতে পারেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জড় দেহ ত্যাগের পর তিনি ভগবানের ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৩০

গৃহ্ণীত যদ্ যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা
শুল্বং সুতস্য ন তু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সংবীক্ষ্যশঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥ ৩০ ॥

গৃহ্ণীত—গ্রহণ করে; **যৎ**—যা কিছু; **উপবন্ধম্**—বন্ধনরজ্জু; **অমুষ্য**—তাঁর; **মাতা**—মাতা; **শুল্বম্**—রজ্জু; **সুতস্য**—তাঁর পুত্রের; **ন**—না; **তু**—তা সত্ত্বেও; **তত্তৎ**—ক্রমশঃ; **অমুষ্য**—তাঁর; **মাতি**—পর্যাপ্ত ছিল; **যৎ**—যা; **জৃম্ভতঃ**—মুখ ব্যাদন করলে; **অস্য**—তাঁর; **বদনে**—মুখে; **ভুবনানি**—ভুবন সমূহ; **গোপী**—গোপ রমণী; **সংবীক্ষ্য**—এইভাবে দর্শন করে; **শঙ্কিত মনাঃ**—মনে মনে আশঙ্কিত ছিলেন; **প্রতিবোধিতা**—অন্যভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন; **আসীৎ**—করা হয়েছিল।

অনুবাদ

গোপরমণী (শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা) যখন প্রচুর রজ্জুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁকে বন্ধন করার পক্ষে সে সমস্ত রজ্জুই অপর্যাপ্ত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অবশেষে হতাশ হয়ে সেই প্রয়াস ত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে জৃম্ভন করার ছলে তাঁর মুখ ব্যাদন করেছিলেন ; তখন তাঁর মা তাঁর মুখের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেও তাঁর পুত্রের যোগমায়ার প্রভাবে তিনি ভিন্নভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একদিন দুরন্ত শিশু কৃষ্ণ যখন তাঁর মা যশোদাকে বিরক্ত করছিলেন, তখন তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর মা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত দড়ি একত্রিত করা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁধার পক্ষে তা অপ্রতুল হল। এইভাবে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখ ব্যাদন করেছিলেন ; স্নেহময়ী মাতা তাঁর পুত্রের মুখের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখতে পেয়েছিলেন। মা যশোদা তখন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর বাৎসল্য স্নেহের প্রভাবে তিনি মনে করেছিলেন যে সর্বশক্তিমান ভগবান নারায়ণ কৃপাপূর্বক তাঁর পুত্রকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করছেন, এবং তাঁরই কৃপাতে তিনি এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর বাৎসল্য স্নেহের প্রভাবে তিনি কখনো ভাবতে পারেননি যে তাঁর পুত্রই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ। এইটি হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি যোগমায়ার প্রভাব, যা ভগবানের বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলার পুষ্টি সাধন করেন। ভগবান ব্যতীত আর কার পক্ষে এই প্রকার অদ্ভুত লীলা-বিলাস করা সম্ভব ?

শ্লোক ৩১

নন্দং চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশাদ্
গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥ ৩১ ॥

নন্দম্—(শ্রীকৃষ্ণের পিতা) নন্দকে ; **চ**—ও ; **মোক্ষ্যতি**—রক্ষা করেন ; **ভয়াৎ**— ভয় থেকে ; **বরুণস্য**—জলের দেবতা বরুণের ; **পাশাৎ**—পাশ থেকে ; **গোপান্**— গোপগণ ; **বিলেষু**—পর্বতের গুহায় ; **পিহিতান্**—স্থাপিত ; **ময়সূনুনা**—ময়ের পুত্রের দ্বারা ; **চ**—ও ; **অহনি-আপৃতম্**—দিনের বেলায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার ফলে ; **নিশি**— রাত্রে ; **শয়ানম্**—শয়ন করে ; **অতিশ্রমেণ**—অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে ; **লোকম্**—

লোক; **বিকুণ্ঠম্**—বৈকুণ্ঠ; **উপনেষ্যতি**—প্রদান করেছিলেন; **গোকুলম্**—সর্বোচ্চ লোক; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে বরুণপাশের ভয় থেকে রক্ষা করেছিলেন, এবং ময়দানবের পুত্র যখন গোপবালকদের পর্বতের গুহায় আটক করে রেখেছিল, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। ব্রজবাসীরা যখন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার ফলে রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চিজ্জগতের সর্বোচ্চ লোকে উন্নীত করে পুরস্কৃত করতেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত এবং তা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণ করে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজ যখন ভ্রান্তিবশত নিশা অবসান হয়েছে মনে করে গভীর রাত্রে যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য বরুণদেব তাঁকে বরুণলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসনা ছিল যে যখন তাঁর পিতাকে মুক্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসবেন, তখন তিনি তাঁকে দর্শন করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে বরুণদেব নন্দ মহারাজকে বন্দী করেননি, কেননা ব্রজবাসীরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ভক্তিযোগের সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন। তাঁদের কোনরকম জড়জাগতিক দুঃখ-কষ্টের ভয় থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে দিব্য প্রেমে ভগবানের কাছে পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়ার ফলে যখন ভগবানের সঙ্গ লাভ হয়, তখন জড়া প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রজবাসীরা দিনের বেলায় অত্যন্ত ব্যস্ত থেকে কঠোর পরিশ্রম করতেন, এবং তার ফলে রাত্রে তাঁরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতেন। তাই ধ্যান করার অথবা অন্য কোনপ্রকার পারমার্থিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার কোন সময় তাঁদের ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক কার্যকলাপে সর্বদা যুক্ত ছিলেন। তাঁরা যা কিছু করতেন তা সবই ছিল চিন্ময়, কেননা তা সবই সম্পাদিত হত শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাই তাঁদের তথাকথিত জাগতিক কার্যকলাপ চিন্ময় শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইটি হচ্ছে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার সুফল। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার সমস্ত কার্য ভগবানের নিমিত্ত সম্পাদন করা এবং তার ফলে তার সমস্ত কার্যকলাপ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়, সর্বোচ্চ স্তরের চিন্ময় সমাধিতে মগ্ন হয়ে সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৩২

গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।

ধর্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্তদিনানি সপ্ত-
বর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥ ৩২ ॥

গোপৈঃ—গোপগণের দ্বারা ; **মখে**—দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞ ; **প্রতিহতে**—বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ; **ব্রজবিপ্লবায়**—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী ব্রজভূমির অস্তিত্ব বিনাশ করার জন্য ; **দেবে**—দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক ; **অভিবর্ষতি**—মুষলধারায় বারি বর্ষণের ফলে ; **পশূন**—পশুগণ ; **কৃপয়া**—তাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ; **বিরক্ষু**—তাদের রক্ষা করার বাসনা করেছিলেন ; **ধর্ত**—ধারণ করে ; **উচ্ছিলীন্ধ্রম্**—ছাতার মতো উৎপাটন করেছিলেন ; **ইব**—সদৃশ ; **সপ্তদিনানি**—একাদিক্রমে সাতদিন ; **সপ্ত-বর্ষঃ**—যদিও তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর ; **মহীধ্রম্**—গোবর্ধন পর্বত ; **অনঘ**—বিনা শ্রমে ; **এক-করে**—কেবল এক হাতে ; **সলীলম্**—লীলাচ্ছলে।

অনুবাদ

বৃন্দাবনের গোপেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন সাতদিন ধরে নিরন্তর মুষলধারায় বৃষ্টি হতে থাকলে বৃন্দাবন ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও ব্রজ পশুদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন একটি ছাতার মতো এক হাতে ধারণ করে ছিলেন।

তাৎপর্য

শিশুরা সাধারণত ব্যাঙের ছাতা নিয়ে খেলা করে, আর শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন কেবল সাত বছর তখন তিনি গোবর্ধন পর্বতকে উৎপাটিত করে এক হাতে সাতদিন ব্যাঙের ছাতার মতো ধারণ করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন ইন্দ্রের কোপ থেকে বৃন্দাবনের পশু এবং অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার কোন আবশ্যকতা থাকে না। বৈদিক শাস্ত্রে দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষদের উচ্চতর অধিকারীদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করা। দেবতারা হচ্ছেন জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত অধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে দেবতাদের পূজা করা পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করার পন্থা। কিন্তু কেউ যখন সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তাঁর দেবতাদের পূজা করার অথবা তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমির অধিবাসীদের উপদেশ দিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করতে কিন্তু ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় না জেনে ইন্দ্র ব্রজবাসীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আয়োজন করেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর স্বীয়

শক্তির প্রভাবে ব্রজবাসীদের এবং ব্রজপশুদের রক্ষা করে প্রমাণ করেন যে যাঁরা ভক্তরূপে তাঁর সেবায় যুক্ত তাঁদের দেবদেবীর সন্তুষ্টি বিধানের কোন প্রয়োজন থাকে না, এমন কি ব্রহ্মা অথবা শিবের মতো শক্তিশালী দেবতাদেরও নয়। এইভাবে এই ঘটনাটির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সর্ব অবস্থাতেই, তা সে মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপেই হোন অথবা সাত বছরের বালকরূপেই হোন বা ১২৫ বছরের বৃদ্ধ রূপেই হোন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান। তিনি কোন অবস্থাতেই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, এবং বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর রূপ ছিল ঠিক একটি ষোল বছর বয়স্ক যুবকের মতো। ভগবানের দিব্য শরীরের এগুলি হচ্ছে বিশেষ লক্ষণ।

শ্লোক ৩৩

ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্যাং
রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং
হর্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ৩৩ ॥

ক্রীড়ন্—লীলা-বিলাস করার সময়; **বনে**—বৃন্দাবনের বনে; **নিশি**—রাত্রি; **নিশাকর**—চন্দ্র; **রশ্মিগৌর্যাম্**—শুভ্র চন্দ্রকিরণ; **রাস-উন্মুখঃ**—রাসনৃত্য করতে অভিলাষী; **কলপদায়ত**—মধুর সঙ্গীত; **মূর্চ্ছিতেন**—এবং ছন্দোময় বাদ্যসহ; **উদ্দীপিত**—জাগরিত; **স্মররুজাম্**—কামেচ্ছা; **ব্রজভৃৎ**—ব্রজবাসীগণ; **বধূনাম্**—পত্নীদের; **হর্তুঃ**—হরণকারীর; **হরিষ্যতি**—বিনাশ করবে; **শিরঃ**—মস্তক; **ধনদ-অনুগস্য**—কুবেরের অনুগামীদের।

অনুবাদ

ভগবান যখন শুভ্র চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নিশিতে বৃন্দাবনের বনে মধুর সঙ্গীতের দ্বারা ব্রজবধূদের কামপীড়া উদ্দীপিত করে রাসনৃত্য করতে উন্মুখ হবেন, তখন ধনাঢ্য কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামক দৈত্য সেই ব্রজরমণীদের হরণ করবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার ধড় থেকে মস্তকটি ছেদন করবেন।

তাৎপর্য

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্রহ্মা নারদকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক যে ঘটনাগুলির কথা বলছেন সেগুলি ঘটবে ভবিষ্যতে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময়। যাঁরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, তাঁরা ভগবানের সমস্ত লীলা সম্বন্ধে অবগত থাকেন। সেইরকম একজন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ হওয়ার ফলে ব্রহ্মাজী ভগবানের লীলা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন। ভগবান কর্তৃক শঙ্খচূড় বধ

সাম্প্রতিক ঘটনা, যা রাসলীলার পরে হয়েছিল। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে দাবানল নির্বাপণের বর্ণনা কালীয়দমন লীলার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তেমনই রাসনৃত্য এবং শঙ্খচূড়-বধ এখানে একসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আপাত বিরোধের মীমাংসা হচ্ছে যে এইসমস্ত ঘটনাগুলি ঘটবে ভবিষ্যতে, ব্রহ্মাজী নারদকে যখন সেগুলি বলেছিলেন তারপরে। ভগবান শঙ্খচূড়কে বধ করেছিলেন ফাল্গুন মাসে তাঁর *হোরিকা* লীলার সময়, ভারতবর্ষে এখনও ভগবানের সেই লীলা হোলি নামে বিখ্যাত, এবং সেই উৎসবের আগের দিন শঙ্খচূড়ের প্রতিমূর্তি জ্বালান হয়।

ভবিষ্যতে ভগবান এবং তাঁর অবতারদের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণনা করা হয়। তাই যারা প্রামাণিক শাস্ত্রের বর্ণনা সম্বন্ধে অবগত, ছদ্মবেশে কপট অবতারেরা কখনো তাদের প্রতারণা করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪-৩৫

যে চ প্রলম্বখরদর্দুরকেশ্যরিষ্ট-
মল্লেভকংসযবনাঃ কপিপৌন্ড্রকাদ্যাঃ।
অন্যে চ শাল্বকুজবল্বলদন্তবক্র-
সপ্তোক্ষশম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ
কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম-
ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

যে—সেইসমস্ত; **চ**—পূর্ণত; **প্রলম্ব**—প্রলম্ব নামক অসুর; **খর**—ধেনুকাসুর; **দর্দুর**—বকাসুর; **কেশী**—কেশী দানব; **অরিষ্ট**—অরিষ্টাসুর; মল্ল—কংসের সভায় একজন মল্ল; **ইভ**—কুবলয়াপীড়; **কংস**—শ্রীকৃষ্ণের মাতুল এবং মথুরার রাজা; **যবনাঃ**—পারস্য এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্তী অন্যান্য দেশের রাজা; **কপি**—দ্বিবিদ; **পৌন্ড্রক-আদ্যাঃ**—পৌন্ড্রক ইত্যাদি; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **শাল্ব**—রাজা শাল্ব; **কুজ**—নরকাসুর; **বল্বল**—রাজা বল্বল; **দন্তবক্র**—শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু শিশুপালের ভ্রাতা; **সপ্তোক্ষ**—রাজা সপ্তোক্ষ; **শম্বর**—শম্বরাসুর; **বিদূরথ**—রাজা বিদূরথ; **রুক্মিমুখ্যাঃ**—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীর ভ্রাতা; **যে**—সেই সব; **বা**—অথবা; **মৃধে**—রণক্ষেত্রে; **সমিতিশালিন**—অত্যন্ত শক্তিমান; **আত্তচাপাঃ**—ধনুক এবং বাণে সুসজ্জিত; **কাম্বোজ**—কাম্বোজের রাজা; **মৎস্য**—দ্বারভাঙ্গার রাজা; **কুরু**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ; **সৃঞ্জয়**—রাজা সৃঞ্জয়; **কৈকয়-আদ্যাঃ**—কেকয়ের রাজা এবং অন্যেরা; **যাস্যন্তি**—প্রাপ্ত হবে; **অদর্শনম্**—ব্রহ্মজ্যোতিতে নির্বিশেষ সাযুজ্য; **অলম্**—কি কথা; **বল**—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব; **পার্থ**—অর্জুন; **ভীম**—

দ্বিতীয় পাণ্ডব ; **ব্যাজ-আহ্বয়েন**— ছদ্মনামের দ্বারা ; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা ; **নিলয়ম্**—ধাম ; **তদীয়ম্**—তাঁর।

অনুবাদ

প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেশী, অরিষ্ট, চাণুর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড় হস্তী, কংস, যবন, নরকাসুর এবং পৌণ্ড্রকের মতো অসুরেরা তথা শাম্বের মতো মহারথী, দ্বিবিদ বানর এবং বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ, শম্বর, বিদূরথ, এবং রুক্মি প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাজাগণ, এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় এবং কেকয় প্রমুখ মহান যোদ্ধাগণ সাক্ষাৎ শ্রীহরির সঙ্গে অথবা বলদেব, অর্জুন, ভীম ইত্যাদি নামে তাঁরই সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করবে। এইভাবে নিহত হওয়ার ফলে এই সমস্ত অসুরেরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হবে অথবা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের স্বীয় ধাম প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

জড় অথবা চিন্ময় উভয় জগতেরই সমস্ত প্রকাশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন শক্তি। ভগবান শ্রীবলদেব হচ্ছেন তাঁর প্রথম ব্যক্তিগত প্রকাশ এবং ভীম, অর্জুন আদি হচ্ছেন তাঁর পার্ষদ। ভগবান যখন আবির্ভূত হন তখন তিনি তাঁর সমস্ত পার্ষদ এবং শক্তিগণসহ আসেন। তাই প্রলম্ব আদি ভগবদ্বিদ্বেষী অসুর এবং অসুরসদৃশ মানুষেরা তখন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক অথবা তাঁর পার্ষদ কর্তৃক নিহত হয়। সেই সমস্ত বিষয় দশম স্কন্ধে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। কিন্তু আমাদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে উপরোক্ত যে সমস্ত জীবদের নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা হয় ব্রহ্মজ্যোতিতে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করবে অথবা ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবিষ্ট হবে। সে কথা পূর্বেই ভীষ্মদেব (প্রথম স্কন্ধে) বিশ্লেষণ করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণ বা বলরামের হাতে নিহত হয়েছিল, তারা মৃত্যুর সময় তাদের মানসিক অবস্থা অনুসারে চিন্ময়পদ লাভ করেছে। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেছেন। যাঁরা ভগবানকে কেবল একজন শক্তিমান ব্যক্তি বলে মনে করেছে, তারা ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতো সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছেন। তবে তাঁরা সকলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি এরকম লাভ হয়, তা হলে যাঁরা ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে ভক্তিসহকারে তাঁর সেবা করছেন, তাঁদের যে কি গতি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্লোক ৩৬

কালেন মীলিতধিয়ামবমৃশ্য নৃণাং
স্তোকায়ুষাং স্বনিগমো বত দূরপারঃ।

আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং
বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম ॥ ৩৬ ॥

কালেন—কালক্রমে ; **মীলিত-ধিয়াম্**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ; **অবমৃশ্য**—অসুবিধা বিবেচনা করে ; **নৃণাম্**—জনসাধারণের ; **স্তোক-আয়ুষাম্**—অল্পায়ু মানুষদের ; **স্বনিগমঃ**—স্বরচিত বৈদিক সাহিত্য ; **বত**—ঠিক সেইভাবে ; **দূরপারঃ**—অত্যন্ত কঠিন ; **আবির্হিতঃ**—আবির্ভূত হয়ে ; **তু**—কিন্তু ; **অনুযুগম্**—যুগ অনুসারে ; **স**—তিনি (ভগবান) ; **হি**—নিশ্চিতভাবে ; **সত্যবত্যাম্**—সত্যবতীর গর্ভে ; **বেদদ্রুমম্**—বেদরূপী কল্পবৃক্ষ ; **বিটপশঃ**—শাখার বিভাগের দ্বারা ; **বিভজিষ্যতি**—বিভক্ত করবেন ; **স্ম**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

কালক্রমে মানুষেরা যখন সঙ্কুচিত বুদ্ধি এবং অল্প আয়ুসম্পন্ন হবে, তখন তাদের পক্ষে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে বলে বিবেচনা করে ভগবান সত্যবতীর পুত্র (ব্যাসদেব) রূপে আবির্ভূত হয়ে যুগের পরিস্থিতি অনুসারে বেদরূপী কল্পবৃক্ষকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করবেন।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মা কলিযুগের অল্পায়ুসম্পন্ন মানুষদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবী সঙ্কলনের উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কেবল অল্পায়ুই হবে না, উপরন্তু ভগবদ্বিহীন হওয়ার ফলে বহু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উদ্বিগ্ন হবে। জড় দেহের ভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উন্নতি সাধন জড়া প্রকৃতির নিয়মে তমোগুণের প্রভাব। জ্ঞানের প্রকৃত প্রগতি হচ্ছে আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধি। কিন্তু কলিযুগের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত তাদের মাত্র একশত বছরের আয়ু (যা প্রকৃত পক্ষে চল্লিশ থেকে ষাট বছরে পরিণত হয়েছে) সর্বস্ব বলে মনে করে। তারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, কেননা জীবনের নিত্যতা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই ; তারা চল্লিশ বছরের আয়ুসম্পন্ন অনিত্য জড় শরীরটিকে তাদের জীবনের মূল তত্ত্ব বলে মনে করে। শাস্ত্রে এই প্রকার মানুষদের গাধা এবং ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত জীবের দয়াময় পিতারূপে পরমেশ্বর ভগবান বিপুল বৈদিক জ্ঞান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপে এবং পারমার্থিক স্নাতকদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করেন। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন প্রকার মানুষদের জন্য ব্যাসদেব পুরাণ এবং মহাভারতও রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির কোনটিই বৈদিক সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র নয়।

শ্লোক ৩৭

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং
পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং
বেষং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্যম্ ॥ ৩৭ ॥

দেব-দ্বিষাম্—যারা ভগবানের ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ; **নিগম**—বেদ; **বর্ত্মনি**—পথে; **নিষ্ঠিতানাম্**—ভালভাবে অবস্থিত; **পূর্ভিঃ**—ক্ষেপণাস্ত্র; **ময়েন**—ময় দানব কর্তৃক নির্মিত; **বিহিতাভিঃ**—নির্মিত; **অদৃশ্যতূর্ভিঃ**—আকাশমার্গে অদৃশ্য; **লোকান্**—বিভিন্ন লোকসমূহ; **ঘ্নতাম্**—হত্যাকারীদের; **মতিবিমোহম্**—মানসিক মোহ; **অতিপ্রলোভম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **বেষম্**—বেশ; **বিধায়**—করে; **বহু ভাষ্যতে**—অনেক কিছু বলবে; **ঔপধর্ম্যম্**—উপধর্ম।

অনুবাদ

নাস্তিক অসুরেরা বৈদিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে, মহাবিজ্ঞানী ময়দানব কর্তৃক নির্মিত মহাকাশযানে চড়ে গগনমার্গে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করবে, তখন তাদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি উপধর্ম প্রচার করবেন।

তাৎপর্য

ভগবান বুদ্ধের এই অবতার আধুনিক ইতিহাসে বর্ণিত বুদ্ধ অবতার নন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে এই শ্লোকে যে বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি অন্য এক কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক মনুর জীবনকালে বাহাত্তরেরও অধিক কলিযুগ হয়, এবং তাদেরই কোন একটি বিশেষ কলিযুগে এখানে যে বুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। মানুষ যখন অত্যন্ত জড়বাদী হয়ে ওঠে এবং সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মনীতির প্রচার করে, তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। বুদ্ধদেব যে অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন তা ধর্ম নয়, তা হচ্ছে ধার্মিক মানুষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম, কেননা তার দ্বারা মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয় অন্য কোন পশু অথবা জীবের অনিষ্ট সাধন না করতে; কেন না যে অন্যের ক্ষতি সাধন করে তারও ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি হয়। তবে এই অহিংসার নীতি শিক্ষালাভের পূর্বে আরো দুটি নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে হয়, এবং সেগুলি হচ্ছে বিনম্র এবং নিরভিমানী হওয়া। বিনম্র এবং নিরভিমানী না হলে হিতাকাঙ্ক্ষী এবং অহিংস হওয়া যায় না। অহিংস হওয়ার পর সহিষ্ণুতা এবং সরলতা শিক্ষালাভ করতে হয়। মহান ধর্মোপদেশক পারমার্থিক নেতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা মানুষদের অবশ্য কর্তব্য। সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযম,

পরিবার এবং গৃহের প্রতি অনাসক্তি, ভগবানের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের শিক্ষা লাভ করা মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। চরমে ভগবানকে স্বীকার করা এবং তাঁর ভক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে তা ধর্ম নয়। ভগবানকে কেন্দ্র করেই ধর্ম, অন্যথায় সাধারণ নৈতিক উপদেশ উপধর্ম মাত্র। তা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়, ধর্মের আভাস মাত্র।

শ্লোক ৩৮

যর্হ্যালয়েষ্বপি সতাং ন হরেঃ কথা স্যুঃ
পাষণ্ডিনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ।
স্বাহা স্বধা বষড়িতি স্ম গিরো ন যত্র
শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে ॥ ৩৮ ॥

যর্হি—যখন তা ঘটবে; **আলয়েষু**—গৃহে; **অপি**—যদিও; **সতাম্**—সভ্য ব্যক্তি; **ন**—না; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কথা**—কথা; **স্যুঃ**—হবে; **পাষণ্ডিনঃ**—নাস্তিক; **দ্বিজজনা**—উচ্চতর তিনটি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) বলে যারা ঘোষণা করে; **বৃষলা**—নিম্ন বর্ণের শূদ্র; **নৃদেবাঃ**—রাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ; **স্বাহা**—যজ্ঞের মন্ত্র; **স্বধা**—যজ্ঞের উপকরণ; **বষট্**—বৈদিক মন্ত্র; **ইতি**—এই সমস্ত; **স্ম**—হবে; **গিরঃ**—শব্দ; **ন**—কখনোই না; **যত্র**—কোনখানে; **শাস্তা**—দণ্ডদাতা; **ভবিষ্যতি**—প্রকট হবেন; **কলেঃ**—কলিযুগে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যুগান্তে**—অন্তে।

অনুবাদ

তারপর কলিযুগের শেষে, যখন তথাকথিত সাধু এবং উচ্চতর তিন বর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহেও ভগবানের কথা আলোচনা হবে না এবং যখন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত শূদ্র অথবা তার থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের হাতে ন্যস্ত হবে, এবং যখন স্বাহা, স্বধা, বষট্ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র আর শোনা যাবে না, তখন ভগবান পরম দণ্ডদাতারূপে আবির্ভূত হবেন।

তাৎপর্য

এখানে এই কলিযুগের অন্তিম সময়ে জড় জগতের যে কি প্রচণ্ড দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হবে, তার লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে মানুষের ভগবদ্বৈমুখ্য। সেই সময়ে তথাকথিত সাধুসন্ত এবং সমাজের উচ্চতর বর্ণের মানুষেরাও, যাদের সাধারণত দ্বিজজন বলা হয়, তারাও পাষণ্ডী হয়ে যাবে। তারা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কথা আলোচনা করা তো দূরে থাক, ভগবানের দিব্য নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হবে। সমাজের উচ্চ বর্ণের বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা (ব্রাহ্মণেরা) সমাজের ভাগ্যবিধায়ক, প্রশাসক বর্গ (ক্ষত্রিয়েরা) সমাজের আইন ও

শৃঙ্খলার পরিচালক, আর উৎপাদনকারীগণ (বৈশ্যেরা) সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির সাধক। এই তিনটি উচ্চ বর্ণের মানুষদের যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা উচিত। সাধুসন্ত এবং সমাজের উচ্চতর বর্ণের মানুষদের মাহাত্ম্যের পরিচয় হচ্ছে তাদের ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, তাদের জন্ম বা উপাধি নয়। ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তির ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যতীত এই সমস্ত উপাধি কেবল মৃত শরীরের অলঙ্কারের মতো। যখন সমাজে এই প্রকার অলঙ্করণই প্রাধান্য লাভ করে, তখন মানুষের জীবনে নানাপ্রকার বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়ে মানব সমাজের শান্তি ব্যাহত করে। সমাজের উচ্চ বর্ণে যখন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অভাব হয়, তখন মানুষ নিজেকে *দ্বিজজন* বলে পরিচয় দিতে পারে না। *দ্বিজ* শব্দটির প্রকৃত অর্থ এই মহান শাস্ত্রের বহু স্থানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং এখানেও পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে পিতামাতার দৈহিক মিলনের ফলে যে জন্ম হয় তা পশু জন্ম। কিন্তু এই পশু জন্ম এবং আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই চারটি পশু-প্রবৃত্তি সমন্বিত (পারমার্থিক তত্ত্ববিজ্ঞান বিহীন) যে জীবন তা হচ্ছে শূদ্রের জীবন বা নিম্ন স্তরের মানুষের অসভ্য জীবন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগের মানব সমাজের প্রশাসনিক শক্তি অসংস্কৃত, ভগবদ্বিহীন শ্রমিক সম্প্রদায়ের হাতে হস্তান্তরিত হবে, এবং তার ফলে বৃষলারা বা অসংস্কৃত মানব সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষেরা নৃদেব (বা রাষ্ট্রের মন্ত্রী) হবে। অসভ্য অসংস্কৃত নিম্ন বর্ণের মানুষেরা যখন নেতৃত্ব করে তখন সমাজে কোনরকম শান্তি অথবা সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। এইপ্রকার অসংস্কৃত পশুদের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, এবং নেতৃস্থানীয় মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করে, মানুষকে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দান করে, সমাজ ব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা করা। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্কৃতি প্রচার করার মাধ্যমে তা সম্ভব। মানব সমাজের অধঃপতিত অবস্থায় ভগবান কল্কি অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়ে নির্দয়ভাবে সমস্ত অসুরদের সংহার করেন।

শ্লোক ৩৯

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ
স্থানেঽথ ধর্মমখমন্বমরাবনীশাঃ।
অন্তে ত্বধর্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যাঃ
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্গে—সৃষ্টির আদিতে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অহম্**—আমি; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **নব**—নয়জন; **যে প্রজেশাঃ**—প্রজাপতিগণ; **স্থানে**—সৃষ্টির পালন করার সময়; **অথ**—নিশ্চিতভাবে; **ধর্ম**—ধর্ম; **মখ**—শ্রীবিষ্ণু; **মনু**—মানবদের পিতা; **অমর**—দেবতাগণ, যাদের উপর পালন করার ভার রয়েছে; **অবনীশাঃ**—বিভিন্নলোকের

রাজাগণ ; **অন্তে**—অন্তকালে ; **তু**—কিন্তু ; **অধর্ম**—অধর্ম ; **হর**—শিব ; **মন্যুবশ**—ক্রোধের বশে ; **অসুর-আদ্যাঃ**—ভক্তদের শত্রু নাস্তিকগণ ; **মায়া**—শক্তি ; **বিভূতয়**—শক্তিশালী প্রতিনিধি ; **ইমাঃ**—তাঁরা সকলে ; **পুরুশক্তিভাজঃ**—পরম শক্তিমান ভগবানের।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে তপস্যা, আমি (ব্রহ্মা) এবং প্রজাপতিগণ ; তারপর স্থিতি সময়ে শ্রীবিষ্ণু, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সমন্বিত দেবতাগণ এবং বিভিন্ন লোকের রাজাগণ ; এবং সংহারকালে অধর্ম, রুদ্র, এবং ক্রোধী নাস্তিক ইত্যাদি এরা সকলেই বহু শক্তিধারী ভগবানের শক্তির বিভিন্ন প্রতিনিধি।

তাৎপর্য

এই ভৌতিক জগৎ ভগবানের শক্তি থেকে উৎপন্ন, যার প্রকাশ সৃষ্টির প্রারম্ভে, প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার তপস্যা থেকে, এবং তারপর নয়জন প্রজাপতির আবির্ভাব হয়, যাঁরা মহান ঋষি নামে পরিচিত। সৃষ্টির পালনকালে যথার্থ ধর্ম, অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, বিভিন্ন দেবতাগণ এবং এই জগতের পালনকারী বিভিন্ন লোকের রাজাদের আবির্ভাব হয়। অবশেষে যখন সৃষ্টির সংহারের আয়োজন হয় তখন প্রথমে অধর্ম, তারপর ক্রোধোন্মত্ত নাস্তিকগণসহ শিবের প্রকাশ হয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ। তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ভিন্ন ভিন্ন অবতার। শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ব্রহ্মা রজোগুণের এবং শিব তমোগুণের নিয়ন্তা। এই জড়সৃষ্টি অনিত্য এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের মুক্তিলাভের সুযোগ দান করা। যারা শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক সংরক্ষিত সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের বৈষ্ণব পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে ও তার ফলে তারা ভগবানের ধামে উন্নীত হতে পারে ; তাদের আর তখন এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ৪০

বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানম্ ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ; **নু**—কিন্তু ; **বীর্য**—পরাক্রম ; **গণনাম্**—গণনায় ; **কতমঃ**—অন্য আর কে ; **অর্হতি**—করতে সক্ষম ; **ইহ**—এই জগতে ; **যঃ**—যিনি ; **পার্থিবানি**—পরমাণু ; **অপি**—ও ; **কবিঃ**—মহাবিজ্ঞানী ; **বিমমে**—গণনা করে থাকতে

পারে; **রজাংসি**—কণা; **চস্কন্ত**—ধরতে পারে; **যঃ**—যিনি; **স্ব-রংহসা**—তাঁর পায়ের দ্বারা; **অস্খলতা**—প্রতিহত না হয়ে; **ত্রি-পৃষ্ঠম্**—সর্বোচ্চলোকে; **যস্মাৎ**—যার দ্বারা; **ত্রি-সাম্য**—প্রকৃতির তিনগুণের সাম্য অবস্থা; **সদনাৎ**—সেই স্থান পর্যন্ত; **উরুকম্পযানম্**—অত্যন্ত বিচলিত।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রম কে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারে? কোন বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করে থাকতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও বিষ্ণুর বীর্য গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি তাঁর ত্রিবিক্রম অবতারে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোকেরও ঊর্ধ্বে প্রকৃতির তিন গুণের সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদ-বিক্ষেপ করেছিলেন, এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান হয়েছিল।

তাৎপর্য

জড় বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রগতি হচ্ছে পরমাণু শক্তি, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি তা করতে সক্ষমও হন অথবা আকাশকে বিছানার মতো গুটিয়েও ফেলতে পারেন, তথাপি পরমেশ্বর ভগবানের পরাক্রম এবং শক্তি তিনি গণনা করতে পারবেন না। তিনি *ত্রিবিক্রম* নামে পরিচিত, কেননা একসময় তাঁর বামন অবতারে তিনি সত্যলোকেরও ঊর্ধ্বে জড় জগতের আবরণ নামক প্রকৃতির তিনগুণের সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদবিক্ষেপ করেছিলেন। জড় আকাশের ঊর্ধ্বে সাতটি জড় আবরণ রয়েছে, এবং ভগবান সেই আবরণগুলি পর্যন্ত ভেদ করতে পারেন। তিনি তাঁর পায়ের আঙুল দিয়ে প্রকৃতির সেই আবরণে একটি ছিদ্র করেন যার মধ্য দিয়ে কারণ-সমুদ্রের জল জড় জগতে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সেটিই ত্রিভুবন-পাবনী পবিত্র গঙ্গা নদী। কেউই অপ্রাকৃত শক্তি-সম্পন্ন বিষ্ণুর সমান নয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং কেউই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ৪১

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ৪১ ॥

ন—কখনই না; **অন্তম্**—অন্ত; **বিদামি**—জানি; **অহম্**—আমি, **অমী**—এই সমস্ত; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অগ্রজাঃ**—তোমার পূর্বে যাদের জন্ম হয়েছে; **তে**—তুমি; **মায়াবলস্য**—সর্বশক্তিমানের; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কুতঃ**—অন্যদের কি কথা; **অবরাঃ**—আমাদের পরে যাদের জন্ম হয়েছে; **যে**—যারা; **গায়ন্**—গানের

দ্বারা ; **গুণান্**—গুণাবলী ; **দশ-শত-আননঃ**—সহস্র আনন ; **আদিদেবঃ**—ভগবানের প্রথম অবতার ; **শেষঃ**—শেষ ; **অধুনা**—এখন পর্যন্ত ; **অপি**—ও ; **সমবস্যতি**—প্রাপ্ত হতে পারে ; **ন**—না ; **অস্য**—তার ; **পারম্**—অন্ত।

অনুবাদ

আমি বা তোমার অগ্রজ মুনিগণও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারি না, সুতরাং আমাদের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা কিভাবে তাঁকে জানবে? ভগবানের প্রথম অবতার শেষ সহস্র বদনে তাঁর গুণাবলী নিরন্তর গান করেও এখনও পর্যন্ত তার সীমা পাননি।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান ভগবান অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা, এই তিনটি শক্তি প্রথমত প্রকাশ করেন, এবং সেই তিনটি শক্তির অসংখ্য বিস্তার হয়। তাঁর এই সমস্ত শক্তির বিস্তারের গণনা কেউই করতে পারে না, এমন কি শেষ অবতাররূপে সহস্র বদনে নিরন্তর সেগুলি বর্ণনা করা সত্ত্বেও তিনিও এই শক্তিসমূহের গণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ৪২

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে ॥ ৪২ ॥

যেষাম্—কেবল তাদেরই ; **সঃ**—ভগবান ; **এষ**—এই ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **দয়য়েৎ**—তাঁর কৃপা প্রদান করেন ; **অনন্তঃ**—অনন্ত শক্তিমান ; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে ; **আশ্রিত-পদঃ**—শরণাগত আত্মা ; **যদি**—যদি এইপ্রকার শরণাগতি ; **নির্ব্যলীকম্**—নিষ্কপট ; **তে**—তারাই কেবল ; **দুস্তরাম্**—দুরতিক্রম্য ; **অতি তরন্তি**—অতিক্রম করতে পারেন ; **চ**—এবং সামগ্রী ; **দেবমায়াম্**—ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ; **ন**—না ; **এষাম্**—তাদের ; **মম**—আমার ; **অহম্**—আমি ; **ইতি**—এইভাবে ; **ধীঃ**—চেতনা ; **শ্ব**—কুকুর ; **শৃগাল**—শৃগাল ; **ভক্ষ্যে**—খাদ্যস্বরূপ।

অনুবাদ

যাঁরা নিষ্কপটে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাবে দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং ভগবানকে জানতে পারেন। কিন্তু যারা কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য এই জড় দেহটির প্রতি আসক্ত, তারা কখনোই তা পারে না।

তাৎপর্য

ভগবানের অনন্য ভক্ত ভগবানের মহিমা জানেন, এবং তাঁরা জানেন ভগবান কত মহৎ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির বিস্তার কত বিশাল। যারা অনিত্য জড় দেহের প্রতি আসক্ত, তারা কখনোই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। দেহাত্ম-বুদ্ধিভিত্তিক জড় জগৎ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। জড়বাদীরা সর্বদাই জড় দেহের কল্যাণ সাধনের চেষ্টায় ব্যস্ত; কেবল তাদের নিজেদের দেহেরই নয়, তাদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, সমাজবাসী, দেশবাসী ইত্যাদির কল্যাণ সাধনেই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। জড়বাদীদের রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নানা প্রকার লোকহিতৈষী এবং পরার্থবাদী কার্যকলাপের শাখা রয়েছে, কিন্তু তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপ দেহাত্মবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করতে পারে না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে, তার পক্ষে কখনো ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিহীন জড় সভ্যতার সমস্ত প্রগতি তা যতই চাকচিক্যপূর্ণ হোক না কেন, তা ব্যর্থ।

শ্লোক ৪৩-৪৫

বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং
যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হিঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥ ৪৩ ॥

ইক্ষ্বাকুরৈলমুচুকুন্দবিদেহগাধি—
রঘম্বরীষসগরা গয়নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবা
দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ৪৪ ॥

সৌভর্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদ-
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।
যেঽন্যে বিভীষণহনূমদুপেন্দ্রদত্ত-
পার্থার্ষ্টিষেণবিদুরশ্রুতদেববর্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

বেদ—জেনে রাখ; **অহম্**—আমি; **অঙ্গ**—হে নারদ; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **যোগমায়াম্**—শক্তি; **যূয়ম্**—তুমি; **ভবঃ**—শিব; **চ**—এবং; **ভগবান**—মহান দেবতা; **অথ**—ও; **দৈত্যবর্যঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ, দৈত্য কুলোদ্ভূত মহান ভক্ত; **পত্নী**—শতরূপা; **মনোঃ**—মনুর; **স**—তিনি; **চ**—ও; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **চ**—এবং; **তৎ-আত্ম-জাঃ চ**—এবং প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, দেবহূতি আদি তাঁর

সন্তানগণ ; **প্রাচীনবর্হিঃ**—প্রাচীনবর্হি ; **ঋভুঃ**—ঋভুঃ ; **অঙ্গ**—অঙ্গ ; **উত**—এমনকি ; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব ; **চ**—এবং ; **ইক্ষ্বাকুঃ**—ইক্ষ্বাকু ; **ঐল**—ঐল ; **মুচুকুন্দ**—মুচুকুন্দ ; **বিদেহ**—মহারাজ জনক ; **গাধি**—গাধি ; **রঘু**—রঘু ; **অম্বরীষ**—অম্বরীষ ; **সগরা**—সগর ; **গয়**—গয় ; **নাহুষ**—নাহুষ ; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি ; **মান্ধাতৃ**—মান্ধাতা ; **অলর্ক**—অলর্ক ; **শতধনু**—শতধনু ; **অনু**—অনু ; **রন্তিদেবা**—রন্তিদেব ; **দেবব্রতঃ**—ভীষ্ম ; **বলিঃ**—বলি ; **অমূর্ত্তরয়ঃ**—অমূর্ত্তরয় ; **দিলীপঃ**—দিলীপ ; **সৌভরি**—সৌভরি ; **উতঙ্ক**—উতঙ্ক ; **শিবি**—শিবি ; **দেবল**—দেবল ; **পিপ্পলাদ**—পিপ্পলাদ ; **সারস্বতঃ**—সারস্বত ; **উদ্ধব**—উদ্ধব ; **পরাশর**—পরাশর ; **ভূরিষেণাঃ**—ভূরিষেণ ; **যে**—যারা ; **অন্যে**—অন্য ; **বিভীষণ**—বিভীষণ ; **হনূমৎ**—হনুমান ; **উপেন্দ্রদত্ত**—শুকদেব গোস্বামী ; **পার্থ**—অর্জুন ; **আর্ষ্টিষেণ**—অরিষ্টষেণ ; **বিদুর**—বিদুর ; **শ্রুতদেব**—শ্রুতদেব ; **বর্যাঃ**—মুখ্য ।

অনুবাদ

হে নারদ, যদিও ভগবানের শক্তি অজ্ঞেয় এবং অপরিমেয়, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে আমরা জানি কিভাবে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা কার্য করেন। এইভাবে ভগবানের শক্তি তুমি, ভগবান শিব, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁর পত্নী শতরূপা, মনু-সন্তান প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, বেনের পিতা অঙ্গ, মহারাজ ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, মহারাজ জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নাহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনুমান, শুকদেব গোস্বামী, অর্জুন, অরিষ্টসেন, বিদুর, শ্রুতদেব ইত্যাদি ব্যক্তিরা অবগত আছেন।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে অথবা বর্তমানে ভগবানের যত ভক্ত আছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা ভক্ত হবেন, তাঁরা সকলেই ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর, ব্যক্তিত্ব সহ ভগবানের বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে অবগত। তাঁরা কিভাবে তা অবগত হন? অবশ্যই তাঁদের মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নয়, অথবা সীমিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়। সীমিত জ্ঞান-আহরণ যন্ত্রের দ্বারা (ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা অথবা অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ আদি যন্ত্রের দ্বারা) এমনকি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত ভগবানের জড়া বা অপরা শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায় না। যেমন বৈজ্ঞানিকদের গণনার অতীত লক্ষ-কোটি গ্রহ রয়েছে। কিন্তু এগুলি কেবল ভগবানের জড়া শক্তির প্রকাশ। অতএব বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রকার জড় উপায়ের দ্বারা ভগবানের চিন্ময় শক্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার আশা কিভাবে করতে পারে? বহু 'যদি' এবং 'হয়ত' যুক্ত জল্পনা-কল্পনা

কখনোই জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে পারে না। পক্ষান্তরে এই প্রকার জল্পনা-কল্পনা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকারপূর্বক মামলা খারিজ করে দিয়ে হতাশায় পর্যবসিত হয়। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা তাই তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অতীত যে বিষয় সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা না করে যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেন, কেননা তিনিই বাস্তবিক জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। উপনিষদসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কঠোর পরিশ্রম করার মাধ্যমে অথবা মেধার দ্বারা অথবা জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা শব্দবিন্যাসের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। ভগবানের শরণাগত ভক্তই কেবল ভগবানকে জানতে পারেন। জড় জগতের শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাজী এখানে সেই সত্য অঙ্গীকার করেছেন। তাই আরোহ পন্থায় জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টায় শক্তির অপব্যয় করা উচিত নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে এবং এখানে বর্ণিত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। অসীম ভগবান যোগমায়ার দ্বারা শরণাগত আত্মাদের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে তাঁকে জানতে সহায়তা করেন।

শ্লোক ৪৬

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৪৬ ॥

তে—এইপ্রকার ব্যক্তিগণ; **বৈ**—নিঃসন্দেহে; **বিদন্তি**—জানেন; **অতিতরন্তি**—অতিক্রম করেন; **চ**—ও; **দেবমায়াম্**—ভগবানের আবরণাত্মিকা শক্তি; **স্ত্রী**—যেমন স্ত্রী; **শূদ্র**—শ্রমিক সম্প্রদায়ের মানুষ; **হূণ**—পর্বতবাসীগণ; **শবরা**—সাইবেরিয়াবাসী অথবা শূদ্রের থেকে অধম; **অপি**—যদিও; **পাপজীবাঃ**—পাপী জীব; **যদি**—যদি; **অদ্ভুত-ক্রম**—যার কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **পরায়ণ**—ভক্ত; **শীল**—ব্যবহার; **শিক্ষাঃ**—শিক্ষিত; **তির্যগ্‌জনা**—এমনকি যারা মানুষও নয়; **অপি**—ও; **কিম্**—কি; **উ**—বলার আছে; **শ্রুতধারণাঃ**— যাঁরা ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানকে স্বীকার করেন; **যে**— যাঁরা।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলে এবং ভক্তি যোগে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর আদি পাপজীবীরাও, এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অবগত হয়ে মায়ার মোহময় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

কখনো কখনো প্রশ্ন করা হয় কিভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) ভগবান অর্জুনকে তাঁর শরণাগত হতে উপদেশ দিয়েছেন। যারা তা করতে চায় না তারা প্রশ্ন করে ভগবান কোথায় এবং কার কাছে তারা আত্মসমর্পণ করবে। সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। কেউ তার চোখের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে নাও দেখতে পারে, কিন্তু সে যদি সঠিক পথে ঐকান্তিকভাবে পরিচালিত হতে চায় তা হলে ভগবান সদ্‌গুরু পাঠিয়ে দেবেন, যিনি তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে পরিচালিত করতে পারেন। পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোনরকম জাগতিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। জড় জগতে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তার সেই প্রকার যোগ্যতা না থাকলে সেই কার্যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে কেবল একটি মাত্র যোগ্যতার প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে শরণাগতি। নিজেকে সমর্পণ করার এই যোগ্যতাটিতে সকলেরই ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে। কেউ যদি চায়, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ, এক মুহূর্তও দেরী না করে আত্মসমর্পণ করতে পারে এবং তার ফলে পারমার্থিক জীবন শুরু করতে পারে। ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধি ভগবান থেকে অভিন্ন। পক্ষান্তরে বলা যায় ভগবানের প্রেমময়ী প্রতিনিধি ভগবানের থেকেও অধিক কৃপালু এবং তাঁর সমীপবর্তী হওয়া সহজ। পাপী ব্যক্তি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যেতে পারে না, কিন্তু সে অনায়াসে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছে যেতে পারে। কেউ যদি ভগবানের এইপ্রকার ভক্তের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তা হলে সেও ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অবগত হতে পারে এবং ভগবানের অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্তের মতো হয়ে তার নিত্য আনন্দময় আলয় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

অতএব ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করা এবং অর্থহীন জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তি লাভ করা আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু যারা শরণাগত না হয়ে ব্যর্থ জল্পনা-কল্পনাই কেবল করে, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৪৭

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥ ৪৭॥

শশ্বৎ—নিত্য ; **প্রশান্তম্**—ক্ষোভশূন্য ; **অভয়ম্**—নির্ভয় ; **প্রতিবোধমাত্রম্**—জড় চেতনার বিপরীত ; **শুদ্ধম্**—নিষ্কলুষ ; **সমম্**—ভেদশূন্য ; **সৎ-অসতঃ**—কারণ এবং কার্যের ; **পরমাত্ম-তত্ত্বম্**—আদি কারণের তত্ত্ব ; **শব্দঃ**—কাল্পনিক ধ্বনি ; **ন**—না ; **যত্র**—যেখানে ; **পুরু-কারকবান্**—সকাম কর্মে যার পরিণতি ; **ক্রিয়ার্থঃ**—উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে ; **মায়া**—মায়া ; **পরৈতি**—দূরে সরে যায় ; **অভিমুখে**—সম্মুখে ; **চ**—ও ; **বিলজ্জমানা**—লজ্জিত হয়ে ; **তৎ**—তা ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে ; **পদম্**—পরম অবস্থা ; **ভগবতঃ**—ভগবানের ; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের ; **পুংসঃ**—পুরুষের ; **ব্রহ্ম**—পরম ; **ইতি**—এইভাবে ; **যৎ**—যা ; **বিদুঃ**—বিদিত ; **অজস্র**—অন্তহীন ; **সুখম্**—সুখ ; **বিশোকম্**—শোকরহিত।

অনুবাদ

ব্রহ্ম-উপলব্ধি শোকরহিত অসীম আনন্দে পূর্ণ। তা অবশ্যই পরম পুরুষ ভগবানের পরম পদ। তিনি নিত্য ক্ষোভরহিত এবং অভয়। তিনি জড় পদার্থের বিপরীত পূর্ণ চেতনাময়। নির্মল এবং ভেদরহিত তিনি সমস্ত কারণ এবং কার্যের পরম কারণ। তাঁর সকাম কর্মের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, এবং মায়া তাঁর সামনে অবস্থান করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম বা পরম আশ্রয়, কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। জড় অস্তিত্বের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার ফলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে তাঁকে জানার প্রথম স্তর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে জড় বৈচিত্র্য থেকে ভিন্ন ভগবানের রূপ, ঠিক যেমন আলোক আঁধারের বিপরীত প্রকাশ। অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে আলোককে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যারা আলোকের জগতে অগ্রসর হয়েছেন তারা আলোকের বৈচিত্র্য দর্শন করতে পারেন। তেমনই, ব্রহ্ম-উপলব্ধির চরম অবস্থা হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতির উৎস, সব কিছুর পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। তাই ভগবদুপলব্ধি হলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি আপনা থেকেই হয়ে যায়, যা হচ্ছে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থার বিপরীত উপলব্ধি। ভগবদুপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধির তৃতীয় স্তর, যা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। এই তত্ত্ব সকলেরই জানা অবশ্য কর্তব্য।

প্রতিবোধ-মাত্রম্ জড় অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা। জড় জগৎ দুঃখময়, এবং ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রথম স্তরে তাই এই দুঃখময় পরিস্থিতির নিবৃত্তি হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিরূপ দুঃখ কষ্টের বিপরীত নিত্য অস্তিত্বের অনুভূতি হয়। সেইটি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রাথমিক অনুভূতি।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুরই পরমাত্মা, এবং তাই পরমের ধারণায় প্রেমের উপলব্ধি হয়। এই প্রেম আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক প্রসূত। পিতা তার পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ, কেননা পিতা এবং পুত্রের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু জড় জগতে এই প্রকার ভালবাসা প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন সেই প্রেম পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, কেননা তাঁর সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক তা হচ্ছে প্রকৃত প্রেম। তিনি দেহ বা মনের প্রেমাস্পদ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবাত্মার পূর্ণ, অনাবৃত শুদ্ধ প্রেমের বস্তু, কেননা তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। মুক্ত অবস্থায় ভগবানের প্রতি পূর্ণ প্রেম জাগরিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এক নিত্য আনন্দের অনন্ত প্রবাহ রয়েছে, যা জড় জগতের সুখের মতো প্রতিহত হওয়ার বা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা সমন্বিত নয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না ; তাই সেখানে কোন শোক এবং ভয় নেই। সেই আনন্দ বর্ণনাতীত, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান বা পার্থিব আয়োজনের সকাম কর্মের দ্বারা সেই আনন্দ উৎপাদন করা যায় না। আমাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভাবের বিনিময়ের ফলে যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বর্ণনা এই শ্লোকে করা হয়েছে, তা উপনিষদে বর্ণিত নির্বিশেষ ধারণার অতীত। উপনিষদে জড়জাগতিক ধারণার নিবৃত্তির বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অস্বীকৃতি নয়। এখানেও জড় তত্ত্বের বিষয়ে সেই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে ; তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং জড় উপাধির কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। মুক্ত পুরুষেরা ইন্দ্রিয়বিহীন নন ; তা যদি হত তাহলে ভগবানের সঙ্গে তাদের অপ্রাকৃত ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপলব্ধির কোন প্রশ্নই উঠত না। ভগবান এবং ভক্ত, উভয়েরই সমস্ত ইন্দ্রিয় জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তার কারণ হচ্ছে তাঁরা জড়া প্রকৃতির কারণ এবং কার্যের অতীত, যা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (*সদ্-অসতঃ পরম্*)।

মায়াশক্তি, ভগবান এবং তাঁর অপ্রাকৃত ভক্তের সম্মুখে লজ্জা অনুভব করার ফলে তাঁদের সম্মুখে থাকতে পারেন না। জড় জগতে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ শোকরহিত নয়, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ শোকরহিত। জড় এবং চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, এবং জড় ধারণার বশবর্তী হয়ে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার না করে তা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

জড় ইন্দ্রিয়সমূহ জড়া প্রকৃতির অবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত। মহাজনেরা সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় ধারণার কলুষ থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগতে ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার করা হয় নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য, কিন্তু চিজ্জগতে ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় সেগুলির মূল প্রয়োজনের নিমিত্ত, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। সেইটিই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কার্যকলাপ, এবং তাই সেখানে যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুভূতি তা জড় কলুষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না বা ছিন্ন হয় না, কেননা সেখানে ইন্দ্রিয়গুলি চিন্ময়ভাবে বিশুদ্ধ। আর ইন্দ্রিয়ের এই তৃপ্তি সেব্য

এবং সেবক উভয়েই অপ্রাকৃত ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে সমভাবে আস্বাদন করেন। যেহেতু এই প্রকার কার্য অন্তহীন এবং নিরন্তর বর্ধমান, তাই সেখানে জড় প্রচেষ্টা বা কৃত্রিম ব্যবস্থার কোন অবকাশ নেই। এই প্রকার দিব্য আনন্দকে বলা হয় *ব্রহ্ম-সৌখ্যম্‌*, যা পঞ্চম স্কন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৪৮

সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ॥ ৪৮ ॥

সধ্র্যক্—কৃত্রিম মনোধর্মপ্রসূত কল্পনা বা ধ্যান; **নিয়ম্য**—সংযত করে; **যতয়ঃ**—যোগীগণ; **যম-কর্ত-হেতিম্**—আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রক্রিয়া; **জহ্যুঃ**—ত্যাগ করা হয়; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **ইব**—সদৃশ; **নিপান**—কূপ; **খনিত্রম্**—খনন করার কষ্ট; **ইন্দ্রঃ**—বর্ষা নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা।

অনুবাদ

এইপ্রকার অপ্রাকৃত অবস্থায়, জ্ঞানী অথবা যোগীদের মতো, কৃত্রিমভাবে মনকে সংযত করার, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা করার অথবা ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না, ঠিক যেমন বর্ষার নিয়ন্ত্রণকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে জল পাওয়ার জন্য কূপ খনন করার কষ্ট করতে হয় না।

তাৎপর্য

জলের অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে জল পাওয়ার জন্য কূপ খনন করতে হয়। তেমনই, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে দরিদ্র ব্যক্তি মনের মাধ্যমে জল্পনা-কল্পনা করে অথবা ইন্দ্রিয় সংযত করে ধ্যান করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা জানে না যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া মাত্রই এইপ্রকার ইন্দ্রিয় সংযম এবং পারমার্থিক সিদ্ধি আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়। সেই জন্যই মহান মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ এবং কীর্তন করার বাসনা করেন। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের উদাহরণ অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই ব্রহ্মাণ্ডের মেঘগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং বারিবর্ষণের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা, তাই তাঁকে তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য জল সংগ্রহ করার জন্য কূপ খনন করতে হয় না। তাঁর পক্ষে জলের জন্য কূপ খনন করা হাস্যকর ব্যাপার। তেমনই, যারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে ভগবানের প্রকৃতি অথবা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন রকম জল্পনা-কল্পনা করতে হয় না, অথবা ভগবানের কাল্পনিক বা বাস্তবিক রূপের ধ্যান করতে হয় না। যেহেতু তাঁরা প্রকৃতই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের

এবং ধ্যানের চরম ফল ইতিমধ্যে প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৪৯

স শ্রেয়সামপি বিভুর্ভগবান্ যতোঽস্য
ভাবস্বভাববিহিতস্য সতঃ প্রসিদ্ধিঃ।
দেহে স্বধাতুবিগমেঽনুবিশীর্যমাণে
ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্যতেঽজঃ॥ ৪৯॥

সঃ—তিনি; **শ্রেয়সাম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **অপি**—ও; **বিভুঃ**—প্রভু; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যতঃ**—যেহেতু; **অস্য**—জীবের; **ভাব**—স্বাভাবিক গুণাবলী; **স্বভাব**—স্বীয় প্রকৃতি; **বিহিতস্য**—কার্যকলাপ; **সতঃ**—সমস্ত ভাল কাজ; **প্রসিদ্ধিঃ**—অন্তিম সাফল্য; **দেহে**—দেহের; **স্বধাতু**—গঠনের উপাদানসমূহ; **বিগমে**—বিনষ্ট হওয়ার ফলে; **অনু**—পরে; **বিশীর্যমাণে**—ত্যাগ করার পর; **ব্যোম**—আকাশ; **ইব**—মতো; **তত্র**—তারপর; **পুরুষঃ**—জীব; **ন**—কখনোই না; **বিশীর্যতে**—বিনষ্ট হয়; **অজঃ**—জন্মরহিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

যা কিছু মঙ্গলময় সে সবেরই পরম প্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কেননা জড় অথবা চিন্ময় অস্তিত্বে জীবের সমস্ত কার্যের ফল তিনিই প্রদান করেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম উপকারী। প্রতিটি জীবই জন্মরহিত, তাই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান বায়ুর মতো আত্মার বা জীবের অস্তিত্ব জড় দেহের বিনাশের পরেও বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

জীব অজ এবং নিত্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/৩০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে জড় দেহের বিনাশ হলেও জীবের বিনাশ হয় না। জীব যতক্ষণ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে তার কর্ম অনুসারে এই জন্মে অথবা পরজন্মে সেই সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। তেমনই চিন্ময় স্তরে সম্পাদিত কর্মও পাঁচ প্রকার মুক্তির মাধ্যমে ভগবান কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। নির্বিশেষবাদীরাও পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত তাদের ঈপ্সিত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে যে জীবের বাসনা অনুসারে ভগবান বর্তমান জীবনে মানুষকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ভগবান জীবকে বাসনা করার স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন এবং তাদের সেই বাসনা অনুসারে তিনি তাদের ফল প্রদান করেন।

তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিষ্ঠা সহকারে কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই আরাধনা করা। নির্বিশেষবাদীরা জল্পনা-কল্পনার পরিবর্তে

অথবা ধ্যান করার পরিবর্তে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারে এবং তার ফলে অনায়াসে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।

ভক্তেরা স্বাভাবিকভাবেই নির্বিশেষবাদীদের বাঞ্ছিত ব্রহ্ম-সাযুজ্যের বাসনা না করে ভগবানের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। ভক্তেরা তাই তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে ভগবানের দাস, সখা, পিতা-মাতা বা প্রেয়সী হতে চান। ভগবদ্ভক্তির নয়টি অপ্রাকৃত বিধি রয়েছে, যথা শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি, এবং এই প্রকার সহজ এবং স্বাভাবিক ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে ভক্তেরা সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেন, যা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি থেকে অনেক অনেক গুণ শ্রেয়। তাই ভক্তদের কখনো পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা অথবা কৃত্রিমভাবে শূন্যে ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয় না।

ভ্রান্তভাবে কখনো মনে করা উচিত নয় যে এই দেহের বিনাশের পর কোন শরীর থাকবে না যার দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করা সম্ভব। জীব অজ। এমন নয় যে তার জড় দেহের উৎপত্তির ফলে জীব সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে জড় দেহের বিকাশ হয় জীবের বাসনা অনুসারে। জড় দেহের বিবর্তন জীবের বাসনা অনুসারে হয়ে থাকে। জীবের এই বাসনা অনুসারে জড় দেহের বিকাশ হয়। অতএব চিন্ময় আত্মার জীবনী-শক্তি থেকে জড় দেহের প্রকাশ হয়। জীব যেহেতু নিত্য, তাই সে বায়ুর মতো দেহের ভিতর বিদ্যমান থাকে। বায়ু দেহের ভিতরে এবং বাহিরে বর্তমান। তাই যখন বাহিরের আবরণস্বরূপ জড় দেহ বিনষ্ট হয়, তখন চিৎ-স্ফুলিঙ্গ দেহের ভিতরের বায়ুর মতো বর্তমান থাকে। আর ভগবানের পরিচালনায়, যেহেতু তিনি হচ্ছেন জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, জীব তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গে সঙ্গ করার উপযুক্ত সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি বা সামীপ্য মুক্তিলাভের অনুরূপ দেহ লাভ করে।

ভগবান এতই দয়াময় যে কোন ভক্ত যদি জড় জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত অনন্য ভগবদ্ভক্তির চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তপরিবারে অথবা ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম হয়, যাতে জড়জাগতিক জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত না হয়ে অবশিষ্ট কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমান দেহ ত্যাগ করার পর তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের *ভাগবত-সন্দর্ভে* পাওয়া যায়। একবার পারমার্থিক স্থিতি লাভ হলে ভক্ত নিত্য সেই স্তরে অবস্থান করেন, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

শ্লোক ৫০

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥ ৫০॥

সঃ—তা; **অয়ম্**—একই; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতঃ**—আমার দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্বভাবনঃ**—প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা; **সমাসেন**—সংক্ষেপে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বিনা; **ন**—কখনোই না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **অন্যস্মাৎ**—কারণ হওয়ার ফলে; **সৎ**—প্রকাশিত; **অসৎ**—অব্যক্ত; **চ**—এবং; **যৎ**—যা কিছু।

অনুবাদ

হে পুত্র, আমি তোমাকে সংক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব বর্ণনা করলাম, যিনি হচ্ছেন এই প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বর ভগবান হরি বিনা এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জগতের আর অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

যেহেতু আমাদের সাধারণত এই অনিত্য জড় জগৎ এবং তার উপর বদ্ধ জীবের আধিপত্য করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই ব্রহ্মাজী নারদদেবের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন যে এই অনিত্য জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির কার্য এবং এই জগতে জীবন সংগ্রামে রত বদ্ধ জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা-শক্তি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ব্যতীত এই সমস্ত কার্যকলাপের অন্য কোন কারণ নেই। সেই ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভগবান নির্বিশেষরূপে নিজেকে বিতরণ করেছেন। তিনি বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তির এই সমস্ত জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তাঁর শক্তির দ্বারাই কেবল তিনি সর্বত্র বিরাজমান। যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তা সবই কেবল তাঁর শক্তিতে আশ্রিত; কিন্তু তিনি, পরমেশ্বর ভগবানরূপে সর্বদাই সব কিছু থেকে পৃথক। শক্তি এবং শক্তিমান যুগপৎ পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন।

এই দুঃখময় জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য কখনো ভগবানকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, ঠিক যেমন কারাগার সৃষ্টি করার জন্য রাজাকে দোষ দেওয়া যায় না। যারা রাষ্ট্রের আইন মানতে চায় না, সেই সব অবাধ্য নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় কারাগারের প্রয়োজন রয়েছে। তেমনই, যারা পরমেশ্বর ভগবানকে অস্বীকার করে নিজেরাই ভগবান সাজতে চায়, তাদের বিকৃত মনোভাব সংশোধন করার জন্য ভগবান এই দুঃখময় অনিত্য জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি কিন্তু সর্বদাই চান যে অধঃপতিত জীবেরা যেন ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে আসে, এবং সেই জন্য প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে, তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং তিনি স্বয়ং অবতরণ করে বদ্ধ জীবদের তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন। যেহেতু এই জড় জগতের প্রতি তাঁর কোন রকম আসক্তি নেই, তাই তা সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না।

শ্লোক ৫১

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥ ৫১ ॥

ইদম্—এই; **ভাগবতম্**—ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; **নাম**—নামক; **যৎ**—যা; **মে**—আমাকে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **উদিতম্**—প্রকাশিত হয়েছে; **সংগ্রহঃ**—সংগৃহীত; **অয়ম্**—এই; **বিভূতীনাম্**—বিভিন্ন শক্তির; **ত্বম্**—তুমি; **এতৎ**—এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; **বিপুলী**—বিস্তার; **কুরু**—কর।

অনুবাদ

হে নারদ, এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান সংক্ষেপে আমাকে বলেছিলেন। এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের বর্ণনা। তুমি এই বিজ্ঞান সম্প্রসারিত কর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমদ্ভাগবত সংক্ষেপে কেবলমাত্র ছটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, যা পরে বর্ণনা করা হবে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, এবং তা পরমেশ্বর ভগবানের অতি শক্তিশালী প্রতিনিধি। যেহেতু তিনি অদ্বয়-তত্ত্ব, তাই তাঁর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর থেকে অভিন্ন। ব্রহ্মাজী ভগবান সম্বন্ধীয় এই বিজ্ঞান সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, এবং তিনি তা নারদকে প্রদান করেছিলেন। নারদ শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বজ্ঞান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে। তাই পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত জ্ঞান মনোধর্মী তার্কিকদের জল্পনা-কল্পনা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত নিষ্কলুষ, নিত্য নির্ভুল জ্ঞান। তাই ভাগবত-পুরাণ হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দরূপে ভগবানের অবতার, এবং ভগবান থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস, ব্যাসদেব থেকে শুকদেব গোস্বামী, শুকদেব গোস্বামী থেকে সূত গোস্বামী—এই পরম্পরা-ধারায় সদ্গুরুর কাছ থেকে এই দিব্য জ্ঞান লাভ করতে হয়। বেদরূপী বৃক্ষের এই সুপক্ব ফলটি অতি উচ্চ শাখা থেকে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেই জন্য এক হাত থেকে আর এক হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে তা নেমে আসে। তাই গুরু-পরম্পরা ধারার যথার্থ প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ না করলে এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তা কখনোই পেশাদারী ভাগবত পাঠকের কাছে শ্রবণ করা উচিত নয় যারা তাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে।

শ্লোক ৫২

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সংকল্প্য বর্ণয় ॥ ৫২ ॥

যথা—যতখানি; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **ভবিষ্যতি**—আলোকপ্রাপ্ত হয়; **সর্বাত্মনি**—পরম ঈশ্বর; **অখিল-আধারে**—সেই সর্ব মঙ্গলময়কে; **ইতি**—এইভাবে; **সংকল্প্য**—নিষ্ঠাসহকারে; **বর্ণয়**—বর্ণনা কর।

অনুবাদ

নিষ্ঠা সহকারে এই ভগবত্তত্ত্ব তুমি বর্ণনা কর যাতে মানুষ সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং সমস্ত শক্তির পরম উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির দর্শন, এবং জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। ভগবান এবং তাঁর শক্তিসমূহকে জানবার জন্য কলিযুগের পূর্বে এইপ্রকার কোন গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কলিযুগের আবির্ভাবের ফলে মানব সমাজ অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া এবং অনর্থক পশুহত্যা—এই চারটি পাপ কর্মের দ্বারা অত্যন্ত কলুষিত হয়েছে, এবং তার ফলে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে। তাই মানুষ তার জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে গেছে। পশুর মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে এবং আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারটি পশু-প্রবৃত্তি উন্নত উপায়ে চরিতার্থ করা মানব জীবনের লক্ষ্য নয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই প্রকার অন্ধ মানব সমাজের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে একটি আলোক-বর্তিকা, যার দ্বারা মানুষ যথাযথভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়। তাই সৃষ্টির শুরুতেই বা জড় জগতের প্রকাশ হওয়ার সময়েই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়েছিল।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত এত বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই জ্ঞান লাভের প্রয়াসী যে কোন নিষ্ঠাবান বিদ্যার্থী কেবলমাত্র মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করার মাধ্যমে অথবা নিয়মিতভাবে উপযুক্ত কীর্তনকারীর কাছে তা শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। সকলেই আনন্দের অন্বেষণ করছে, কিন্তু এই যুগে মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে তারা বুঝতে পারে না যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, কেননা তিনি হচ্ছেন সবকিছুর পরম উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*)। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে প্রেমময়ী ভক্তির মাধ্যমে সম্পর্কিত হওয়ার ফলেই কেবল অপ্রতিহতরূপে পূর্ণ আনন্দ

আস্বাদন করা যায়, এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল দুঃখ-দুর্দশাময় জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এমনকি যারা জড় জগতের আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তারাও মহাবিজ্ঞান সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে এবং চরমে তারাও সফল হতে পারে। তাই নারদমুনিকে তাঁর গুরুদেব আদেশ দিয়েছিলেন দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সুপরিকল্পিতভাবে এই বিজ্ঞানকে উপস্থাপিত করতে। জীবিকা-নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করার উপদেশ নারদমুনিকে দেওয়া হয়নি; তাঁর গুরুদেব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করতে।

শ্লোক ৫৩

মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি ॥ ৫৩ ॥

মায়াম্—বহিরঙ্গা-শক্তির ব্যাপার; **বর্ণয়তঃ**—বর্ণনা করার সময়; **অমুষ্য**—ভগবানের; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বরের; **অনুমোদতঃ**—এইভাবে অভিনন্দিত; **শৃণ্বতঃ**—এইভাবে শ্রবণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাসহকারে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **আত্মা**—জীব; **ন**—কখনোই না; **মুহ্যতি**—মোহগ্রস্ত হয়।

অনুবাদ

ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁর শিক্ষা অনুসারে কীর্তন, অভিনন্দন এবং শ্রবণ করা উচিত। নিয়মিত ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তা করা হলে জীব কখনোই মায়ার দ্বারা মোহিত হবে না।

তাৎপর্য

নিষ্ঠা সহকারে জ্ঞান অর্জন করার পন্থা অন্ধ গোঁড়ামির আবেগ-প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রকার গোঁড়া বা মূর্খ মানুষেরা মনে করতে পারে যে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিরর্থক, এবং তারা ভ্রান্তভাবে দাবী করতে পারে যে তারা ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তিতে অংশ গ্রহণ করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা উভয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের কার্যকলাপ সমভাবে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে, যারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়, তাদের বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের লীলা-বিলাস ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করা উচিত। মূর্খের মতো রাসলীলা আদি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্যকলাপের প্রতি কৃত্রিমভাবে আকৃষ্ট হয়ে লাফ দিয়ে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে উঠবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সহজলভ্য ভাগবত পাঠকেরা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির

লীলাসমূহ বর্ণনা করতে অত্যন্ত উৎসাহী, আর মিছা ভক্তরা জড় সুখভোগের লালসায় মগ্ন হয়ে কৃত্রিমভাবে লাফ দিয়ে মুক্ত জীবের স্তরে উঠবার চেষ্টা করে এবং তার ফলে তারা বহিরঙ্গা শক্তির বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ হয়।

তাদের কেউ কেউ মনে করে যে ভগবানের লীলা-শ্রবণ করার অর্থ হচ্ছে গোপীদের সঙ্গে ভগবানের লীলা এবং গোবর্ধন ধারণ আদি লীলা শ্রবণ করা এবং জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস কার্যে ভগবানের পুরুষ-অবতার আদি অবতারদের লীলা শ্রবণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে রাস লীলায় অথবা জড় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্পর্কিত ভগবানের লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে, পুরুষাবতাররূপে ভগবানের লীলার বর্ণনা বিশেষরূপে মায়াগ্রস্ত জীবেদের জন্য। রাসলীলা আদি লীলার বিষয় মুক্ত জীবদের জন্য, বদ্ধ জীবদের জন্য নয়। তাই বদ্ধ জীবদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের লীলাসমূহ অনুরাগ এবং ভক্তি সহকারে শ্রবণ করা, এবং ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মুক্ত স্তরে রাসলীলা শ্রবণ করারই মতো। বদ্ধ জীবদের উচিত নয় মুক্ত আত্মাদের কার্যকলাপের অনুকরণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনো সাধারণ মানুষদের সঙ্গে রাসলীলা শ্রবণ করেননি।

ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম নটি স্কন্ধে দশম স্কন্ধ শ্রবণ করার ভূমি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে তা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। তৃতীয় স্কন্ধে তা আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হবে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম থেকেই পাঠ করতে অথবা শ্রবণ করতে শুরু করেন, দশম স্কন্ধ থেকে নয়। তথাকথিত কিছু ভক্ত আমাদের অনুরোধ করেছে এখনই দশম স্কন্ধের আলোচনা শুরু করতে। কিন্তু আমরা তা করিনি, কেন না আমরা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানরূপে উপস্থাপন করতে চাই, বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়প্রসূত জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। ব্রহ্মাজীর মতো মহাজনেরা তা করতে নিষেধ করেছেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রবণ করার ফলে বদ্ধ জীব ধীরে ধীরে মায়ামুক্ত হয়ে দিব্য জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন।

ইতি "বিশিষ্ট কার্য-সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতার" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন

শ্লোক ১

রাজোবাচ

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেঽগুণস্য চ।
যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১ ॥

রাজা—রাজা ; **উবাচ**—বললেন ; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মাজীর দ্বারা ; **চোদিতঃ**—উপদিষ্ট হয়ে ; **ব্রহ্মন্**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী) ; **গুণ-আখ্যানে**—অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনায় ; **অগুণস্য**—জড় গুণরহিত ভগবানের ; **চ**—এবং ; **যস্মৈ যস্মৈ**— যাঁকে যাঁকে ; **যথা**—যে প্রকারে ; **প্রাহ**—বর্ণনা করেছিলেন ; **নারদঃ**—নারদমুনি ; **দেব-দর্শনঃ**—দেবতার ন্যায় যাঁর দর্শন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—হে ব্রাহ্মণ ; ব্রহ্মা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে দেবতার ন্যায় দর্শন বিশিষ্ট শ্রীনারদমুনি কেমনভাবে এবং কাদের কাছে প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন ?

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মাজী সরাসরিভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাজী এই জ্ঞান স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের কাছে লাভ করেছিলেন ; তাই নারদ মুনি তাঁর শিষ্যদের যে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন তা পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানেরই তুল্য। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার এটিই হচ্ছে পন্থা। এই জ্ঞান আসছে গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান থেকে, এবং এই অবরোহ-পন্থায় এই দিব্য জ্ঞান এই জগতে বিতরণ হয়। মনোধর্মের ভিত্তিতে যারা অনুমান করে, তাদের কাছ থেকে কখনো বৈদিক জ্ঞান লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই নারদমুনি যেখানেই যান তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাই তাঁর দর্শন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনেরই তুল্য। তেমনই যে শিষ্য-পরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিব্য উপদেশ অনুসরণ করে, তা সৎপরম্পরা এবং

এই ধরনের সৎ পরম্পরাযুক্ত সদ্‌গুরুদের পরীক্ষা এই যে ভগবান প্রথমে তাঁর ভক্তকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে যে উপদেশ গুরুদেব দেন, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নারদ মুনি কিভাবে ভগবানের দিব্য জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন, তা পরবর্তী স্কন্ধগুলিতে বর্ণনা করা হবে।

সেই বর্ণনার মাধ্যমে দেখা যাবে যে, জড় সৃষ্টির পূর্বে ভগবান বিরাজমান ছিলেন, এবং তাই তাঁর অপ্রাকৃত নাম, গুণ ইত্যাদি কোন জড় গুণবাচক নয়। তাই ভগবানকে *অগুণ* বলে বর্ণনা করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর কোন গুণ নেই। প্রকৃতপক্ষে তা ইঙ্গিত করে যে, তিনি বদ্ধ জীবের মতো সত্ত্ব, রজো অথবা তমো গুণের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না। তিনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত, এবং তাই তাঁকে এখানে *অগুণ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তত্ত্ববিদাং বর।
হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই; **বেদিতুম্**—জানবার জন্য; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **তত্ত্ববিদাম্**—পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা ভালভাবে অবগত; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **হরেঃ**—ভগবানের; **অদ্ভুত-বীর্যস্য**—যিনি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন; **কথা**—বর্ণনা; **লোক**—সমস্ত লোকের; **সুমঙ্গলাঃ**—কল্যাণকর।

অনুবাদ

রাজা বললেন—আমি অপূর্ব শক্তিমান শ্রীহরির কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক, যা সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের পক্ষে কল্যাণকর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত লোকের জীবের পক্ষে কল্যাণকর। যারা মনে করে যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য, তারা অবশ্যই ভ্রান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্যই ভগবদ্ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় শাস্ত্র গ্রন্থ, কিন্তু তা অভক্তদের জন্যও মঙ্গল বিধায়িনী। কেননা তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ অভক্তরাও একাগ্রতা এবং ভক্তিসহকারে পরম্পরার ধারায় ভগবানের প্রতিনিধির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

কথয়স্ব—কৃপাপূর্বক বলতে থাকুন; **মহাভাগ**—হে পরম ভাগ্যশালী; **যথা**—যে প্রকার; **অহম্**—আমি; **অখিলাত্মনি**—পরমাত্মায়; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **নিবেশ্য**—স্থাপন করে; **নিঃসঙ্গম্**—জড় গুণ থেকে মুক্ত হয়ে; **মনঃ**—মন; **ত্যক্ষ্যে**—পরিত্যাগ করতে পারে; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, দয়া করে আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বর্ণনা করতে থাকুন যাতে আমি জড় গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মনকে পরমাত্মায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করে আমার কলেবর পরিত্যাগ করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত বর্ণনা শ্রবণে সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করা। আর নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করার অর্থ হচ্ছে জড় গুণাবলীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণ সূর্যসম, আর জড় কলুষ হচ্ছে অন্ধকার। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, ঠিক তেমনই নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে অচিরে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড় গুণের কলুষ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণ, আর জড় গুণ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। শুকদেব গোস্বামীর কৃপায় মুক্তির এই রহস্য অবগত হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ এখন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, কেননা শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে জানিয়েছেন যে জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে মৃত্যুর সময় নারায়ণকে স্মরণ করা। মহারাজ পরীক্ষিতের সাত দিন পরে মৃত্যু হওয়ার কথা, এবং তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করবেন এবং পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি পূর্ণ চেতনায় অনুভব করার মাধ্যমে তাঁর কলেবর পরিত্যাগ করবেন।

পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা মহারাজ পরীক্ষিতের অপ্রাকৃত শ্রবণ থেকে ভিন্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্ববেত্তা। জড়বাদী সকাম কর্মীরা আত্মতত্ত্ববেত্তা নয়, তারা তাদের তথাকথিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে জাগতিক লাভ করতে চায়। পেশাদারী ভাগবত পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকারী এইপ্রকার শ্রোতারা তাদের বাসনা অনুসারে কিছু জাগতিক লাভ করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এক সপ্তাহ ব্যাপী তাদের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার অভিনয় মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রবণের তুল্য।

সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাজনদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা, পেশাদারী পাঠকদের কাছ থেকে নয়। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত এই শ্রবণ করা উচিত, যাতে ভগবানের অপ্রাকৃত সঙ্গ লাভ করা যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ইতিমধ্যেই তাঁর রাজ্য এবং পরিবারের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, যা হচ্ছে জড় জগতের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জড় দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ করার মাধ্যমেই তিনি সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৪ ॥

শৃণ্বতঃ—যাঁরা শ্রবণ করেন; **শ্রদ্ধয়া**—দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে, সর্বক্ষণ; **গৃণতঃ**—গ্রহণ করেন; **চ**—ও; **স্বচেষ্টিতম্**—স্বীয় চেষ্টার দ্বারা; **কালেন**—সময়ে; **ন**—না; **অতিদীর্ঘেণ**—অত্যন্ত দীর্ঘকাল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বিশতে**—প্রকাশিত হন; **হৃদি**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

যাঁরা নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

সহজিয়া বা প্রাকৃত ভক্তরা উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করেই চাক্ষুষ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে চায়। এই প্রকার কনিষ্ঠ ভক্তদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে জড় আসক্তি এবং ভগবদ্দর্শন সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী। এমন নয় যে পেশাদারী ভাগবত পাঠকেরা কোন যান্ত্রিক উপায়ে জড়বাদী মিছা ভক্তদের হয়ে সেই কাজটি সম্পাদন করতে পারবে। এই বিষয়ে পেশাদারী মানুষেরা সম্পূর্ণ অক্ষম, কেননা তাদের না আছে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, আর না আছে শ্রোতাদের ভববন্ধন মোচনের অভিপ্রায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভাগবত পাঠ করার মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন করে তাদের পরিবার প্রতিপালন করা এবং কিছু জড় সুবিধা অর্জন করা। পরীক্ষিৎ মহারাজের আয়ু ছিল আর মাত্র সাতদিন, কিন্তু অন্যদের জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বয়ং অনুমোদন করেছেন যে তারা যেন নিরন্তর *নিত্যম্*—ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে। তার ফলে অচিরেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা সম্ভব হবে।

মিছাভক্তরা জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার কোনরকম প্রয়াস না করেই কিন্তু খেয়ালখুশি মতো ভগবানকে দর্শন করতে অত্যন্ত আগ্রহী। পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো মহাজন, যিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে প্রকৃতই লাভবান হয়েছিলেন, কখনো এইপ্রকার পন্থা অনুমোদন করেননি।

শ্লোক ৫

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥ ৫ ॥

প্রবিষ্টঃ—এইভাবে প্রবেশ করে; **কর্ণরন্ধ্রেণ**—কর্ণকুহরের মাধ্যমে; **স্বানাম্**—মুক্ত অবস্থা অনুসারে; **ভাব**—স্বরূপগত সম্পর্ক; **সরঃ-রুহম্**—পদ্মফুল; **ধুনোতি**—নির্মল করে; **শমলম্**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি জড় প্রভাব; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সলিলস্য**—জলাশয়ের; **যথা**—যেমন; **শরৎ**—শরৎ ঋতু।

অনুবাদ

পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দরূপী অবতার (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত) স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে ভাবরূপ কমলাসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ আদি জড়জাগতিক আসক্তি প্রসূত সমস্ত মলিনতাকে বিদূরিত করে, ঠিক যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে কর্দমাক্ত জলাশয়ের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত এই পৃথিবীর সমস্ত পতিত জীবদের উদ্ধার করতে পারেন। তাই যাঁরা প্রকৃতই নারদমুনি অথবা শুকদেব গোস্বামীর মতো শুদ্ধ ভক্তের বিশ্বাসভাজন হয়েছেন এবং তাঁর গুরুদেবের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছেন,ঠিক যেমন নারদমুনি ব্রহ্মাজী কর্তৃক হয়েছিলেন, তিনি যে কেবল নিজেকেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন তা নয়, তিনি তাঁর বিশুদ্ধ এবং শক্তিসম্পন্ন ভক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ উদ্ধার করতে পারেন। এখানে যে কর্দমাক্ত জলাশয়ে শরৎ ঋতুর বর্ষণের উপমা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। বর্ষার সময় নদীর জল কর্দমাক্ত হয়ে যায়, কিন্তু শরৎ কালে যখন অল্প বর্ষা হয় তখন সারা পৃথিবীর সমস্ত কর্দমাক্ত জল তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগের ফলে শহরের জল সরবরাহকারী জলাধারের জল পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু এই প্রকার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা নদীগুলির জল পরিষ্কার করা কখনোই সম্ভব নয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যে কেবল নিজেকেই উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই নয়, অন্য আর যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসেন, তাদেরও উদ্ধার করতে সক্ষম।

পক্ষান্তরে বলা যায়, অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা (যেমন জ্ঞান মার্গে অথবা যৌগিক কসরতের দ্বারা) কেবল নিজের হৃদয় নির্মল করা যায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে একজন শুদ্ধ, শক্ত্যাবিষ্ট ভক্ত সারা পৃথিবীর মানুষদের হৃদয় নির্মল করতে পারেন। নারদ মুনি, শুকদেব গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ষড় গোস্বামীগণ এবং পরবর্তী কালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রমুখ, তাঁদের শক্ত্যাবিষ্ট ভক্তির দ্বারা সকলকে উদ্ধার করতে পারেন। ঐকান্তিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার ফলে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মধুর রসে ভগবানের সঙ্গে স্বরূপগত সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায়, এবং এই প্রকার স্বরূপ উপলব্ধির ফলে জীব তৎক্ষণাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। নারদ মুনির মতো সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা কেবল স্বরূপ-সিদ্ধ জীবই নন, তাঁরা তাঁদের পারমার্থিক আবেগের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের বাণীর প্রচারকার্যে যুক্ত হন এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বহু হীন জীবদের উদ্ধার করেন। তাঁরা এই প্রকার শক্তিসম্পন্ন, কেননা তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব শ্রবণ করেন এবং আরাধনা করেন। এই কার্যকলাপের প্রভাবে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কাম, ক্রোধ আদি মল বিদূরিত হয়। ভগবান সর্বদাই জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, কিন্তু ভক্তির দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন।

জ্ঞানের অনুশীলন বা যোগের অভ্যাস সাময়িকভাবে অনুশীলনকারীর হৃদয় নির্মল করতে পারে, কিন্তু তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অল্প পরিমাণে স্থির জল পরিষ্কার করার মতো। এইভাবে পরিষ্কৃত জলে জলরাশি তলদেশে থিতিয়ে পড়ার ফলে সাময়িকভাবে পরিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু অল্প ক্ষোভিত হলেই পুনরায় সেই মল জলে মিশ্রিত হওয়ার জন্য কর্দমাক্ত হয়ে যায়। হৃদয়কে চিরতরে নির্মল করার একমাত্র পন্থা ভগবদ্ভক্তি। আর অন্য সমস্ত পন্থা সাময়িকভাবে কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু চিত্ত বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে তা পুনরায় কলুষিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। নিয়মিতভাবে সর্বদা ঐকান্তিক একাগ্রতা সহকারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে অনুমোদিত হয়েছে।

শ্লোক ৬

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥ ৬ ॥

ধৌত-আত্মা—যাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছে; **পুরুষঃ**—জীব; **কৃষ্ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পাদমূলম্**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়; **ন**—না; **মুঞ্চতি**—পরিত্যাগ করে; **মুক্ত**—মুক্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **পরিক্লেশঃ**—জীবনের সমস্ত ক্লেশ; **পান্থঃ**—পথিক; **স্ব-শরণম্**—নিজ গৃহে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে যাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছে, ভগবানের সেই ভক্ত কখনোই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না। কেননা সেখানে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেন, ঠিক যেমন দীর্ঘ ক্লেশকর পথ ভ্রমণের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পথিক সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত নয়, তার হৃদয় কখনো সম্পূর্ণরূপে নির্মল হতে পারে না। কিন্তু যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছে, তিনি কখনো ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করেন না। ব্রহ্মাজী যেমন নারদকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেইরকম প্রচার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে ভগবানের প্রতিনিধিরাও কখনো কখনো প্রচার করার সময় নানারকম তথাকথিত অসুবিধার সম্মুখীন হন। নিত্যানন্দ প্রভু যখন দুটি অত্যন্ত অধঃপতিত জীব জগাই এবং মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন তাঁকে এই প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তেমনই যিশুখ্রিস্টকে ভগবদ্বিদ্বেষীরা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। কিন্তু ভগবানের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্ত এইপ্রকার দুঃখ-কষ্টকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা অত্যন্ত কঠোর হলেও ভগবদ্ভক্ত তার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন, কেননা তাঁর সেই কার্যকলাপে ভগবান সন্তুষ্ট হন। প্রহ্লাদ মহারাজকে অসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনো ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা ভুলে যাননি। তার কারণ হচ্ছে যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় এতই নির্মল যে তিনি কখনো কোন অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারেন না। ভগবানের প্রতি ভক্তের সেবায় কোন রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না। জ্ঞানীর জ্ঞান আহরণের পন্থা অথবা যোগীর দৈহিক কসরত, অনুশীলনকারীরা চরমে সেগুলি পরিত্যাগ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনো ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন না, কেননা তিনি তাঁর গুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন। নারদ এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মতো শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের গুরুদেবের আদেশকে তাদের প্রাণের থেকেও অধিক বলে মনে করেন। ভবিষ্যতে তাঁদের জীবনে কি হবে তা নিয়ে তারা কখনো কোনরকম চিন্তা করেন না। যেহেতু সেই আদেশ আসছে উচ্চতর অধ্যক্ষের কাছ থেকে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধির কাছ থেকে বা স্বয়ং ভগবান থেকে, তাই তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তা গ্রহণ করেন।

এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। পথিক ধন উপার্জনের জন্য গৃহত্যাগ করে যখন দূরদেশে গমন করে, তখন তাকে অরণ্যে, সাগরে অথবা পর্বত-শিখরে অবশ্যই নানারকম ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সে যখন প্রবাস থেকে

তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের স্নেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে তার সমস্ত পথ-শ্রমের কথা ভুলে যায়।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত, এবং তাই ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি অবিচলিতভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৭

যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোহস্য ধাতুভিঃ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা ॥ ৭ ॥

যৎ—যেমন ; **অধাতু-মতঃ**—জড়রূপে গঠিত না হয়ে ; **ব্রহ্মন্**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ; **দেহ**—জড়দেহ ; **আরম্ভঃ**—শুরু ; **অস্য**—জীবের ; **ধাতুভিঃ**—পদার্থের দ্বারা ; **যদৃচ্ছয়া**—অকারণ, আকস্মিক ; **হেতুনা**—কোন কারণে ; **বা**—অথবা ; **ভবন্তঃ**—আপনি ; **জানতে**—যেভাবে জানেন ; **যথা**—সেইভাবে আপনি আমাকে বলুন।

অনুবাদ

হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ! চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে ভিন্ন। জীব কি কোন কারণের বশবর্তী হয়ে নাকি ঘটনাচক্রে আকস্মিক দেহ প্রাপ্ত হয়? আপনি তা জানেন, তাই আপনি দয়া করে আমাকে তা বলুন।

তাৎপর্য

একজন আদর্শ ভক্তরূপে মহারাজ পরীক্ষিৎ গুরু-পরম্পরা ব্রহ্মার ধারায় প্রতিনিধির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেই সন্তুষ্ট হননি, অধিকন্তু তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার বিশেষ বিজ্ঞান, এবং ঐকান্তিকভাবে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির হৃদয়ে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হতে পারে, সেগুলির উত্তর প্রামাণিক বর্ণনার মাধ্যমে তাতে দেওয়া হয়েছে। ভক্তিপথের পথিক ভগবান এবং জীব বিষয়ক সমস্ত প্রশ্ন তার গুরুদেবের কাছে করতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত থেকে জানা যায় যে গুণগতভাবে ভগবান এবং জীব এক। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব নিরন্তর একদেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবের এই জড় বন্ধনের কারণ কি? আত্ম-উপলব্ধি এবং ভগবদ্ভক্তির পথের সমস্ত পথিকদের জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরম পুরুষ ভগবানের এই প্রকার দেহান্তর হয় না। তিনি চিন্ময়ভাবে পূর্ণ, এবং বদ্ধ জীবের মতো তাঁর দেহ এবং আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। যে সমস্ত নিত্যমুক্ত জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সঙ্গ করেন, তারাও ঠিক

ভগবানের মতো। মুক্তির প্রতীক্ষাকারী বদ্ধ জীবেদেরই কেবল দেহের পরিবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়ার শুরু হয় কিভাবে?

ভগবদ্ভক্তির প্রথম সোপান হচ্ছে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁর কাছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। ভগবদ্ভক্তির পথে সর্ব প্রকার অপরাধ খণ্ডনের জন্য এই প্রকার জিজ্ঞাসা অপরিহার্য। কেউ যদি পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণও হন, তবুও তাঁকে তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর কাছে প্রশ্ন করতে হবে। সেই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুদেবকে অবশ্যই এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পারঙ্গত হতে হবে যাতে তিনি শিষ্যের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আর যারা প্রামাণিক শাস্ত্রে পারঙ্গত নয় এবং এই সমস্ত বিষয়ে সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়, তাদের কখনো গুরুর ভূমিকা অবলম্বন করা উচিত নয়। যে শিষ্যকে উদ্ধার করতে অসমর্থ, তার গুরু হওয়া অন্যায়।

শ্লোক ৮

আসীদ্ যদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণম্।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব ॥ ৮ ॥

আসীৎ—উদ্ভূত হয়েছিল; **যৎ-উদরাৎ**—যাঁর উদর থেকে; **পদ্মম্**—পদ্মফুল; লোক—জগৎ; **সংস্থান**—অবস্থিতি; **লক্ষণম**—লক্ষণ; **যাবান্**—যেমন ছিল; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইয়ত্তা**—পরিমিতি; **অবয়বৈঃ**—অবয়বের দ্বারা; **পৃথক্**—ভিন্ন; **তাবান্**—তেমন; **অসৌ**—সেই; **ইতি প্রোক্তঃ**—এইভাবে বলা হয়; **সংস্থা**—স্থিতি; **অবয়ববান্**—অবয়বযুক্ত; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

যাঁর উদর থেকে পদ্ম নাল প্রাদুর্ভূত হয়েছে সেই পরমেশ্বর ভগবান যদি তাঁর ক্ষমতা এবং পরিমিতি অনসারে বিরাট শরীরযুক্ত হন, তাহলে তাঁর সেই শরীর এবং সাধারণ জীবের শরীরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

তাৎপর্য

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত শরীর সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অবগত হওয়ার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেবের কাছে কিরকম বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করছেন তা লক্ষ্যণীয়। পূর্বে বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর মতো বিরাট শরীর ধারণ করেন, যাঁর লোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উদ্ভূত হয়। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে এক পদ্ম নির্গত হয় যার নালে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকসমূহ অবস্থিত, এবং তার শীর্ষে পদ্মফুলটি থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। জড় জগতের

সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর ভগবান নিঃসন্দেহে এক বিরাট শরীর ধারণ করেন, এবং জীবেরাও তাদের প্রয়োজন অনুসারে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করে। যেমন, একটি হস্তী তার প্রয়োজন অনুসারে এক বিরাট দেহ প্রাপ্ত হয়, আর একটি পিপীলিকা তার প্রয়োজন অনুসারে একটি ক্ষুদ্র দেহ প্রাপ্ত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও যদি ব্রহ্মাণ্ডের লোকসমূহ ধারণ করার জন্য এক বিরাট শরীর ধারণ করেন, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে জীবের দেহ ধারণ এবং ভগবানের দেহ ধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জীব এবং ভগবানের পার্থক্য কেবল দেহের আয়তন অনুসারে নয়। অতএব তার উত্তর নির্ভর করে সাধারণ জীবের দেহের সঙ্গে ভগবানের দেহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের উপর।

শ্লোক ৯

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনুগ্রহাৎ।
দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৯ ॥

অজঃ—কোন জড় উৎস থেকে যাঁর জন্ম হয়নি; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ভূতানি**—জড় দেহধারী প্রাণীসমূহের; **ভূতাত্মা**—জড় শরীর সমন্বিত; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে; **দদৃশে**—দর্শন করতে পারে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **তৎ-রূপম্**—তাঁর দেহের রূপ; **নাভি**—নাভি; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভূত হয়েছে।

অনুবাদ

যাঁর জন্ম কোন জড় উৎস থেকে হয়নি, পক্ষান্তরে ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত কমল থেকে হয়েছে এবং সেই সূত্রে যিনি জন্মরহিত, সেই ব্রহ্মা জড় জগতের সমস্ত প্রাণীসমূহের স্রষ্টা। ভগবানের কৃপায় সেই ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মাকে বলা হয় অজ, কেননা মাতৃগর্ভে তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি ভগবানের নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত একটি কমলে সরাসরিভাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভগবানের শরীর এবং ব্রহ্মার শরীর এক অথবা ভিন্ন কিনা তা সহজে বোঝা যায় না। তবে তা স্পষ্টভাবে বোঝা অবশ্য কর্তব্য। একটি বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে ব্রহ্মা সর্বতোভাবে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, কেননা তাঁর জন্মের পর কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার প্রভাবেই তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলেন। ব্রহ্মা যে রূপ দর্শন করেছিলেন, সেই রূপটি ব্রহ্মার রূপের সঙ্গে গুণগতভাবে এক কিনা তা একটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পেতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ।
মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সঃ—তিনি ; **চ**—ও ; **অপি**—তিনি যেমন ; **যত্র**—যেখানে ; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বিশ্ব**—জড় জগৎ ; **স্থিতি**—পালন ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি ; **অপ্যয়ঃ**—বিনাশ ; **মুক্ত্বা**—স্পর্শ না করে ; **আত্মমায়াম্**—স্বীয় শক্তির দ্বারা ; **মায়েশঃ**—সমস্ত শক্তির ঈশ্বর ; **শেতে**—শয়ন করেন ; **সর্বগুহাশয়ঃ**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন ।

অনুবাদ

কৃপা করে আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বলুন যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত শক্তির ঈশ্বর হলেও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা ভগবানের যে রূপ দর্শন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে চিন্ময়, তা না হলে তিনি কিভাবে কেবলমাত্র তাঁর ঈক্ষণের দ্বারা মায়াশক্তির স্পর্শ ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করেছিলেন ? সেই পুরুষই আবার সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন । সেই সম্বন্ধেও যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন ।

শ্লোক ১১

পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্বকল্পিতাঃ ।
লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুম ॥ ১১ ॥

পুরুষ—ভগবানের বিশ্বরূপ (বিরাট পুরুষ) ; **অবয়বৈঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা ; **লোকাঃ**—লোকসমূহ ; **সপালাঃ**—পালকগণসহ ; **পূর্ব**—পূর্বে ; **কল্পিতাঃ**—আলোচিত হয়েছে ; **লোকৈঃ**—বিভিন্ন লোকের দ্বারা ; **অমুষ্য**—তাঁর ; **অবয়বাঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ; **সপালৈঃ**—পালকগণসহ ; **ইতি**—এইভাবে ; **শুশ্রুম**—আমি শ্রবণ করেছি ।

অনুবাদ

হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোক তাদের পালকগণসহ বিরাট পুরুষের বিরাট শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত । আমি এও শুনেছি যে বিভিন্ন ভুবন হচ্ছে বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর । কিন্তু তাদের প্রকৃত স্থিতি কি ? দয়া করে আপনি কি তা বিশ্লেষণ করবেন ?

শ্লোক ১২

যাবান্ কল্পো বিকল্পো বা যথা কালোঽনুমীয়তে ।
ভূতভব্যভবচ্ছব্দ আয়ুর্মানং চ যৎ সতঃ ॥ ১২ ॥

যাবান্—যেমন ; **কল্পঃ**—সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মধ্যবর্তী কাল ; **বিকল্পঃ**—গৌণ সৃষ্টি এবং প্রলয় ; **বা**—অথবা ; **যথা**—যেমন ; **কালঃ**—সময় ; **অনুমীয়তে**—মাপা যায় ; **ভূত**—অতীত ; **ভব্য**—ভবিষ্যৎ ; **ভবৎ**—বর্তমান ; **শব্দ**—শব্দ ; **আয়ুঃ**—জীবের অবধি ; **মানম্**—মাপ ; **চ**—ও ; **যৎ**—যা ; **সতঃ**—সমস্ত লোকের সমস্ত জীবদের ।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অন্তর্বর্তী কাল (কল্প), গৌণ সৃষ্টি (বিকল্প) এবং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শব্দের দ্বারাসূচিত কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন । দেবতা, মানুষ ইত্যাদি নামে পরিচিত বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন জীবের আয়ুর কাল এবং পরিমিতি সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করুন ।

তাৎপর্য

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের এই বিভিন্ন রূপ ব্রহ্মাণ্ড এবং বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন জীবসমূহ সমন্বিত সমস্ত সামগ্রীর আয়ুষ্কাল সূচনা করে।

শ্লোক ১৩

কালস্যানুগতির্যা তু লক্ষ্যতেঽণ্বীবৃহত্যপি ।
যাবত্যঃ কর্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম ॥ ১৩ ॥

কালস্য—নিত্যকালের ; **অনুগতিঃ**—শুরু ; **যা তু**—তারা যেমন ; **লক্ষ্যতে**— অনুভূত হয় ; **অণ্বী**—ক্ষুদ্র ; **বৃহতি**—বৃহৎ ; **অপি**—ও ; **যাবত্যঃ**—যতক্ষণ ; **কর্ম- গতয়ঃ**—কর্ম অনুসারে ; **যাদৃশীঃ**—যেমন ; **দ্বিজ-সত্তম**—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দয়া করে আপনি কালের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পরিমিতির কারণ এবং কর্ম অনুসারে কালের কিভাবে সূচনা হয়, তা বর্ণনা করুন ।

শ্লোক ১৪

যস্মিন্ কর্মসমাবায়ো যথা যেনোপগৃহ্যতে ।
গুণানাং গুণিনাঞ্চৈব পরিণামমভীপ্সতাম্ ॥ ১৪ ॥

যস্মিন্—যাতে ; **কর্ম**—কর্ম ; **সমাবায়ঃ**—সমন্বয় ; **যথা**—যতদূর ; **যেন**—যার দ্বারা ; **উপগৃহ্যতে**—গ্রহণ করে ; **গুণানাম্**—জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ; **গুণিনাম্**—গুণের ; **চ**—ও ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **পরিণামম্**—ফলস্বরূপ ; **অভীপ্সতাম্**—বাসনা অনুসারে।

অনুবাদ

কিভাবে বিভিন্ন গুণ থেকে উৎপন্ন ফলের এবং জীবের বাসনা অনুসারে জীব দেবতা থেকে অত্যন্ত নগণ্য প্রাণী পর্যন্ত উন্নীত হয় অথবা অধঃপতিত হয়, সেই সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বিশ্লেষণ করুন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের সমস্ত কার্যের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অণু রূপে অথবা বিরাটরূপে সঞ্চিত হয় এবং সেই অনুপাতে সে কর্মের ফল প্রকাশিত হয়। কিভাবে সেই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তার বিভিন্ন পদ্ধতি, কি অনুপাতে তা ক্রিয়া করে, মহান ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামীর কাছে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের সেইগুলি হচ্ছে বিষয় বস্তু।

স্বর্গলোক নামক উচ্চতর লোকে অন্তরীক্ষযানের সাহায্যে যাওয়া যায় না (যে-চেষ্টা আজকাল অনভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা করছে)। পক্ষান্তরে সেখানে যাওয়ার প্রকৃত উপায় হচ্ছে সত্ত্বগুণে কর্ম করা।

আমাদের এই গ্রহেও যে সমস্ত দেশগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, সেখানে বিদেশীদের প্রবেশ করার ব্যাপারে নানারকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন, অনুন্নত দেশগুলির নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার ব্যাপারে মার্কিন সরকার নানারকম প্রতিবন্ধকতা জারি করেছে। তার কারণ হচ্ছে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি, তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা সেই দেশের সমৃদ্ধিতে ভাগ বসাতে দিতে চায় না। তেমনই অন্যান্য যে সমস্ত গ্রহে উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীবেরা বাস করে, তাদের মনোভাবও এইরকম। উচ্চতর গ্রহের অধিবাসীরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং চন্দ্র, সূর্য, শুক্র আদি গ্রহে যারা প্রবেশ করতে চায় তাদের অবশ্যই সত্ত্বগুণে কার্যকলাপ করার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন সত্ত্বগুণে কর্মের অনুপাতের উপর আধারিত, যার ফলে এই গ্রহের মানুষেরা ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতম প্রদেশে উন্নীত হতে পারে।

আমাদের এই জগতেও, সৎ কর্ম করার মাধ্যমে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করলে সমাজে উন্নত পদ লাভ করা যায় না। উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করে কেউই জোর করে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করতে পারে না। তেমনই, এই জীবনে সৎ কর্ম করার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন না করে কেউই উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে না।

যারা রজো এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতর লোকে প্রবেশ করার কোন সম্ভাবনা তাদের নেই।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার (৯/২৫) বর্ণনা অনুসারে যারা উচ্চতর স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করছে, তারা সেখানে যেতে পারে ; তেমনই, যারা পিতৃলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা পিতৃলোকে যেতে পারে ; তেমনই যারা এই পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করছে তারাও তা করতে পারে ; আর যারা তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায় তারাও সেই ফল লাভ করতে পারে। সত্ত্বগুণে সম্পন্ন বিভিন্ন কার্যকলাপ হচ্ছে ভক্তিযুক্ত পুণ্য কর্ম, ভক্তিযুক্ত জ্ঞানের অনুশীলন, ভক্তিযুক্ত যোগ এবং (চরমে) গুণাতীত শুদ্ধ ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তি জড়া প্রকৃতির অতীত এবং তাকে বলা হয় পরা-ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত ধামে উন্নীত হওয়া যায়। এই ভগবদ্ধাম কাল্পনিক নয়, তা চন্দ্র-সূর্যের মতোই বাস্তব। ভগবান এবং তাঁর ধাম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হতে হলে অবশ্যই অপ্রাকৃত গুণাবলী অর্জন করতে হয়।

শ্লোক ১৫

ভূপাতালককুব্ব্যোমগ্রহনক্ষত্রভূভৃতাম্।
সরিৎসমুদ্রদ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসাম্ ॥ ১৫ ॥

ভূ-পাতাল—ভূমির নীচে ; **ককুপ্**—স্বর্গের চারিদিক ; **ব্যোম**—আকাশ ; **গ্রহ**—গ্রহ ; **নক্ষত্র**—তারকা ; **ভূভৃতাম্**—পর্বতের ; **সরিৎ**—নদী ; **সমুদ্র**—সাগর ; **দ্বীপানাম্**—দ্বীপসমূহের ; **সম্ভবঃ**—উৎপত্তি ; **চ**—ও ; **এতৎ**—তাদের ; **ওকসাম্**—অধিবাসীদের।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন ভূমি, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, এবং সেই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত প্রাণীরা বাস করে তাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়।

তাৎপর্য

বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা বিভিন্নভাবে অবস্থিত, এবং তারা সকলেই সর্বতোভাবে সমান নয়। স্থলচর প্রাণীরা জলচর অথবা খেচর প্রাণীদের থেকে ভিন্ন, এবং তেমনই বিভিন্ন গ্রহ এবং নক্ষত্রের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে ভিন্ন। ভগবানের নিয়ম অনুসারে কোন স্থানই শূন্য নয়, তবে বিভিন্ন স্থানের প্রাণীরা অন্যান্য স্থানের প্রাণীদের থেকে ভিন্ন। এমনকি মানব সমাজেও জঙ্গল অথবা মরুভূমির অধিবাসীরা গ্রাম ও নগরের অধিবাসীদের থেকে ভিন্ন। প্রকৃতির গুণের প্রভাব অনুসারে তারা এইভাবে নির্মিত হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মের এই আয়োজন অন্ধ নয়। এই আয়োজনের পিছনে এক

বিশাল পরিকল্পনা রয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ মহর্ষি শুকদেব গোস্বামীর কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন প্রামাণিকভাবে যথাযথ উপলব্ধির মাধ্যমে সেই সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করেন।

শ্লোক ১৬

প্রমাণমণ্ডকোশস্য বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
মহতাং চানুচরিতং বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৬ ॥

প্রমাণম্—বিস্তার এবং মাপ; **অণ্ডকোশস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **বাহ্য**—বাহিরের; **অভ্যন্তর**—ভিতরে; **ভেদতঃ**—ভেদক্রমে; **মহতাম্**—মহাত্মাদের; **চ**—ও; **অনুচরিতম্**—চরিত্র এবং কার্যকলাপ; **বর্ণ**—জাতি; **আশ্রম**—জীবনের চারটি আশ্রম; **বিনিশ্চয়ঃ**—বিশেষভাবে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, মহাত্মাদের চরিত্র এবং যে যে লক্ষণ ও স্বভাব অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম নির্দিষ্ট হয়, তাও কৃপা করে বলুন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলক্ষণ ভক্ত, এবং তাই তিনি ভগবানের সৃষ্টির পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে উৎসুক। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে কি রয়েছে তা জানতে চেয়েছেন। যারা জ্ঞানের প্রকৃত অনুসন্ধানী তাদের এই সমস্ত বিষয় জানা উচিত। যারা মনে করে যে ভগবদ্ভক্তেরা তাদের আবেগ নিয়েই সন্তুষ্ট, তাদের মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা যথাযথ জ্ঞান লাভের ব্যাপারে কত আগ্রহী। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে কি রয়েছে তাই জানতে অক্ষম, অতএব ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কি রয়েছে সে সম্বন্ধে জানার তো কোন কথাই নেই।

পরীক্ষিৎ মহারাজ কেবল জড়জাগতিক জ্ঞান লাভ করেই সন্তুষ্ট নন। তিনি মহাত্মা, ভগবদ্ভক্তদের চরিত্র সম্বন্ধেও জানতে ইচ্ছুক। ভগবানের মহিমা এবং ভক্তের মহিমা সম্মিলিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়বস্তু। মা যশোদা যখন তাঁর পুত্রের মাধুর্যে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ কতটা মাটি খেয়েছেন তা দেখবার জন্য তাঁর মুখের ভিতর দেখতে চান, তখন তিনি তাঁর মুখের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তেরা ভগবানের মুখের ভিতর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে পারেন।

ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতে কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানব সমাজ চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত হয় সে সম্বন্ধেও পরীক্ষিৎ মহারাজ জানতে চেয়েছেন। সমাজের চারটি বর্ণ ঠিক দেহের চারটি অঙ্গের মতো। দেহে অঙ্গগুলি দেহ থেকে

অভিন্ন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সেগুলি কেবল অংশ। চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার এইটি হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। মানব সমাজের এই বিজ্ঞানসম্মত বিভাগের মূল্য নিরূপিত হয় ভগবদ্ভক্তির আনুপাতিক বিকাশের দ্বারা। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারীরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ। তারা সকলেই সরকারি কর্মচারী, কিন্তু তারা কেউই এককভাবে সরকার নয়। পরমেশ্বর ভগবানের রাষ্ট্রে সমস্ত জীবের স্থিতিও ঠিক এইরকম। কেউই কৃত্রিমভাবে ভগবানের পদ দাবী করতে পারে না, পক্ষান্তরে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই পরম পূর্ণের সেবা করা।

শ্লোক ১৭

যুগানি যুগমানং চ ধর্মো যশ্চ যুগে যুগে।
অবতারানুচরিতং যদাশ্চর্যতমং হরেঃ ॥ ১৭ ॥

যুগানি—বিভিন্ন যুগ ; **যুগমানম্**—প্রতি যুগের পরিমাণ ; **চ**—ও ; **ধর্মঃ**—ধর্ম ; **যঃ চ**—এবং যা ; **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে ; **অবতার**—অবতার ; **অনুচরিতম্**—অবতারদের কার্যকলাপ ; **যৎ**—যা ; **আশ্চর্যতমম্**—সবচাইতে আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

বিভিন্ন যুগ, তাদের পরিণাম, যুগধর্মসমূহ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির যুগাবতারদের অতি আশ্চর্য কার্যকলাপ আপনি কৃপা করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর সমস্ত অবতারেরা তাঁর থেকে উদ্ভূত, যদিও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ মহাজ্ঞানী মহর্ষি শুকদেব গোস্বামীর কাছে ভগবানের এই সব অবতারদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন যাতে প্রামাণিক শাস্ত্রে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর অবতারদের তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ সাধারণ মানুষদের বিচার ধারায় প্রভাবিত হয়ে ভগবানের অবতার স্বীকার করার মতো মানুষ ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণের মাধ্যমে এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো আচার্যের বর্ণনার ভিত্তিতে ভগবানের অবতারদের স্বীকার করতে চেয়েছিলেন। জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিরদ্বারা অবতরণ করেন, এবং তাই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপও অসাধারণ। ভগবানের বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সকলেরই জেনে রাখা উচিত ভগবানের কার্যকলাপ এবং ভগবান স্বয়ং অদ্বয় তত্ত্ব হওয়ার ফলে পরস্পর থেকে অভিন্ন। তাই ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করা এবং সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর সরাসরিভাবে

ভগবানের সাথে সঙ্গ করার ফলে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্বখণ্ডে আমরা সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

শ্লোক ১৮

নৃণাং সাধারণো ধর্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ।
শ্রেণীনাং রাজর্ষীণাং চ ধর্মঃ কৃচ্ছ্রেষু জীবতাম্ ॥ ১৮ ॥

নৃণাম্—মানব সমাজের; **সাধারণঃ**—সাধারণ; **ধর্মঃ**—ধর্ম বিশ্বাস; **সবিশেষঃ**—বিশেষভাবে; **চ**—ও; **যাদৃশঃ**—যেমন; **শ্রেণীনাম্**—তিনটি বিশেষ বর্ণের; **রাজর্ষীণাম্**—রাজর্ষিদের; **চ**—ও; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কৃচ্ছ্রেষু**—কষ্টকর পরিস্থিতিতে; **জীবতাম্**—জীবের।

অনুবাদ

কৃপা করে এও বলুন যে মানব সমাজের সাধারণ ধর্ম কি, ধর্ম অনুষ্ঠানের বিশেষ কর্তব্য কি, বর্ণাশ্রম ধর্ম কি, রাজর্ষিদের ধর্ম কি, এবং বিপদাপন্ন মানুষদের ধর্ম কি।

তাৎপর্য

জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই ধর্ম হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। এমনকি পশুরাও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারে, এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত বজরংজী বা হনুমান। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত কর্তৃক পরিচালিত হলে আদিবাসী অথবা নরখাদকেরাও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে। স্কন্ধ-পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে কিভাবে শ্রীনারদ মুনির প্রভাবে জঙ্গলের শিকারী ব্যাধ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। অতএব ভগবদ্ভক্তি প্রতিটি জীবই সমভাবে লাভ করতে পারে।

বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে যে ধর্মবিশ্বাস তা অবশ্যই মানুষের সাধারণ ধর্ম নয়, পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে ধর্মের মূলতত্ত্ব। কোন ধর্ম যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার নাও করে, তবুও সেই ধর্মের অনুগামীদের বিশেষ ধর্মনেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মকানুনগুলো পালন করতে হয়। এই প্রকার ধর্মনেতারা কখনোই সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নন, কেননা কোন না কোন তপস্যা করার মাধ্যমে এই সমস্ত নেতারা তাঁদের নেতৃত্বের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে কখনো নেতা হওয়ার জন্য কোনরকম নিয়মানুবর্তিতা বা তপশ্চর্যা পালন করতে হয় না, যা আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের মাধ্যমে দর্শন করি।

জীবিকা-নির্বাহের নিয়ম অনুসারে, সমাজের বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্যও ভগবদ্ভক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে সমস্ত কর্মের ফল ভক্তি সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা।

যাঁরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন তাঁদের কখনো কোনরকম অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারে না, এবং তাই তাঁদের পক্ষে *আপদ-ধর্ম* বা বিপদকালীন ধর্ম অনুশীলনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেই বিষয়ে এই গ্রন্থে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক বর্ণিত হবে, এবং তা হল ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য আর কোন ধর্ম নেই, যদিও তা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে পারে।

শ্লোক ১৯

তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণম্ ।
পুরুষারাধনবিধির্যোগস্যাধ্যাত্মিকস্য চ ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বানাম্—সৃষ্টির উপাদান সমূহ; **পরিসংখ্যানম্**—এই সমস্ত উপাদানের সংখ্যা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **হেতুলক্ষণম্**—কারণের লক্ষণসমূহ; **পুরুষ**—ভগবানের; **আরাধন**—ভক্তির; **বিধিঃ**—বিধি-নিষেধ; **যোগস্য**—যোগ পদ্ধতির; **অধ্যাত্মিকস্য**—ভক্তিমার্গে পরিচালিত করে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক পন্থা; **চ**—ও।

অনুবাদ

সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ এবং তাদের সংখ্যা, তাদের কারণ এবং তাদের লক্ষণ, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এবং অষ্টাঙ্গ যোগের বিধিও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২০

যোগেশ্বরৈর্যগতির্লিঙ্গভঙ্গস্তু যোগিনাম্ ।
বেদোপবেদধর্মানামিতিহাসপুরাণয়োঃ ॥ ২০ ॥

যোগ-ঈশ্বর—যোগশক্তির ঈশ্বর; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **গতিঃ**—প্রগতি; **লিঙ্গ**—সূক্ষ্ম শরীর; **ভঙ্গ**—বিচ্ছিন্ন; **তু**—কিন্তু; **যোগিনাম্**—যোগীদের; **বেদ**—দিব্য জ্ঞান; **উপবেদ**—বেদের অনুগামী জ্ঞান; **ধর্মানাম্**—ধর্মসমূহের; **ইতিহাস**—ইতিহাস; **পুরাণয়োঃ**—পুরাণসমূহের।

অনুবাদ

মহান যোগীদের ঐশ্বর্য কি এবং তাঁদের চরম উপলব্ধি কি ?সিদ্ধ যোগী কিভাবে তাঁর সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হন ? ইতিহাস পুরাণ আদি শাখা সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত জ্ঞান কি ?

তাৎপর্য

যোগেশ্বর বা সিদ্ধযোগীরা আট প্রকার যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে পারেন। সেগুলি হচ্ছে পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র হওয়ার ক্ষমতা, পালকের থেকেও হালকা হওয়ার ক্ষমতা, ইচ্ছা

অনুসারে যে কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষমতা, ইচ্ছা অনুসারে সর্বত্র ভ্রমণ করার ক্ষমতা, এমনকি অন্তরীক্ষে গ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এই প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতাশালী অনেক যোগেশ্বর রয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শিব। শিব শ্রেষ্ঠ যোগী, এবং তিনি সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত এইপ্রকার অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তেরা প্রত্যক্ষভাবে এই যোগের পন্থা অনুশীলন করেন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের কৃপায় দুর্বাসা মুনির মতো মহান যোগেশ্বরকেও পরাজিত করতে পারেন। এক সময় মহারাজ অম্বরীষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁর প্রতি যোগবল প্রয়োগ করতে চান। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাই ভগবান তাঁকে দুর্বাসার ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন। অবশেষে দুর্বাসাকে মহারাজ অম্বরীষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়েছিল।

তেমনই কৌরবেরা যখন রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার চেষ্টা করেছিল, তখন ভগবান অন্তহীন বস্ত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, যদিও দ্রৌপদীর কোনরকম যোগশক্তি ছিল না। ভগবানের ভক্তেরা তাই ভগবানের অন্তহীন শক্তির প্রভাবে যোগেশ্বর, ঠিক যেমন একটি শিশু তার পিতার শক্তিতে শক্তিমান। তাঁরা কোন কৃত্রিম উপায়ে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন না, কিন্তু তাঁদের পিতামাতার কৃপার প্রভাবে তাঁরা সর্বদা রক্ষিত হন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামীর কাছে এই প্রকার মহান যোগীদের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন, এবং এও জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা কি তাঁদের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমে এই প্রকার অসাধারণ শক্তি প্রাপ্ত হন, না কি ভগবানের কৃপার প্রভাবে প্রাপ্ত হন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে তাঁরা তাঁদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন বৈদিক জ্ঞানের তাৎপর্য কি। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা এবং তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ২১

সংপ্লবঃ সর্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
ইষ্টাপূর্তস্য কাম্যানাং ত্রিবর্গস্য চ যো বিধিঃ ॥ ২১ ॥

সংপ্লবঃ—সম্যক্ সাধনা বা পূর্ণ বিনাশ; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **বিক্রমঃ**—বিশেষ শক্তির অবস্থা; **প্রতিসংক্রমঃ**—চরম বিনাশ; **ইষ্টা**—বৈদিক বিধির অনুষ্ঠান; **পূর্তস্য**—ধর্মানুসারী পবিত্র কর্ম; **কাম্যানাম্**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের বিধি; **ত্রিবর্গস্য**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটি বর্গ; **চ**—ও; **যঃ**—যা কিছু; **বিধিঃ**—বিধি।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি বলুন জীবের উৎপত্তি কিভাবে হয়, কিভাবে তাদের পালন হয় এবং কিভাবে তাদের সংহার হয়। ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় কি কি। বৈদিক বিধি এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহের নির্দেশ কি, এবং ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের সাধনের বিধি কি?

তাৎপর্য

সংপ্লবঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণ সাধনা' এবং এই শব্দটি ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়, আর *প্রতিসংপ্লবঃ* শব্দটি তার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যা ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। যিনি দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভক্তির মার্গে অবস্থিত, তিনি অনায়াসে জীবনের কার্যসমূহ সম্পাদন করতে পারেন। বদ্ধ জীবনের অবস্থা একটি ক্ষুদ্র নৌকা নিয়ে বিশাল সমুদ্রে পাড়ি দেবার মতো। মানুষকে তখন সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের কৃপার উপর নির্ভর করতে হয়, এবং যে কোন মুহূর্তে সমুদ্রের স্বল্প বিক্ষেপের ফলে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবহাওয়া যদি ভাল থাকে তা হলে নৌকাটি নির্বিঘ্নে চলতে থাকে, কিন্তু যদি ঝড়-ঝঞ্ঝা, কুয়াশা, বায়ু অথবা বর্ষার প্রাদুর্ভাব ঘটলে সমুদ্র গর্ভে নৌকাটি ডুবে যেতে পারে। মানুষ যতই শক্তিশালী হোক এবং জড়জাগতিক দিক দিয়ে যতই সুসজ্জিত হোক সমুদ্রের তরঙ্গকে সে কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যারা জাহাজে করে সমুদ্র-পাড়ি দিয়েছে, সমুদ্রের কৃপার উপর যে কিভাবে নির্ভর করতে হয় সে অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। আর এই সংসাররূপী সমুদ্র যদিও দুস্তর, কিন্তু ভগবানের কৃপার প্রভাবে তা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। যদি বদ্ধ জীবনে কোন দুর্ভাগ্যজনক বিপদ দেখা দেয়, তখন কেউই সাহায্য করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু অনায়াসে এই ভব-সমুদ্র পার হন, কেননা ভগবান সর্বদা শুদ্ধ ভক্তকে রক্ষা করেন (*ভঃ গীঃ* ৯/১৩)। ভগবান তাঁর ভক্তের বদ্ধ জীবনের কার্যকলাপের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন (*ভঃ গীঃ* ৯/২৯)। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বতোভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত হওয়া।

তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে যেভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, সেইভাবে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে ভক্তির অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে জীবন ধারণের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। মানুষের দেহ ধারণের জন্য শাকসব্জি এবং দুধই যথেষ্ট, তাই জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্য কোন কিছু আহার করার প্রয়োজন নেই। জড় জগতে গর্বোদ্ধত হওয়ার জন্য ধন সঞ্চয়েরও কোন প্রয়োজন নেই। সৎ উপায়ে এবং সরলভাবে জীবিকা উপার্জন করা উচিত, কেননা অসৎ উপায়ে সমাজে ধনী হওয়ার থেকে সৎভাবে জীবন যাপনকারী

কুলী হওয়াও শ্রেয়। সৎ উপায়ে কেউ যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু কখনোই ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য সততা ত্যাগ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বাজে কথা বলা উচিত নয় বা প্রজল্প করা উচিত নয়।

ভক্তের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কৃপালাভ করা। তাই ভগবানের অতি অদ্ভুত সৃষ্টিতে ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। ভগবানের সৃষ্টিকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করার মাধ্যমে ভগবানের অবমাননা করা ভক্তের পক্ষে কখনোই উচিত নয়। এই জগৎ মিথ্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন ধারণের জন্য এই জগৎ থেকে কত কিছু গ্রহণ করতে হয়, তা হলে কিভাবে আমরা বলতে পারি যে এই জগৎ মিথ্যা? তেমনই, আমরা কিভাবে মনে করতে পারি যে ভগবান নিরাকার? যিনি পূর্ণ চেতন এবং পূর্ণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, তাঁর পক্ষে নিরাকার হওয়া কিভাবে সম্ভব?

এইভাবে শুদ্ধ ভক্তের জানার অনেক কিছু রয়েছে, এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যথাযথভাবে সেগুলি জানা উচিত।

ভক্তির অনুকূল অবস্থা হচ্ছে ভগবানের সেবার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী হওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবান চেয়েছেন যে ভগবদ্ভক্তি যেন পৃথিবীর সর্বত্র, প্রতিটি প্রান্তে প্রচারিত হয়, এবং তাই শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের এই নির্দেশ যতদূর সম্ভব পালন করা। কেবল ভগবদ্ভক্তির দৈনন্দিন বিধি অনুশীলনের ব্যাপারেই ভক্তের উৎসাহ থাকা উচিত নয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রচার করাও তাদের প্রথম কর্তব্য। তাঁর সেই প্রচেষ্টায় তিনি যদি আপাতদৃষ্টিতে সফল নাও হন, তবুও সেই কর্তব্য থেকে তাঁর বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সাফল্য এবং নৈরাশ্য উভয় ক্ষেত্রেই উদাসীন, কেননা তিনি হচ্ছেন রণক্ষেত্রের সৈনিক। ভগবদ্ভক্তি প্রচার জড় জীবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো। বিভিন্ন প্রকার জড়বাদী রয়েছে, যেমন সকাম কর্মী, মনোধর্মী জ্ঞানী, সিদ্ধিকামী যোগী ইত্যাদি। তারা সকলেই ভগবদ্বিদ্বেষী। তারা ঘোষণা করে যে তারাই হচ্ছে ভগবান, যদিও জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতিটি কার্যকলাপেই তারা ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। তাই ভগবানের শুদ্ধভক্ত এই সমস্ত নাস্তিকদের সঙ্গে সঙ্গ করেন না। নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত কখনো এই প্রকার অভক্ত নাস্তিকদের প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। কনিষ্ঠ ভক্তদের তাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। ভক্তের কর্তব্য কেবল আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ না করে সদ্‌গুরুর পরিচালনায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। সর্বদা দেখা উচিত সদ্‌গুরুর নির্দেশে কতখানি ভক্তি সম্পাদন হচ্ছে, আচার-অনুষ্ঠান নয়।

ভক্তের কখনো কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানের কৃপায় স্বাভাবিকভাবে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেটিই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরুর পরিচালনায় সেই উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে

সহজেই অবগত হওয়া যায়। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে সেই সম্বন্ধে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন, এবং সকলেরই তার সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বৈদিক অনুষ্ঠানের বিধি এবং পুরাণ ও মহাভারত আদি বেদানুগ শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে পুণ্য কর্ম সম্পাদনের বিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে মহাভারত হচ্ছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, এবং পুরাণসমূহও তাই। বেদানুগ শাস্ত্রে (স্মৃতিতে) পুণ্য কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশগুলি হল জনসাধারণের জল সরবরাহের জন্য পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন করা, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করা, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করা, দরিদ্রদের খাদ্য সরবরাহ করার জন্য দানছত্র স্থাপন করা ইত্যাদি এবং এই ধরনের কর্মগুলিকে বলা হয় পূর্ত।

তেমনই মহারাজ পরীক্ষিৎ সকলের লাভের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে স্বাভাবিক প্রবণতা চরিতার্থ করার পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ২২

যো বানুশায়িনাং সর্গঃ পাষণ্ডস্য চ সম্ভবঃ।
আত্মনো বন্ধমোক্ষৌ চ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ ॥ ২২ ॥

যঃ—সেই সমস্ত ; **বা**—অথবা ; **অনুশায়িনাম্**—ভগবানের শরীরে লীন ; **সর্গঃ**— সৃষ্টি ; **পাষণ্ডস্য**—পাষণ্ডদের ; **চ**—এবং ; **সম্ভবঃ**—উৎপত্তি ; **আত্মনঃ**—জীবসমূহের ; **বন্ধ**—বন্ধন ; **মোক্ষৌ**—মুক্তি ; **চ**—ও ; **ব্যবস্থানম্**—অবস্থিতি ; **স্বরূপতঃ**—বন্ধন মুক্ত অবস্থায়।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি বিশ্লেষণ করুন ভগবানের শরীরে লীনপ্রাপ্ত জীবাদির সৃষ্টি হয় কিভাবে, পাষণ্ডীদের উৎপত্তি হয় কিভাবে, এবং জীবের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ কি এবং তার স্বরূপে সে কিভাবে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

প্রগতিশীল ভগবদ্ভক্তের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে প্রশ্ন করা কিভাবে প্রলয়ের সময় জীবেরা ভগবানের দেহে লীন হয়ে যায় এবং সৃষ্টির সময় আবার কিভাবে ফিরে আসে। জীব দুই প্রকার—নিত্য মুক্ত এবং নিত্য বদ্ধ। নিত্য বদ্ধ জীবেরাও আবার দুই প্রকার। তারা হচ্ছে অনুগত এবং পাষণ্ড। অনুগতরাও আবার দুই প্রকার। যথা ভক্ত এবং মনোধর্মী জ্ঞানী। জ্ঞানীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায় অথবা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায়

রেখে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। যে সমস্ত ভক্তেরা পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ হতে পারেনি, তারা এবং জ্ঞানী দার্শনিকেরা পরবর্তী সৃষ্টিতে পুনরায় বদ্ধ অবস্থা লাভ করে, যাতে তারা শুদ্ধ হতে পারে। এই প্রকার বদ্ধ জীবেরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রগতি লাভ করে মুক্ত হয়। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন সদ্‌গুরুর কাছে এই সমস্ত প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ২৩

যথাত্মতন্ত্রো ভগবান্ বিক্রীড়ত্যাত্মমায়য়া।
বিসৃজ্য বা যথা মায়ামুদাস্তে সাক্ষিবদ্বিভুঃ ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন ; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—স্বতন্ত্র ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বিক্রীড়তি**—তাঁর লীলা উপভোগ করেন ; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা ; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করেন ; **বা**—ও ; **যথা**—তাঁর বাসনা অনুসারে ; **মায়াম্**—বহিরঙ্গা শক্তি ; **উদাস্তে**—থাকেন ; **সাক্ষিবৎ**—ঠিক একজন সাক্ষীর মতো ; **বিভুঃ**—সর্ব শক্তিমান।

অনুবাদ

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর লীলা আস্বাদন করেন, এবং প্রলয়ের সময় তিনি সে সমস্ত তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিতে পরিত্যাগ করেন, এবং তিনি কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার ফলে এবং সমস্ত অবতারদের উৎস হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণই কেবল একমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করে তাঁর লীলাবিলাস করেন এবং প্রলয়ের সময় তাদের বহিরঙ্গা শক্তিতে প্রদান করেন। তাঁর অন্তরঙ্গা-শক্তির প্রভাবেই কেবল তিনি মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকালেই পুতনার মতো একজন ভয়ঙ্কর রাক্ষসীকে সংহার করেছিলেন। তিনি যখন এই জগৎ পরিত্যাগ করার সংকল্প করেন, তখন তিনি তাঁর নিজের বংশের (যদুকুলে) সদস্যদের সংহার লীলা সম্পাদন করেন এবং এই প্রকার বিনাশের দ্বারা স্বয়ং অপ্রভাবিত থাকেন। যদিও তিনি সমস্ত ঘটনার সাক্ষী, কিন্তু তথাপি তাঁর কৃত্য কিছুই নেই। তিনি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে চেয়েছিলেন, কেননা শুদ্ধ ভক্তের সবকিছু ভালভাবে জানা উচিত।

শ্লোক ২৪

সর্বমেতচ্চ ভগবন্ পৃচ্ছতো মেঽনুপূর্বশঃ ।
তত্ত্বতোঽর্হস্যুদাহর্তুং প্রপন্নায় মহামুনে ॥ ২৪ ॥

সর্বম্—এই সমস্ত; **এতৎ**—প্রশ্ন; **চ**—যা কিছু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারিনি; **ভগবন্**—হে মহান ঋষি; **পৃচ্ছতঃ**—জিজ্ঞাসুর; **মে**—আমি; **অনুপূর্বশঃ**—শুরু থেকে; **তত্ত্বতঃ**—সত্য অনুসারে; **অর্হসি**—কৃপাপূর্বক বিশ্লেষণ করুন; **উদাহর্তুম্**—যেভাবে আপনি জানাবেন; **প্রপন্নায়**—শরণাগত; **মহামুনে**—হে মহর্ষি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হে মহামুনি, আমি প্রথম থেকে আপনার কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছি এবং যে সমস্ত বিষয় প্রশ্ন করতে পারিনি, কৃপাপূর্বক আপনি যথাযথভাবে সে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করুন। যেহেতু আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে সে সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করুন।

তাৎপর্য

গুরুদেব সর্বদাই শিষ্যকে জ্ঞান প্রদান করতে প্রস্তুত, বিশেষ করে শিষ্য যখন এই বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক। পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধনে উৎসুক শিষ্যের অনুসন্ধিৎসু হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন আদর্শ শিষ্য, কেননা তিনি পূর্ণরূপে আগ্রহী। আত্ম-উপলব্ধির ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী না হলে কেবল শিষ্য হওয়ার অভিনয় করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন কেবল সেগুলি সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসু নন, যে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করতে পারেননি সেই সম্বন্ধেও তিনি জানতে আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে গুরুদেবের কাছে সবকিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়, কিন্তু সদ্‌গুরুদেব শিষ্যের কল্যাণের জন্য তাকে সর্বতোভাবে জ্ঞান দান করতে সক্ষম।

শ্লোক ২৫

অত্র প্রমাণং হি ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্মভূঃ ।
অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্বেষাং পূর্বজৈঃ কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

অত্র—এই বিষয়ে; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **হি**—অবশ্যই; **ভবান্**—আপনি; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা; **যথা**—যেমন; **আত্মভূঃ**—সরাসরিভাবে ভগবান থেকে যাঁর জন্ম হয়েছে; **অপরে**—অন্যেরা; **চ**—কেবল; **অনুতিষ্ঠন্তি**—কেবল অনুসরণ করার জন্য; **পূর্বেষাম্**—প্রথা অনুসারে; **পূর্বজৈঃ**—পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা যে জ্ঞান অনুমোদন করেছেন; **কৃতম্**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! আত্মযোনি ব্রহ্মার মতো আপনিই একমাত্র এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের তত্ত্ববেত্তা। এই জগতে অন্যান্য সকলে পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণের আচরিত বিষয়েরই অনুসরণ করেন।

তাৎপর্য

এখানে হয়ত প্রশ্ন হতে পারে যে পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয়ে শুকদেব গোস্বামীই কেবল একমাত্র তত্ত্ববেত্তা নন, কেননা অন্যান্য বহু ঋষি এবং তাঁদের অনুগামীরাও রয়েছেন। ব্যাসদেবের সমসাময়িক এবং তাঁর পূর্বে গৌতম, কনাদ, জৈমিনি, কপিল এবং অষ্টাবক্র আদি বহু মহান ঋষি রয়েছেন, এবং তাঁরা সকলেই তাঁদের দর্শন প্রদান করেছেন। পতঞ্জলিও তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু এই সমস্ত মহান ঋষিরাও আধুনিক দার্শনিক এবং মনোধর্মীদের মতো তাঁদের নিজ নিজ মত প্রদান করেছেন। পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত বিখ্যাত ঋষি কর্তৃক প্রদত্ত ছয়টি দার্শনিক পন্থা ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শুকদেব গোস্বামীর দর্শনের পার্থক্য হচ্ছে যে ছয়জন মহর্ষি তাঁদের নিজেদের ধারণা অনুসারে তাঁদের মতামত প্রদান করেছেন, কিন্তু শুকদেব গোস্বামী যে জ্ঞান দান করেছেন তা *আত্মভূঃ* ব্রহ্মার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অপ্রাকৃত বৈদিক জ্ঞান সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অবতরণ করে। তাঁর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা এই জ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মা সেই জ্ঞান দান করেন নারদকে এবং নারদমুনি ব্যাসদেবকে তা দান করেন। শুকদেব গোস্বামী এই দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে। এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় লব্ধ এই জ্ঞান সর্বতোভাবে পূর্ণ। গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় এইভাবে এই জ্ঞান লাভ না করলে আদর্শ গুরু হওয়া যায় না। দিব্য জ্ঞান লাভ করার এইটি হচ্ছে রহস্য।

যে ছয়জন মহর্ষির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা মহান চিন্তাশীল হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান পূর্ণ নয়। কোন দার্শনিক তাঁর দর্শনগত মতামত বা তত্ত্ব উপস্থাপনায় যতই দক্ষ হন তা কখনই পূর্ণ নয়; কেননা তা ত্রুটিপূর্ণ মনোপ্রসূত। এই সমস্ত মহান ঋষিদেরও পরম্পরা রয়েছে, কিন্তু তা প্রামাণিক নয়। কেননা সেই জ্ঞান স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ থেকে সরাসরিভাবে আসছে না। নারায়ণ ব্যতীত কেউই স্বতন্ত্র হতে পারে না; তাই কারও জ্ঞানই পূর্ণ নয়, কেননা সকলের জ্ঞানই তাদের চঞ্চল মনের উপর আধারিত। মন জড় এবং তাই মনোধর্মী কাল্পনিকদের মতবাদ কখনো দিব্য নয় এবং পূর্ণ নয়। জড় দার্শনিকেরা স্বয়ং অপূর্ণ হওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়,কেননা জড় দার্শনিকেরা যদি তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা না করতে পারে তা হলে তাদের দার্শনিক বলে গণ্য করা হয় না। পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এই প্রকার মনোধর্মীদের স্বীকৃতি দেন না, তা তিনি যতই মহান হোন। পক্ষান্তরে তাঁরা শুকদেব গোস্বামীর মতো আচার্যের কাছে দিব্য জ্ঞান গ্রহণ

করেন, যিনি পরম্পরার ধারায় পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, যা বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভবগদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৬

ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্ননশনাদমী।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষম্ তদ্বাক্যাব্ধিবিনিঃসৃতম্ ॥ ২৬ ॥

ন—কখনোই না; **মে**—আমার; **অসবঃ**—জীবন; **পরায়ন্তি**—শেষ হয়ে যায়; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মজ্ঞানী; **অনশনাৎঅমী**—অনশনের ফলে; **পিবতঃ**—পান করার ফলে; **অচ্যুত**—যাঁর পতনের কোন সম্ভাবনা নেই; **পীযূষম্**—অমৃত; **তৎ**—আপনার; **বাক্যাব্ধি**—বাণীরূপী সমুদ্র; **বিনিঃসৃতম্**—প্রবাহিত হচ্ছে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! যেহেতু আমি আপনার বাণী-সমুদ্র থেকে প্রবাহিত অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের কথামৃত পান করেছি, তাই আমি অনশনজনিত কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস এবং শুকদেব গোস্বামী থেকে যে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা, তা অন্যান্য সমস্ত পরম্পরা থেকে বিশেষভাবে ভিন্ন। অন্যান্য মুনিদের থেকে যে পরম্পরা তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তা অচ্যুত ভগবানের বাণী বা অচ্যুত কথা সমন্বিত নয়। মনোধর্মী জ্ঞানীরা যুক্তি এবং তর্কের মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারে, কিন্তু এইপ্রকার যুক্তি এবং তর্ক অচ্যুত নয়, কেননা অধিক পারদর্শী জ্ঞানী তা খণ্ডন করতে পারেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ চঞ্চল মনের শুষ্ক ধারণার প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের কথার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কেননা তিনি বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ-নিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করার ফলে তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়েছিল, যদিও তিনি আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবাস করছিলেন।

কেউ ইচ্ছা করলে মনোধর্মী জ্ঞানীদের কথা শ্রবণ করতে পারে, কিন্তু তা দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রবণ করা সম্ভব হয় না। এই প্রকার নীরস কথা অচিরেই ক্লান্তিকর বোধ হয়, এবং সেই সমস্ত অর্থহীন জল্পনা-কল্পনার কথা শ্রবণ করে কেউই কখনো তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ভগবানের বাণী, বিশেষ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাপুরুষের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত বাণী কখনোই ক্লান্তিকর হয় না, যদিও অন্যান্য বিষয়ে ক্লান্তি বোধ হতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোকের শেষ পংক্তিটি *অন্যত্র কুপিতাদ্ দ্বিজাৎ* রূপে লেখা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে সর্প দংশনে আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় রাজা বিহ্বল হয়ে থাকতে পারেন। সর্পও দ্বিজ, এবং তার ক্রোধ সৎ বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণবালকের অভিশাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃত্যুভয়ে মোটেই ভীত ছিলেন না, কেননা তিনি ভগবানের বাণীর দ্বারা পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত ছিলেন। যিনি অচ্যুত-কথায় পূর্ণরূপে মগ্ন, তিনি কখনো এই পৃথিবীর কোন কিছুর দ্বারাই ভয়ভীত হন না।

শ্লোক ২৭

সূত উবাচ

স উপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথায়ামিতি সৎপতেঃ।
ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি ॥ ২৭ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (শুকদেব গোস্বামী); **উপামন্ত্রিতঃ**—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **কথায়াম্**—বিষয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **সৎপতেঃ**—পরম সত্যের; **ব্রহ্ম-রাতঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **বিষ্ণুরাতেন**—মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক; **সংসদি**—সভায়।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে ভক্তসহ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতে আমন্ত্রিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তদের সঙ্গেই কেবল শ্রীমদ্ভাগবত যথাযথভাবে আলোচনা করা যায়। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে (ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে) যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছিল, তেমনই শ্রীমদ্ভাগবত, যা হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্নাতকোত্তর পাঠ, শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তদের মধ্যে আলোচিত হয়েছিল। তা না হলে সেই অমৃত যথাযথভাবে আস্বাদন করা যায় না। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শ্রবণে আনন্দিত হয়েছিলেন। কেননা তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করে ক্লান্ত হওয়া তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে তা শ্রবণের ফলে তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়েছিল এবং তিনি তা শুনতে অধিক থেকে অধিকতর আগ্রহী হয়েছিলেন। মূর্খ ব্যাখ্যাকারেরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়ে অনর্থক হস্তক্ষেপ করতে চায়, যদিও সেই বিষয়ে তাদের কোন অধিকার নেই। এই দুটি সর্বোত্তম বৈদিক শাস্ত্রে অভক্তদের হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত, এবং তাই

শঙ্করাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করার কোন চেষ্টা করেননি। তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরে নির্বিশেষবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাষ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু তাঁর স্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করার চেষ্টা করেননি।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিলেন (*ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* দ্রষ্টব্য), এবং তাই তিনি *ব্রহ্মরাত* নামে পরিচিত, এবং শ্রীমৎ পরীক্ষিৎ মহারাজ বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি *বিষ্ণুরাত* নামে পরিচিত। তাঁরা ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদা তাঁদের রক্ষা করেছেন। এখানে স্পষ্টভাবে দ্রষ্টব্য যে *ব্রহ্মরাতের* কাছ থেকে *বিষ্ণুরাতের* শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত এবং অন্য কারো কাছ থেকে তা শ্রবণ করা উচিত নয়, কেননা অন্যেরা এই দিব্য জ্ঞান ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করে এবং তার ফলে মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।

শ্লোক ২৮

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৮ ॥

প্রাহ্—তিনি বলেছিলেন; **ভাগবতম্**—ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; **নাম**—নামক; **পুরাণম্**—পুরাণ; **ব্রহ্মসম্মিতম্**—বেদগর্ভ; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মাকে; **ভগবৎপ্রোক্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক কথিত; **ব্রহ্মকল্পে**—যে কল্পে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল; **উপাগতে**—প্রারম্ভে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম কল্পে ভগবান ব্রহ্মাকে যে বেদগর্ভ ভাগবত নামক পুরাণ বলেছিলেন, তা বলতে আরম্ভ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান। নির্বিশেষবাদীরা বেদগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের মহান তত্ত্ববিজ্ঞান না জেনে সব সময় ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করে। এই তত্ত্ব বিজ্ঞান অবগত হতে হলে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তা না করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে গেলে ভগবানের চরণে মহা অপরাধ হয়। অভক্তদের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে মহা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তাই যারা ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তাদের এই বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা কর্তব্য।

শ্লোক ২৯

যদ্ যৎ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডূনামনুপৃচ্ছতি ।
আনুপূর্ব্যেণ তৎসর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ২৯ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু ; **পরীক্ষিৎ**—রাজা ; **ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ ; **পাণ্ডূনাম্**—পাণ্ডু বংশের ; **অনুপৃচ্ছতি**—জিজ্ঞাসা করতে থাকেন ; **আনুপূর্ব্যেণ**—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ; **তৎ**—সেই সমস্ত ; **সর্বম্**—সম্পূর্ণরূপে ; আখ্যাতুম্—বর্ণনা করার জন্য ; **উপচক্রমে**—তিনি নিজেকে প্রস্তুত করলেন ।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পাণ্ডুবংশের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, এবং তাই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত প্রশ্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । শুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন ।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যথাযথভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য গভীর ঔৎসুক্য সহকারে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু গুরুদেব শিষ্যের সেই প্রশ্নগুলির ক্রম অনুসারে উত্তর নাও দিতে পারেন। কিন্তু, একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকরূপে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সুসংবদ্ধভাবে, পরম্পরা-ধারায় যেভাবে সেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেই অনুসারে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি কোন প্রশ্ন বাদ না দিয়ে সবকটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন।

ইতি "মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

ভগবানের বাণীর বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন; **আত্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **মায়াম্**—শক্তি; **ঋতে**—বিনা; **রাজন্**—হে রাজন; **পরস্য**—শুদ্ধ আত্মার; **অনুভব-আত্মনঃ**—শুদ্ধ চেতনার; **ন**—কখনোই না; **ঘটেত**—সম্ভব হতে পারে; **অর্থ**—অর্থ; **সম্বন্ধঃ**—জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্ক; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **দ্রষ্টুঃ**—দর্শকের; **ইব**—সদৃশ; **অঞ্জসা**—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হলে শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধ চেতনায় জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। সেই সম্পর্ক স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট দেহের কার্যকলাপ দর্শন করার মতো।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন, জীব তার জড় দেহ এবং মন থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও জড় জগতের বন্ধনে কিভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তার উত্তর এখানে যথার্থ সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে। চিন্ময় আত্মা জড় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু সে আত্ম মায়া নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় বিষয়ে মগ্ন হয়ে পড়ে। সেই তত্ত্ব ইতিমধ্যেই প্রথম স্কন্ধে ব্যাসদেবের পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির উপলব্ধি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং জীব ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই জীব যদিও তার শুদ্ধ অবস্থায় শুদ্ধ চেতনাময়, তথাপি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে ভগবানের ইচ্ছার অধীন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও

(১৫/১৫) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীবের চেতনা এবং বিস্মৃতি তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে ভগবান কেন জীবকে এই ধরনের চেতনা এবং বিস্মৃতিতে প্রভাবিত করেন। তাঁর উত্তর হচ্ছে যে ভগবান চান যে তাঁর বিভিন্ন অংশরূপে প্রতিটি জীব যেন শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। কেননা সেইটি হচ্ছে তার স্বরূপগত অবস্থা, কিন্তু জীবের যেহেতু আংশিক স্বতন্ত্রতা রয়েছে, তাই সে ভগবানের সেবা করার ইচ্ছা না করে পক্ষান্তরে ভগবানের মতো স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

সমস্ত অভক্ত জীবেরা ভগবানের মতো শক্তিসম্পন্ন হতে চায়, যদিও তা হওয়া তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। জীবেরা ভগবানের ইচ্ছায় মোহাচ্ছন্ন হয়েছে,কেননা তারা তাঁর মতো হতে চেয়েছে। ঠিক যেমন একজন মানুষ উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করেই রাজা হতে চায়। জীব যখন ভগবান হওয়ার বাসনা করে, তখন সে এক স্বপ্নবৎ অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়। তাই জীবের প্রথম অপরাধ হচ্ছে যে সে ভগবান হতে চেয়েছে এবং তার ফলে সে ভগবানের ইচ্ছায় তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে এক অলীক স্থানের স্বপ্ন দেখে যেখানে সে ভগবানের মতো পরম নিয়ন্তা হতে পারে।

শিশু চাঁদ চেয়ে মায়ের কাছে কাঁদে, আর মা তখন একটি আয়না এনে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে ক্রন্দনরত শিশুকে সন্তুষ্ট করে। তেমনই, ভগবান তাঁর ক্রন্দনরত সন্তানদের প্রতিবিম্বস্বরূপ জড় জগৎদান করেন, যাতে তারা কর্মীরূপে ভগবানের মতো তা ভোগ করার চেষ্টা করে নিরাশ হয় এবং অবশেষে তা পরিত্যাগ করে। এই উভয় অবস্থাই স্বপ্নের মতো অলীক।

জীব যে কখন সে বাসনা করেছিল তার বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই। আসল কথা হচ্ছে যে যখনই সে সেই বাসনা করে, তৎক্ষণাৎ ভগবানের নির্দেশে সে *আত্ম-মায়ার* কবলিত হয়। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় জীব ভ্রান্তভাবে তাই স্বপ্ন দেখে যে 'এটি আমার' এবং 'এটি আমি'। সেই স্বপ্নাবস্থায় বদ্ধ জীবাত্মা মনে করে যে তার জড় দেহটি হচ্ছে 'আমি', অথবা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে সে হচ্ছে ঈশ্বর এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই 'আমার'। এইভাবে জন্ম-জন্মান্তরে 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত ধারণার স্বপ্ন দেখে। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে তাঁর অধীনস্থ হওয়ার শুদ্ধ চেতনা লাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

জীবের শুদ্ধ চেতনায় কিন্তু এইপ্রকার কোন ভ্রান্তিজনক স্বপ্ন নেই। সেই শুদ্ধ চেতনায় জীব কখনো বিস্মৃত হয় না যে সে ভগবান নয়, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের নিত্য সেবক।

শ্লোক ২

বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া ।
রমমাণো গুণেম্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥ ২ ॥

বহু-রূপঃ—বিভিন্ন রূপ ; **ইব**—যেমন ; **আভাতি**—প্রকাশিত ; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা-শক্তির প্রভাবে ; **বহুরূপয়া**—বিবিধ রূপে ; **রমমাণঃ**—ভোগ করছে বলে মনেকরে ; **গুণেষু**—বিভিন্ন গুণে ; **অস্যাঃ**—বহিরঙ্গা-শক্তির ; **মমঃ**—আমার ; **অহম্**—আমি ; **ইতি**—এইভাবে ; **মন্যতে**—মনে করে ।

অনুবাদ

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব নানা রূপবিশিষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়, এবং সেই মায়ারই গুণসমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার অভিমান করে ।

তাৎপর্য

জীবের বিভিন্ন রূপ ভগবানের মোহময়ী বহিরঙ্গা শক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের মতো, যা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জীবের ভোগ করার বাসনা অনুসারে প্রদান করেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজো এবং তমো এই তিনটি গুণের মাধ্যমে প্রকাশিতা হন। তাই জড় জগতেও জীবের স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়ন করার সুযোগ রয়েছে, এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর দান করে।

প্রকৃতিতে নয় লক্ষ জলচর, কুড়ি লক্ষ উদ্ভিদ, এগার লক্ষ কৃমি-কীট এবং সরীসৃপ, দশ লক্ষ পক্ষী, ত্রিশ লক্ষ পশু এবং চার লক্ষ মনুষ্য শরীর রয়েছে। অর্থাৎ মোট চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার শরীর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে রয়েছে, এবং জীব তার ভোগ করার বাসনা অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করে।

এমনকি এক শরীরেই জীব শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে রূপান্তরিত হয়, এবং বার্ধক্যের পর তার কর্ম অনুসারে সৃষ্ট আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়।

জীব তার বাসনা অনুসারে তার দেহ সৃষ্টি করে, এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি তাকে এমন একটি শরীর দান করেন যার দ্বারা সে পূর্ণরূপে তার বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়। বাঘ অন্য পশুর রক্ত খেতে চায়, এবং তাই জড়া প্রকৃতি ভগবানের নির্দেশে তাকে অন্য পশুদের রক্ত খাওয়ার জন্য একটি বাঘের শরীর দান করেন। তেমনই, যে জীব উচ্চতর গ্রহলোকে দেবতার শরীর প্রাপ্ত হতে চায়, ভগবানের কৃপায় সেই প্রকার দেহ সে প্রাপ্ত হয়। আর তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে তিনি চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার বাসনা করতে পারেন, এবং ভগবানের কৃপায় তাঁর

সেই বাসনাও চরিতার্থ হয়। অতএব জীবের যে ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, সে তা পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারে। আর ভগবান এতই কৃপালু যে তিনি জীবের বাসনা অনুসারে তাকে তার দেহ প্রদান করেন। জীবের বাসনা ঠিক সোনার পর্বতের স্বপ্ন দেখার মতো। মানুষ জানে যে পর্বত রয়েছে এবং সে জানে যে সোনাও রয়েছে।কিন্তু তার বাসনার ফলেইকেবল সে সোনার পর্বতের স্বপ্ন দেখে। আর সেই স্বপ্ন যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সে দেখে যে তার সামনে অন্য কিছু রয়েছে। জাগরিত অবস্থায় সে দেখে যে সেখানে সোনাও নেই, আর পর্বতও নেই, আর সোনার পর্বতের কি কথা।

জড় জগতে জীবের বিভিন্ন স্থিতি 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত। কর্মীরা মনে করে যে এই জগৎ 'আমার' এবং জ্ঞানীরা মনে করে যে 'আমি' সবকিছু। সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, লোকহিতৈষী, পরার্থবাদ প্রভৃতির জড় ধারণা, বদ্ধ জীবের 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত, যা হচ্ছে জড়জগতে ভোগ করার তীব্র বাসনার প্রকাশ।জড় দেহ এবং যে স্থানে দেহটি লাভ হয়েছে সেই স্থানের সামাজিক, জাতীয়, পারিবারিক ইত্যাদির আসক্তির কারণ হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ-বিস্মৃতি। মোহাচ্ছন্ন জীবের এই ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হতে পারে শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গ প্রভাবে, যা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩

যর্হি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ ।
রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ৩ ॥

যর্হি—যে কোন সময়ে; **বাব**—নিশ্চিতভাবে; **মহিম্নি**—মহিমায়; **স্বে**—তার; **পরস্মিন্**—পরমে; **কাল**—সময়ে; **মায়য়োঃ**—জড়া প্রকৃতির; **রমেত**—উপভোগ করে; **গতসম্মোহঃ**—মোহমুক্ত হয়ে; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **উদাস্তে**—পূর্ণতায়; **তদা**—তখন; **উভয়ম্**—উভয় ('আমি' এবং 'আমার'—এই ভ্রান্ত ধারণা)।

অনুবাদ

জীব যখন তার মহিমান্বিত স্বরূপে অবস্থিত হয়ে কাল এবং জড়া প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করে, তখনই জীবনের এই দুটি ভ্রান্ত ধারণার (আমি এবং আমার) মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তার শুদ্ধ স্বরূপে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হয়।

তাৎপর্য

এই দুটি ভ্রান্ত ধারণা, যথা 'আমি' এবং 'আমার' প্রকৃতপক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়। নিম্নতর স্তরে 'আমার' ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল, এবং উচ্চতর স্তরে 'আমি' ভ্রান্ত ধারণাটি প্রবল। 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি কুকুর বিড়ালের মতো পশুদের

মধ্যেও দেখা যায়, এবং এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে।

মানব জীবনের নিম্নস্তরেও 'এটি আমার দেহ', 'এটি আমার গৃহ', 'এটি আমার পরিবার', 'এটি আমার বর্ণ', 'এটি আমার জাতি', 'এটি আমার দেশ' ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার প্রাধান্য দেখা যায়। আর জল্পনা-কল্পনা প্রসূত জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি 'আমি' অথবা 'আমিই সবকিছু' ইত্যাদি ধারণায় পর্যবসিত হয়।

বহু শ্রেণীর মানুষ বিভিন্নরূপে 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি পোষণ করছে। কিন্তু প্রকৃত 'আমি' কে তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা নিজেকে'আমি পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস' রূপে চিনতে পারি। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা এবং সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে আমাদের সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে।

'আমি ভগবান' অথবা 'আমি পরমেশ্বর' এই ভ্রান্ত ধারণা 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি থেকেও অধিক মারাত্মক। যদিও বৈদিক শাস্ত্রে কখনো কখনো ভগবানের সঙ্গে একত্ব অনুভব করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কোন জীব সর্বতোভাবে ভগবানের সমান।

জীবের সঙ্গে ভগবানের যে নানা বিষয়ে ঐক্য রয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু চরমে জীব ভগবানের অধীন এবং তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করা। তাই ভগবান বদ্ধ জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দেন। জীব যদি ভগবানের ইচ্ছার অধীন না হত, তা হলে ভগবান কেন জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন? জীব যদি সর্বতোভাবে ভগবানের সমকক্ষ হত, তা হলে কেন তাকে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়?

পূর্বে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি যে জড়া প্রকৃতি ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) ভগবানের জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে। যে জীব নিজেকে পরম পুরুষ বলে দাবী করে, সে কি জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম? মূর্খ 'আমি' উত্তর দেবে যে সে ভবিষ্যতে তা করবে। যদি মেনেই নেওয়া যায় যে ভবিষ্যতে সে ভগবানের মতো জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তা হলে কেন সে বর্তমানে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে জীব জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু সে যদি ভগবানের শরণাগত না হয়, তা হলে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা তো দূরের কথা, সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকেই মুক্ত হতে পারবে না।

তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে 'আমি' ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কোন বৃত্তিহীন অথবা চাকরিহীন দরিদ্র মানুষ নানারকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে যদি কোন ভাল সরকারি চাকরি পায় তা হলে সে তৎক্ষণাৎ সুখী হয়। সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা ভগবানের পরমেশ্বরত্ব

অস্বীকার করার ফলে কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক হওয়ার শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জীব তার পূর্ণ মহিমান্বিত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

বদ্ধ অবস্থায় জীব মায়ার দাসত্ব করে, আর মুক্ত অবস্থায় সে ভগবানের শুদ্ধ, অকিঞ্চন সেবক। ভগবানের সেবার জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। জীব যতক্ষণ তার মনের দাসত্ব করে ততক্ষণ সে 'আমি' এবং 'আমার' রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না।

পরম সত্য কখনো মায়ার দ্বারা কলুষিত হন না, কেননা তিনি হচ্ছেন মায়ার অধীশ্বর। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মায়ার দ্বারা আবৃত হতে পারে। কিন্তু সর্বোত্তম উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হয় যখন কেউ সরাসরিভাবে পরম সত্যের সম্মুখীন হয়, ঠিক সূর্যের প্রতি উন্মুখ হওয়ার মতো। আকাশে সূর্য জ্যোতির্ময়, কিন্তু যখন আকাশে সূর্যকে দেখা যায় না তখন সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। তেমনই, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয় তখন সে সম্পূর্ণরূপে মায়ার মোহময়ী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, এবং যে তা করে না সে মায়ার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাপূর্বক ভগবানের পূজা, ভগবানের মহিমা কীর্তন, যথাযথ সূত্রে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ (পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের কাছে কখনো শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে তা শ্রবণ করা উচিত শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ অনুসারে জীবনযাপনকারী ব্যক্তির কাছে) এবং শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা। 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা কখনো বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কর্মীরা 'আমার' ধারণার প্রতি অনুরক্ত, আর জ্ঞানীরা 'আমি' ধারণার প্রতি অনুরক্ত, এবং তারা উভয়ই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওগার অযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মুখ্যত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে 'আমি', 'আমার' ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা, এবং শ্রীল ব্যাসদেব সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন বদ্ধ জীবদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই। জীবের কর্তব্য হচ্ছে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া, যেখানে কাল এবং জড়া প্রকৃতির কোন প্রভাব নেই। বদ্ধ অবস্থায় জীব অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নরূপ কালের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত।

জ্ঞানীরা জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে অহঙ্কারকে জয় করে বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবান হয়ে কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু এই পন্থাটি যথাযথ নয়। প্রকৃত পন্থা হচ্ছে বাসুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জেনে, জ্ঞানের যথার্থ পূর্ণতা সাধনের মাধ্যমে তাঁর শরণাগত হওয়া, কেননা তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর উৎস। সেই জ্ঞান অর্জন

করার মাধ্যমেই কেবল 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত উভয় শাস্ত্রেই এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীল ব্যাসদেব ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং ভক্তিযোগের পন্থা বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভাগবতরূপী মহান শাস্ত্রগ্রন্থ মায়াচ্ছন্ন জীবদের উপহার দিয়েছেন, এবং বদ্ধ জীবদের কর্তব্য হচ্ছে এই মহান বিজ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

শ্লোক ৪

আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম।
ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ ॥ ৪ ॥

আত্ম-তত্ত্ব—ভগবান অথবা জীবের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; **বিশুদ্ধি**—পবিত্রীকরণ; **অর্থম্**—লক্ষ্য; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋতম্**—বাস্তবিকভাবে; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মাকে; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **রূপম্**—নিত্য রূপ; **অব্যলীক**—নিষ্কপটে; **ব্রত**—সংকল্প; **আদৃতঃ**—পূজিত।

অনুবাদ

হে রাজন্! ব্রহ্মার ভক্তিময় নিষ্কপট তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সম্মুখে নিজের শাশ্বত দিব্য রূপ প্রকাশ করলেন। বদ্ধ জীবদের পবিত্র করার এইটি হচ্ছে অভীষ্ট লক্ষ্য।

তাৎপর্য

আত্ম-তত্ত্ব ভগবান এবং জীবাত্মা উভয়েরই বিজ্ঞান। পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়কেই আত্মা বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় *পরমাত্মা* এবং জীবকে বলা হয় *আত্মা, ব্রহ্ম* অথবা *জীব*। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়ই জড়া প্রকৃতির অতীত হওয়ার ফলে *আত্মা* নামে পরিচিত। তাই শুকদেব গোস্বামী পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই তত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে এই শ্লোক বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণত মানুষদের পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই সম্পর্কের নানারকম ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। জীবাত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে জড় দেহকে বিশুদ্ধ আত্মা বলে মনে করা, এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে তাঁকে জীবের সমকক্ষ বলে মনে করা। কিন্তু ভক্তিযোগের একটি আঘাতেই সেই উভয় ভ্রান্ত ধারণাই বিদূরিত হয়ে যায়, ঠিক যেমন সূর্যের উদয়ে অন্ধকার বিদূরিত হলে সূর্য, পৃথিবী এবং পৃথিবীর অন্তর্বর্তী সবকিছু যথাযথভাবে দর্শন করা যায়। অন্ধকারে সূর্যকে দেখা যায় না, নিজেকে দেখা যায় না অথবা এই পৃথিবীর কোনকিছুই দেখা যায় না। কিন্তু সূর্যালোকের প্রভাবে সূর্যকে, নিজেকে এবং আমাদের চারপাশের জগতকে দেখা যায়। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে উভয় ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করার জন্য ভগবান ব্রহ্মার নিষ্কপটে ভক্তিযোগ

সম্পাদন করার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার সম্মুখে তাঁর শাশ্বত রূপ প্রকাশ করেছিলেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত আত্ম-তত্ত্ব-উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা কালক্রমে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে ভক্তিযোগের দ্বারাই কেবল তাঁকে পূর্ণরূপে জানা যায়, এবং তখন ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে প্রবেশ করা যায়। ব্রহ্মাজী ভক্তিযোগ অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ভগবানের দিব্য রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য রূপ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং শুদ্ধ ভক্তিযোগে যথাযথভাবে তপস্যা করার ফলে চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারাই কেবল তাঁকে দর্শন করা যায়। ব্রহ্মার সম্মুখে ভগবান যে রূপ প্রকাশ করেছিলেন তা জড় জগতে আমাদের যে রূপ দর্শন হয় তেমন কোন রূপ ছিল না। ব্রহ্মাজী কোন জড় রূপ দর্শন করার জন্য এইভাবে কঠোর তপস্যা করেননি। অতএব, ভগবানের রূপ সম্বন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন, অর্থাৎ তা নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং পূর্ণ আনন্দময়। কিন্তু জড় জগতে জীবের রূপ নিত্য নয়, জ্ঞানময় নয় অথবা আনন্দময় নয়। সেটিই হচ্ছে ভগবানের রূপ এবং বদ্ধ জীবের রূপের মধ্যে পার্থক্য। বদ্ধ জীবেরা কিন্তু ভক্তিযোগের মাধ্যমে কেবল ভগবানকে দর্শন করার ফলেই তাদের সচ্চিদানন্দময় রূপ ফিরে পেতে পারে।

এখানে সার তত্ত্ব হচ্ছে এই যে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে বদ্ধ জীব নশ্বর ভৌতিক রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের রূপ নশ্বর বদ্ধ জীবের রূপের মতো নয়, তিনি সর্বদা জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। বদ্ধ জীব এবং ভগবানের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্রহ্মাকে ভগবান চারটি মূল শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের সারাংশ শুনিয়েছিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত মনোধর্মী জ্ঞানীদের কল্পনাপ্রসূত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্বনি অপ্রাকৃত, এবং তার অনুরণন বেদের ধ্বনি থেকে অভিন্ন। এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় হচ্ছে ভগবান এবং জীব উভয়ই। নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার ফলে ভক্তিযোগের অনুশীলন হয়, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গ করার ফলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ উভয়েই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত।
তাং নাধ্যগচ্ছদ্ দৃশমত্র সম্মতাং
প্রপঞ্চনির্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি; **আদি-দেবঃ**—প্রথম দেবতা; **জগতাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের; **পরঃ**—পরম; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **স্বধিষ্ণ্যম্**—তাঁর কমলাসন; **আস্থায়**—তাঁর উৎস খুঁজে পাওয়ার

উদ্দেশ্যে ; **সিসৃক্ষয়া**—ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়সমূহ সৃষ্টি করার জন্য ; **ঐক্ষত**—চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন ; **তাম্**— সেই বিষয়ে ; **ন**—পারেননি ; **অধ্যগচ্ছৎ**—হৃদয়ঙ্গম করতে ; **দৃশম্**—দিক ; **অত্র**—সেখানে ; **সম্মতাম্**—সঠিক উপায় ; **প্রপঞ্চ**—জড় ; **নির্মাণ**—রচনা ; **বিধিঃ**—বিধি ; **যয়া**— যতখানি ; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

প্রথম গুরু এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাঁর কমলাসনের উৎস খুঁজে পেলেন না ; এবং জড় জগৎ সৃষ্টি করার বিষয়ে তিনি যখন চিন্তা করছিলেন তখন তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে এই কার্য শুরু করা যায়। তিনি বুঝতে পারেননি কোন্ পন্থায় এই কার্য সম্পাদন করা যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবানের রূপ এবং তাঁর ধামের দিব্য প্রকৃতির বিশ্লেষণের প্রস্তাবনা। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে ইতিমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বীয় ধামে বিরাজ করেন এবং মায়া-শক্তি তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সুতরাং ভগবানের ধাম কল্পনা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অপ্রাকৃত লোকসমূহ। এই অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হবে।

জড় আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে এই চিদাকাশ এবং তার সমস্ত সামগ্রীর জ্ঞান ভক্তিযোগের দ্বারাই কেবল সম্ভব। ব্রহ্মাও তাঁর সৃষ্টি করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে। সৃষ্টির বিষয়ে ব্রহ্মা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর অস্তিত্বের উৎস পর্যন্ত খুঁজে পাননি। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয়ে তিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে। ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব হয়, এবং ভগবানকে পরমেশ্বর রূপে জানার ফলে অন্য সবকিছু জানা যায়। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তিনি সবকিছু জানেন। সেটিই সমস্ত বেদের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম গুরু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, অতএব ভগবানের কৃপা ব্যতীত কে সবকিছু সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে? কেউ যদি সবকিছু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের কৃপা লাভ করতে হবে, এবং এছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নেই। ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপর নির্ভর করে জ্ঞান লাভ করার প্রচেষ্টা সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্লোক ৬

স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভ—
স্যুপাশৃণোদ্ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎষোড়শমেকবিংশং
নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ধনং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি; **চিন্তয়ন্**—এইভাবে চিন্তা করার সময়; **দ্বি**—দুই; **অক্ষরম্**—অক্ষর; **একদা**—একসময়; **অম্ভসি**—জলে; **উপাশৃণোৎ**—নিকটে শ্রবণ করেছিলেন; **দ্বিঃ**—দুইবার; **গদিতম্**—উচ্চারিত; **বচঃ**—বাণী; **বিভুঃ**—মহান; **স্পর্শেষু**—স্পর্শাক্ষর; **যৎ**—যা; **ষোড়শম্**—ষোল; **একবিংশম্**—একবিংশতি; **নিষ্কিঞ্চনানাম্**—সন্ন্যাস আশ্রমের; **নৃপ**—হে রাজন; **যৎ**—যা; **ধনম্**—সম্পদ; **বিদুঃ**—যথার্থভাবে জ্ঞাত।

অনুবাদ

তিনি যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন জলের মধ্য থেকে দুটি অক্ষর তিনি দুবার উচ্চারিত হতে শুনতে পেলেন। সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের ষোড়শ অক্ষর (অর্থাৎ ত) এবং দ্বিতীয় বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের একবিংশ (অর্থাৎ প)। হে রাজন! এই তপ শব্দটি নিষ্কিঞ্চন ত্যাগীর একমাত্র ধন বলে পরিজ্ঞাত।

তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জন বর্ণগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা স্পর্শ বর্ণ এবং তালব্য বর্ণ। ক থেকে ম পর্যন্ত অক্ষরগুলিকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ, এবং ষোড়শ অক্ষর হচ্ছে ত এবং একবিংশতি অক্ষর হচ্ছে *প*। তাদের সমন্বয়ের ফলে *তপ* শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। এই তপ বা তপস্যা হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং ত্যাগীদের সৌন্দর্য ও সম্পদ। ভাগবত দর্শন অনুসারে প্রতিটি মানুষেরই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে *তপ*, কেননা তপস্যা দ্বারাই কেবল আত্ম-উপলব্ধি সম্ভব, এবং আত্ম-উপলব্ধিই হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়। এই *তপ* বা তপস্যা সৃষ্টির আদি থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং পরম গুরুদেব শ্রীব্রহ্মা প্রথমে এই তপস্যার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তপস্যার দ্বারাই কেবল মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব, চাকচিক্যপূর্ণ পাশবিক সভ্যতার দ্বারা নয়। পশুরা আহার, পান এবং আনন্দ উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ব্যতীত আর কিছু জানে না। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তপস্যার পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মাণ্ডের জড় সৃষ্টির ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর কমলাসনের উৎস খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে জলের অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি দুবার তপ শব্দটি শ্রবণ করেন। তপস্যার পন্থা গ্রহণ হচ্ছে উপযুক্ত শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম। *উপশৃণোৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূণ। এই শব্দটি *উপনয়ন* শব্দটির সমান, অর্থাৎ তপস্যার পন্থা গ্রহণ করার জন্য শিষ্যকে সদ্‌গুরুর সমীপে আনয়ন। এইভাবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সে কথা ব্রহ্মা স্বয়ং *ব্রহ্ম-সংহিতায়* ব্যক্ত করেছেন। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* প্রতিটি শ্লোকে ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন, *গোবিন্দম্ আদি পুরুষং তমহং ভজামি*। এইভাবে ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পাদনে সক্ষম হওয়ার পূর্বের বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

ব্রহ্ম-সংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মা অষ্টাদশ অক্ষর সমন্বিত কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা সাধারণত সমস্ত কৃষ্ণ ভক্তরা গ্রহণ করে থাকেন। আমরা সেই পন্থা অনুসরণ করি, কেননা আমরা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস, ব্যাস থেকে মধ্বমুনি এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে গুরু-পারম্পর্যে অবশেষে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পরম্পরায় আমরা অন্তর্ভুক্ত।

যিনি এইভাবে গুরু-পরম্পরা ধারায় দীক্ষিত হন, তিনি একই ফল বা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জন করেন। এই দিব্য মন্ত্র উচ্চারণ করাই হচ্ছে ভগবানের নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তের একমাত্র আশ্রয়। এই প্রকার তপস্যা দ্বারাই কেবল ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মার মতো সর্বসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ৭

নিশম্য তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া দিশো
বিলোক্য তত্রান্যদপশ্যমানঃ।
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিমৃশ্য তদ্ধিতং
তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ ॥ ৭ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে ; **তৎ**—তা ; **বক্তৃ**—বক্তা ; **দিদৃক্ষয়া**—কে তা বলেছে তা জানবার জন্য ; **দিশঃ**—সমস্ত দিকে ; **বিলোক্য**—দেখে ; **তত্র**—সেখানে ; **অন্যৎ**—অন্য কেউ ; **অপশ্যমানঃ**—না দেখে ; **স্বধিষ্ণ্যম্**—তাঁর কমলাসনে ; **আস্থায়**—বসে ; **বিমৃশ্য**—চিন্তা করে ; **তৎ**—তা ; **হিতম্**—কল্যাণ ; **তপসি**—তপস্যায় ; **উপাদিষ্ট**—যেভাবে তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন ; **ইব**—তা পালন করার জন্য ; **আদধে**—দিয়েছিলেন ; **মনঃ**—মনযোগ।

অনুবাদ

সেই শব্দটি শুনে ব্রহ্মা চতুর্দিকে সেই শব্দের উচ্চারণকারীকে অন্বেষণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অন্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে তিনি স্থির করেছিলেন যে তাঁর কমলাসনে উপবিষ্ট হয়ে, সেই নির্দেশ অনুসারে মনোযোগ দিয়ে তপস্যা করাই সমীচীন।

তাৎপর্য

জীবনে সাফল্য অর্জন করার জন্য প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। তপস্যা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি তপস্যা করার সংকল্প করেছিলেন এবং চতুর্দিকে দর্শন করে অন্য আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভগবান স্বয়ং তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সেই সময় ব্রহ্মাই ছিলেন

একমাত্র জীব, কেননা তখন অন্য আর কারো সৃষ্টি হয়নি এবং অন্য আর কাউকে তাই খুঁজে পাননি। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে, প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মা তাঁর অন্তরে ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরমাত্মা রূপে ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান, এবং যেহেতু ব্রহ্মা দীক্ষা লাভের বাসনা করেছিলেন, তাই তিনি ব্রহ্মাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এইভাবে যারা দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক, তাদের ভগবান এইভাবে দীক্ষা দিতে পারেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি গুরু, এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী গুরু-শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করার জন্য গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় বর্তমান যোগ সূত্র বা প্রকট গুরুর সমীপবর্তী হওয়া কর্তব্য। পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার পর ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য তপস্যা করা কর্তব্য। কিন্তু তা বলে কখনো মনে করা উচিত নয় যে তিনিও ব্রহ্মার মতো অন্তরে সরাসরিভাবে ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হবেন, কেননা এই যুগে কেউই ব্রহ্মার মতো নির্মল নন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করার জন্য ব্রহ্মার পদ সবচাইতে পবিত্র জীবকে দেওয়া হয়, এবং সে রকম যোগ্যতা না থাকলে ব্রহ্মাজীর মতো ভগবান কর্তৃক সরাসরিভাবে ভগবানের কৃপা লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই একই সুবিধা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে, শাস্ত্রের মাধ্যমে (বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে) ও সদ্‌গুরুর মাধ্যমে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব। ভগবানের সেবায় অভিলাষী ঐকান্তিক ব্যক্তিদের কাছে ভগবান স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হন। তাই ঐকান্তিক ভক্তের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন যে সদ্‌গুরু, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের সবচাইতে অন্তরঙ্গ এবং প্রিয় প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করা উচিত। এই প্রকার সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় কেউ যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন।

শ্লোক ৮

দিব্যং সহস্রাব্দমমোঘদর্শনো
জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ।
অতপ্যত স্মাখিললোকতাপনং
তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥

দিব্যম্—স্বর্গের দেবতাদের ; **সহস্র**—এক হাজার ; **অব্দম্**—বর্ষ ; **অমোঘ**—নিষ্কলঙ্ক, নির্মল ; **দর্শনঃ**—জীবনের এই প্রকার দর্শন যিনি লাভ করেছেন ; **জিত**—নিয়ন্ত্রিত ; **অনিল**—প্রাণবায়ু ; **আত্মা**—মন ; **বিজিত**—নিয়ন্ত্রিত ; **উভয়**—উভয় ; **ইন্দ্রিয়ঃ**—এই

প্রকার যাঁর ইন্দ্রিয় ; **অতপ্যত**—তপস্যা করে ; **স্ম**—অতীতে ; **অখিল**—সমস্ত ; **লোক**—গ্রহ ; **তাপনম্**—প্রকাশ করে ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা ; **তপীয়ান্**—অত্যন্ত কঠোর তপস্যা ; **তপতাম্**—সমস্ত তপস্বীদের ; **সমাহিতঃ**—এইভাবে অবস্থিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বর্ষ তপস্যা করেছিলেন। তিনি আকাশে এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণ করেন এবং তিনি তা দিব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করেছিলেন এবং যে তপস্যা তিনি করেছিলেন তা সমস্ত জীবের পক্ষে এক আদর্শ শিক্ষা। এইভাবে তিনি সমস্ত তপস্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্বী বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাজী তপ শব্দটি শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু শব্দ উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে দর্শন করেননি।কিন্তু তবু তিনি নিজের হিতের জন্য সেই উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাই স্বর্গের গণনা অনুসারে এক হাজার বছর ধরে ধ্যানে আবিষ্ট ছিলেন। স্বর্গীয় গণনা অনুসারে এক বছর হল আমাদের ৬×৩০×১২×১০০০ বছরের সমান। ভগবানের পরম প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর বিশুদ্ধ দর্শনের জন্যই তিনি সেই শব্দ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর তাঁর অভ্রান্ত দর্শনের জন্যই তিনি ভগবান এবং তাঁর বাণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেননি। ভগবান এবং তাঁর থেকে আগত শব্দব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এমনকি তিনি যদি স্বয়ং উপস্থিত নাও থাকেন। এই ধরনের দিব্য উপদেশ গ্রহণ করাই হচ্ছে উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং সকলের আদিগুরু ব্রহ্মা এই প্রকার অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অ-প্রাকৃত শব্দতরঙ্গের অনুরণনকারী আপাতভাবে স্বয়ং উপস্থিত না থাকলেও তাতে শব্দের শক্তি হ্রাস পায় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা বা অন্য যে কোন শাস্ত্র গ্রন্থকে অ-প্রাকৃত শক্তিবিহীন সাধারণ জড় শব্দসম্ভূত বলে কখনোই মনে করা উচিত নয়।

অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম যথার্থ সূত্র থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং এটিকে বাস্তব বস্তু বলে গ্রহণ করে নির্দ্বিধায় তা পালন করতে হবে। সদ্‌গুরুর মত যথার্থ মাধ্যম থেকে এই শব্দ গ্রহণই সাফল্যের প্রকৃত রহস্য। জড়ে উদ্ভূত প্রাকৃত শব্দের কোন শক্তি নেই, এবং ঠিক তেমনই, অননুমোদিত ব্যক্তির কাছ থেকে গৃহীত অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গেরও কোন শক্তি থাকে না। এই প্রকার অপ্রাকৃত শক্তি নিরূপণের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, এবং যোগ্যতার বলেই হোক বা দৈবাৎ সৌভাগ্যের ফলেই হোক, কেউ যদি অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে লাভ করতে সমর্থ হন তাহলে তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত। কিন্তু শিষ্যকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, ঠিক যেভাবে ব্রহ্মা তাঁর গুরুদেব স্বয়ং ভগবানের আদেশ পালন করেছিলেন। সদ্‌গুরুর

আদেশ পালন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে সদ্‌গুরুর এইরকম আদেশ পালনই হচ্ছে সাফল্যের প্রকৃত রহস্য।

ব্রহ্মা তাঁর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, কেননা তাঁর ভগবানের আদেশ পালনের জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। তাই ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল সেগুলিকে ভগবানের দিব্য সেবায় নিযুক্ত করা। ভগবানের আদেশ গুরু-পরম্পরায় ধারায় সদ্‌গুরুর মাধ্যমে অবতরণ করে, এবং তাই তাঁর আদেশ পালন করাই হচ্ছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়-সংযম। পূর্ণ বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা সহকারে এইরকম তপস্যা করার ফলে ব্রহ্মাজী এত শক্তি অর্জন করেছিলেন যে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হয়েছিলেন। আর যেহেতু তিনি এই প্রকার শক্তি অর্জন করেছিলেন, তাই তাঁকে তপস্বীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়।

শ্লোক ৯

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্ ।
ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভির্পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥ ৯ ॥

তস্মৈ—তাঁকে ; **স্বলোকম্**—তাঁর স্বীয় লোক বা ধাম ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **সভাজিতঃ**—ব্রহ্মার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ; **সন্দর্শয়ামাস**—প্রকাশ করেছিলেন ; **পরম্**—পরম ; **ন**—না ; **যৎ**—যাঁর ; **পরম্**—তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ ; **ব্যপেত**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে ; **সংক্লেশ**—পাঁচ প্রকার জড় তাপ ; **বিমোহ**—মোহমুক্ত ; **সাধ্বসম্**—সংসার ভয় ; **স্ব-দৃষ্ট-বদ্ভিঃ**—যাঁরা আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন তাঁদের দ্বারা ; **পুরুষৈঃ**—পুরুষদের দ্বারা ; **অভিষ্টুতম্**—উপাসিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মার তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সমস্ত লোকের উর্ধ্বে তাঁর পরম ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন করিয়েছিলেন। ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ধাম সবরকম জড় ক্লেশ এবং সংসার ভয় থেকে মুক্ত আত্মবিদ্‌দের দ্বারা পূজিত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে তপস্যার ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন তা অবশ্যই ভক্তিযোগের পন্থা। তা না হলে তাঁর কাছে ভগবানের স্বধাম বা বৈকুণ্ঠলোক প্রকাশিত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ভগবানের স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ কাল্পনিক অথবা ভৌতিক নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা মনে করে। কিন্তু ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ধাম কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায় এবং তাই ভগবদ্ভক্তরাই কেবল সেই ধামে প্রবেশ করতে পারেন। তপস্যা যে

ক্লেশকর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভক্তিযোগ সাধনে যে কষ্ট স্বীকার করা হয় তা শুরু থেকেই দিব্য আনন্দ প্রদান করে। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির অন্যান্য পন্থায় (জ্ঞান যোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি) যে তপস্যা করা হয় তা অত্যন্ত কষ্টকর এবং চরমেও কষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না, বৈকুণ্ঠ উপলব্ধি তো দূরের কথা। তুষে আঘাত করে যেমন কখনো শস্য লাভ করা যায় না, তেমনই ভক্তিযোগ ব্যতীত আত্ম-উপলব্ধির অন্যান্য পন্থায় তপস্যার কষ্ট স্বীকার করার ফলে কোন লাভ হয় না।

ভক্তিযোগের অনুশীলন পরমেশ্বর ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত অপ্রাকৃত পদ্মে উপবিষ্ট হওয়ার মতো, কেননা ব্রহ্মা সেখানে উপবিষ্ট। ব্রহ্মাজী ভগবানকে প্রসন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং ভগবানও ব্রহ্মাজীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে স্বীয় ধাম প্রদর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ক্রম-সন্দর্ভ নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বৈদিক প্রমান প্রদর্শন করে গর্গ-উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম বর্ণনা করে বলেছেন যে তা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ভগবানের এই ধাম যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা হলেও তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অল্পজ্ঞ মানুষদের কাছে রূপকথা বলে মনে হয়। এখানে *স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি যথার্থই আত্ম-উপলব্ধি করেছেন, তিনি তাঁর দিব্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। আত্মা অথবা পরমেশ্বরের নির্বিশেষ উপলব্ধি অপূর্ণ, কেননা তা জড় সবিশেষত্বের বিপরীত ধারণা। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তেরা অপ্রাকৃত ; তাঁদের কোন প্রাকৃত শরীর নেই। জড় শরীরে পাঁচ প্রকার ক্লেশের আবরণ থাকে, যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই পাঁচ প্রকার জড় ক্লেশের দ্বারা অভিভূত থাকে, ততক্ষণ তার বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। স্বরূপের নির্বিশেষ ধারণা জড় সবিশেষত্বের বিপরীত ধারণা, এবং তা প্রকৃত সবিশেষত্বের থেকে অনেক অনেক দূরে। ভগবদ্ধামের সবিশেষ রূপের কথা পরবর্তী শ্লোকসমূহে বিশ্লেষণ করা হবে। ব্রহ্মাজীও বৈকুণ্ঠলোকের সর্বোচ্চ লোককে গোলোক বৃন্দাবন বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে ভগবান এক গোপ বালকরূপে শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক পরিবৃত হয়ে দিব্য সুরভী গাভীদের পালন করেন।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ—
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী, *যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম,* এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। *পরম* মানে পরব্রহ্ম। তাই ভগবানের ধামও ব্রহ্ম, এবং তা পরমেশ্বর ভগবান

থেকে অভিন্ন। ভগবান বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত, এবং তাঁর ধামকেও বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এই বৈকুণ্ঠ উপলব্ধি এবং পূজা কেবল অপ্রাকৃত রূপ এবং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্ভব।

শ্লোক ১০

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বং চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে—
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥ ১০ ॥

প্রবর্ততে—বিরাজ করে; **যত্র**—যেখানে; **রজঃ তমঃ**—রজ এবং তমোগুণ; **তয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **চ**—এবং; **মিশ্রম্**—মিশ্রণ; **ন**—কখনোই না; **চ**—এবং; **কাল**—সময়; **বিক্রমঃ**—প্রভাব; **ন**—না; **যত্র**—সেখানে; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **কিম্**—কি; **উত**—সেখানে আছে; **অপরে**—অন্যেরা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানে; **অনুব্রতাঃ**—ভক্ত; **যত্র**—যেখানে; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **অসুর**—অসুরদের দ্বারা; **অর্চিতাঃ**—পূজিত।

অনুবাদ

ভগবানের সেই ধামে রজো ও তমোগুণ নেই, এমনকি সেখানে সত্ত্বগুণেরও প্রভাব নেই। সেখানে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব তো দূরের কথা, কালেরও প্রভাব নেই। মায়া সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। সুর এবং অসুর উভয়েই কোনরকম ভেদবুদ্ধি না করেই ভগবানের পূজা করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ধাম, বৈকুণ্ঠ জগৎ, *ত্রিপাদ-বিভূতি* নামে পরিচিত, এবং তা জড় জগৎ থেকে তিনগুণ বড়। সেই বৈকুণ্ঠ ধামের বর্ণনা এখানে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও সংক্ষেপে করা হয়েছে। কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের একটি, এবং এই সমস্ত অগণিত ব্রহ্মাণ্ড একত্রে ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। জড় আকাশের ঊর্ধ্বে চিদাকাশ রয়েছে এবং সেই চিদাকাশে বৈকুণ্ঠ নামক অপ্রাকৃত লোক রয়েছে, এবং তা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির তিন-চতুর্থাংশ। ভগবানের সৃষ্টি সর্বদাই অন্তহীন। মানুষ একটি বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত গণনা করতে পারে না, অথবা তার নিজের মাথার চুল গণনা করতে পারে না। তাদের শরীরের একটি চুল পর্যন্ত সৃষ্টি করার ক্ষমতা না থাকলেও এই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভগবান হওয়ার ধারণায় গর্বিত। মানুষ নানাবিধ আশ্চর্যজনক যানবাহন তৈরি করতে পারে, কিন্তু সে যদি তার বহু বিজ্ঞাপিত আকাশযানে চড়ে চন্দ্রলোকেও যায়, সে সেখানে থাকতে পারে না। তাই সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হওয়ার গর্বে গর্বিত না হয়ে,

অপ্রাকৃত জগতের জ্ঞান লাভের সবচেয়ে সহজ পন্থা বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করেন। জড় আকাশের ঊর্ধ্বে যে অপ্রাকৃত জগৎ রয়েছে, তার প্রকৃতি এবং গঠন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতার মাধ্যমে জানা উচিত। সেই আকাশে জড় গুণ, বিশেষ করে তমো এবং রজোগুণ, সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। রজোগুণের প্রভাবে জীব কাম ও লোভের বশবর্তী হয়, এবং বৈকুণ্ঠলোকে সেই গুণটি না থাকার ফলে সেখানকার জীবেরা এই দুটি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে ব্রহ্মভূত স্তরে জীব অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়। তাই সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বৈকুণ্ঠলোকের সমস্ত অধিবাসীরা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁরা জড় জগতের বদ্ধ জীবদের মতো অনুশোচনা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত নন। কেউ যখন রজো এবং তমোগুণের অতীত হন, তখন অনুমান করা যায় যে তিনি জড় জগতে সত্ত্ব গুণে অধিষ্ঠিত। জড় জগতের এই সত্ত্বগুণও কিছু পরিমাণে রজো ও তমো গুণের দ্বারা মিশ্রিত। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে যে গুণ তা হচ্ছে শুদ্ধ সত্ত্ব।

সেখানকার সমস্ত পরিস্থিতি বহিরঙ্গা শক্তির মোহময়ী সৃষ্টি থেকে মুক্ত। মায়া যদিও ভগবানেরই শক্তি, এই শক্তি ভগবান থেকে ভিন্ন। মায়া শক্তি কিন্তু মিথ্যা নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা দাবী করে থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছে একটি রজ্জু সর্প বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রজ্জুটি বাস্তব এবং সর্পও বাস্তব। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত একটি পশু উত্তপ্ত বালুকাকে জল বলে ভুল করতে পারে, কিন্তু মরুভূমি এবং জল উভয়ই বাস্তব। অতএব একজন অভক্তের কাছে ভগবানের জড় সৃষ্টি মোহময়ী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একজন ভক্তের কাছে ভগবানের এই জড় সৃষ্টিও তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে বাস্তব। কিন্তু ভগবানের এই শক্তিটি সবকিছু নয়। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিও রয়েছে, যা বৈকুণ্ঠলোক নামে পরিচিত, এবং সেই বৈকুণ্ঠে তমোগুণ নেই, রজো গুণ নেই, মোহ নেই এবং অতীত আদি কাল নেই। জ্ঞানের অল্পতাহেতু কেউ বৈকুণ্ঠ পরিবেশের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তা নেই। মানুষের অন্তরীক্ষ যান এই সমস্ত লোকে পৌঁছাতে পারে না বলে তার অর্থ এই নয় যে তাদের অস্তিত্ব নেই। প্রামাণিক শাস্ত্রে তাদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

নারদ-পঞ্চরাত্র থেকে শ্রীল জীব গোস্বামীর উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারি যে অপ্রাকৃত জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক অপ্রাকৃত গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত। এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যার প্রকাশ হয় তা জড় তমো, রজো এবং সত্ত্ব গুণ থেকে ভিন্ন। অভক্তরা কখনো এই সমস্ত গুণ লাভ করতে পারে না। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশের ঊর্ধ্বে রয়েছে তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশ। জড় জগৎ এবং চিজ্জগতের মধ্যবর্তী বিভাজক রেখা হচ্ছে বিরজা নদী, যা ভগবানের শরীরের স্বেদ-বারি থেকে উদ্ভূত। এই বিরজার পরপারে ভগবানের তিন-চতুর্থাংশ সৃষ্টি। ভগবানের সৃষ্টির সেই অংশটি নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয় এবং অব্যয়, এবং সর্বোচ্চ স্তরের সিদ্ধ জীবেরা সেখানে বাস করেন। সাংখ্য-কৌমুদীতে

বর্ণনা করা হয়েছে যে শুদ্ধ সত্ত্ব বা অপ্রাকৃত তত্ত্ব জড়া প্রকৃতির গুণের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানকার সমস্ত জীবেরা সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করেন, এবং ভগবান হচ্ছেন প্রধান এবং পরম পুরুষ। আগম পুরাণেও সেই অপ্রাকৃত ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে—ভগবানের পার্ষদেরা ভগবানের সৃষ্টির যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেন এবং ভগবানের সেই সৃষ্টি অন্তহীন, বিশেষ করে তাঁর তিন-চতুর্থাংশ সৃষ্টিতে। যেহেতু সেই স্থান অনন্ত, তাই তার কোন ইতিহাস নেই বা অন্ত নেই।

তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে যেহেতু সেখানে রজো এবং তমোগুণ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত, তাই সেখানে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কোন প্রশ্ন উঠে না। জড় জগতে সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে এবং সবকিছুরই বিনাশ হয়, এবং সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্যবর্তী জীবন ক্ষণস্থায়ী। চিন্ময় জগতে সৃষ্টি নেই এবং ধ্বংস নেই, এবং তাই সেখানকার জীবন নিত্য। অর্থাৎ চিজ্জগতে সবকিছুই নিত্য, পূর্ণজ্ঞানময় এবং অক্ষয় আনন্দময়। যেহেতু সেখানে ক্ষয় নেই, তাই সেখানে অতীত, ভবিষ্যৎ রূপ সময়ের প্রভাব নেই। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেখানে কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সমগ্র জড় জগৎ ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে উদ্ভূত, যা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রূপে কালের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত। সেখানে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কার্য-কারণের প্রভাব নেই। তাই সেখানে জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং প্রলয়—এই ছয়টি ভৌতিক পরিবর্তন নেই। তা হল জড় জগতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভগবানের শক্তির বিশুদ্ধ প্রকাশ। বৈকুণ্ঠ লোকের সমগ্র অস্তিত্ব ঘোষণা করে যে সেখানকার প্রতিটি জীব ভগবানের অনুগত। সেখানে ভগবান হচ্ছেন প্রধান নায়ক। সেখানে নেতৃত্ব করার জন্য কেউ ভগবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না এবং সেখানে সকলেই ভগবানের অনুগত। তাই বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন প্রধান নায়ক এবং অন্য সমস্ত জীবেরা তাঁর অধীন, কেননা ভগবানই কেবল অন্য সমস্ত জীবের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

শ্লোক ১১

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিশঙ্গ বস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্বে চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি—
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চসঃ ॥ ১১ ॥

শ্যাম—আকাশী নীল; **অবদাতাঃ**—উজ্জ্বল; **শতপত্র**—পদ্মফুল; **লোচনাঃ**—নেত্র; **পিশঙ্গ**—পীত বা হলুদ; **বস্ত্রাঃ**—বস্ত্র; **সুরুচঃ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়;

সুপেশসঃ—সুকুমার ; **সর্বে**—তারা সকলে ; **চতুঃ**—চার ; **বাহবঃ**—হস্তযুক্ত ; **উন্মিষণ**—প্রভাযুক্ত ; **মণি**—মুক্তা ; **প্রবেক**—উত্তম ; **নিষ্ক-আভরণাঃ**—আলঙ্কারিক পদক ; **সুবর্চসঃ**—জ্যোতির্ময়।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠবাসীদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তাঁরা সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁদের নয়ন পদ্ম ফুলের মতো, বসন পীতবর্ণ, অঙ্গ অতি কমনীয় ও সুকুমার ; তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যন্ত প্রভাশালী, মণিখচিত পদকাভরণে সমলংকৃত ও অত্যন্ত তেজস্বী।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠবাসীরা সকলেই চিন্ময় দেহ সমন্বিত, যা এই জড় জগতে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। শাস্ত্রে যে চিজ্জগতের নির্বিশেষ বর্ণনা দেখা যায়, তা ইঙ্গিত করে যে বৈকুণ্ঠলোকের রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও দেখা যায় না। কোন গ্রহের বিভিন্ন স্থানে যেমন দেহের গঠন বিভিন্ন প্রকার হয়, অথবা বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের দেহের গঠন যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমনই বৈকুণ্ঠ লোকের অধিবাসীদের দেহের গঠন জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের দেহের গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, এই পৃথিবীর কোথাও চার হাতসম্পন্ন মানুষ দেখা যায় না।

শ্লোক ১২

প্রবালবৈদূর্যমৃণালবর্চসঃ
পরিস্ফুরৎকুণ্ডল মৌলিমালিনঃ ॥ ১২ ॥

প্রবাল—প্রবাল ; **বৈদূর্য**—এক বিশেষ হীরা ; **মৃণাল**—স্বর্গীয় কমল ; **বর্চসঃ**—কিরণ ; **পরিস্ফুরৎ**—বিকশিত ; **কুণ্ডল**—কর্ণাভরণ ; **মৌলি**—মস্তক ; **মালিনঃ**—মাল্য বিভূষিত।

অনুবাদ

তাঁদের কারো অঙ্গকান্তি প্রবাল, বৈদূর্য ও মৃণালের মতো, এবং তাঁরা অতি দীপ্তিমান কুণ্ডল, মুকুট ও মাল্যসমূহে বিভূষিত।

তাৎপর্য

কোন কোন বৈকুণ্ঠবাসী স্বারূপ্য মুক্তি লাভ করেছেন, অর্থাৎ তাঁদের রূপ ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো। বৈদূর্য মণি বিশেষভাবে ভগবানের জন্য, কিন্তু যাঁরা ভগবানের মতো রূপ লাভ করেছেন তাঁরা এই প্রকার মণি ধারণ করার বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্লোক ১৩

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানা বলিভির্মহাত্মানাম্ ।
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ
সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ ॥ ১৩ ॥

ভ্রাজিষ্ণুভিঃ—দেদীপ্যমান; **যঃ**—বৈকুণ্ঠলোক; **পরিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **বিরাজতে**—এইভাবে অবস্থিত; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **বিমান**—বিমান; **অবলিভিঃ**—সমূহ; **মহাত্মনাম্**—মহান ভগবদ্ভক্তদের; **বিদ্যোতমানঃ**—বিদ্যুতের মতো সুন্দর; **প্রমদ**—মহিলাগণ; **উত্তম**—দিব্য; **অদ্যুভিঃ**—কান্তিযুক্ত; **সবিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎসহ; **অভ্রাবলিভিঃ**—মেঘমালা; **যথা**—যেমন; **নভঃ** —আকাশ।

অনুবাদ

বিদ্যুৎশোভিত নিবিড় মেঘমালামণ্ডিত গগনমণ্ডল যেমন শোভাশালী, তেমনই সেই বৈকুণ্ঠধাম মহাত্মাদের দেদীপ্যমান বিমানশ্রেণী দ্বারা এবং সেখানকার রমণীদের বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল কান্তির দ্বারা শোভিত।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে বৈকুণ্ঠলোকে অতি উজ্জ্বল বিমানসমূহ রয়েছে, এবং ভগবানের মহান ভক্তেরা বিদ্যুতের মতো দ্যুতি সম্পন্ন তাঁদের সুন্দরী স্ত্রীদের নিয়ে সেই বিমানে ভ্রমণ করেন। সেখানে যেমন বিমান রয়েছে, তেমনই অন্যান্য যানও নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে, তবে সেগুলি এই পৃথিবীর যানবাহনের মতো যন্ত্রচালিত নয়। যেহেতু সেখানে সবকিছুই সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়, সেখানকার বিমান এবং অন্যান্য যানবাহনও ব্রহ্মভূত। যদিও সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নেই, তা বলে কারোরই ভ্রান্তভাবে ধারণা করা উচিত নয় যে সেই জগৎ শূন্য এবং বৈচিত্র্যহীন। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে মানুষ সেইভাবে চিন্তা করে; তা না হলে কেউই ব্রহ্মকে শূন্য বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত না। সেখানে যেহেতু বিমান, রমণী এবং পুরুষেরা রয়েছে, তাই সেই লোকের উপযুক্ত বাড়ি, ঘর, শহর ও নিশ্চয়ই রয়েছে। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে সেখানকার পরিবেশ কাল ইত্যাদির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সেকথা বিবেচনা না করে এই জগতের অপূর্ণতার ভিত্তিতে সেই জগতের অনুমান করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৪

শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।

প্রেঙ্খং শ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ
বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম গায়তী ॥ ১৪ ॥

শ্রীঃ—লক্ষ্মী ; **যত্র**—বৈকুণ্ঠলোকে ; **রূপিণী**—তাঁর দিব্য রূপে ; **উরুগায়**—ভগবান, মহান ভক্তরা যাঁর মহিমা গান করেন ; **পাদয়োঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ; **করোতি**—করেন ; **মানম্**—শ্রদ্ধাযুক্ত সেবা ; **বহুধা**—বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা ; **বিভূতিভিঃ**—তাঁর পার্ষদগণসহ ; **প্রেঙ্খম্**—আনন্দপূর্বক বিচরণ ; **শ্রিতা**—শরণাগত ; **যা**—যিনি ; **কুসুমাকর**—বসন্ত ; **অনুগৈঃ**—ভ্রমরদের দ্বারা ; **বিগীয়মানা**—অনুগীত ; **প্রিয়কর্ম**—প্রিয়তমের কার্যকলাপ ; **গায়তী**—গান করেন।

অনুবাদ

দিব্য রূপ সমন্বিত লক্ষ্মীদেবী তাঁর সহচরী বিভূতিগণ সহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবা করেন। সেই লক্ষ্মীদেবী আনন্দভরে আন্দোলিতা এবং বসন্তের অনুচর ভ্রমরগণ কর্তৃক অনুগীত হয়ে তাঁর প্রিয়তম ভগবানের মহিমা গান করেন।

শ্লোক ১৫

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দ নন্দ প্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিসেবিতং বিভুম্ ॥ ১৫ ॥

দদর্শ—ব্রহ্মা দেখলেন ; **তত্র**—সেখানে (বৈকুণ্ঠ লোকে) ; **অখিল**—সমগ্র ; **সাত্বতাম্**—মহান্ ভক্তদের ; **পতিম্**—ঈশ্বর ; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর ; **পতিম্**—পতি ; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের ; **পতিম্**—পতি ; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের ; **পতিম্**—পতি ; **সুনন্দ**—সুনন্দ ; **নন্দ**—নন্দ ; **প্রবল**—প্রবল ; **অর্হণ**—অর্হণ ; **আদিভিঃ**—তাদের দ্বারা ; **স্বপার্ষদ**—স্বীয় পার্ষদগণ ; **অগ্রৈঃ**—মুখ্য ; **পরিসেবিতম্**—অপ্রাকৃত প্রেমপূর্বক সেবিত ; **বিভুম্**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

ব্রহ্মা দেখলেন যে সেই বৈকুণ্ঠে ভক্তদের প্রভু, যজ্ঞপতি, জগৎপতি, লক্ষ্মীপতি সর্বশক্তিমান ভগবান সেখানে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রেমপূর্বক সেবিত হয়ে বিরাজ করছেন।

তাৎপর্য

আমরা যখন কোন রাজার কথা বলি তখন স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারি, সেই রাজা তাঁর সচিব, ব্যক্তিগত সহকারী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ইত্যাদি বিশ্বস্ত পার্ষদগণ কর্তৃক

পরিবেষ্টিত। তেমনই আমরা যখন ভগবানকে দর্শন করি তখন দেখতে পাই যে তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তি, পার্ষদ, বিশ্বস্ত সেবক আদি সহ বিরাজমান। তাই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত জীবের পতি, সমস্ত ভক্তদের ঈশ্বর, সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিপতি, সমগ্র যজ্ঞের পতি এবং তাঁর সৃষ্টির সব কিছুর অধীশ্বর, তিনি কেবল পরম পুরুষই নন, তিনি সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ কর্তৃক পরিবেষ্টিত, এবং তাঁরা সকলে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ১৬

ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ১৬ ॥

ভৃত্য—সেবক; **প্রসাদ**—স্নেহ; **অভিমুখম্**—উদ্‌গ্রীব; **দৃক্**—দৃশ্য; **আসবম্**—মাদক; **প্রসন্ন**—অত্যন্ত প্রীত; **হাস**—হাস্য; **অরুণ**—রক্তিম; **লোচন**—নেত্র; **আননম্**—মুখ; **কিরীটিনম্**—মুকুটসহ; **কুণ্ডলিনম্**—কুণ্ডলসহ; **চতুর্ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **পীত**—হলুদ; **অংশুকম্**—বসন; **বক্ষসি**—বক্ষে; **লক্ষিতম্**—অঙ্কিত; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সেখানে তাঁর ভৃত্যদের প্রসাদ বিতরণের জন্য উদগ্রীব। তাঁর মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণীয় রূপ অত্যন্ত প্রসন্নতাময়। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল অরুণ নয়ন শোভিত, তাঁর মস্তক কিরীটশোভিত, কর্ণে কুণ্ডল, তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর বক্ষঃস্থল শ্রীচিহ্ন ভূষিত।

তাৎপর্য

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ভগবান যেখানে তাঁর ভক্তদের দর্শন দান করেন সেই যোগপীঠের পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। সেই যোগপীঠে মূর্তিমান ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভগবানের চরণ কমলে আসীন। চতুর্বেদ—ঋক, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব, সেখানে ভগবানকে উপদেশ দেওয়ার জন্য সর্বদা উপস্থিত। চণ্ড প্রমুখ ষোড়শ শক্তি সেখানে বর্তমান। চণ্ড এবং কুমুদ হচ্ছেন প্রথম দুই দ্বাররক্ষী। মধ্য দ্বারে দ্বারীগণ হচ্ছেন ভদ্র এবং সুভদ্র, এবং শেষ দ্বারে রয়েছেন জয় এবং বিজয়। সেখানে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ ইত্যাদি অন্যান্য দ্বাররক্ষীগণও রয়েছেন। ভগবানের প্রাসাদ উপরোক্ত দ্বাররক্ষকগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত এবং রক্ষিত।

শ্লোক ১৭

অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥

অধ্যর্হনীয়—পরম পূজ্য ; **আসনম্**—সিংহাসন ; **আস্থিতম্**—উপবিষ্ট ; **পরম্**—পরম ; **বৃতম্**—পরিবেষ্টিত ; **চতুঃ**—চার, যথা প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ এবং অহংকার ; **ষোড়শ**—ষোল ; **পঞ্চ**—পাঁচ ; **শক্তিভিঃ**—শক্তির দ্বারা ; **যুক্তম্**—যুক্ত ; **ভগৈঃ**—তাঁর ঐশ্বর্য ; **স্বৈঃ**— স্বীয় ; **ইতরত্র**— অন্যান্য গৌণ শক্তিসমূহের দ্বারা ; **চ**—ও ; **অধ্রুবৈঃ**—অনিত্য ; **স্বে**—স্বীয় ; **এব**—অবশ্যই ; **ধামন্**—ধাম ; **রম্যমাণম্**—উপভোগ করে ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট, এবং তিনি চতুঃ, ষোড়শ ও পঞ্চ শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং অন্যান্য গৌণ শক্তিসহ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর স্বীয় ধামে রম্যমাণ প্রকৃত পরমেশ্বর ভগবান

তাৎপর্য

ভগবান স্বাভাবিক ভাবেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। বিশেষ করে তিনি সব চেয়ে সম্পদশালী, সর্বশক্তিমান, সর্বাধিক যশস্বী, সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী। জড় সৃষ্টির জন্য তিনি প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার এই চারটি শক্তির দ্বারা সেবিত। তিনি পঞ্চ মহাভূত (ভূমি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক), এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, উদর, পায়ু এবং উপস্থ) এবং মন, এই ষোলটি শক্তির দ্বারাও সেবিত। অন্য পঞ্চশক্তি হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ, এই পাঁচটি তন্মাত্র। এই পঞ্চ বিংশতি উপকরণ জড় সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবানকে সেবা করেন, এবং তাঁরা সকলে সেখানে উপস্থিত। আটটি নগণ্য ঐশ্বর্যও (অষ্ট সিদ্ধি, যা যোগীরা তাদের অনিত্য প্রভাব বিস্তারের জন্য কামনা করে) তাঁর অধীন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবেই অনায়াসে এই সমস্ত শক্তিসমন্বিত, এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

জীব কঠোর তপস্যা অথবা যোগ ব্যায়ামের দ্বারা সাময়িকভাবে কোন কোন আশ্চর্য শক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু তা বলে তারা ভগবান হয়ে যায় না। পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই যে কোন যোগীর থেকে অসংখ্য গুণ অধিক শক্তিশালী ; তিনি যে কোন জ্ঞানীর থেকে অসংখ্য গুণ অধিক জ্ঞানী, তিনি যে কোন ধনী ব্যক্তির থেকে

অসংখ্য গুণ ধনী, তিনি যে কোন সুন্দর ব্যক্তির থেকে অসংখ্য গুণ অধিক সুন্দর এবং তিনি যে কোন দানীর থেকে অসংখ্য গুণ অধিক দানী। সর্বোপরি কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে মহৎ নয়। কেউই কোনরকম তপস্যা বা যোগ অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধিলাভপূর্বক তাঁর মতো পূর্ণতার স্তরে পৌঁছাতে পারে না। যোগীরা তাঁর কৃপার উপর নির্ভরশীল। তাঁর অসীম দানশীলতার জন্য তিনি যোগীদের সাময়িকভাবে কোনও শক্তি দান করেন, কেননা যোগীরা সেই সমস্ত শক্তির আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তাঁর অনন্য ভক্তদের, যাঁরা তাঁর প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না, তাঁদের প্রতি তিনিএতই প্রসন্ন হন যে, তাঁদের অহৈতুকী সেবার বিনিময়ে তাঁদের কাছে নিজেকে দান করেন।

শ্লোক ১৮

তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো
হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ
যৎপারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥ ১৮ ॥

তৎ—তাঁর ; **দর্শন**—দর্শন ; **পরিপ্লুত**—আনন্দ ; **আহ্লাদ**—বিহ্বল ; **অন্তরঃ**—হৃদয়ে ; **হৃষ্যৎ**—আনন্দে পূর্ণ ; **তনুঃ**—দেহ ; **প্রেম-ভর**—অপ্রাকৃত প্রেমে পূর্ণ ; **অশ্রু**—অশ্রু ; **লোচনঃ**—নয়ন ; **ননাম**—প্রণত ; **পাদাম্বুজম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ; **অসৎ**—ভগবানের ; **বিশ্বসৃগ্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ; **যৎ**—যা ; **পারমহংস্যেন**—পরম মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ; **পথা**—পথ ; **অধিগম্যতে**—অনুসরণ করা হয়।

অনুবাদ

এইভাবে পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল হলেন এবং দিব্য প্রেম ও আনন্দে তাঁর নেত্র প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হল। তিনি তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলেন। পরমহংসদের মার্গ অনুসরণ করলেই কেবল এই পরম সিদ্ধি লাভ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই মহান শাস্ত্রটি পরমহংসদের জন্য। *পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্*, অর্থাৎ যাঁরা সমস্ত কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছেন, এই শ্রীমদ্ভাগবত কেবল তাঁদেরই জন্য। বদ্ধ জীবন শুরু হয় সর্বোচ্চ ঈর্ষার ফলে, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মৎসরতা পোষণ করার ফলে। সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানকে বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই মহান শাস্ত্রের শেষ অংশে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সেই পরমেশ্বর

ভগবানের শরণাগত হওয়ার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত পুণ্যহীন ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানে বিশ্বাস করে না, পক্ষান্তরে তারা ভগবান হতে চায়। বদ্ধ জীবের এই মৎসরতার পরম প্রকাশ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, এবং তাই সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরাও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করার ফলে, মাৎসর্যপূর্ণ মনোভাবের ফলে কখনো *পরমহংস* হতে পারে না। যাঁরা ভক্তিযোগের অনুশীলনে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত, তাঁরাই কেবল *পরমহংস* স্তর লাভ করতে পারেন। ভক্তিযোগের শুরু হয় যখন মানুষ গভীর নিষ্ঠা সহকারে বিশ্বাস করে যে পূর্ণ প্রেমে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ফলেই কেবল জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়। ব্রহ্মাজী ভক্তিযোগের এই পন্থায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তিনি তপস্যা করার জন্য ভগবানের নির্দেশে বিশ্বাসপরায়ণ হয়েছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করার ফলে বৈকুণ্ঠলোক এবং ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার মহান সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কোন যান্ত্রিক উপায়ে অথবা মানসিক চেষ্টার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ধামে যাওয়া যায় না, কিন্তু কেবল ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করার ফলে সেই বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায়; কেননা ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মাজী প্রকৃতপক্ষে তাঁর কমলাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু গভীর ঐকান্তিকতা সহকারে ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করার ফলে সেখান থেকে তিনি পরম বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠলোক এবং স্বপার্ষদ ভগবানকে দর্শন করেছিলেন।

ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখনও যে কোন ব্যক্তি সেই সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, এবং এই পন্থাকে বলা হয় *পরমহংস* পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও আধুনিক যুগের মানুষদের আত্ম-উপলব্ধির জন্য এই পন্থা অনুমোদন করেছেন। সর্বপ্রথমে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস করতে হবে এবং মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানবার চেষ্টা না করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবত থেকে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হবে। আর পেশাদারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে, অর্থাৎ কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীদের কাছ থেকে না শুনে ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকে ভগবানের কথা শুনতে হবে। এই বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার এটিই হচ্ছে রহস্য। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই; পক্ষান্তরে যে অবস্থায় মানুষ রয়েছে, সেই অবস্থায় থেকেই ভগবানের যথার্থ ভক্তের সান্নিধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করতে হবে। এটিই হচ্ছে *পরমহংস* পন্থা, যা এখানে অনুমোদন করা হয়েছে। ভগবানের অসংখ্য দিব্য নামের মধ্যে একটি হচ্ছে *অজিত*, অর্থাৎ কেউই কখনো তাঁকে জয় করতে পারে না। তথাপি তিনি *পরমহংস* পন্থায় জিত হন, যা মহান গুরু ব্রহ্মা স্বয়ং উপলব্ধি করার মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং এই *পরমহংস* পন্থার বর্ণনা করে বলেছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙমনোভি—
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসিতৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

ব্রহ্মা বলেছেন, "হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যে ভক্ত ব্রহ্মে লীন হওয়ার জ্ঞানের পন্থা পরিত্যাগ করে সাধুদের কাছে তোমার মহিমা এবং কার্যকলাপ কায়মনোবাক্যে শ্রবণ করেন, এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি তোমার সহানুভূতি এবং করুণা জয় করতে পারেন, যদিও তুমি অজিত।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৩) এটিই হচ্ছে *পরমহংস* পন্থা, যা ব্রহ্মা স্বয়ং অনুসরণ করেছিলেন এবং পরে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভের জন্য অনুমোদন করেছেন।

শ্লোক ১৯

তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং
প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্ ।
বভাষ ঈষৎস্মিতশোচিষা গিরা
প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ১৯ ॥

তম্—ব্রহ্মাকে; **প্রীয়মাণম্**—প্রিয়পাত্র; **সমুপস্থিতম্**—সম্মুখে উপস্থিত; **কবিম্**—মহাবিদ্বান; **প্রজা**—জীব; **বিসর্গে**—সৃষ্টিকার্যে; **নিজ**—তাঁর নিজের; **শাসন**—নিয়ন্ত্রণ; **অর্হণম্**—উপযুক্ত; **বভাষে**—সম্বোধন করেছিলেন; **ঈষৎ**—মৃদু; **স্মিত**—হাস্য; **শোচিষা**—শোভাযুক্ত; **গিরা**—বাণী; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **প্রিয়ম্**—প্রেমাস্পদ; **প্রীতমনাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **করে**—হস্ত দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে।

অনুবাদ

তখন প্রেমবশ ভগবান সন্তুষ্ট চিত্তে উপদেশ প্রদানের যোগ্য পাত্র ব্রহ্মার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হয়ে তাঁর হাত ধরে ঈষৎ রুচির হাস্য সহকারে সুমধুর সম্ভাষণে বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি অন্ধ নয় অথবা আকস্মিক নয়। ভগবান ব্রহ্মা প্রমুখ তাঁর প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে নিত্যবদ্ধ জীবদের মুক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। বদ্ধ জীবদের এই জ্ঞান প্রদান করার জন্য ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন। বদ্ধ জীবেরা ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, এবং তাই এইভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করার প্রয়োজন হয়েছে। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার মহান দায়িত্ব ব্রহ্মার রয়েছে, এবং তাই তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

ব্রহ্মা তাঁর কর্তব্য অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে সম্পাদন করেন, কেবল জীব সৃষ্টি করেই নয়, উপরন্তু অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর অনুগামীদের চতুর্দিকে প্রেরণ

করার মাধ্যমে। তাঁর গোষ্ঠীকে বলা হয় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, এবং আজও এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা ভগবদ্ধামে বদ্ধ জীবদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যে স্বাভাবিকভাবে লিপ্ত। ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাই যাঁরা বদ্ধ জীবদের ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যে লিপ্ত, তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে কিছু দলত্যাগী রয়েছে যাদের একমাত্র কার্য হচ্ছে মানুষদের ভগবানের কথা বিস্মৃত করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করা। এই প্রকার ব্যক্তিরা কখনো ভগবানের প্রিয় নয় এবং ভগবান তাদের গভীর অন্ধকার প্রদেশে নিক্ষেপ করেন, যাতে সেই ঈর্ষাপরায়ণ অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে না পারে। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে ভগবানের শিক্ষা প্রচার করেন, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভগবান প্রামাণিক ভক্তিমার্গের সেই সমস্ত প্রচারকদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁদের হস্ত ধারণপূর্বক তাঁর প্রসন্নতা প্রকাশ করেন।

শ্লোক ২০

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বয়াহং তোষিতঃ সম্যগ্বেদগর্ভ সিসৃক্ষয়া।
চিরং ভৃতেন তপসা দুস্তোষঃ কূটযোগিনাম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—সর্বসৌন্দর্যমণ্ডিত পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **তোষিতঃ**—প্রসন্ন; **সম্যক্**—পূর্ণ রূপে; **বেদগর্ভ**—বৈদিক জ্ঞান সমন্বিত; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টির জন্য; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **ভৃতেন**—সঞ্চিত; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **দুস্তোষঃ**—যাঁকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন; **কূটযোগিনাম্**—কপট যোগীদের দ্বারা।

অনুবাদ

পরম সুন্দর পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা! সৃষ্টির বাসনায় তুমি যে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। কপট যোগীরা কখনো আমার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে না।

তাৎপর্য

দুই প্রকার তপস্যা রয়েছে—একটি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য এবং অপরটি আত্ম তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য। বহু কপট যোগী রয়েছে যারা তাদের নিজেদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করে, আর অন্য অনেকে রয়েছে যারা ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করে। যেমন, আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তা কখনো ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে না, কেননা এই প্রকার তপস্যা সন্তুষ্টিজনক নয়।

প্রকৃতির নিয়মে যথাসময়ে সকলেরই মৃত্যু হবে, কিন্তু মৃত্যুর সেই প্রক্রিয়া শীঘ্রকরণের জন্য যদি কেউ তপস্যা করে, তা হলে তা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে না।

ভগবান চান তাঁর বিভিন্নাংশ জীবসমূহ যেন নিত্য জীবন লাভ করে নিত্য আনন্দ আস্বাদনের জন্য তাঁর কাছে ফিরে যায়। জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ব্রহ্মা কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তাই ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান তাঁর হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান সঞ্চার করেছিলেন। বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা। অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার করা উচিত নয়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা বৈদিক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে না, তাদের বলা হয় *কূটযোগী* বা কপট যোগী, যারা অসৎ উদ্দেশ্যে তাদের জীবন নষ্ট করে।

শ্লোক ২১

বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাভিবাঞ্ছিতম্।
ব্রহ্মঞ্ছ্রেয়ঃ পরিশ্রামঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধিঃ ॥ ২১ ॥

বরম্—বর; **বরয়**—আমার কাছে ভিক্ষা কর; **ভদ্রম্**—মঙ্গলময়; **তে**—তোমাকে; **বর-ঈশম্**—সমস্ত বর প্রদানকারী; **মা** (**মাম্**)—আমার থেকে; **অভিবাঞ্ছিতম্**—অভিলষিত; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মা; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়; **পরিশ্রামঃ**—সমস্ত তপস্যার জন্য; **পুংসাম্**—সকলের জন্য; **মৎ**—আমার; **দর্শন**—দর্শন; **অবধিঃ**—চরম সীমা।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা! তোমার মঙ্গল হোক, তুমি আমার কাছে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কেননা আমিই একমাত্র বর প্রদানের কর্তা। শ্রেয় লাভের জন্য সকলে যে পরিশ্রম করে, আমার দর্শনই তার চরম ফল।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছে সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা এবং দর্শন করা। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা উপলব্ধি ভগবদুপলব্ধির চরম অবস্থা নয়। পরমেশ্বর ভগবানকে জানার জন্য এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে হয় না। তখন কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয়। অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন এবং দর্শন করেছেন, তিনি সর্বসিদ্ধি লাভ করেছেন, কেননা সেই পরম সিদ্ধিতে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। নির্বিশেষবাদী এবং কপট যোগীরা কিন্তু কখনো এই স্তর প্রাপ্ত হতে পারে না।

শ্লোক ২২

মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্ ।
যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমং তপঃ ॥ ২২ ॥

মনীষিত—দক্ষতা ; **অনুভাবঃ**—উপলব্ধি ; **অয়ম্**—এই ; **মম**—আমার ; **লোক**—ধাম ; **অবলোকনম্**—প্রকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দর্শন করা ; **যৎ**—যেহেতু ; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে ; **রহসি**—গভীর তপস্যায় ; **চকর্থ**—অনুষ্ঠান করে ; **পরমম্**—সর্বোচ্চ ; **তপঃ**—তপস্যা ।

অনুবাদ

সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম দক্ষতা হচ্ছে আমার ধাম ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করা, এবং তোমার পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে কেননা আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি শ্রদ্ধা সহকারে কঠোর তপস্যা করেছ ।

তাৎপর্য

জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের কৃপায় প্রত্যক্ষ দর্শন মাধ্যমে ভগবানকে জানা । তা তাদেরই পক্ষে সম্ভব যারা শাস্ত্রের বাণী এবং সদ্‌গুরুর স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসারে ভক্তির পন্থা অনুশীলনে ইচ্ছুক । যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র যা শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব, শ্রীচৈতন্য, বিশ্বনাথ, বলদেব, সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রমুখ বহু আচার্য কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন সকলেই যেন তাদের মনের দ্বারা তাঁর কথা চিন্তা করে, তাঁর ভক্ত হয়, তাঁর পূজা করে এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে, এবং তা করার ফলে তারা তাদের নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে ;সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই ।

অন্যত্র তিনি সেই নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন সমস্ত তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে সকলেই যেন পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়, এবং তা হলে তিনি তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন । সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের এটিই হচ্ছে রহস্য ।

ব্রহ্মা সর্বপ্রকার অহঙ্কার পরিত্যাগ করে যথাযথভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর ধাম এবং পরিকরসহ দর্শন করার পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন ।

ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতির নির্বিশেষ দর্শন সর্বোচ্চ সিদ্ধি নয়, এমনকি পরমাত্মা উপলব্ধিও সর্বোচ্চ সিদ্ধি নয় । এখানে *মনীষিত* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ । সকলেই ভ্রান্তভাবে অথবা বাস্তবিকভাবে তাদের বিদ্যার গৌরবে গর্বান্বিত । কিন্তু ভগবান বলেছেন যে বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হচ্ছে সর্বপ্রকার মোহমুক্ত হয়ে তাঁর ধাম সহ তাঁকে জানা ।

শ্লোক ২৩

প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্মবিমোহিতে ।
তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোহনঘ ॥ ২৩ ॥

প্রত্যাদিষ্টম্—আদিষ্ট হয়ে ; **ময়া**—আমার দ্বারা ; **তত্র**—কারণে ; **ত্বয়ি**—তোমাকে ; **কর্ম**—কর্তব্য ; **বিমোহিতে**—মোহগ্রস্ত হয়ে ; **তপঃ**—তপস্যা ; **মে**—আমাকে ; **হৃদয়ম্**—হৃদয় ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে ; **আত্মা**—জীবন এবং আত্মা ; **অহম্**—আমি স্বয়ং ; **তপসঃ**—তপস্বী ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা ! আমার কাছে অবগত হও যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি যখন তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলে তখন আমিই তোমাকে তপস্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। এই তপস্যা আমার হৃদয় এবং আমি তপস্যার আত্মা। তাই তপস্যা আমার থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

যে তপস্যার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যায় সেই ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে প্রকৃত তপস্যা, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা অপ্রাকৃত প্রেম সহকারে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। এই প্রকার তপস্যা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তা তাঁর থেকে অভিন্ন। এই অন্তরঙ্গা শক্তি জড় বিষয় ভোগের প্রতি অনাসক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আধিপত্য করার প্রবণতার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে এই উপভোগ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই জাগতিক সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, এবং এই বৈরাগ্যই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ফল। তাই ভগবদ্ভক্তির তপস্যায় জ্ঞান এবং বৈরাগ্য নিহিত রয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ।

কেউ যদি তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, তাহলে জড় জগতের মায়িক সমৃদ্ধি সে উপভোগ করতে পারে না। যাদের ভগবানের সান্নিধ্যে অপ্রাকৃত আনন্দের কোন ধারণা নেই, তারা মূর্খতাবশত এই অনিত্য জড় জগতে সুখভোগের বাসনা করে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবানকে দর্শন করতে চায় এবং সেই সঙ্গে জড় সুখ ভোগ করতে চায়, তা হলে বুঝতে হবে যে সে অতি মূর্খ। যারা জড় সুখভোগের জন্য এই জগতে থাকতে চায়, তাদের ভগবানের নিত্যধামে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। এইপ্রকার মূর্খ ভক্তকে কৃপা করে ভগবান তার সমস্ত জাগতিক সম্পদ হরণ করে নেন। এইপ্রকার মূর্খ

ভক্ত যদি তার সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে, তখন ভগবান কৃপা করে পুনরায় তার সর্বকিছু হরণ করে নেন। এইভাবে জড় সমৃদ্ধি লাভে বার বার ব্যর্থ হয়ে সে তার পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠে। জড় জগতে পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা তাদেরই প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যারা যে কোনও প্রকারে ধনসম্পদ অর্জনে সফল হয়েছে। এইভাবে ভগবানের মূর্খ ভক্তরা ভগবানের কৃপায় তপস্যা করতে বাধ্য হয়, এবং অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আনন্দ আস্বাদন করে। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা ভগবান কর্তৃক বাধ্য হয়ে ভগবদ্ভক্তির যে তপস্যা, তা সিদ্ধি লাভের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক, এবং এই প্রকার তপস্যা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি।

সবরকম পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হলে কিন্তু ভগবদ্ভক্তির তপস্যায় যুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে যারা সর্বতোভাবে পাপ-মুক্ত হয়েছে, তারাই কেবল ভগবানের আরাধনায় যুক্ত হতে পারে। ব্রহ্মাজী ছিলেন নিষ্পাপ এবং তাই তিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবান কর্তৃক "*তপ তপ*" শব্দে আদিষ্ট হয়ে তপস্যা করেছিলেন এবং ভগবান তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেছিলেন। তাই প্রেম এবং তপস্যা এই দুইয়ের মিলনের প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং এইভাবে তাঁর পূর্ণ কৃপা লাভ করা যায়। তিনি নিষ্পাপীকে পরিচালিত করেন, নিষ্পাপ ভক্ত জীবনে পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৪

সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্যং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ২৪ ॥

সৃজামি—আমি সৃজন করি ; **তপসা**—সেই তপস্যা শক্তির দ্বারা ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **ইদম্**—এই ; **গ্রসামি তপসা**—সেই শক্তির দ্বারা আমি সংবরণ করি ; **পুনঃ**—পুনরায় ; **বিভর্মি**—পালন করি ; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা ; **বিশ্বম্**—বিশ্ব ; **বীর্যম্**—শক্তি ; **মে**—আমার ; **দুশ্চরম্**—কঠোর ; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

এই প্রকার তপস্যার দ্বারা আমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করি, পালন করি এবং সেই শক্তির দ্বারাই আমি তা সংবরণ করি। অতএব তপস্যাই হচ্ছে বাস্তবিক শক্তি।

তাৎপর্য

তপস্যা করার সময় আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সবরকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। জড় জগতে সমৃদ্ধি, নাম এবং যশ অর্জনের জন্য কত কঠোর

তপস্যা করতে হয়, তা না হলে জড় জগতে প্রসিদ্ধ হওয়া যায় না। তা হলে ভগবদ্ভক্তিতে সিদ্ধি লাভের জন্য কঠোর তপস্যা কেন করতে হবে? সুখের জীবন এবং পরমার্থ উপলব্ধির সিদ্ধি এক সঙ্গে সম্ভব নয়। ভগবান যে কোন জীবের থেকে অধিক চতুর; তাই তিনি দেখতে চান ভক্তির জন্য ভক্ত কতটা কষ্ট স্বীকার করতে চায়। সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে অথবা তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সমস্ত কঠোরতা সত্ত্বেও সেই নির্দেশ পালন করাই হচ্ছে কঠোর তপস্যা। যিনি দৃঢ়তা সহকারে এই নিয়ম পালন করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের কৃপা লাভে সফল হবেন।

শ্লোক ২৫

ব্রহ্মোবাচ

ভগবন্ সর্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **ভগবন্**—হে প্রভু; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **অধ্যক্ষঃ**—পরিচালক; **অবস্থিতঃ**—স্থিত; **গুহাম্**—হৃদয় অভ্যন্তরে; **বেদ**—জানা; হি—নিশ্চিতভাবে; **অপ্রতিরুদ্ধেন**—নির্বিঘ্নে; **প্রজ্ঞানেন**—চরম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; **চিকীর্ষিতম্**—প্রয়াস করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, হে ভগবান! পরম নিয়ন্তারূপে আপনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং তাই আপনি আপনার অপ্রতিহত প্রজ্ঞার প্রভাবে সকলেরই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবগত।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, এবং সেই সূত্রে তিনি পরম উপদেষ্টা এবং অনুমন্তা। উপদেষ্টা কর্মফলের ভোক্তা নন,কেননা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউই উপভোগ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ অঞ্চলে পানাসক্ত ব্যক্তিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পরিচালকের কাছে অনুমোদন-পত্র দিতে হয়, এবং পরিচালক তার অবস্থা বিবেচনা করে তাকে কেবল কিছু পরিমাণ সুরা অনুমোদন করেন। তেমনই, সমগ্র জড় জগৎ পানাসক্ত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই বিষয় সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তাদের বাসনা চরিতার্থ করার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। সর্বশক্তিমান ভগবান জীবের প্রতি পিতৃবৎ সদয় হয়ে তাদের শিশু সুলভ ভোগের বাসনা পূরণ করেন। এই প্রকার মনোবাসনা চরিতার্থ করার ফলে জীব কিন্তু

কখনো প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারে না, সে কেবল তার অর্থহীন দেহের আবেদনগুলি চরিতার্থ করে ; কিন্তু তার ফলে তার কোন লাভ হয় না। পানাসক্ত ব্যক্তির যেমন সুরাপানের মাধ্যমে কোন লাভ হয় না, কিন্তু যেহেতু সে সুরাপানের বদ অভ্যাসের দাস হয়েছে, এবং যেহেতু সে তার সেই বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে না, তাই কৃপাময় ভগবান তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার সমস্ত সুযোগ দেন।

নির্বিশেষবাদীরা বাসনাশূন্য হওয়ার উপদেশ দেয় এবং অন্যেরা সম্পূর্ণরূপে বাসনা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তা অসম্ভব ; কেউই সম্পূর্ণরূপে বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না, কেননা বাসনা হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। বাসনাবিহীন জীব মৃত, যা প্রকৃতপক্ষে সে নয়। তাই জীবন এবং বাসনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাসনার চরম চরিতার্থতা তখনই হয় যখন জীব ভগবানের সেবা করার বাসনা করে, এবং ভগবানও চান যে প্রতিটি জীব যেন তার সমস্ত ব্যক্তিগত বাসনা পরিত্যাগ করে তাঁর বাসনার অনুকূলে চলে। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ। ব্রহ্মাজী ভগবানের সেই নির্দেশ স্বীকার করেছিলেন, এবং তাই শূন্য ব্রহ্মাণ্ডে জীব সৃষ্টি করার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভগবানের বাসনার সঙ্গে আমাদের বাসনা যুক্ত করা, তার ফলে সমস্ত বাসনা পূর্ণতা লাভ করে।

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে কি রয়েছে তা জানেন, এবং অন্তঃস্থিত ভগবানের জ্ঞান ব্যতীত কেউই কোন কিছু করতে পারে না। তাঁর পরম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে, ভগবান সকলকে সম্পূর্ণরূপে তাদের বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন এবং তার ফলও ভগবানই প্রদান করেন।

শ্লোক ২৬

তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্ ।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ ॥ ২৬ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও ; **নাথমানস্য**—আকাঙ্ক্ষাকারীর ; **নাথ**—হে ভগবান ; **নাথয়**—দয়া করে প্রদান করুন ; **নাথিতম্**—বাসনা অনুসারে ; **পর-অবরে**—জড় এবং চিন্ময় উভয় বিষয়ে ; **যথা**—যেমন ; **রূপে**—রূপে ; **জানীয়াম্**—জানা হোক ; **তে**—আপনার ; **তু**—কিন্তু ; **অরূপিণঃ**—রূপহীন।

অনুবাদ

হে প্রভু ! তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি কৃপা করে আমার বাসনা চরিতার্থ করুন। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আপনার চিন্ময় রূপ সত্ত্বেও আপনি কিভাবে জড় রূপ পরিগ্রহ করেছেন, যদিও আপনার সে রকম কোন রূপ নেই।

শ্লোক ২৭

যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ॥ ২৭ ॥

যথা—যতখানি ; **আত্ম**—স্বীয় ; **মায়া**—শক্তি ; **যোগেন**—যুক্ত করার দ্বারা ; **নানা**—বিবিধ ; **শক্তি**—শক্তি ; **উপবৃংহিতম্**—সমন্বয়ের মাধ্যমে ; **বিলুম্পন্**—বিনাশ করার ব্যাপারে ; **বিসৃজন্**—সৃষ্টি করার ব্যাপারে ; **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করেন ; **বিভ্রৎ**—পালন করার ব্যাপারে ; **আত্মানম্**—নিজেকে ; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা ।

অনুবাদ

(দয়া করে আপনি আমাকে বলুন) আপনি কিভাবে আপনার আপনার বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে সংহার করেন, সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন ।

তাৎপর্য

সমগ্র সৃষ্টি ভগবানের বিভিন্ন শক্তির, যথা অন্তরঙ্গা,বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তির মাধ্যমে ভগবানেরই প্রকাশ, ঠিক যেমন সূর্যকিরণ সূর্য মণ্ডলের শক্তির প্রকাশ । এইপ্রকার শক্তি যুগপৎ ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন, ঠিক যেমন সূর্যরশ্মি যুগপৎ সূর্য মণ্ডল থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ভগবান এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ প্রতিনিধির নির্দেশে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অবতার। পক্ষান্তরে বলা যায় যে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এই সমস্ত প্রকাশিত কার্যকলাপ থেকে ভিন্ন। সেটি কিভাবে হয় সে কথা পরে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ২৮

ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে ।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২৮ ॥

ক্রীড়সি—আপনি যেভাবে ক্রীড়া করেন ; **অমোঘ**—অচ্যুত ; **সংকল্প**—সংকল্প ; **ঊর্ণনাভিঃ**—মাকড়সা ; **যথা**—যেমন ; **ঊর্ণুতে**—আচ্ছাদিত করে ; **তথা**—তেমন ; **তৎ-বিষয়াম্**—এই সমস্ত বিষয়ে ; **ধেহি**—আমাকে জানতে দিন ; **মনীষাম্**—দর্শনের দ্বারা ; **ময়ি**—আমাকে ; **মাধব**—হে সমস্ত শক্তির ঈশ্বর ।

অনুবাদ

হে মাধব ! দয়া করে সে সমস্ত বিষয়ে আমাকে দর্শনের মাধ্যমে অবগত করুন। ঊর্ণনাভের মতো আপনি আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন, এবং আপনার সংকল্প অচ্যুত ।

তাৎপর্য

ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানের দ্রব্যশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি নামক স্বীয় শক্তি রয়েছে। ভগবানের এই সমস্ত শক্তির সমন্বয়ের ফলে এবং কালের প্রভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রতিনিধি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব ধ্বংস করেন। কিন্তু ভগবানের এই সমস্ত প্রতিনিধি এবং সৃষ্টিশক্তি ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়, এবং সেই সূত্রে ভগবান ব্যতীত আর কিছু নেই, অথবা বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে পরম উৎস একটিই। তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সা এবং তার জাল। মাকড়সা সেই জাল সৃষ্টি করে, তা পালন করে এবং তার ইচ্ছা অনুসারে সে তা গুটিয়ে নেয়। মাকড়সা তার জালের মধ্যে আচ্ছাদিত। একটি নগণ্য মাকড়সা যদি তার ইচ্ছানুসারে কার্য সাধনে এত শক্তিশালী হতে পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবান কেন তাঁর ইচ্ছার দ্বারা জড়জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস করতে পারবেন না? ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মার মতো ভক্ত অথবা পরম্পরা ধারায় কোন ভক্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিরন্তর তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসে যুক্ত।

শ্লোক ২৯

ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।
নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ॥ ২৯॥

ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **শিক্ষিতম্**—শিক্ষিত; **অহম্**—আমি; **করবাণি**—আচরণের দ্বারা; **হি**—নিশ্চয়ই; **অতন্দ্রিতঃ**—সহায়ক; ন—কখনোই না; **ইহমানঃ**—কার্য করা সত্ত্বেও; **প্রজাসর্গম্**—প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে; **বধ্যেয়ম্**—বদ্ধ হওয়া; **যৎ**—প্রকৃতপক্ষে; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার দ্বারা।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি আমাকে বলুন যাতে আমি আপনার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে আপনার প্রতিনিধিরূপে জীব সৃষ্টির কার্য করতে পারি এবং সেই প্রকার কার্যে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বদ্ধ হয়ে না পড়ি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাজী তাঁর নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে অনুমান করতে চাননি এবং জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি। সকলেরই বিশুদ্ধ চেতনায় জানা উচিত যে, সমস্ত কার্য সম্পাদনে সে হচ্ছে একটি যন্ত্র মাত্র। জীব বদ্ধ অবস্থায় ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি, গুণময়ী মায়া কর্তৃক যন্ত্রের মতো পরিচালিত হয় এবং মুক্ত অবস্থায় সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়। সরাসরিভাবে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা

পরিচালিত হওয়াই জীবের স্বরূপগত অবস্থা, কিন্তু ভগবানের মায়া-শক্তি কর্তৃক পরিচালিত হওয়া জীবের বদ্ধ অবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় জীব পরম সত্য এবং তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সে সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকার মুক্ত আত্মার সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে ক্রটিহীন এবং জল্পনা-কল্পনা করার অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/১০-১১) বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তেরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং তার ফলে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা কখনো তাঁদের প্রগতির গর্বে গর্বিত হন না, কিন্তু মনোধর্মী অভক্তেরা মায়ার গভীরতম অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং সেই সমস্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবেরা তাদের জল্পনা-কল্পনাভিত্তিক ভ্রান্ত জ্ঞানের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। ব্রহ্মা যদিও এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি তিনি সেই গর্বের প্রভাবে অধঃপতনের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ
প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্।
অবিক্লবস্তে পরিকর্মণি স্থিতো
মা মে সমুন্নদ্ধমদোঽজমানিনঃ ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যেমন; **সখা**—বন্ধু; **সখ্যুঃ**—বন্ধুকে; **ইব**—তেমন; **ঈশ**—হে ভগবান; **তে**—আপনি; **কৃতঃ**—স্বীকার করেছেন; **প্রজা**—জীব; **বিসর্গে**—সৃষ্টির বিষয়ে; **বিভজামি**—আমি যা ভিন্নভাবে করব; **ভোঃ**—হে প্রভু; **জনম্**—যাদের জন্ম হয়েছে; **অবিক্লবঃ**—অবিচলিতভাবে; **তে**—আপনার; **পরিকর্মণি**—সেবার ব্যাপারে; **স্থিতঃ**—এইভাবে অবস্থিত; **মা**—তা যেন কখনো না হয়; **মে**—আমাকে; **সমুন্নদ্ধ**—ফলস্বরূপ; **মদঃ**—মত্ততা; **অজ**—হে জন্মহীন; **মানিনঃ**—এইভাবে যাঁকে মনে করা হয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে অজ! বন্ধু যেমন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে, আপনিও সেভাবে আমার সঙ্গে করেছেন (যেন আমি আপনার সমকক্ষ)। বিভিন্ন প্রকার জীবের সৃষ্টির ব্যাপারে আমি যুক্ত হব এবং এইভাবে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত হব। আমি বিচলিত হব না, কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন তার ফলে আমি নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করে গর্বান্বিত না হই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সখ্য রসে সম্পর্কিত। প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পাঁচটি অপ্রাকৃত রসের যে কোন একটির দ্বারা সম্পর্কিত। পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে এই পাঁচটি রসের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে যে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সখ্য রসে সম্পর্কিত।

শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে যে কোন একটি অপ্রাকৃত রসে সম্পর্কিত হতে পারেন, এমনকি বাৎসল্য রসেও সম্পর্কিত হতে পারেন ; কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত সেবক। কেউই ভগবানের সমকক্ষ নন অথবা ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নন। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী।

ব্রহ্মাজী যদিও ভগবানের সঙ্গে সখ্য রসে সম্পর্কিত এবং যদিও তিনি বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি সচেতন ছিলেন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান নন অথবা পরম শক্তিমান নন।

কখনো কখনো এই ব্রহ্মাণ্ডে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কোন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি ভগবানের থেকেও অধিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তা হলেও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে সেই শক্তি ভগবানেরই বিভূতি, এবং এই প্রকাব শক্ত্যাবিষ্ট জীব কখনোই স্বতন্ত্র নন।

শ্রীহনুমানজী লাফ দিয়ে ভারত মহাসাগর পার হয়েছিলেন, অথচ শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধন করে পায়ে হেঁটে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে হনুমান ভগবান রামচন্দ্রের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিলেন। ভগবান কখনো কখনো তাঁর ভক্তকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্ত সর্বদাই জানেন যে সেই শক্তি ভগবানের এবং তিনি স্বয়ং ভগবানের হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

অভক্তরা নিজেকে ভগবান বলে মনে করে গর্বোদ্ধত হয়, শুদ্ধ ভক্তরা কিন্তু কখনোই সেরকম নয়। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে প্রতি পদক্ষেপে ভগবানের মায়াশক্তি কর্তৃক পদাহত হচ্ছে যে ব্যক্তি, সে ভ্রান্তভাবে মনে করে যে সে ভগবান হবে। এইপ্রকার মনোভাব মায়ার চরম বন্ধন।

জীবের প্রথম মোহ হচ্ছে যে সে ধনসম্পদ এবং শক্তি সঞ্চার করে জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করবে, কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে চরমে সে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। অতএব এই জড় জগতে সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি হওয়া এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা দুটিই মায়ার দুটি বন্ধন।

কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু ভগবানের শরণাগত, তাই তাঁরা মায়ার এই মোহময়ী বন্ধনের অতীত। ব্রহ্মা যেহেতু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই এই জড় জগতে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হওয়া সত্ত্বেও এবং নানাপ্রকার অতি অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মূর্খ অভক্তদের মতো ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে

যাওয়ার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেননি। যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অসৎ বাসনা পোষণ করে, তাদের ব্রহ্মাজীর আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্ন জীবদের পূর্বকল্পে তাদের কর্ম অনুসারে দেহ প্রদান করার ক্ষমতা কেবল তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মাজীর কর্তব্য হচ্ছে জীবদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তাদের উপযুক্ত কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত করা। ব্রহ্মাজী তাঁর খেয়াল-খুশিমতো বিভিন্ন স্তরের জীব সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তিনি জীবদের উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর দান করার কার্যে নিযুক্ত। এমন মহান দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই সচেতন যে তিনি কেবল ভগবানের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, এবং তিনি সর্বদাই সর্তক থাকেন যেন কখনো তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে না করেন।

ভগবানের ভক্তরা ভগবান প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনে যুক্ত থাকেন, এবং এই প্রকার কর্তব্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে তাঁরা সক্ষম হন, কেননা তাঁরা ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন। এই সাফল্যের গৌরব ভক্তেরা গ্রহণ করেন না, তা তাঁরা সর্বদাই ভগবানকে প্রদান করেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা ভগবানকে কোনরকম স্বীকৃতি না দিয়ে নিজেরাই তাদের সাফল্যের সমস্ত গৌরব গ্রহণ করতে চায়। এটিই হচ্ছে অভক্তদের লক্ষণ।

শ্লোক ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন ; **জ্ঞানম্**—লব্ধ জ্ঞান ; **পরম**— অত্যন্ত ; **গুহ্যম্**—গোপনীয় ; **মে**—আমার ; **যৎ**—যা ; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধি ; **সমন্বিতম্**—সমন্বিত ; **সরহস্যম্**—ভক্তিসহকারে ; **তৎ**—তার ; **অঙ্গম্ চ**—আনুষঙ্গিক সামগ্রী ; **গৃহাণ**—গ্রহণ করার চেষ্টা কর ; **গদিতম্**—বিশ্লেষিত ; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং তা ভক্তি সহকারে উপলব্ধি করতে হয়। সেই পন্থার আনুষঙ্গিক অঙ্গসমূহ আমি বিশ্লেষণ করছি তুমি তা যত্ন সহকারে গ্রহণ কর।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং তাই তিনি তাঁর চারটি মুখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে, যা *চতুঃশ্লোকী ভাগবত* নামে

পরিচিত। ব্রহ্মার প্রশ্নগুলি ছিল—(১) জড় এবং চিন্ময় উভয় স্তরে ভগবানের রূপ কি রকম ? (২) ভগবানের বিভিন্ন শক্তি কিভাবে ক্রিয়া করে ? (৩) ভগবান কিভাবে তাঁর বিভিন্ন শক্তিতে লীলা বিলাস করেন ? (৪) ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করবেন ? সেই প্রশ্নগুলির উত্তরের ভূমিকাস্বরূপ এই শ্লোকটির মাধ্যমে ভগবান ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধীয় পরম তত্ত্বজ্ঞান যা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ভগবানের কৃপায় আত্ম-উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছেন যে তিনি যেভাবে সেগুলি বিশ্লেষণ করছেন তা যেন তিনি যত্নসহকারে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান তখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যখন ভগবান স্বয়ং তা কাউকে জানান। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরাও তাঁদের মনীষার দ্বারা পরম তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। মনোধর্মীজ্ঞানীরা বড় জোর নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পূর্ণজ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অতীত। তাই তাকে বলা হয় গুহ্যতম জ্ঞান।

বহু মুক্ত আত্মাদের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন পরমেশ্বর ভগবানকে জানার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজেও বলেছেন যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা করে, এবং বহু সিদ্ধ জীবের মধ্যে কদাচিৎ একজন তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারে। তাই পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল লাভ করা সম্ভব। *রহস্যম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন কেননা অর্জুন ছিলেন তাঁর ভক্ত এবং সখা। এই যোগ্যতা ব্যতীত কেউই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রহস্য উন্মোচন করতে পারে না। তাই ভগবানের ভক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন না করলে কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। এই রহস্য হচ্ছে *ভগবৎ-প্রেম*। পরমেশ্বর ভগবানের রহস্য জানার এটিই হচ্ছে প্রধান যোগ্যতা। আর ভগবৎ-প্রেমের অপ্রাকৃত স্তর লাভ করতে হলে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসরণ করতে হবে। এই বিধিকে বলা হয় বিধি-ভক্তি, এবং নবীন ভক্ত তার বর্তমান ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা এই বিধিভক্তির অনুশীলন করতে পারেন। এই বিধি প্রধানত ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই কেবল এই প্রকার শ্রবণ এবং কীর্তন সম্ভব।

ভগবদ্ভক্তিতে সিদ্ধিলাভের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই পাঁচটি প্রধান বিধির নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তার প্রথমটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন; তৃতীয়, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ; চতুর্থ, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র স্থানে বাস; এবং পঞ্চমটি হচ্ছে ভক্তি সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা। এই প্রকার বিধিবিধানগুলি ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ। সুতরাং ব্রহ্মার অনুরোধ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চারটি প্রশ্নের উত্তর পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করবেন এবং সেই প্রশ্নগুলির আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলিরও উত্তর দেবেন।

শ্লোক ৩২

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩২ ॥

যাবান্—আমার নিত্যরূপে; **অহম্**—আমি; **যথা**—যেমন; **ভাবঃ**—চিন্ময় অস্তিত্ব; **যৎ**—যারা; **রূপ**—বিভিন্ন রূপ এবং বর্ণ; **গুণ**—গুণাবলী; **কর্মকঃ**— কার্যকলাপ; **তথা**—তেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তত্ত্ববিজ্ঞানম্**—বাস্তব উপলব্ধি; **অস্তু**—হোক; **তে**—তোমার; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহাৎ**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে।

অনুবাদ

আমার সবকিছু, যথা আমার নিত্যরূপ এবং আমার চিন্ময় অস্তিত্ব, বর্ণ, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ, আমার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবানের দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান হৃদয়ঙ্গমকরার রহস্য হচ্ছে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা। জড় জগতেও বহু পুত্রের পিতা তার নিজের রহস্য তার প্রিয় পুত্রের কাছে কেবল উদ্ঘাটন করে থাকে। যাকে সে যোগ্য পুত্র বলে মনে করে তার কাছেই সে তার গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করে। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে জানা যায় কেবল তার কৃপার মাধ্যমেই। তেমনই ভগবানকে জানার ব্যাপারেও অবশ্যই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হতে হয়। ভগবান অসীম; কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে ভগবানকে জানার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভগবান ব্রহ্মাজীর প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেছিলেন যাতে তিনি তাঁকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

বেদেও বলা হয়েছে যে কেউই পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানকে জড় বিদ্যা অথবা বুদ্ধিমত্তার দ্বারা জানতে পারে না। সদ্গুরু এবং ভগবানের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি যদি জড়জাগতিক বিচারে অশিক্ষিতও হন, তথাপি ভগবানের কৃপায় আপনা থেকেই তিনি ভগবানকে জানতে পারেন। ভগবদ্গীতাতেও বলা হয়েছে যে ভগবান সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না, এবং যারা অবিশ্বাসী তাদের কাছে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখেন।

যারা শ্রদ্ধাশীল তাদের কাছে ভগবান তাঁর রূপ, গুণ এবং লীলা প্রকাশ করেন। নির্বিশেষবাদীরা যে ভগবানকে নিরাকার বলে মনে করে তা সত্য নয়, তবে রূপ সম্বন্ধে

আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তা থেকে তাঁর রূপ ভিন্ন। ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে তাঁর রূপ প্রকাশ করেন, এমনকি তাঁর মাপ পর্যন্ত, এবং এটিই হচ্ছে *যাবান্* শব্দের অর্থ, যা শ্রীমদ্ভাগবতের মহান তত্ত্ববিদ্ শ্রীল জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করে গেছেন।

ভগবান তাঁর অস্তিত্বের অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকট করেন। জড় জল্পনা-কল্পনাকারীরা ভগবানের রূপ সম্বন্ধে নানারকম জড় ধারণা পোষণ করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবানের কোন জড় রূপ নেই; তাই যারা অজ্ঞ তারা স্থির করে ভগবান নিশ্চয়ই নিরাকার। তারা জড় রূপ এবং চিন্ময় রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। তাদের মতে, জড় রূপ না থাকার অর্থ হল, নিরাকার। এই ধারণাটিও জড়, কেননা নিরাকারের ধারণা আকারের ধারণারই বিপরীত। জড় ধারণার নিবৃত্তি কখনো চিন্ময় তত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারে না।

ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে ভগবানের চিন্ময় রূপ রয়েছে এবং তিনি তাঁর যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারেন। যেমন, তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা আহার করতে পারেন এবং তাঁর পায়ের দ্বারা দর্শন করতে পারেন। জড় রূপে কেউ চক্ষুর দ্বারা আহার করতে পারে না অথবা পায়ের দ্বারা দর্শন করতে পারে না : সেটিই জড় দেহ এবং সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় দেহের পার্থক্য।

চিন্ময় দেহ নিরাকার নয় ; এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দেহ যে সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা কোনরকম ধারণাই করতে পারি না। তাই নিরাকারের অর্থ হচ্ছে জড় আকারবিহীন অথবা চিন্ময় দেহ সমন্বিত, যে সম্বন্ধে অভক্তরা তাদের অনুমানের মাধ্যমে কোন ধারণাই করতে পারে না।

ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে তাঁর অন্তহীন বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্ময় দেহ, যা বিভিন্ন রূপ সত্ত্বেও পরস্পর থেকে অভিন্ন, তা প্রকাশ করেন। ভগবানের কোন কোন চিন্ময় রূপ শ্যামবর্ণ এবং অন্য কোন রূপ শ্বেতবর্ণ। কোন রূপ রক্তবর্ণ এবং কোন রূপ পীত বর্ণ। তাঁর কোন রূপ চতুর্ভুজ এবং কোন রূপ দ্বিভুজ। কোন রূপ মৎস্যের মতো এবং কোন রূপ সিংহের মতো। ভগবানের এই সমস্ত চিন্ময় দেহ ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর ভক্তের কাছে প্রকাশ করেন, এবং তাই নির্বিশেষবাদীদের ভগবানের নিরাকার হওয়ার অসৎ বিচার, ভক্তিমার্গে অনুন্নত ভক্তের কাছেও কোনরকম আবেদন সৃষ্টি করে না।

ভগবানের অন্তহীন চিন্ময় গুণাবলী রয়েছে, এবং তাদের একটি হচ্ছে তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি তাঁর বাৎসল্য। জড় জগতের ইতিহাসেও আমরা তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর উপলব্ধি করতে পারি। ভগবান তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য জগতে অবতরণ করেন। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ তাঁর ভক্তদের নিয়ে। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই প্রকার লীলা-বিলাসের বর্ণনায় পূর্ণ, এবং অভক্তদের সেই সমস্ত লীলা-বিলাসের কোন ধারণাই নেই।

সাত বছর বয়সের বালকরূপে ভগবান গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন, এবং ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বারি বর্ষণের দ্বারা বৃন্দাবনকে প্লাবিত করছিল, তখন তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন। যারা অবিশ্বাসী তাদের কাছে সাত বছরের বালকের গোবর্ধন পর্বত ধারণ করা অবিশ্বাস্য হতে পারে, কিন্তু ভক্তদের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য।

ভক্তেরা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা মুখে ভগবানকে সর্বশক্তিমান বললেও প্রকৃতপক্ষে তা বিশ্বাস করে না। এইপ্রকার মূর্খেরা জানে না যে ভগবান চিরকালই ভগবান এবং লক্ষকোটি বছর ধরে ধ্যান করলেও অথবা কোটি কোটি বছর ধরে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন করলেও কখনো ভগবান হওয়া যায় না।

জড় জল্পনা-কল্পনাপ্রবণ জ্ঞানীদের নির্বিশেষ ধারণা এই শ্লোকটিতে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে। কেননা এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের গুণ আছে, রূপ আছে, লীলা আছে এবং কোন মানুষের যা রয়েছে তা সবই ভগবানের মধ্যে আছে। ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সমস্ত বর্ণনা ভগবদ্ভক্তদের উপলব্ধ জ্ঞান। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই জ্ঞান ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে প্রকাশিত হয়, এবং অন্য আর কারো কাছে হয় না।

শ্লোক ৩৩

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥

অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আসম্**—ছিলাম; **এব**—কেবল; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **ন**—কখনোই না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **যৎ**—সেই সমস্ত; **সৎ**—কার্য; **অসৎ**—কারণ; **পরম**—পরম; **পশ্চাৎ**—অন্তে; **অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—এই সমস্ত; **এতৎ**—সৃষ্টি; **চ**—ও; **যঃ**—সবকিছু; **অবশিষ্যেত**—অবশিষ্ট থাকে; **সঃ**—তা; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব।

তাৎপর্য

এখানে আমাদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে বলছেন যে তিনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন,

তিনিই কেবল সমগ্র সৃষ্টিকে পালন করেন এবং প্রলয়ের পর একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্মাও পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি। নির্বিশেষবাদীরা অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে বলে যে, *"অহম্"* পরম সত্য থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে ব্রহ্মাও সেই একই *"অহম্"* তত্ত্ব এবং সেই সূত্রে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মার কোন পার্থক্য নেই, এবং এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে *"অহম্"* তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। নির্বিশেষবাদীদের এই যুক্তি মেনে নিলেও স্বীকার করতে হবে যে ভগবান হচ্ছেন স্রষ্টা *"অহম্"* এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্ট *"অহম্"*। অতএব এই দুই *"অহম্"* এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমন মুখ্য *"অহম্"* এবং গৌণ *"অহম্"*। অতএব নির্বিশেষবাদীদের যুক্তি মানলেও দুটি *অহম্* স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এখানে আমাদের সাবধানতা সহকারে লক্ষ্য করতে হবে যে বৈদিক শাস্ত্রে (*কঠোপনিষদে*) গুণ অনুসারে এই দুটি *অহম্* স্বীকার করা হয়েছে। *কঠোপনিষদে* বলা হয়েছে—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥

স্রষ্টা "আমি" এবং সৃষ্ট "আমি"— এই দুটি আমিকেই বেদে গুণগতভাবে এক বলে স্বীকার করা হয়েছে, কেননা উভয়ই নিত্য এবং চেতন। কিন্তু তার একটি "আমি" হচ্ছে স্রষ্টা "আমি" এবং তা এক বচন, এবং সৃষ্ট "আমি" বহু বচন, কেননা ব্রহ্মার মতো এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট বহু "আমি" রয়েছে। এটি একটি সরল সত্য।

পিতা পুত্র উৎপাদন করেন এবং পুত্রও অন্য বহু পুত্র উৎপাদন করে, এবং তারা সকলেই মানুষরূপে এক হলেও পুত্র এবং পৌত্ররা পিতা থেকে ভিন্ন। পুত্র এবং পৌত্ররা কখনো পিতার স্থান অধিকার করতে পারে না ; পিতা, পুত্র এবং পৌত্র যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন মানুষরূপে তারা সকলেই এক, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন।

তাই বৈদিক শাস্ত্রে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বা আশ্রয় "আমি" এবং আশ্রিত "আমি"—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বর্ণনা করা হয়েছে আশ্রয় "আমি" আশ্রিত "আমি"কে পোষণ করে, এবং তার ফলে এই দুই "আমি" সত্তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

এই শ্লোকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভগবান এবং ব্রহ্মা উভয়েরই ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অতএব চরমে আশ্রয় তত্ত্ব এবং আশ্রিত তত্ত্ব উভয়েই ব্যক্তি। এই সিদ্ধান্ত নির্বিশেষবাদীদের সিদ্ধান্ত—"চরমে সবকিছুই নিরাকার" এই মতবাদকে খণ্ডন করে। অল্পজ্ঞ নির্বিশেষবাদীদের সিদ্ধান্ত এইভাবে খণ্ডিত হয়েছে যে আশ্রয় তত্ত্ব "আমি" হচ্ছে পরম সত্য এবং তিনি একজন সবিশেষ ব্যক্তি। আশ্রিত তত্ত্ব "আমি" ব্রহ্মাও একজন ব্যক্তি, কিন্তু তিনি পরম পুরুষ নন। নিজেকে চিন্ময় সত্তারূপে উপলব্ধি করার জন্য "আমি চিন্ময় তত্ত্ব" বা "আমি ব্রহ্ম" উপযোগী হতে পারে, কিন্তু আশ্রয় তত্ত্ব এবং আশ্রিত তত্ত্বের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য রয়েছে, যা নির্বিশেষবাদীরা না বুঝতে পারলেও এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্রহ্মা এখানে মুখোমুখি তাঁর পরম

আশ্রয় ভগবানকে দর্শন করছেন, যিনি জড় সৃষ্টির বিনাশের পরেও তাঁর নিত্য চিন্ময়রূপে বিরাজ করেন। ব্রহ্মা ভগবানের যে রূপ দর্শন করেছেন তা ব্রহ্মার সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজমান ছিলেন এবং সমস্ত উপাদান এবং প্রকাশ সেই ভগবানেরই শক্তির বিস্তার। ভগবানের সেই শক্তির প্রদর্শন যখন শেষ হয়ে যায়, তখন যে অবশিষ্ট থাকে তাও সেই পরমেশ্বর ভগবান। অতএব সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয়ের সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের রূপ বর্তমান থাকে। *বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান* ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে বাসুদেব ব্যতীত কেউ ছিলেন না। ব্রহ্মা ছিলেন না, শঙ্কর ছিলেন না। কেবল নারায়ণ ছিলেন এবং অন্য কেউ ছিলেন না, এমনকি ব্রহ্মা এবং ঈশানও নন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকায় প্রতিপন্ন করেছেন যে নারায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি অব্যক্ত থেকে উদ্ভূত। অতএব সৃষ্ট এবং স্রষ্টার মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য রয়েছে, যদিও গুণগতভাবে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট এক।

এই বর্ণনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পরম সত্য হচ্ছেন ভগবান বা পরম ঈশ্বর। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ধাম পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবানের ধাম শূন্য নয় বা রিক্ত নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা মনে করে থাকে। বৈকুণ্ঠলোকসমূহ চিন্ময় বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সেই ধামের চতুর্ভুজ অধিবাসীরা পরম ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধি সহকারে বিরাজ করেন এবং অতি উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের উপযোগী বিমান ইত্যাদি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সেখানে রয়েছে। অতএব পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজ করেন এবং সর্বপ্রকার চিন্ময় বৈচিত্র্য সহ তিনি বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই বৈকুণ্ঠলোককে সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ জড় জগতের প্রলয় হলেও বৈকুণ্ঠলোকের বিনাশ হয় না। সেই সমস্ত চিন্ময় লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, এবং সেই প্রকৃতি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। রাজার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তার রাজ্যের অস্তিত্বও সিদ্ধ হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোকের অস্তিত্বও স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক শাস্ত্রে বহু স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৮/১০) মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করছেন—

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ ॥

কৃপা করে আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বলুন যিনি পরমাত্মারূপেসকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত শক্তির ঈশ্বর হলেও তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বিদুরও প্রশ্ন করেছেন—

তত্ত্বানাং ভগবাংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।
তত্রেমং ক উপাসীরণ্ ক উস্বিদনুশেরতে ॥ (ভাঃ ৩/৭/৩৭)

শ্রীধর স্বামী এর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন, "সৃষ্টি যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় সেই সময় শেষশায়ী ভগবানের সেবা কে করেন ইত্যাদি"। অর্থাৎ, ভগবান তাঁর নাম, যশ, গুণ এবং উপকরণসহ নিত্য বিরাজমান। স্কন্ধ পুরাণের কাশী-খণ্ডের ধ্রুব চরিতে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্বগোঽব্যয়ঃ ॥

মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হলেও পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের বিনাশ হয় না, অতএব ভগবানের কি কথা! ভগবান জড়া প্রকৃতির পরিবর্তনের তিনটি অবস্থাতে সর্বদাই বিদ্যমান থাকেন।

নির্বিশেষবাদীরা বলে যে ভগবান নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ভগবান এবং ব্রহ্মার মধ্যে এখানে যে আলোচনা হয়েছে তাতে ভগবানকে ক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর রূপ ও গুণ রয়েছে। সৃষ্টির পালনের সময় ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের যে কার্যকলাপ তা ভগবানেরই কার্যকলাপ বলে বুঝতে হবে। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানকে সরকারী কার্যালয়ে দেখা নাও যেতে পারে, কেননা তিনি রাজকীয় বিলাসে মগ্ন। কিন্তু তা হলেও সবকিছুই তাঁরই নির্দেশনায় পরিচালিত হয় এবং সবকিছুই তাঁর অধীন।

পরমেশ্বর ভগবান কখনই নিরাকার নন। এই জড় জগতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে তাঁর সবিশেষ রূপ প্রকট না হতে পারে, তাই তাঁকে কখনো কখনো নিরাকার বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর নিত্যরূপে বৈকুণ্ঠলোকে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অবতাররূপে নিত্য প্রকাশিত। রাত্রিবেলায় মানুষ সূর্যকে দেখতে পায় না, কিন্তু যেখানে সূর্যোদয় হয়েছে সেখানে সূর্যকে দেখা যায়। পৃথিবীর বিশেষ কোন স্থানের মানুষ সূর্যকে যদি না দেখতে পায় তার অর্থ এই নয় যে সূর্য নেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১/৪/১) একটি মন্ত্র রয়েছে—*আত্মৈবেদমগ্রাসীৎ পুরুষ-বিধঃ*। এই মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) পুরুষাবতারে আবির্ভাবের পূর্বেও ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৮)উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, এমনকি পুরুষ-অক্ষর এবং পুরুষ-ক্ষরেরও অতীত। অক্ষর-পুরুষ বা মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন এবং তার ফলে সমগ্র জড় জগৎ প্রকাশিত হয়, কিন্তু পুরুষোত্তম তারও পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনা প্রতিপন্ন হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম।

কোন কোন বেদে এও বলা হয়েছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা, তাকে আপাত কারণ বলা যেতে পারে, কিন্তু সর্বকারণের পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। এই জড় জগতেই কেবল ভগবানের নির্বিশেষ রূপের অস্তিত্ব রয়েছে, কেননা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা জড় চক্ষুর দ্বারা

ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না অথবা দর্শন করা যায় না। ভগবানকে দর্শন করতে হলে অথবা উপলব্ধি করতে হলে সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে চিন্ময়ত্ব প্রদান করতে হবে। ভগবান তাঁর স্বরূপে নিত্য লীলা-বিলাস-পরায়ণ, এবং তিনি সাক্ষাৎভাবে বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীদের কাছে নিত্য প্রকাশিত। তাই জড় দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্বিশেষ, ঠিক যেমন সরকারী কার্যালয়ে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বিশেষ হলেও রাজভবনে তিনি নির্বিশেষ নন। তেমনই ভগবান তাঁর ধামে নির্বিশেষ নন, যা সর্বদাই *নিরস্ত কুহকম্*, যা শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব ভগবানের নির্বিশেষ এবং সবিশেষ উভয় রূপকেই স্বীকার করা যায়, যা প্রামাণিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* শ্লোকে (১৪/২৭) ভগবানের সবিশেষত্ব বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অতএব চিন্ময় জ্ঞানের সবচাইতে গুহ্যতম অংশ হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নয়। তাই পরম তত্ত্বের সবিশেষ রূপকে জানাই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, নির্বিশেষ রূপ নয়। পরম তত্ত্বের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি করার ব্যাপারে ঘটের ভিতরের আকাশ এবং ঘটের বাহিরের আকাশের দৃষ্টান্ত উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভগবানের বিভিন্ন অংশ তাদের ভ্রান্ত দাবীর প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবান হয়ে যেতে পারে। এটি হচ্ছে মায়ার চরম ফাঁস। দৈবী মায়ার শেষ ফাঁদ হচ্ছে ভগবানের আমিত্বে একাকার হয়ে যাওয়ার বাসনা। ভগবানের নির্বিশেষ অস্তিত্বেও, যা জড় সৃষ্টিতে প্রকাশিত, সকলের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সবিশেষ উপলব্ধির প্রচেষ্টা করা, এবং সেটি হচ্ছে *পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্*-এর অর্থ।

নারদকে উপদেশ দেওয়ার সময় ব্রহ্মাজীও সেই সত্যকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ (ভাঃ ২/৭/৫০)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ব্যতীত সর্বকারণের আর কোন কারণ নেই। তাই এইশ্লোকে *অহমেব* শব্দটি কখনোই পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুর ইঙ্গিত করে না, এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পন্থা অনুসরণ করা। অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস আদি গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারা অনুসরণ করা, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্থির করা। শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের এই অতি গোপনীয় উপদেশ ভগবান অর্জুনকেও দিয়েছিলেন, এবং সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকেও দিয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতারা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য ভগবানের বিভিন্ন রূপ। সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান এবং বিভিন্ন শক্তি ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ হলেও তাদের মূল উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে শাখা-প্রশাখার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে বৃক্ষের মূলের প্রতি আসক্ত হওয়া। এই শ্লোকে সেই উপদেশই দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৩৪ ॥

ঋতে—বিনা; **অর্থম্**—মূল্য; **যৎ**—যা; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **ন**—না; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **চ**—এবং; **আত্মনি**—আমার সম্পর্কে; **তৎ**—তা; **বিদ্যাৎ**—তোমার জানা অবশ্য কর্তব্য; **আত্মনঃ**—আমার; **মায়াম্**—মায়া; **যথা**—যেমন; **আভাসঃ**—প্রতিবিম্ব; **যথা**—যেমন; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা! আমার সঙ্গে সম্পর্করহিত যদি কোন কিছু অর্থপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে তার কোন বাস্তবতা নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনো, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যে নির্ণীত হয়েছে যে সৃষ্টির প্রতিটি স্তরেই—উৎপত্তি, পালন, বৃদ্ধি, বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া, ক্ষয় এবং ধ্বংস সবই ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং যখন ভগবানের সঙ্গে এই মূল সম্পর্কের বিস্মৃতি হয় এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্করহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাস্তব বলে মনে করা হয়, তা হচ্ছে ভগবানের মায়া।

যেহেতু ভগবান ব্যতীত কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই জানতে হবে যে মায়াও ভগবানের শক্তি। প্রত্যেক বস্তুকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত করার যথার্থ সিদ্ধান্তকে বলা হয় যোগমায়া বা যুক্ত করার শক্তি, এবং ভগবানের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করার ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় ভগবানের দৈবী মায়া বা মহামায়া। উভয় মায়াই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কেননা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ভ্রান্ত ধারণা মিথ্যা নয়, কিন্তু মায়িক।

কোন বস্তুকে অন্য বস্তু বলে মনে করাকে বলা হয় ভ্রম। যেমন রজ্জুকে সর্প বলে মনে করা ভ্রম, কিন্তু রজ্জু মিথ্যা নয়। ভ্রমাচ্ছন্ন ব্যক্তির সম্মুখস্থ রজ্জুটি মিথ্যা নয়, কিন্তু তার সম্পর্কীয় ধারণাটি ভ্রান্ত। তেমনই জড় সৃষ্টিকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বলে মনে করার ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে মায়া, কিন্তু তা বলে তা মিথ্যা নয়। এই ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় অজ্ঞানের অন্ধকারে বাস্তবের প্রতিবিম্ব। ভগবান বলেছেন যা কিছু আমার শক্তিসম্ভূত নয় বলে প্রতীত হয়, তাকে বলা হয় মায়া। জীবকে অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার বলে মনে করার ধারণাও মায়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/১২) ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে সেই রণক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান সমস্ত যোদ্ধাগণ, অর্জুন স্বয়ং এবং ভগবান স্বয়ং পূর্বে ছিলেন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁরা বর্তমান এবং তাঁদের বর্তমান শরীর ধ্বংস হলেও, এমনকি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেও, তাঁদের সকলেরই অস্তিত্ব থাকবে। সর্বাবস্থাতেই ভগবান এবং জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং ভগবান এবং জীব উভয়েরই স্বরূপ কখনও ধ্বংস হয় না; কেবল ভগবানের কৃপায় মায়ার প্রভাব বা অন্ধকারে আলোকের প্রতিবিম্ব অপসারিত হতে পারে।

জড় জগতে সূর্যের আলোক স্বতন্ত্র নয়, তেমনই চন্দ্রের কিরণও নয়। আলোকের প্রকৃত উৎস হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, যা ভগবানের অপ্রাকৃত দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। সেই রশ্মিচ্ছটা বিভিন্ন জ্যোতির্ময় বস্তুতে প্রতিফলিত হয়—সূর্যের কিরণরূপে, চন্দ্রের আলোকরূপে, অগ্নির জ্যোতিতে অথবা বিদ্যুতের প্রকাশে। অতএব আত্মাকে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বলে মনে করাও মায়া। এই মায়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির চরম প্রকাশ হচ্ছে নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করা, অথবা *"অহং ব্রহ্মাস্মি"*—এর ভ্রান্ত ধারণা।

বেদান্ত-সূত্রের শুরুতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে সবকিছু পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকেও সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, যে সমস্ত স্বতন্ত্র জীবের সৃষ্টি হয়েছে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি থেকে। ব্রহ্মাও ভগবানের শক্তিজাত, এবং অন্য সমস্ত জীবেরাও ব্রহ্মার মাধ্যমে ভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কারোরই কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

প্রতিটি জীবের যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা বাস্তবিক স্বাতন্ত্র্য নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের প্রতিবিম্ব। বদ্ধ জীবের পরম স্বতন্ত্র হওয়ার ভ্রান্ত দাবী হচ্ছে মায়া,এবং এই শ্লোকে সেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হয়েছে।

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা মায়াচ্ছন্ন হয়, এবং তাই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দেহতত্ত্ববিদ্, দার্শনিকেরা সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রতিবিম্বিত আলোকের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনাপ্রসূত মতবাদ উপস্থাপন করে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। চিকিৎসকেরা দেহের অতীত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তারা কখনো কোন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না, যদিও মৃত্যুর পরেও দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্তমান থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের গঠনমূলক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং তারা মনে করে যে মস্তিষ্কের পিণ্ডটি হচ্ছে মনের কার্যকলাপের যন্ত্র, কিন্তু কোন মৃতদেহে তারা মনের কার্যকলাপ ফিরিয়ে আনতে পারে না।

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্করহিত জড় সৃষ্টির অথবা জড় দেহের এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কেবল প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিমত্তার কসরত মাত্র, কিন্তু চরমে তা সবই ভ্রান্ত। জড়

সভ্যতার এই প্রকার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতি হচ্ছে মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির ক্রিয়া।

মায়ার দুই প্রকার শক্তি রয়েছে, যথা আবরণাত্মিকা শক্তি এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির দ্বারা মায়া জীবকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে এবং আবরণাত্মিকা শক্তির দ্বারা মায়া অজ্ঞানের আবরণে জীবের জ্ঞানচক্ষু আচ্ছাদিত করে, যার ফলে তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়, যে ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেছিলেন।

এখানে ব্রহ্মা এবং পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব এক বলে কখনো দাবী করা হয়নি, এবং তাই মূর্খ মানুষদের এই প্রকার ভ্রান্ত দাবী ভগবানের মায়ারই আর একটি প্রকাশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৬/১৮-২০) ভগবান বলেছেন, যে সমস্ত আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা গভীর থেকে গভীরতর অজ্ঞানের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এইভাবে এই প্রকার আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরহিত হয়ে নানা যোনি ভ্রমণ করে।

কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা, স্বয়ং ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মাজীর পরম্পরা ধারায় অথবা ভগবান কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান প্রাপ্ত অর্জুনের পরম্পরা ধারায় জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হন। তাঁরা ভগবানের এই বাণী স্বীকার করেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস এবং সবকিছুই তাঁরই শক্তির আশ্রয়ে আশ্রিত। যে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ তা জানেন তিনি হচ্ছেন প্রকৃতজ্ঞানী এবং তাই তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন।

যদিও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের প্রতিবিম্বক শক্তি নানাপ্রকার ভ্রম উৎপন্ন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্পষ্টভাবে জানেন যে আমাদের দৃষ্টির বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা ক্রিয়া করতে পারেন, ঠিক যেমন বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অগ্নি আলোক এবং তাপ বিকিরণ করে। প্রাচীন ঋষিরা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে বর্ণনা করেছেন—

জগদযোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ।
পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥
অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ।
অকরোদ্বিশ্বমখিলম্ অনিত্যম্ নাটকাকৃতিম্॥

এক পরম পুরুষ রয়েছেন যিনি এই জগতের স্রষ্টা এবং তাঁর শক্তি পরা প্রকৃতির চোখ-ধাঁধানো প্রতিফলন জড়া প্রকৃতিরূপে ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির এই প্রকার মায়িক ক্রিয়ার ফলে অচেতন জড় পদার্থ সক্রিয় হয় ভগবানের জীবশক্তির সহযোগিতায়, এবং

তমসাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই জড় জগৎ একটি নাটকের মতো প্রতিভাত হয়। তাই, মূর্খ ব্যক্তিরা, তা সে বৈজ্ঞানিকই হোক অথবা দেহতত্ত্ববিদই হোক, প্রকৃতির এই নাটককে বাস্তব বলে মনে করে।

কিন্তু প্রকৃতিস্থ মানুষ জানেন যে এই প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের মায়া। এই প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে জীবও ভগবানের পরা প্রকৃতির প্রকাশ, কিন্তু জড় জগৎ হচ্ছে তার অপরা প্রকৃতির প্রদর্শন। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য যদিও অতি অল্প, তথাপি ভগবানের পরা প্রকৃতি ভগবানের সমতুল্য নয়, ঠিক যেমন আগুনের শক্তি তাপ আগুনের সমতুল্য নয়। এই সরল সত্যটি অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বুঝতে পারে না, যারা ভ্রান্তভাবে দাবী করে যে তাপ এবং আগুন এক। আগুনের এই শক্তিকে (যথা তাপ) এখানে প্রতিবিম্ব বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং তা সরাসরিভাবে আগুন নয়।

তাই জীব বা জৈব শক্তি ভগবানের প্রতিবিম্ব এবং তা কখনোই স্বয়ং ভগবান নয়। ভগবানের প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে জীবের অস্তিত্ব পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল, যিনি হচ্ছেন প্রকৃত আলোক। এই জড়া প্রকৃতিকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং এই অন্ধকার জগতে জীবের কার্যকলাপ হচ্ছে সেই প্রকৃত আলোকের প্রতিফলন।

এই শ্লোকের বিষয় বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানকে জানা উচিত। এই উভয় শক্তিই যখন ভগবানের উপর নির্ভর করে না, তখন তা হচ্ছে মায়া। আলোকের প্রতিফলনের দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকারের সমাধান হয় না। তেমনই সাধারণ মানুষ কর্তৃক প্রতিফলিত আলোকের দ্বারা কেউই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না ; তাকে প্রকৃত আলোকের উৎস থেকে আলোকপ্রাপ্ত হতে হয়। অন্ধকারে সূর্যের আলোকের প্রতিফলন অন্ধকার দূর করতে পারে না, কিন্তু সেই প্রতিফলনের পিছনে যে সূর্যের আলোক রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার দূর করতে পারে। অন্ধকারে কেউই কোন কিছু দর্শন করতে পারে না। তাই অন্ধকারে মানুষ সাপ, বিছা ইত্যাদির ভয়ে ভীত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সেখানে নাও থাকতে পারে। কিন্তু আলোকের দ্বারা ঘরের সব কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং সাপ ও বিছার ভয় তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। তাই ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত আলোকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, যা তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদান করেছেন, এবং কখনোই প্রতিবিম্বস্বরূপ ব্যক্তিদের আশ্রয়গ্রহণ করা উচিত নয় যাদের ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যারা ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না তাদের কাছ থেকে কখনোই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা অত্যন্ত হতভাগ্য, এবং যারা তাদের সঙ্গ করে তাদেরও সর্বনাশ হয়।

পদ্ম পুরাণের বর্ণনা অনুসারে, জড় জগতের অসংখ্য জড় ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে (অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত ব্রহ্মা রয়েছে)

একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেছে, এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে হলে তাদের প্রকৃত আলোকের প্রয়োজন, ঠিক যেমন সূর্যের আলোকের দ্বারাই কেবল সূর্যকে দর্শন করা যায়। কোন প্রদীপ বা জড় দীপবর্তিকা, তা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সূর্যকে দর্শন করাতে সাহায্য করতে পারে না। সূর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে।

তাই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া অথবা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানকে, ভগবানের অহৈতুকী করুণার দ্বারা প্রকাশিত আলোকের দ্বারাই কেবল উপলব্ধি করা যায়। নির্বিশেষবাদীরা বলে যে ভগবানকে দেখা যায় না। ভগবানকে ভগবানের আলোকের দ্বারাই দেখা যায়, মানুষের জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে নয়। এখানে এই আলোককে *বিদ্যাৎ* বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের একটি প্রত্যাদেশ। ভগবানের এই প্রত্যক্ষ আদেশটি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, এবং এই বিশেষ শক্তিটি সরাসরিভাবে ভগবানকে দর্শন করার উপায়। কেবল ব্রহ্মাই নন, যিনিই ভগবানের কৃপায় প্রত্যক্ষভাবে এই অন্তরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করেছেন, তিনি কোনপ্রকার মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা ব্যতীতই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ৩৫

যথা মহান্তি ভূতাণি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩৫ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **মহান্তি**—ব্রহ্মাণ্ড; **ভূতাণি**—পঞ্চ মহাভূত; **ভূতেষু-উচ্চ-অবচেষু**—অণু তথা বিরাটে; **অনু**—পরে; **প্রবিষ্টানি**—প্রবিষ্ট হয়ে; **অপ্রবিষ্টানি**—প্রবিষ্ট নয়; **তথা**—তেমন; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **ন**—না; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **অহম্**—আমি স্বয়ং।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা, জেনে রেখ যে মহাভূতসমূহ যেমন উচ্চনীচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনই আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি।

তাৎপর্য

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, জড় জগতের এই মহাভূতসমূহ সমুদ্র, পর্বত, জলচর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, দেবতা এবং জড় জগতের সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত উপাদানগুলি পৃথকভাবে বর্তমান। উন্নত স্তরের চেতনাসম্পন্ন মানুষ দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং ভৌতিক বিজ্ঞান উভয়ই অধ্যয়ন করতে পারে, কিন্তু এই প্রকার বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত জড় উপাদানের অতিরিক্ত আর

কিছু নয়। মানুষের শরীর, পর্বতের শরীর এবং ব্রহ্মা আদি দেবতাদের শরীর, সব কিছুই মাটি, জল ইত্যাদি উপাদানের দ্বারা গঠিত, এবং তা সত্ত্বেও এই সমস্ত উপাদানগুলি দেহের বাইরেও রয়েছে। এই সমস্ত উপাদানগুলি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তাই তারা পরে শরীর গঠনের সময় শরীরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই তারা সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে প্রবিষ্ট হয়ওনি। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জগতের প্রতিটি বস্তুর অন্তরে বিরাজমান, আবার সেই সঙ্গে তিনি সব কিছুর বাইরে, তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠ লোকে নিত্য বিরাজমান, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৭) তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি—
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা সচ্চিদানন্দ শক্তির বিস্তারের দ্বারা বহু রূপে তাঁর অংশ এবং কলায় নিজেকে বিস্তার করে আনন্দ আস্বাদন করেন। গোলোক বৃন্দাবন নামক তাঁর নিত্যধামে নিত্য বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিটি পরমাণুর অন্তরেও বিরাজমান।"

সেই ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৫) তাঁর অংশের বিস্তার অধিক বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর এক অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এইভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টিতে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেছেন।"

নির্বিশেষবাদীরা কল্পনা করতে পারে অথবা অনুভবও করতে পারে যে পরব্রহ্ম এইভাবে সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই তারা সিদ্ধান্ত করে যে তাঁর কোন সবিশেষরূপ থাকা সম্ভব নয়। এটিই ভগবানের দিব্য জ্ঞানের রহস্য। এই রহস্যটি হচ্ছে দিব্য ভগবৎ-প্রেম, এবং যিনি এই দিব্য ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত হয়েছেন, তিনি অনায়াসে প্রতিটি পরমাণুতে এবং স্থাবর অথবা জঙ্গম সমস্ত বস্তুতে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি ভগবানকে তাঁর নিত্যধাম গোলোকে তাঁর চিন্ময় সত্তার বিস্তারস্বরূপ নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করতে দেখতে পান। এই দৃষ্টি দিব্যজ্ঞানের

প্রকৃত রহস্য, যা ভগবান শুরুতে উল্লেখ করেছেন (*সরহস্যং তদঙ্গং চ*)। এই রহস্যটি হচ্ছে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের সবচাইতে গোপনীয় বিষয়, এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের পক্ষে জল্পনা-কল্পনার কসরতের মাধ্যমে তা আবিষ্কার করা কখনোই সম্ভব নয়। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৮) ব্রহ্মাজী যে পন্থা অনুমোদন করেছেন, তার মাধ্যমে সেই রহস্য উন্মোচিত হতে পারে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যাম সুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যাঁকে ভগবৎ-প্রেম-রূপী অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত দৃষ্টিতে শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে দর্শন করতে পারেন। এই গোবিন্দ হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণাবলী সমন্বিত আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্যামসুন্দর।"

তাই যদিও তিনি প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান, শুষ্ক জ্ঞানীরা তাঁকে দর্শন করতে পারে না; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের দৃষ্টিতে সেই রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হয়, কেননা তাঁদের চক্ষু ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা রঞ্জিত। এই ভগবৎ-প্রেম কেবল অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ নয়; তা ভগবদ্ভক্তির পন্থায় পবিত্র। পক্ষান্তরে বলা যায়, জগতের মহাভূতসমূহ যেমন সমস্ত বস্তুর ভিতরে এবং বাইরে উভয় অবস্থাতেই রয়েছে, তেমনই ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ইত্যাদিও শাস্ত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে অথবা জড় সৃষ্টি থেকে বহু বহু দূরে বৈকুণ্ঠলোকে যেভাবে বিরাজ করছে, তা বাস্তবিকভাবে ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। মূর্খ মানুষেরা সে কথা বুঝতে পারে না, যদিও তারা দেখে যে জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে দূরদর্শনের মাধ্যমে দূরের বস্তুকে দর্শন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তির চিন্ময় চেতনা বিকশিত হয়েছে, তিনি তাঁর হৃদয়পটে সর্বদা দূরদর্শনের মতো ভগবদ্ধামের প্রতিফলন দর্শন করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের রহস্য।

ভগবান যে কোন ব্যক্তিকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিদান করতে পারেন, কিন্তু তিনি কদাচিৎ কাউকে ভগবৎ-প্রেম দান করেন। এই সত্য প্রতিপন্ন করে নারদমুনি বলেছেন, "*মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্*"। এই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি এতই অদ্ভুত যে তার বৃত্তি উপযুক্ত ভক্তের মনকে সর্বদা চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন রাখে এবং এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের সংসর্গ থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এইভাবে ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবৎ-প্রেম বিকশিত হয়, তা হচ্ছে এক মহান রহস্য। ব্রহ্মাজী পূর্বে নারদকে বলেছেন যে ব্রহ্মার বাসনা কখনো অপূর্ণ থাকে না, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন; এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত আর অন্য কোন বাসনা নেই। এটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের সৌন্দর্য এবং রহস্য।

ভগবান অচ্যুত বলে তাঁর বাসনাও যেমন অচ্যুত, তেমনই ভগবদ্ভক্তের ভগবানকে সেবা করার অপ্রাকৃত বাসনাও অচ্যুত। কিন্তু তা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা অত্যন্ত কঠিন যদি না সে ভগবদ্ভক্তির রহস্য সম্বন্ধে অবগত হয়; ঠিক যেমন পরশ পাথরের অচিন্ত্য শক্তি সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পরশ পাথর যেমন দুর্লভ, তেমনই ভগবানের শুদ্ধভক্তের দর্শনও দুর্লভ। এমনকি কোটি মুক্তদের মধ্যেও একজন কৃষ্ণভক্ত খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। জ্ঞানের মাধ্যমে যে সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়, ভগবদ্ভক্তি-যোগের সিদ্ধি তার থেকেও শ্রেষ্ঠ, এবং তা অত্যন্ত রহস্যাবৃতও। তা অষ্টাঙ্গযোগের অষ্টসিদ্ধির থেকেও অধিক রহস্যজনক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৪) ভগবান অর্জুনকে এই ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

"পুনরায় তুমি ভগবদ্গীতার সবচাইতে গুহ্যতম তত্ত্ব আমার কাছে শ্রবণ কর।" সেই সত্য প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মাজীও নারদকে বলেছেন—

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু॥

ব্রহ্মাজী নারদকে বললেন, "ভাগবত সম্বন্ধে আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা পরমেশ্বর ভগবান আমার কাছে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি খুব সুন্দরভাবে তা তুমি বিস্তার কর যাতে মানুষ ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে অনায়াসে ভক্তিযোগের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে ভক্তিযোগের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। কেউ যদি দিব্য গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই ভগবান এবং শব্দরূপে তাঁর অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাবেন।

শ্লোক ৩৬

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ৩৬॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; **এব**—নিশ্চয়ই; **জিজ্ঞাস্যম্**—জিজ্ঞাস্য; **তত্ত্ব**—পরম সত্য; **জিজ্ঞাসুনা**—বিদ্যার্থী কর্তৃক; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অন্বয়**—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্যতিরেকাভ্যাম্**—পরোক্ষভাবে; **যৎ**—যা কিছু; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে এবং সর্বকালে; **সর্বদা**—সর্বাবস্থায়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে, তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় এই বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করতে হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যেভাবে ভক্তিযোগের রহস্য উন্মোচনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটিই হচ্ছে সমস্ত জিজ্ঞাসার পরম স্তর অথবা জিজ্ঞাসুর পরম লক্ষ্য। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ আদি বিভিন্ন যোগের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সকলেই আত্ম-উপলব্ধির অন্বেষণ করছে। উন্নত চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে আত্মার রহস্য সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে, জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। কিন্তু এখানে সেই সমস্ত জিজ্ঞাসার পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদান্ত-সূত্রের শুরু হয় জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মাধ্যমে, আর শ্রীমদ্ভাগবত সেই সমস্ত অনুসন্ধানের অথবা সমস্ত জিজ্ঞাসার রহস্যের উত্তর প্রদান করে। ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে পূর্ণরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, এবং এখানে ভগবান *অহমেব* থেকে শুরু করে এই শ্লোকের *এতাবৎ* অবধি চারটি শ্লোকের মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছেন। এটিই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধির সমস্ত পন্থার সমাপ্তি।

অন্ধকারে চোখ ঝলসানো আলোকের প্রতিফলনের ফলে মানুষ জানে না যে জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণু বা পরমেশ্বর ভগবান। সকলেই অসংযত ইন্দ্রিয় কর্তৃক ধাবিত হয়ে জড় অস্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রবেশ করছে। মৈথুন আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক বাসনাপ্রসূত ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের স্পৃহা থেকে সমগ্র জড় জগতের উদ্ভব হয়েছে, এবং তার ফলে জ্ঞানের এত উন্নতি সাধন সত্ত্বেও জীবের সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন।

কিন্তু এখানে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগের বিজ্ঞানে পারদর্শী সদ্গুরুর কাছে অথবা এই জড় জগতে প্রকট ভক্ত-ভাগবতের কাছে প্রশ্ন করার মাধ্যমেএই বিষয় অবগত হওয়া।

সকলেই বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় প্রশ্নের অনুসন্ধান করছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন ঃ কঠোর পরিশ্রম অথবা অধ্যবসায় ব্যতীত জীবনের এই পরম লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যার হৃদয়ে ঐকান্তিকভাবে এই সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মাজীর পরম্পরায় সদ্গুরুর কাছে সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, এবং সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সেই রহস্য ব্রহ্মার কাছে পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশ করেছিলেন, তাই আত্মতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্ন অবশ্যই এই প্রকার গুরু-পরম্পরার ধারায় স্বীকৃত ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ সদ্গুরুর কাছে উপস্থাপন করা উচিত।

এইপ্রকার সদ্গুরু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শাস্ত্রের প্রমাণের মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন। যদিও সকলেই শাস্ত্র আলোচনা করতে পারে, কিন্তু তবুও শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্গুরুর পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে, এবং এই শ্লোকে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। সদ্গুরু হচ্ছেন ভগবানের সবচাইতে অন্তরঙ্গ প্রতিনিধি এবং ব্রহ্মাজী যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেইভাবেই সদ্গুরুর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

গুরু-পরম্পরার ধারায় যে সদ্গুরু, তিনি কখনো নিজেকে ভগবান বলে দাবী করেন না; যদিও এইপ্রকার সদ্গুরু ভগবানের থেকেও মহৎ, কেননা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে ভগবানকে অন্যের কাছে দান করতে সক্ষম। অধ্যয়নের দ্বারা অথবা মেধার দ্বারা কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু সদ্গুরুর মাধ্যমে নিষ্ঠাবান শিষ্য অবশ্যই তাঁকে প্রাপ্ত হন।

সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্র সরাসরিভাবে নির্দেশ দেয়, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন জীবেরা অন্ধকারে চোখ ঝলসানো প্রতিবিম্বের প্রভাবে অন্ধ হয়ে সৎ শাস্ত্রের এই সত্যকে খুঁজে পায় না। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু ব্রহ্মাজী অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রোতা অর্জুনের মতো সদ্গুরু কর্তৃক শিক্ষিত না হওয়ার ফলে বহু অযোগ্য ব্যক্তি তাদের খেয়ালখুশি মতো এই দিব্য জ্ঞানকে বিকৃত করে।

নিঃসন্দেহে চিদাকাশের দিগন্তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে সবচাইতে উজ্জ্বল একটি তারকা, তথাপি এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থটি এমনইভাবে বিকৃত হয়েছে যে তা পাঠ করা সত্ত্বেও তারা সেই জড় জগতের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভগবদ্গীতার জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়নি।

শ্রীমদ্ভাগবতে চারটি মুখ্য শ্লোকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবদ্গীতাতেও প্রকৃতপক্ষে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদের মনগড়া এবং ভ্রান্ত বিশ্লেষণের ফলে মানুষ ভগবদ্গীতার চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (১৮/৬১) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে (পরমাত্মারূপে) বিরাজমান এবং তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে জড় জগতে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং জীব সর্বদাই ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই ভগবদ্গীতাতেই (১৮/৬৫) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে ভগবানের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে—সকলের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে স্মরণ করা, ভগবানের ভক্ত হওয়া, ভগবানের পূজা করা এবং ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা। তারফলে ভগবদ্ভক্ত নিঃসন্দেহে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে সমগ্র মানব সমাজের বৈদিক কাঠামো এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে প্রত্যেকেই ভগবানের পূর্ণ শরীরের বিভিন্ন অংশরূপে সক্রিয় হতে পারে। বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ বা ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মস্তকে অবস্থিত ; শাসক শ্রেণীর মানুষ বা ক্ষত্রিয়েরা ভগবানের বাহুতে অবস্থিত ; উৎপাদক শ্রেণীর মানুষ বা বৈশ্যেরা ভগবানের কটিতে অবস্থিত ; এবং শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ও শূদ্রেরা ভগবানের পায়ে অবস্থিত। তাই সমগ্র সমাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ, এবং সেই দেহের বিভিন্ন অংশগুলি যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র শরীরের সেবা করা ; তা না হলে অংশ পূর্ণ চেতনার সঙ্গে ঐক্য সাধনে অক্ষম হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যৌথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে বিশ্বচেতনা লাভ করা সম্ভব, এবং তার ফলেই কেবল সামগ্রিক পূর্ণতা লাভ করা যায়। তাই মহান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, সমাজসেবী ইত্যাদি কেউই জড় জগতের অশান্ত সমাজে শান্তি আনতে পারে না, কেননা তারা ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণিত সফলতার রহস্য অর্থাৎ ভক্তিযোগের রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৭/১৫) বলা হয়েছে ঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

যেহেতু মানব সমাজের তথাকথিত মহান নেতারা ভক্তিযোগের এই মহান জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে সর্বদাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অপকর্মে লিপ্ত, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্বের অবজ্ঞা করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং কখনই তাঁর শরণাগত হতে চায় না, কেননা তারা দুষ্কৃতকারী, মূঢ় এবং নরাধম।

এই প্রকার ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকেরা জড়জাগতিক বিচারে মহাপণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচাইতে বড় মূর্খ। ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে তাদের তথাকথিত সমস্ত জ্ঞান অজ্ঞানে পর্যবসিত হয়েছে। তাই বর্তমান বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের সর্বপ্রকার প্রগতি পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামরত কুকুর-বিড়ালের মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা অপচয় হচ্ছে। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক উন্নতি, ধর্ম এবং মহান কার্যকলাপের সমস্ত জ্ঞান মৃতদেহ সাজানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূর্খ জনগণের কাছ থেকে ভ্রান্ত প্রশংসা লাভ

করা ছাড়া একটি শবাধার সাজানোর আর কোন উপযোগিতা নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বার বার বলা হয়েছে যে ভক্তিযোগের স্তর লাভ করা ব্যতীত মানব সমাজের সমস্ত কার্যকলাপ কেবল চরম ব্যর্থতা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) বলা হয়েছে—

পরাভবস্তাবদবোধজাতো যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধান সম্পর্কে অন্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ, তা যতই মহৎ হোক না কেন, বিভিন্ন প্রকার পরাজয় মাত্র। কেননা এইপ্রকার অর্থহীন এবং লাভহীন কার্যকলাপ সম্পাদনের মাধ্যমে মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কখনও চরিতার্থ হয় না। মানব শরীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জড়জাগতিক কার্যকলাপে সম্পূর্ণ রূপে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার মন জড় বিষয়ের আবর্তে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং তার ফলে সে জন্ম-জন্মান্তরে জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥

(ভাঃ ৫/৫/৬)

বিভিন্ন প্রকার জড় ক্লেশ ভোগ করার জন্য মন বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে। তাই যতক্ষণ মন সকাম কর্মে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ মন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে এবং এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম লাভ না করা পর্যন্ত সে বার বার বিভিন্ন জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অপ্রাকৃত নাম, গুণ, রূপ এবং লীলায় মগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তিকে পরমতত্ত্ব জ্ঞানে রূপান্তরিত করা, যার ফলে মানুষ পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধ মুক্ত হতে পারে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ তাই *সর্বত্র, সর্বদা* শব্দ দুটির টীকায় লিখেছেন যে ভক্তিযোগ বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সর্বাবস্থায়ই অনুকূল; অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই ভক্তিযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত মহাজনেরা তার অনুশীলন করেছেন, সমস্ত স্থানে তা গুরুত্বপূর্ণ, সমস্ত কার্য এবং কারণে তা উপযোগী ইত্যাদি। সমস্ত শাস্ত্রে ভক্তিযোগের অনুমোদন সম্বন্ধে তিনি স্কন্দপুরাণ থেকে ব্রহ্মানারদ সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন

সংসারেহস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্থিতম ॥

জন্ম-মৃত্যু এবং বিভিন্ন প্রকার উৎকণ্ঠা সমন্বিত ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল এই জড় জগতের মহাবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবান শ্রীবাসুদেবের

অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। এই সত্য সমস্ত শ্রেণীর দার্শনিকেরা স্বীকার করেছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী আরেকটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন যা পদ্মপুরাণ,স্কন্দপুরাণ এবং লিঙ্গপুরাণ এই তিনটি পুরাণে পাওয়া যায়। যথা—

আলোড্য সর্বশাস্ত্রানি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়োনারায়ণঃ সদা।।

"পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করে এবং পুনঃ পুনঃ তাদের বিচার করে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে নারায়ণ হচ্ছেন পরম সত্য এবং সর্বদা তাঁরই ধ্যান করা উচিত এবং আরাধনা করা উচিত।" গরুড় পুরাণেও পরোক্ষভাবে সেই সত্যই বর্ণিত হয়েছেঃ

পারং গতোঽপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ।।

"সমগ্র বেদে পারঙ্গত এবং সর্বশাস্ত্রবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নয়, তাকে পুরুষাধম বলেই জানতে হবে।" তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতেও (৫/১৮/১২) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতোমহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত ভক্তিসম্পন্ন, তাঁর মধ্যে স্বর্গের দেবতাদের সমস্ত সদ্গুণগুলির সমাবেশ হয়। আর পক্ষান্তরে যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের মধ্যে কোনরকম মহৎ গুণ থাকতে পারে না, কেননা তারা সর্বদা মনোরথে আরোহণপূর্বক অজ্ঞানের অন্ধকারে বিচরণ করে এবং সবরকম অনিত্য জড় কার্যকলাপে সর্বদা যুক্ত থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/১৮) বলা হয়েছে—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।

"শব্দব্রহ্ম বেদে পারঙ্গত হয়েও যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে রতিবিশিষ্ট না হয়, তার সমস্ত পরিশ্রম দুগ্ধ প্রদানে অক্ষম গাভী পালনের মতোই ব্যর্থ হয়।"

তেমনই ভগবানের সেবা করার অধিকার সকলেরই রয়েছে, এমনকি স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং অন্য সমস্ত পাপযোনি জীবদেরও রয়েছে।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।।

[ভাঃ ২/৭/৪৬]

ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় পারঙ্গত সদ্‌গুরু কর্তৃক শিক্ষিত হলে সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষও ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন। সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের পক্ষে যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে বৈদিক জ্ঞানে সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট মানুষদের সম্পর্কে আর বলার আছে? অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে, তা সে যেই হোক না কেন। এই ভক্তি সকল প্রকার মানুষদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

তাই সদ্‌গুরুর শিক্ষায় লব্ধ পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত ভগবদ্ভক্তি সকলকেই অনুশীলন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এমনকি যারা মানুষ নয় তাদেরও জন্য। সেকথা প্রতিপন্ন করে গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে—

কীটপক্ষীমৃগানাঞ্চ হরৌ সন্ন্যস্তচেতসাম্।
ঊর্ধ্বামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥

"কীট, পক্ষী এবং পশুরাও পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হলে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে পারে, অতএব মানুষদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তাদের কি কথা?"

তাই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্রের অন্বেষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা সদাচারযুক্ত হোক বা দুরাচারী হোক, তারা জ্ঞানী হোক অথবা মূর্খ হোক, তারা বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হোক অথবা বিরক্ত হোক, তারা মুক্ত হোক অথবা মুক্তিকামী হোক, তারা ভগবদ্ভক্তির সম্পাদনে পারদর্শী হোক অথবা অনভিজ্ঞ হোক, তারা সকলেই উপযুক্ত পরিচালকের পরিচালনায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে পরমপদ প্রাপ্ত হতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩০-৩২) সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

সর্বপ্রকার পাপকার্যে আসক্ত ব্যক্তিও যদি উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁকেও নিঃসন্দেহে একজন সাধু বলে বিবেচনা করতে হবে। এইভাবে যে কোন ব্যক্তি, এমনকি পতিতা স্ত্রী, স্বল্পবুদ্ধি শ্রমিক, স্বল্পবুদ্ধি বৈশ্য অথবা তাদের থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষেরা জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন, যদি তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঐকান্তিক নিষ্ঠাই জীবনের পরম পূর্ণতা লাভের একমাত্র যোগ্যতা, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রকৃত নিষ্ঠার উদয় হয় ততক্ষণ শুচি অথবা অশুচি, জ্ঞান অথবা অজ্ঞানের পার্থক্য থাকে।

আগুন সর্বাবস্থাতেই আগুন, এবং কেউ যদি তা স্পর্শ করে তা সে জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, তা হলে অগ্নি কোনরকম ভেদাভেদ বিচার না করে তার নিজের কাজ করবে। অর্থাৎ— *হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।*

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর ভক্তকে পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত করতে পারেন, যেমন সূর্য শক্তিশালী কিরণের মাধ্যমে সব কিছুকে দূষণমুক্ত করতে পারে। "জড় সুখ উপভোগের আকর্ষণ কখনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে আকর্ষণ করতে পারে না।" শাস্ত্রে শত-সহস্র সূত্র রয়েছে। *আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ* "আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ মহাত্মারাও ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন।" *কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ*— "কেবল বাসুদেবের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমেই তাঁর মহান ভক্তে পরিণত হওয়া যায়।" *ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ*—"যে ব্যক্তি এক পলকের জন্যওভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত হন না, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।" *ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে মৎসেবয়া প্রতীতং তে*— "ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে তাঁরা তাঁর সঙ্গ লাভ করবেন, এবং তার ফলে তাঁরা সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত।" তাই সমস্ত মহাদেশে, সমস্ত লোকে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগ প্রচলিত রয়েছে, এবং সেটিই শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রের বাণী। *সর্বত্র* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির প্রত্যেক অংশেই। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা কেবল মনের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় এক ব্রাহ্মণ কেবল তাঁর মনের দ্বারা ভগবানের সেবা করে ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন।

যে ভক্ত যে কোন একটি ইন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তাঁর সাফল্য অনিবার্য। যে কোন উপচারের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়, এমনকি একটি ফুল, একটি পাতা, একটি ফল অথবা একটু জলের দ্বারাও ভগবানের সেবা করা যায়, যা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে বিনামূল্যে আহরণ করা যায় এবং এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্রহ্মাণ্ডের জীবেরা ভগবানের সেবা করতে পারে। কেবল শ্রবণ করার মাধ্যমে তাঁর সেবা করা যায়, তাঁর লীলা কীর্তন করার মাধ্যমে অথবা পাঠ করার মাধ্যমে তাঁর সেবা করা যায়, অথবা তাঁকে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং তাঁর আরাধনা করার মাধ্যমে তাঁকে সেবা করা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে স্বীয় কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমেও ভগবানের সেবা করা যায়, তা সে যাই করুক না কেন। সাধারণত মানুষ বলতে পারে যে সে যা করছে তা সে ভগবানের প্রেরণার জন্যই করছে, কিন্তু তাই সব কিছু নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবকরূপে ভগবানের উদ্দেশ্যে কার্য করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) ভগবান বলেছেন ঃ

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

তোমার যা করতে ভাল লাগে অথবা যা করা তোমার পক্ষে সহজসাধ্য তাই কর, তুমি যা খেতে চাও খাও, যে যজ্ঞ তোমার ইচ্ছা তা কর, তোমার যা দান করতে ইচ্ছা তা-ই দান কর এবং যে তপস্যা তোমার ইচ্ছা তা কর, কিন্তু সব কিছুই কেবল ভগবানেরই জন্য করতে হবে। তুমি যদি ব্যবসা কর অথরা চাকুরী কর তবে তা ভগবানের জন্য কর। তুমি যা খেতে চাও, তা ভগবানকে নিবেদন করতে পার এবং নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে তিনি তা ভোজন করার পর তোমাকে তা প্রসাদ রূপে ফিরিয়ে দেবেন। তিনি পরম পূর্ণ তাই ভক্ত তাঁকে যা অর্পণ করেন তা তিনি ভক্তের প্রেমের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করেন, কিন্তু পুনরায় তা তিনি তাঁর প্রসাদ রূপে ভক্তের কাছে ফিরিয়ে দেন। যাতে ভক্ত তা খেয়ে তৃপ্ত হতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবানের সেবক হও এবং তার ফলে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন কর, এবং চরমে তোমার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাও। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু ।
নূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমুচ্যতম্ ॥

"আমি অচ্যুত ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, কেননা কেবল তাঁকেই স্মরণ করার ফলে অথবা তাঁর দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে সমস্ত তপস্যা, যজ্ঞ অথবা সকাম কর্মের সম্পূর্ণতা লাভ করা যায় এবং এই পন্থা সর্বত্র পালন করা যায়।" শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) আরও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"কোন ব্যক্তি সর্বপ্রকার কামনাযুক্ত হতে পারেন অথবা সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য এই অচ্যুত ভক্তিযোগের পন্থা অনুসরণ করতে পারেন।" প্রত্যেক দেবদেবীকে প্রসন্ন করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তাঁদের সকলেরই মূল হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন গাছের প্রতিটি ডালপালা এমনকি পাতার পুষ্টিসাধন হয়, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ফলে কোনরকম পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই সমস্ত দেবদেবীর সেবা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। ভগবান সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই তাঁর সেবাও সর্বব্যাপ্ত। সেই তথ্য সমর্থন করে স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

অর্চিতে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধরে ।
অর্চিতাঃ সর্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্বগতো হরিঃ ॥

যখন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা হয়, তখন আপনা থেকেই অন্য সমস্ত দেবতাদের পূজাও সম্পন্ন হয়ে থাকে, কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সর্বব্যাপ্ত। তাই সর্বক্ষেত্রেই, যথা কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ এবং

সমর্থক, সকলেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ফলে লাভবান হন। অর্থাৎ যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, আরাধ্য ভগবান, আরাধনার উদ্দেশ্য, আরাধনার উপকরণের উৎস, আরাধনার স্থান ইত্যাদি সব কিছুই লাভান্বিত হয়।

এমনকি জড় জগতের প্রলয়ের সময়ও ভক্তিযোগের পন্থা প্রয়োগ করা যেতে পারে। *কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ম্*—প্রলয়ের সময় ভগবানের আরাধনা করা হয়, কেননা তিনি বেদসমূহকে রক্ষা করেন। প্রত্যেক যুগে তাঁর আরাধনা করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫২) বলা হয়েছে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

সহানিস্তন্ মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥

"এক পলকের জন্যও যদি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে স্মরণ না করা হয়, তা হলে সবচাইতে বড় ক্ষতি হয়, কেননা সেটিই হচ্ছে সবচাইতে বড় ভ্রম এবং সবচাইতে বড় বিড়ম্বনা।" জীবনের সমস্ত অবস্থায় ভগবানের আরাধনা করা যায়। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ মাতৃজঠরে অবস্থানকালে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ; শৈশবে, পাঁচবছর বয়সে ধ্রুব মহারাজ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ; পূর্ণযৌবনে মহারাজ অম্বরীষ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ; এবং নৈরাশ্যের চরম অবস্থায় বার্ধক্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। অজামিল দেহত্যাগের সময় ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং চিত্রকেতু স্বর্গে এবং নরকে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। নৃসিংহপুরাণে বলা হয়েছে যে নারকিরা যখন ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে শুরু করে, তখন তারা নরক থেকে স্বর্গ অভিমুখে উন্নীত হতে থাকে। দুর্বাসা মুনিও তার সমর্থনে বলেছেন—*মুচ্যেত যন্নাম্ন্যদিতে নারকোঽপি*। "কেবলমাত্র ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে নারকিরাও নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে।" তাই শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তস্বরূপ পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন ঃ

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

"হে রাজন্! চরমে বিবেচনা করা হয়েছে যে সন্ন্যাসী, যোগী এবং সকাম কর্মী আদি সকলেরই বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্য নির্ভয়ে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত।" (ভাঃ ২/১/১১)।

তেমনই, শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে—(১) সমস্ত বেদ

এবং সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হয়, তা হলে তাকে নরাধম বলে বিবেচনা করা হয়।

(২) গরুড় পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, এবং পদ্ম পুরাণে এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে—ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তির বৈদিক জ্ঞান এবং তপশ্চর্যার কি প্রয়োজন?

(৩) একজন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে কি হাজার হাজার প্রজাপতিরও তুলনা করা যায়?

(৪) শুকদেব গোস্বামী বলেছেন (*ভাঃ ২/৪/১৭*) যে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া ব্যতীত তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবিদ্ ও অন্য যে কোন সদাচারী ব্যক্তি তাদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারে না।

(৫) স্বর্গে থেকেও মহিমান্বিত স্থানে যদি বৈকুণ্ঠনাথ পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মহিমা কীর্তন না হয়, তা হলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য।

(৬) ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য পাঁচ প্রকার মুক্তি গ্রহণ করেন না।

তাই চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে সর্বদা এবং সর্বত্র ভগবানের মহিমা কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা উচিত, কীর্তন করা উচিত এবং স্মরণ করা উচিত, কেননা সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। সকাম কর্ম কেবল ভোগ্য শরীর পর্যন্ত সীমিত; যোগ কেবল সিদ্ধি পর্যন্ত সীমিত; শুষ্ক দর্শন কেবল দিব্য জ্ঞানের উপলব্ধি পর্যন্ত সীমিত; এবং দিব্যজ্ঞান মুক্তিলাভ পর্যন্ত সীমিত। যদি এই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তবুও সেই মার্গে ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দিব্য-ভগবদ্ভক্তিতে কোন সীমা নেই এবং অধঃপতনেরও ভয় নেই। সেই পন্থা ভগবানের কৃপায় আপনা থেকেই চরম স্তরে পৌঁছে দেয়। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে আপাত দৃষ্টিতে জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে, কিন্তু উন্নত স্তরে এই প্রকার জ্ঞানের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাই ভক্তিযোগ বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থাই হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সর্বোত্তম তথা নিশ্চিত পন্থা।

কখনও কখনও নির্বিশেষবাদীরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি শ্লোক নিষ্পেষণ করে বা নিঙড়ে তাদের মতবাদের অনুকূল ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিৎ যে এই চারটি শ্লোক ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, এবং তাই ভগবান সম্বন্ধে কোনরকম জ্ঞানবিহীন যে নির্বিশেষবাদী, তাদের এখানে প্রবেশ করার কোনই সম্ভাবনা নেই। তাই নির্বিশেষবাদীরা সেগুলি নিঙড়ে যে অর্থই বার করুক না কেন, তাদের সেই ব্যাখ্যা কখনই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পরম্পরায় দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত হবে না। আর তা ছাড়া শ্রুতিতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান কখনও নিজেকে জ্ঞানমদে মত্ত ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেন না। শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (*কঠোপনিষদ ১/২/২৩*)

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।

ভগবান স্বয়ং সব কিছু বিশ্লেষণ করেছেন, এবং যারা ভগবানের সবিশেষ রূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, তারা গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-ভাগবত কর্তৃক শিক্ষিত না হয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৩৭

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥ ৩৭॥

এতৎ—এই ; **মতম্**—সিদ্ধান্ত ; **সমাতিষ্ঠ**—স্থির থাকে ; **পরমেণ**—পরম কর্তৃক ; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা ; **ভবান্**—তুমি ; **কল্প**—অন্তর্বর্তী প্রলয়ে ; **বিকল্পেষু**—অন্তিম প্রলয়ে ; **ন বিমুহ্যতি**—বিমোহিত হবে না ; **কর্হিচিৎ**—কোন কিছু।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা! তুমি একাগ্র চিত্তে আমার এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ কর, তা হলে কল্পে ও বিকল্পে কোনরকম অহঙ্কার তোমাকে বিচলিত করবে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত গীতার সারাংশ চারটি শ্লোকে, যথা—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ* ইত্যাদিতে প্রদান করেছেন। তেমনই সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সারাংশ চারটি শ্লোকে যথা—*অহমেবাসমেবাগ্রে* ইত্যাদিতে প্রদান করেছেন। এইভাবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভাগবত-সিদ্ধান্তের গুহ্যতম উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদি বক্তা যিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও আদি বক্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়েছে। বহু বৈয়াকরণিক অভক্ত এবং তার্কিক শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি শ্লোকের কদর্থ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়েছেন তিনি যে স্থির সিদ্ধান্ত তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বিচলিত না হতে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সারমর্ম চারটি শ্লোকে ভগবান শিক্ষা দিয়েছেন এবং ব্রহ্মা সেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। নির্বিশেষবাদীদের শব্দ বিন্যাসের দ্বারা *অহম্* শব্দের ভ্রান্ত বিশ্লেষণ যেন কখনও শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্ঠাবান অনুগামীর মনকে বিচলিত না করে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের বিষয়ে পাঠ, এবং এটি তাঁর অনন্য ভক্তদের, যাঁদের ভাগবত বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাঁদের পাঠ্য ; ভগবদ্ভক্তির এই গুহ্যতম শাস্ত্রে অন্য কারো প্রবেশের অধিকার নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, সেই নির্বিশেষবাদীরা কখনো কখনো ব্যাকরণ এবং শুষ্ক অনুমানের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। তাই ভগবান ব্রহ্মাকে (এবং ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের

সমস্ত ভবিষ্যৎ ভক্তদের) সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা যেন কখনো অল্পজ্ঞ বৈয়াকরণিক এবং তার্কিকদের সিদ্ধান্তের দ্বারা বিচলিত না হয় এবং গুরুপরম্পরার মাধ্যমে মনকে যথাযথভাবে সর্বদা একাত্ম করে রাখে। জড় জ্ঞানের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের নতুন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয় এবং তাই এই জ্ঞান আহরণ করার প্রথম পন্থা হচ্ছে পরম্পরার ধারায় ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া। কখনো অপূর্ণ জড় জ্ঞানের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ বার করা উচিত নয়। সদ্‌গুরু প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে শিষ্যকে যথার্থ পন্থায় শিক্ষা দান করতে সক্ষম। তিনি কখনো শিষ্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাক্য বিন্যাস করার চেষ্টা করেন না। সদ্‌গুরু তাঁর স্বীয় আচরণের মাধ্যমে শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব শিক্ষা দেন। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের সেবা ব্যতীত, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জন্ম-জন্মান্তর ধরে প্রচেষ্টা করলেও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সৎ শাস্ত্র কর্তৃক সমর্থিত সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করে চললে শিষ্য পূর্ণজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হবে, যা প্রদর্শিত হবে জড়বিষয় ভোগের প্রতি বিরক্তির মাধ্যমে। জড়বাদীরা ভগবদ্ভক্তের বৈরাগ্য দর্শন করে বিস্মিত হয় এবং তাই তাদের কাছে ভগবদুপলব্ধির প্রয়াস রহস্যময় বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের প্রতি বিরক্তিকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত* অবস্থা। এটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির (পরাভক্তির) প্রাথমিক স্তর। *ব্রহ্মভূত-স্তরের* আরেকটি নাম হচ্ছে *আত্মারাম-স্তর,* যে স্তরে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোনরকম আকাঙ্ক্ষা তখন আর থাকে না। এই সম্পূর্ণ প্রসন্নতার স্তর পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার আদর্শ অবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

এই আত্মারাম স্থিতি, যা ভক্তির অনুশীলনের ফলস্বরূপ জড় ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রতি পূর্ণ বিরক্তির দ্বারা প্রকট হয়, সেই স্তরে মানুষ ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

এই পূর্ণ প্রসন্নতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি বিরক্তির স্তরে মানুষ গূঢ় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং এই জ্ঞান জাগতিক বিদ্যা বা জল্পনা-কল্পনার উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মা যেহেতু সেই জ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তাই ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত এই উপদেশ জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত যে কোন ভক্তের জন্যই সুলভ, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/১০) উল্লেখ করা হয়েছে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

যে সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, ভগবান তাঁদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করেন, যাতে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে যথাযথভাবে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি শ্লোকের মর্ম জল্পনা-কল্পনা করার মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধে পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, ঠিক যেমন ব্রহ্মাজী করেছিলেন। এই বৈকুণ্ঠ উপলব্ধি ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত যে কোন ভগবদ্ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

গোপাল-তাপনী উপনিষদে (শ্রুতি) বর্ণনা করা হয়েছে, *গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদ্ আবির্বভুব*—ভগবান ব্রহ্মার সম্মুখে এক গোপবালকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অর্থাৎ আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, যার বর্ণনা ব্রহ্মাজী ব্রহ্ম সংহিতায় (৫/২৯) বর্ণনা করেছেন ঃ

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মাজী গোলোক বৃন্দাবন নামক বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করতে চেয়েছিলেন। সেই গোলোক বৃন্দাবনে তিনি সুরভী গাভীদের পালন করেন, এবং সেখানেই তিনি শত সহস্র লক্ষ্মীগণ (গোপীগণ) কর্তৃক প্রীতি ও সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং*)। সেকথাও এই বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ; নারায়ণ অথবা পুরুষাবতার নন, যাঁরা হচ্ছেন তাঁর অংশ এবং কলা। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় ভাবিত হওয়া। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের প্রকাশ, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও ঠিক তাই। এইভাবে স্থির নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, যাঁর মাধ্যমে ভগবান এবং তাঁর ধাম পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ৩৮

শ্রীশুক উবাচ

সম্প্রদিশ্যৈবমজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্।
পশ্যতস্তস্য তদ্রূপমাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সম্প্রদিশ্য**—ব্রহ্মাজীকে পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **অজনো**—পরমেশ্বর ভগবান; **জনানাং**—জীবদের; **পরমেষ্ঠিনম্**—প্রধান নায়ক ব্রহ্মাকে; **পশ্যতঃ**—দর্শন করার সময়; **তস্য**—তাঁর; **তৎ-রূপম্**—সেই অপ্রাকৃত রূপ; **আত্মনঃ**—নিজের; **ন্যরুণৎ**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি লোকসমূহের পরম আধিপত্যে স্থিত ব্রহ্মাকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে তাঁর সামনে থেকে তাঁর সেই অপ্রাকৃত রূপ অন্তর্হিত করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন *অজনঃ* অর্থাৎ পরম পুরুষ, এবং তিনি তাঁর অপ্রাকৃত রূপ (*আত্মনো রূপম্*) শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বরূপ চতুঃশ্লোক উপদেশ দেওয়ার সময় ব্রহ্মাজীকে প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি সমস্ত জীবেদের মধ্যে (*জনানাম্*) পরমপুরুষ (*অজনঃ*)। সমস্ত জীবেরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ, এবং তাদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ, যে সম্বন্ধে শ্রুতি মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। তাই চিজ্জগতে জড় জগতের মতো নির্বিশেষ রূপের কোন অবকাশ নেই। যেখানেই চেতনা বা জ্ঞান রয়েছে, সেখানে সবিশেষ রূপ থাকতে বাধ্য। চিজ্জগতে সব কিছুই পূর্ণ জ্ঞানময়, এবং তাই সেখানকার ভূমি, জল, বৃক্ষ, পর্বত, নদী, মানুষ, পশু-পক্ষী সব কিছুই এক গুণসম্পন্ন, অর্থাৎ চিন্ময়, এবং তাই সেখানে সব কিছুই সবিশেষ এবং স্বতন্ত্র সত্তাসমন্বিত। সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের সেই তথ্য প্রদান করে, এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাজীকে প্রদান করেছিলেন, যাতে সমস্ত জীবের পরম নেতারূপে ব্রহ্মা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভক্তিযোগের পরম তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য তা প্রচার করতে পারেন। ব্রহ্মাজী তাঁর প্রিয় পুত্র নারদকে শ্রীমদ্ভাগবতের এই জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন এবং নারদ তা ব্যাসদেবকে দান করেছিলেন, ব্যাসদেব তা শুকদেব গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীর মহানুভবতার ফলে এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃপায় আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সমন্বিত এই শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রাপ্ত হয়েছি।

শ্লোক ৩৯

অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ।
সর্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জেদং স পূর্ববৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্তর্হিত—অন্তর্ধানের পর ; **ইন্দ্রিয়ার্থায়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবানকে ; **হরয়ে**—ভগবানকে ; **বিহিতাঞ্জলি**—অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ; **সর্বভূত**—সমস্ত জীব ; **ময়ঃ**—পূর্ণ ; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন ; **ইদম্**—এই ; **স**— তিনি (ব্রহ্মাজী) ; **পূর্ববৎ**—ঠিক পূর্বের মতো।

অনুবাদ

ভক্তদের দিব্য আনন্দ প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলে সর্বভূতময় সেই ব্রহ্মা তাঁর উদ্দেশ্যে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে পূর্বপূর্ব কল্পের মতো এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা প্রদানকারী। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রতিবিম্বে মোহিত হয়ে জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ইন্দ্রিয়ের উপাসনা করে।

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩/২) নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥

"হে ভগবদ্ভক্ত! কেবল আপনাকে দর্শন করার ফলে চক্ষু সার্থক হয়। আপনার দেহ স্পর্শ করার ফলে স্পর্শেন্দ্রিয় সার্থক হয়। আপনার মহিমা কীর্তন করার ফল জিহ্বা সার্থক হয়, কেননা এই জগতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।"

প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তের সেবা করার জন্য জীবদেহের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতি কর্তৃক মোহিত হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই সমগ্র ভগবদ্ভক্তির পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিকৃত কার্যকলাপ সংশোধন করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় তাদের যুক্ত করা। ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। এইভাবে এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার সাধিত হয় ভগবানের ইচ্ছার মাধ্যমে। বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই জগতের সৃষ্টি হয়, এবং ব্রহ্মাজী, নারদজী, ব্যাসজী প্রমুখ সেবকেরা ভগবানের সেই উদ্দেশ্য সাধনের কার্যে লিপ্ত হন। তাঁরা বদ্ধ জীবদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত স্বরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

নির্বিশেষবাদীরা তা না করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিকৃত কার্যকলাপের সংশোধন না করার পরিবর্তে বদ্ধ জীবদের ইন্দ্রিয়-বিহীন করার চেষ্টা করে এবং প্রচার করে যে

ভগবানও ইন্দ্রিয়বিহীন। বদ্ধ জীবদেহের রোগ নিরাময়ের এটি এক প্রকার ভ্রান্ত চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের রোগগ্রস্ত অবস্থার নিরাময় করার মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা উচিত, ইন্দ্রিয়সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করার মাধ্যমে নয়। যখন চোখের কোন রোগ হয়, তখন সেই রোগের চিকিৎসা করা হয় যাতে চোখ আবার যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে। চক্ষু উপড়ে ফেলা কোন চিকিৎসা নয়। তেমনই, ভবরোগের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, এবং সেই রোগমুক্তির উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে পুনরায় ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা, তাঁর মহিমা কীর্তন করা এবং সর্বতোভাবে তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য কর্ম করা। এইভাবে ব্রহ্মাজী পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের সূচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

প্রজাপতির্ধর্মপতিরেকদা নিয়মান্ যমান্।
ভদ্রং প্রজানামন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠৎ স্বার্থকাম্যয়া ॥ ৪০ ॥

প্রজাপতিঃ—সমস্ত জীবের পূর্বপুরুষ; **ধর্মপতিঃ**—ধর্মের পিতা; **একদা**—কোন এক সময়ে; **নিয়মান্**—বিধিবিধান; **যমান্**—সংযমের নিয়ম; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **প্রজানাম্**—জীবেদের; **অন্বিচ্ছন্**—কামনা করে; **আতিষ্ঠৎ**—স্থিত; **স্ব-অর্থ**—নিজের প্রয়োজনে; **কাম্যয়া**—কামনা করে।

অনুবাদ

একদা প্রজাপতি এবং ধর্মপতি ব্রহ্মা সমস্ত জীবের মঙ্গল কামনা করে এবং নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য বিধিপূর্বক যম-নিয়মসমূহ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিধি-নিষেধের অনুষ্ঠান না করে কেউ কখনো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অসংযত জীবন পশুজীবন এবং ব্রহ্মা তাঁর বংশধরদের উন্নততর কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ভগবানের দাসরূপে সকলের কল্যাণ কামনা করেছিলেন। কেউ যদি তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং বংশধরদের কল্যাণ কামনা করেন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই নৈতিক এবং ধার্মিক জীবন যাপন করতে হয়। সর্বোত্তম নৈতিক জীবন হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। পক্ষান্তরে যিনি ভগবানের ভক্ত নন, তিনি জড় জগতের বিচারে যতই গুণসম্পন্ন হন না কেন, তাঁর মধ্যে কোন সদ্‌গুণ থাকতে পারে না। ব্রহ্মা এবং গুরু-পরম্পরার ধারায় সমস্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা স্বয়ং আচরণ না করে তাঁদের অধস্তনদের কোনরকম নির্দেশ দেন না।

শ্লোক ৪১

**তং নারদঃ প্রিয়তমো রিক্‌থাদানামনুব্রতঃ ।
শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪১ ॥**

তম্—তাঁকে; **নারদঃ**—মহামুনি নারদ; **প্রিয়তমঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **রিক্থ-আদানাম্**—উত্তরাধিকারী পুত্রদের; **অনুব্রতঃ**—অত্যন্ত বাধ্য; **শুশ্রূষমাণঃ**—সর্বদা সেবা করতে প্রস্তুত; **শীলেন**—সৎ আচরণ দ্বারা; **প্রশ্রয়েণ**—বিনয়ের দ্বারা; **দমেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **চ**—ও।

অনুবাদ

ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী পুত্রদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়তম নারদ, যিনি সর্বদা তাঁর সেবায় তৎপর, এবং তাঁর পিতার উপদেশসমূহ সুশীল আচরণ, বিনয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা পালন করতেন।

শ্লোক ৪২

**মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশস্য মহামুনিঃ ।
মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্যতোষয়ৎ ॥ ৪২ ॥**

মায়াম্—শক্তি সমূহ; **বিবিদিষন্**—জানতে ইচ্ছা করে; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়া-ঈশস্য**—সমস্ত শক্তির অধীশ্বরের; **মহামুনিঃ**—মহর্ষি; **মহাভাগবতঃ**—ভগবানের উৎকৃষ্ট ভক্ত; **রাজন্**—হে রাজন; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে; **পর্যতোষয়ৎ**—অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্! মহর্ষি এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ তাঁর পিতাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন এবং মায়েশ্বর বিষ্ণুর সমস্ত শক্তি সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ফলে ব্রহ্মা দক্ষ, চতুঃসন এবং নারদ প্রমুখ বহু বিখ্যাত পুত্রের পিতা। বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগ কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে নারদমুনি তাঁর পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উপাসনা বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর দক্ষ কর্মকাণ্ড এবং সনক, সনাতন আদি চতুঃসনেরা তাঁদের পিতার কাছ থেকে জ্ঞানকাণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে নারদকে তাঁর সদাচার, আজ্ঞাপালন, বিনয় এবং পিতার প্রতি সেবার তৎপরতার জন্য তাঁকে ব্রহ্মার সবচাইতে প্রিয়তম পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ সমস্ত

ঋষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নারদ ভগবানের বহু প্রসিদ্ধ ভক্তের গুরু। তিনি প্রহ্লাদ, ধ্রুব, ব্যাস থেকে শুরু করে বন্য শিকারী কিরাত পর্যন্ত বহু ভক্তের গুরু। তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সকলকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করা। নারদমুনির এই সমস্ত গুণাবলীর জন্য তিনি তাঁর পিতার প্রিয়তম পুত্র, এবং সেই কারণে নারদমুনি হচ্ছেন ভগবানের অতি উৎকৃষ্ট ভক্ত। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই সমস্ত শক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানতে উৎসুক। যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত, এবং তাঁর শক্তিসমূহও অনন্ত। কেউই পূর্ণরূপে তাঁকে জানতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে এবং সরাসরিভাবে ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়ার ফলে ব্রহ্মাজী অবশ্যই এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সকলের থেকে ভগবান সম্বন্ধে অধিক অবগত, যদিও এই জ্ঞান কখনই পূর্ণ হতে পারে না। তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মার শিষ্যপরম্পরায়, যা নারদ থেকে ব্যাস, ব্যাসদেব থেকে শুকদেব গোস্বামী আদি ভক্তের ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, সেই পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত সদ্গুরুর কাছে সেই অনন্ত ভগবান সম্বন্ধে জানবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা।

শ্লোক ৪৩

তুষ্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহম্।
দেবর্ষিঃ পরিপপ্রচ্ছ ভবান্ যন্মানুপৃচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥

তুষ্টম্—সন্তুষ্ট হয়ে ; **নিশাম্য**—দর্শন করে ; **পিতরম্**—পিতাকে ; **লোকানাম্**— সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ; **প্রপিতামহম্**—প্রপিতামহ ; **দেবর্ষিঃ**—দেবর্ষি নারদ ; **পরিপপ্রচ্ছ**— প্রশ্ন করেছিলেন ; **ভবান্**—আপনি ; **যৎ**—যেমন ; **মা**—আমার কাছে ; **অনুপৃচ্ছতি**— প্রশ্ন করছেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ, আপনি এখন আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, দেবর্ষি নারদ লোকসমূহের প্রপিতামহ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন দেখতে পেয়ে সেই সমস্ত প্রশ্নই করেছিলেন।

তাৎপর্য

চিন্ময় বা দিব্যজ্ঞান লাভ করার জন্য তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কাছে প্রশ্ন করার যে বিধি, তা পাঠশালার শিক্ষকের কাছে সাধারণ প্রশ্ন করার মতো নয়। আধুনিক যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কতকগুলি তথ্য প্রদান করার জন্য বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র,

কিন্তু গুরুদেব বেতনভোগী কর্মচারী নন। তিনি যথার্থ অধিকার প্রাপ্ত না হয়ে উপদেশ দান করতে পারেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৩৪) দিব্যজ্ঞান লাভ করার বিধি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

অর্জুন শরণাগতি, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার মাধ্যমে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের কাছে দিব্যজ্ঞান লাভ করার উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দিব্যজ্ঞান লাভ করার পন্থা টাকা ভাঙানোর মতো ব্যাপার নয় ; এই জ্ঞান লাভ করতে হয় সদ্‌গুরুর সেবা করার মাধ্যমে। ব্রহ্মাজী যেমন ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তেমনই সদ্‌গুরুর প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হয়। গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধানই দিব্য জ্ঞান লাভ করার উপায়, পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না। বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩) ঘোষিত হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

পরমেশ্বর ভগবান এবং গুরুদেবে যার অবিচলিত ভক্তি রয়েছে, তার কাছে দিব্যজ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক নিত্য। আজ যে শিষ্য, পরবর্তীকালে সে-ই গুরু হবে, এবং নিষ্ঠা সহকারে গুরুর আদেশ পালন করা ব্যতীত কখনই সদ্‌গুরু হওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের শিষ্যরূপে ব্রহ্মাজী দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তিনি সেই জ্ঞান তাঁর প্রিয় শিষ্য নারদকে প্রদান করেছিলেন। আবার তেমনই নারদ গুরুরূপে সেই জ্ঞান ব্যাসদেবকে দান করেছিলেন। এইভাবে গুরুপরম্পরা ধারায় দিব্যজ্ঞান প্রবাহিত হয়। তাই তথাকথিত ঔপচারিক বা লৌকিক গুরু এবং শিষ্য ব্রহ্মা তথা নারদ এবং ব্যাসদেবের প্রতিরূপ হতে পারে না। ব্রহ্মা এবং নারদের যে সম্পর্ক তা বাস্তব, কিন্তু প্রতারক এবং প্রতারিতের যে তথাকথিত সম্পর্ক তা কেবল লৌকিকতা মাত্র। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নারদমুনি যে কেবল শিষ্ট, বিনীত এবং বাধ্যই ছিলেন তাই নয়, তিনি আত্মসংযমীও ছিলেন। যে আত্মসংযমী নয়, বিশেষ করে যৌন জীবনে, সে কখনও শিষ্য অথবা গুরু হতে পারে না। পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ দমন করার শিক্ষা লাভ করতে হয়। এই বেগগুলি যিনি দমন করেছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী। গোস্বামী না হলে শিষ্য হওয়া যায় না অথবা গুরু হওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম তথাকথিত যে সমস্ত গুরু, তারা সকলেই প্রতারক এবং তাদের শিষ্যরা সকলেই প্রতারিত।

এই জগতের প্রপিতামহদের মতো ব্রহ্মাজীকে একজন মৃত প্রপিতামহ বলে মনে করা উচিত নয়। তিনি প্রাচীনতম বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং তিনি এখনও বর্তমান। নারদ

মুনিও এখনও বর্তমান। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীদের আয়ু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে ব্রহ্মার একদিনের স্থিতিকাল গণনা করা কঠিন।

শ্লোক ৪৪

তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্।
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥ ৪৪ ॥

তস্মৈ—তারপর ; **ইদম্**—এই ; **ভাগবতম্**—ভগবানের মহিমা বা ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ; **পুরাণম্**—পুরাণ ; **দশলক্ষণম্**—দশটি লক্ষণ সমন্বিত ; **প্রোক্তম্**—বর্ণিত হয়েছে ; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক ; **প্রাহ**—বলেছেন ; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে ; **পুত্রায়**—পুত্রকে ; **ভূতকৃৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।

অনুবাদ

এরপর পিতা (ব্রহ্মা) তাঁর পুত্র নারদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দশটি লক্ষণ বিশিষ্ট ভাগবত-পুরাণ উপদেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীমদ্ভাগবত চারটি শ্লোকে উক্ত হয়েছিল, কিন্তু তার দশটি লক্ষণ রয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে। চারটি শ্লোকে প্রথমে বলা হয়েছে যে ভগবান সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, এবং এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হয়েছে *'জন্মাদ্যস্য'* বেদান্ত সূত্রটির দ্বারা। যদিও *জন্মাদ্যস্য* হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু, তথাপি চারটি শ্লোকে বর্ণিত সৃষ্টি থেকে শুরু করে ভগবানের পরম ধাম পর্যন্ত সব কিছুরই মূল হচ্ছেন ভগবান, এবং তাতে দশটি লক্ষণের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভ্রান্তিবশত কখনো মনে করা উচিত নয় যে ভগবান কেবল চারটি শ্লোক বলেছিলেন এবং তাই শ্রীমদ্ভাগবতের অবশিষ্ট ১৭,৯৯৪টি শ্লোক অর্থহীন। যে দশটি লক্ষণের বিশ্লেষণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হবে, সেগুলির যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য বহু শ্লোকের আবশ্যকতা রয়েছে। ব্রহ্মাজীও নারদকে প্রথমে উপদেশ দিয়েছেন তাঁর উপদিষ্ট জ্ঞান বিস্তার করার জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীল রূপ গোস্বামীকে সংক্ষেপে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং শিষ্যরূপে শ্রীল রূপ গোস্বামী তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছেন। সেই বিষয়কে আবার জীব গোস্বামী আরও অধিক বিস্তার করেন এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাপকভাবে বিস্তার করেন। আমরা কেবল সেই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত কোন সাধারণ উপন্যাস বা জড় সাহিত্য নয়। ভাগবতের শক্তি অপার, এবং ভক্ত তাঁর ক্ষমতা অনুসারে যতই বিস্তার করুক না কেন, ভাগবতের

বিস্তারের কখনও সমাপ্তি হবে না। শব্দরূপে ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত চার শ্লোকে বিশ্লেষিত হতে পারে অথবা চার কোটি শ্লোকে বিশ্লেষিত হতে পারে, ঠিক যেমন ভগবান হচ্ছেন পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র এবং অন্তহীন আকাশের থেকেও বৃহৎ। এমনই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের শক্তি।

শ্লোক ৪৫

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ৪৫ ॥

নারদঃ—দেবর্ষি নারদ; **প্রাহ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **মুনয়ে**—মহামুনিকে; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **তটে**—তীরে; **নৃপ**—হে রাজন্; **ধ্যায়তে**—ধ্যানমগ্ন; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **পরমম্**—পরম; **ব্যাসায়**—শ্রীল ব্যাসদেবকে; **অমিত**—অসীম; **তেজসে**—শক্তিমান।

অনুবাদ

হে রাজন্! পরম্পরাক্রমে দেবর্ষি নারদ সরস্বতীর তীরে ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানমগ্ন অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নারদমুনি মহর্ষি ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছেন—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥

"হে মহাভাগ্যবান, পবিত্র দর্শন, তোমার নাম এবং যশ সর্বব্যাপ্ত, এবং নিষ্কলুষ চরিত্র ও অবিচলিত দর্শনের মাধ্যমে তুমি পরম সত্যে স্থিত। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অতুলনীয় কার্যকলাপসম্পন্ন পরমেশ্বর ভগবানের লীলার ধ্যান কর।"

অতএব ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পরম্পরায় ধ্যানযোগের অভ্যাস উপেক্ষা করা হয় না। কিন্তু ভক্তেরা যেহেতু ভক্তিযোগী, তাই তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করার কষ্ট স্বীকার করেন না; পক্ষান্তরে এখানে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তাঁরা *ব্রহ্ম পরমম্* বা পরব্রহ্মের ধ্যান করেন। ব্রহ্মোপলব্ধির শুরু হয় নির্বিশেষ জ্যোতি থেকে, কিন্তু এই ধ্যানের ক্রমোন্নতির ফলে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়; আরো উন্নতির পর পরমেশ্বর ভগবানের

উপলব্ধি হয়। ব্যাসদেবের গুরুরূপে নারদ মুনি ব্যাসদেবের স্থিতি সম্বন্ধে ভাল মতোই অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতির স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন যে তিনি গভীর নিষ্ঠাসহকারে পরম সত্যে স্থিত। নারদমুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের ধ্যান করতে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন লীলাবিলাস নেই, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান লীলাময় এবং তাঁর এই সমস্ত লীলা দিব্য, তাতে জড় গুণের লেশমাত্র নেই। পরব্রহ্মের লীলাসমূহ যদি জড় কার্যকলাপ হত, তা হলে নারদমুনি ব্যাসদেবকে তাঁর ধ্যান করতে উপদেশ দিতেন না। আর পরমব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥
আহুস্তামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য সারাংশ করে বলেছেন, "হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি সচ্চিদানন্দময় শাশ্বত পুরুষ, এবং সেই তত্ত্ব নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসদেব প্রমুখ সমস্ত ঋষিরা প্রতিপন্ন করেছেন, এবং আপনি স্বয়ং এখন তা প্রমাণ করছেন।" (*ভঃ গীঃ* ১০/১২-১৩)

ব্যাসদেব যখন ধ্যানে তাঁর চিত্তকে একাগ্র করেছিলেন, তখন তিনি তা করেছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে এবং তিনি মায়াসহ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ভগবানের মায়াও ভগবানেরইপ্রকাশ কেননা ভগবান ব্যতীত মায়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ঠিক যেমন অন্ধকার আলোক থেকে স্বতন্ত্র নয়। আলোকের অনুভূতি ব্যতীত অন্ধকারের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু এই মায়া ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, তিনি ভগবান থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন (*অপাশ্রয়ম্*)।

তাই ধ্যানের পূর্ণতা হচ্ছে তাঁর লীলাসহ পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে—*ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।*

শ্লোক ৪৬

যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্ ।
যথাসীৎ তদুপাখ্যাস্তে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ৪৬ ॥

যৎ—যা; **উত**—হয়; **অহম্**—আমি; **ত্বয়া**— তোমার দ্বারা; **পৃষ্ঠঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়েছি; **বৈরাজাৎ**—বিরাট রূপ থেকে; **পুরুষাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে;

ইদম্—এই জগৎ ; **যথা**—যেমন ; **আসীৎ**—ছিল ; **তৎ**—তা ; **উপাখ্যাস্তে**—আমি বিশ্লেষণ করব ; **প্রশ্নান্**—সমস্ত প্রশ্ন ; **অন্যান্**—অন্য ; **চ**—ও ; **কৃৎস্নশঃ**—বিস্তারিত ভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন ! ভগবানের বিরাট রূপ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রশ্ন আপনি করেছেন সেগুলির উত্তর আমি পূর্বোক্ত চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা রূপে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে যে এই মহান শাস্ত্রটি হচ্ছে বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল, এবং তাই সৃষ্টি থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ক যতকিছু প্রশ্ন সে সবেরই উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হয়েছে। সেই উত্তরগুলি কেবল নির্ভর করে ব্যাখ্যাকারীর যোগ্যতার উপর। শ্রীমদ্ভাগবতের যে দশটি বিভাগের বিশ্লেষণ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী করেছেন, তাতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে সর্বতোভাবে উপকৃত হতে পারবেন।

ইতি "ভগবানের বাণীর বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন ; **অত্র**—এই শ্রীমদ্ভাগবতে ; **সর্গঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির বর্ণনা ; **বিসর্গঃ**—উপসৃষ্টির বর্ণনা ; **চ**—ও ; **স্থানম্**—লোকসমূহের স্থিতি ; **পোষণম্**—পালন ; **উতয়ঃ**—কর্মবাসনা ; **মন্বন্তর**—মনুগণের পরিবর্তন ; **ঈশানুকথাঃ**—ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ; **নিরোধঃ**—ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া ; **মুক্তিঃ**—মুক্তি ; **আশ্রয়ঃ**—আধার।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্ ।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ২ ॥

দশমস্য—আশ্রয়ের ; **বিশুদ্ধি**—বিশুদ্ধভাবে ; **অর্থম্**—উদ্দেশ্য ; **নবানাম্**—অন্য নয়টির ; **ইহ**—এই শ্রীমদ্ভাগবতে ; **লক্ষণম্**—লক্ষণ ; **বর্ণয়ন্তি**—বর্ণনা করেছেন ; **মহাত্মানঃ**—মহাপুরুষগণ ; **শ্রুতেন**—বৈদিক প্রমাণের দ্বারা ; **অর্থেন**—তাৎপর্যের দ্বারা ; **চ**—এবং ; **অঞ্জসা**—সংক্ষিপ্ত রূপে।

অনুবাদ

দশম তত্ত্বে (আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব নয়টি লক্ষণ মহাত্মারা বৈদিক প্রমাণের দ্বারা, কখনো বা সাক্ষাৎ বিশ্লেষণের দ্বারা, কখনো বা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

ভূত—আকাশ ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **ধিয়াং**—মনের; **জন্ম**—সৃষ্টি; **সর্গ**—প্রকাশ; **উদাহৃতঃ**—সৃষ্টি বলা হয়; **ব্রহ্মণো**—আদিপুরুষ ব্রহ্মার; **গুণবৈষম্যাৎ**—প্রকৃতির তিনটি গুণের পরিণামবশত; **বিসর্গ**—পুনঃ সৃষ্টি; **পৌরুষঃ**—পরিণামস্বরূপ কার্যকলাপ; **স্মৃতঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

ষোড়শ উপাদানের সৃষ্টি যথা—পঞ্চমহাভূত, (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন—এদের বলা হয় সর্গ। আর জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় বিসর্গ।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশটি লক্ষণ বিশ্লেষণ করার জন্য একাদিক্রমে সাতটি শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে। তার প্রথম শ্লোকটিতে অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং মন সহ মাটি, জল ইত্যাদি সৃষ্টির ষোলটি উপাদান বর্ণিত হয়েছে। তাকে বলা হয় সর্গ। বিসর্গ হচ্ছে আদিপুরুষ গোবিন্দের অবতার মহাবিষ্ণুর শক্তি এই ষোলটি তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ার ফল, যা ব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭) পরে বিশ্লেষণ করেছেন—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মহাবিষ্ণু নামক গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, এবং তাঁর প্রতিটি রোমকূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত।

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে উল্লেখ করা হয়েছে *শ্রুতেন* (বা বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে), ভগবানের বিশেষ শক্তির প্রভাবে জড় জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই বৈদিক নির্দেশ

ব্যতীত এই সৃষ্টি জড়া প্রকৃতিজাত বলে মনে হয়। অজ্ঞানতাবশত মানুষ এধরনের সিদ্ধান্ত করে। বেদের নির্দেশ থেকে স্থির নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে সমস্ত শক্তির (যথা অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা) উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, মায়িক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জড়া প্রকৃতি থেকে সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে দিব্যজ্যোতি, আর অবৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে জড় অন্ধকার। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, আর বহিরঙ্গা শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির সংস্পর্শে সজীব হয়। অন্তরঙ্গা শক্তির বিভিন্ন অংশ, যা বহিরঙ্গা শক্তির সংস্পর্শে ক্রিয়া করে, তাকে বলা হয় তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি।

এভাবে সর্গ বা আদি সৃষ্টি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান বা পরব্রহ্ম থেকে হয়, এবং গৌণশক্তি বা বিসর্গ সম্পাদিত হয় ব্রহ্মা কর্তৃক মূল উপাদানগুলির প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ শুরু হয়।

শ্লোক ৪

স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম উতয়ঃ কর্মবাসনাঃ ॥ ৪ ॥

স্থিতিঃ—উপযুক্ত অবস্থা; **বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ**—বৈকুণ্ঠপতির বিজয়; **পোষণম্**—পালন; **তদনুগ্রহঃ**—তাঁর অহৈতুকী কৃপা; **মন্বন্তরাণি**—মনুগণের শাসনকাল; **সদ্ধর্ম**—আদর্শ ধর্ম; **উতয়ঃ**—কর্মপ্রেরণা; **কর্মবাসনাঃ**—সকাম কর্মের আকাঙ্ক্ষা।

অনুবাদ

ভগবানের সৃষ্ট বস্তুসমূহের মর্যাদা পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ, তার নাম 'স্থিতি'; তাঁর ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, এর নাম 'পোষণ'; তাঁর অনুগৃহীত মনুদের ভগবদুপাসনার নির্দেশ স্বরূপ ধর্মই 'সদ্ধর্ম'; এই প্রকাশ ভিত্তিতে যে বহুবিধ কর্মবাসনা, তার নাম 'উতি'।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়, কিছু কালের জন্য পালন হয় এবং অবশেষে ভগবানের ইচ্ছায় তার বিনাশ হয়। সৃষ্টির উপাদানসমূহ এবং উপস্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি হয় বিষ্ণুর প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরুষাবতারদের দ্বারা। প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, এবং দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যাঁর থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পুরুষাবতার হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুতেই বিরাজ করেন এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি পালন করেন। শিব হচ্ছেন ব্রহ্মার অনেক পুত্রদের মধ্যে একজন এবং তিনি জগতের ধ্বংসকার্য সম্পাদন করেন। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের মূল স্রষ্টা হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সৃষ্ট জীবদের পালন করেন। সেই সূত্রে প্রতিটি বদ্ধ

জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের বিজয় স্বীকার করা এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত হয়ে দুঃখময় এবং সংকটময় এই জড় জগতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা। এই জড় জগতকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের স্থান বলে মনে করায় শ্রীবিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত বদ্ধ জীবদের প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি এবং বিনাশের চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন পাতাল লোক পর্যন্ত সব কিছুই বিনাশশীল। বদ্ধ জীবেরা তাদের সৎ এবং অসৎ কর্মের প্রভাবে আধুনিক অন্তরীক্ষ যানের মাধ্যমে বিভিন্ন লোকে বিচরণ করতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যদিও বিভিন্ন লোকে আয়ুষ্কাল ভিন্ন হতে পারে। নিত্য জীবন লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যেখানে এই জড় জগতের মতো পুনর্জন্ম হয় না। বৈকুণ্ঠনাথ ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবেরা এই সরল সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং তাই তারা এই জড় জগতে চিরকাল বসবাসের পরিকল্পনা করে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে তারা প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই যে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেকথা ভুলে গিয়ে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় উন্নতি সাধনের চেষ্টায় যুক্ত হয়। মায়ার প্রভাবে এই বিস্মৃতি এতই প্রবল যে বদ্ধ জীব মোটেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায় না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের কারণে তারা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ হয় এবং শ্রীবিষ্ণুর কাছে ফিরে যাবার অপূর্ব সুযোগ স্বরূপ যে মানব জীবন তা অনর্থক অপচয় করে।

মনুগণকর্তৃক বিভিন্ন যুগ এবং কল্পে যে আদেশাত্মক শাস্ত্র রচিত হয় তাকে বলা হয় সদ্ধর্ম। তা মানুষদের সৎমার্গ প্রদর্শন করে, এবং তাই মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের প্রকৃত কল্যাণ এবং জীবনের সফল সমাপ্তির জন্য এই সমস্ত শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা। এই জগৎ মিথ্যা নয়, তা হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাসনা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কার্যকলাপ তা হচ্ছে আদর্শ মার্গ। যখন এই প্রকার নিয়মিত পন্থা অবলম্বন করা হয়, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর ভক্তদের সর্বতোভাবে পালন করেন, কিন্তু অভক্তেরা তাদের কার্যকলাপের প্রভাবে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এই সম্পর্কে সদ্ধর্ম শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সদ্ধর্ম বা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কর্তব্য সম্পাদন হচ্ছে একমাত্র পুণ্যকর্ম; অন্যেরা পুণ্যবান হওয়ার অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পুণ্যবান নয়। কেবল এই কারণেই ভগবান ভগবদ্গীতায় উপদেশ দিয়েছিলেন তথাকথিত সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হতে এবং তার ফলে ভয়ঙ্কর জড় জাগতিক জীবনের সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে।

সদ্ধর্মে স্থিত হয়ে কর্ম করাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত ;এই অনিত্য জড় জগতে ভালো

বা মন্দ দেহ লাভ করে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হওয়াটা জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। এইটিই হচ্ছে মানবজীবনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, এবং সেই অনুসারে জীবনের কার্যকলাপের আকাঙ্ক্ষা করাই উচিত।

শ্লোক ৫

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥ ৫ ॥

অবতার—ভগবানের অবতার; **অনুচরিতম্**—কার্যকলাপ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চ**—ও; **অস্য**—তাঁর; **অনুবর্তিনাম্**—অনুগামীদের; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ঈশকথাঃ**— ভগবত্তত্ত্ব; **প্রোক্তা**—বলা হয়; **নানা**—বিভিন্ন; **আখ্যান্**—বর্ণনা; **উপবৃংহিতা**—বর্ণিত।

অনুবাদ

শ্রীহরির অবতারসমূহের অনুচরিত্র এবং তাঁর ভক্তদের নানাবিধ উপাখ্যান "ঈশকথা" বলে উক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগতের স্থিতিকালে জীবের কার্যকলাপ লিখে ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তির এবং কালের আখ্যান এবং ইতিহাস জানবার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত তাদের ভগবানের অবতারদের ইতিহাস অধ্যয়ন করার প্রবণতা নেই। সব সময় মনে রাখা উচিত যে জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে বদ্ধ জীবদের মুক্তির জন্য। পরম করুণাময় ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতের বিভিন্ন লোকে অবতরণ করে বদ্ধ জীবদের মুক্তির জন্য লীলাবিলাস করেন। তার ফলে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তা যথার্থই পঠনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান এবং তাঁর মহান ভক্তদের বিষয়ে এই প্রকার দিব্য আখ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভক্ত এবং ভগবানের কাহিনী শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করা উচিত।

শ্লোক ৬

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

নিরোধঃ—জগতের লয়; **অস্য**—তাঁর; **অনুশয়নম্**—পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রায় শয়ন; **আত্মনঃ**—জীবেদের; **সহ**—সহিত; **শক্তিভিঃ**—শক্তিসমূহ; **মুক্তিঃ**—মুক্তি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অন্যথা**—পক্ষান্তরে; **রূপম্**—রূপ; **স্বরূপেন**—স্বরূপে; **ব্যবস্থিতি**—স্থায়ীপদ।

অনুবাদ

মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রার পর উপাধিসহ জীবদের যে শয়ন, তার নাম "নিরোধ" ; মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপ পরিহার করে শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থানের নাম "মুক্তি"।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি যে দুই প্রকার জীব রয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিত্যমুক্ত, আর অন্যরা নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধ জীবদের জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা থাকে, এবং তাই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে নিত্যবদ্ধ জীবদের দুই প্রকার সুবিধা প্রদান করার জন্য। তার একটি হচ্ছে বদ্ধ জীব তার প্রবণতা অনুসারে জড় জগতের উপরে আধিপত্য করার সুযোগ পায়, এবং অন্যটি হচ্ছে বদ্ধ জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। তাই জড় জগতের লয়ের পর অধিকাংশ বদ্ধ জীবই যোগনিদ্রায় শায়িত ভগবান মহাবিষ্ণুতে বিলীন হয়ে যায়, যাতে পরবর্তী সৃষ্টিতে তারা পুনরায় জন্মলাভ করতে পারে। কিন্তু কিছু বদ্ধ জীব বৈদিক শাস্ত্রের দিব্যবাণী অনুসরণ করার ফলে তাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় শরীর পরিত্যাগ করে তাদের স্বরূপগত চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন অবতারে ভগবান কর্তৃক প্রণীত শাস্ত্রের সাহায্যে জড় জগতের বদ্ধ জীব তার স্বরূপে পুনরধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই সমস্ত অপ্রাকৃত শাস্ত্র পাঠ করার ফলে অথবা শ্রবণ করার ফলে জীব জড় জগতে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি, এবং জীব যখন সেই লক্ষ্যে উপনীত হয়, তৎক্ষণাৎ তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি হয়। জড় জগতের বদ্ধ জীবের যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ, তা তার অবিদ্যার ফল এবং যখনই সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এই ভক্তিই হচ্ছে সমস্ত রসের আধার স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দিব্য আকর্ষণ। সকলেই আনন্দ উপভোগ করতে চায়, কিন্তু তারা কেউই সেই আনন্দের পরম উৎসকে জানে না। (*রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি*)। বৈদিক মন্ত্রে সমস্ত আনন্দের পরম উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে ; সমস্ত আনন্দের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের মাধ্যমে যখন কেউ তা জানবার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তিনি চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে তাঁর প্রকৃত স্থিতিতে অবস্থিত হন।

শ্লোক ৭

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥

আভাসঃ—জড় সৃষ্টি ; **চ**—এবং ; **নিরোধঃ**—লয় ; **চ**—ও ; **যতঃ**—উৎপত্তি থেকে ; **অস্তি**—হয় ; **অধ্যবসীয়তে**—প্রকট হয় ; **স**—তিনি ; **আশ্রয়ঃ**—আধার ; **পরম্**—পরম ; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম ; **পরমাত্মা**—পরমাত্মা ; **ইতি**—এইভাবে ; **শব্দ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যাঁর থেকে এই জগৎ প্রকাশিত হয় এবং যাঁর থেকে সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলে অভিহিত হন। তিনি আশ্রয়—তিনি পরম সত্য।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে সমস্ত শক্তির পরম উৎস হচ্ছেন "*জন্মাদ্যস্য যতঃ, বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে,*" তিনি পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান নামে অভিহিত হন। এই শ্লোকে *ইতি* শব্দটি প্রতিশব্দগুলির সমাপ্তি ঘোষণা করে *ভগবানকে* ইঙ্গিত করছে। পরবর্তী শ্লোকসমূহে তা বিশ্লেষণ করা হবে। কিন্তু এই ভগবান বলতে চরমে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়, কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।* সমস্ত শক্তির আদি উৎস অথবা পরম আশ্রয় হচ্ছেন পরম সত্য, তিনি পরম ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হন, এবং সেই পরম সত্যের চরম উপাধি হচ্ছে ভগবান। কিন্তু নারায়ণ, বিষ্ণু, পুরুষ ইত্যাদি ভগবান প্রতিশব্দেরও অন্তিম শব্দ হচ্ছে কৃষ্ণ, যে কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে* ইত্যাদি। আর তা ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শব্দরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥

(*ভাঃ ১/৩/৪৩*)

এইভাবে সাধারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত শক্তির চরম উৎস, এবং কৃষ্ণ শব্দটির অর্থই হচ্ছে তাই। আর শ্রীকৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান বিশ্লেষণ করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে সূত গোস্বামী এবং শৌনক আদি ঋষিদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবং এই স্কন্ধের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট, এবং চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু তার থেকেও অধিক স্পষ্ট। দ্বিতীয় স্কন্ধে পরম সত্য যে পরমেশ্বর ভগবান তা বিশেষ দৃঢ়তাসহ প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। চতুঃশ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্তসার, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তা সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত স্পষ্ট। ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।* সে কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই

বিষয়টির পূর্ণ এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম এবং একাদশ স্কন্ধে করা হয়েছে। মনু এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর, চাক্ষুষ মন্বন্তর আদি মন্বন্তরসমূহের পরিবর্তন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্কন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতেও শ্রীকৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অষ্টম স্কন্ধে বৈবস্বত মন্বন্তরের বর্ণনাতেও পরোক্ষভাবে সেই বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং নবম স্কন্ধের তাৎপর্যেও তাই। দ্বাদশ স্কন্ধে তা আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিশেষভাবে ভগবানের বিশেষ অবতার সম্বন্ধে। এইভাবে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের পর এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আশ্রয় বা সমস্ত শক্তির পরম উৎস। উপাসকদের স্তর ভেদে নারায়ণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা আদি রূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষিত হন।

শ্লোক ৮

যোহধ্যাত্মিকোহয়ং পুরুষঃ সোহসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥ ৮ ॥

যঃ—যিনি ; **অধ্যাত্মিকঃ**—ইন্দ্রিয়যুক্ত ; **অয়ম্**—এই ; **পুরুষঃ**—পুরুষ ; **সঃ**—তিনি ; **অসৌ**—তা ; **এব**—ও ; **আধিদৈবিকঃ**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা ; **যঃ**—যা ; **তত্র**—সেখানে ; **উভয়**—উভয়ের ; **বিচ্ছেদঃ**—বিয়োগ ; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি ; **হি**—জন্য ; **আধিভৌতিকঃ**—দৃশ্যশরীর অথবা দেহধারী জীবাত্মা।

অনুবাদ

বিবিধ ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পুরুষ, ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাকে বলা হয় আধিদৈবিক পুরুষ, এবং চক্ষুগোলকে দৃষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় আধিভৌতিক পুরুষ।

তাৎপর্য

পরম নিয়ন্ত্রণকারী আশ্রয়তত্ত্ব হচ্ছেন পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) বলা হয়েছেঃ

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, আদি সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মারূপে বিভিন্ন প্রকাশ, যিনি তাঁর থেকে উৎপন্ন প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু তা হলেও আপাত দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে ভেদ রয়েছে। যেমন খাদ্য বিভাগের নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন একজন ব্যক্তি যার অবয়ব নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিরই মতো একই উপাদান দ্বারা গঠিত। তেমনই জড় জগতে প্রতিটি ব্যক্তি উচ্চতর দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। যেমন আমাদের ইন্দ্রিয় রয়েছে,

কিন্তু সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি উন্নততর নিয়ন্ত্রক দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আলোক ছাড়া আমরা দর্শন করতে পারি না, এবং আলোকের পরম নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন সূর্য। সূর্যদেব সূর্যলোকে রয়েছেন, আর আমরা মানুষেরা অথবা অন্যান্য জীবেরা এই পৃথিবীতে রয়েছি, এবং আমাদের দর্শন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সূর্যদেবের দ্বারা। তেমনই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ উন্নততর দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁরা হচ্ছেন আমাদেরই মতো জীব, কিন্তু তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির দ্বারা আবিষ্ট, আর আমরা নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত জীবদের বলা হয় *আধ্যাত্মিক ব্যক্তি*, আর নিয়ন্ত্রণকারীদের বলা হয় *আধিদৈবিক ব্যক্তি।* জড় জগতের এই সমস্ত পদ বিভিন্ন কর্মের ফলস্বরূপ লাভ হয়। যে কোন জীব সূর্যদেব অথবা ব্রহ্মা অথবা উচ্চতর লোকে যে কোন দেবতা হতে পারেন তাদের পুণ্য কর্মের প্রভাবে, এবং তেমনই নিম্নতর কর্মের প্রভাবে অন্য কেউ সেই সমস্ত দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইভাবে প্রতিটি জীবই পরমাত্মার পরম নিয়ন্ত্রণের অধীন, যিনি বিভিন্ন জীবেদের নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের পদে স্থাপন করেন।

যা নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিত জড় দেহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে, তাকে বলা হয় *আধিভৌতিক* পুরুষ। শরীরকে কখনও কখনও পুরুষ বলা হয়, যা এই বৈদিক মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—*'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ'*—এই শরীরকে বলা হয় *অন্নরসময়*। এই শরীর অন্নের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেহী জীবাত্মা কিছুই খায় না, কেননা দেহী হচ্ছে চিন্ময়। যন্ত্র স্বরূপ দেহের ব্যবহারাদির ফলে ক্ষয়বশত পদার্থের পুনঃ যোজনের প্রয়োজন হয়। তাই নিয়ন্ত্রিত জীব এবং নিয়ন্ত্রকারী দেবতাদের পার্থক্য *অন্নময়* দেহে। সূর্যের শরীর বিশাল হতে পারে, আর মানুষের শরীর ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত দৃশ্যমান দেহ জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত ; কিন্তু তা হলেও সূর্যদেব এবং একজন সাধারণ মানুষ, যারা পরস্পরের সঙ্গে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের সম্বন্ধে সম্পর্কিত, তারা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন চিন্ময় অংশ, এবং পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশদের বিভিন্ন পদে স্থাপন করেন। এইভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকলের আশ্রয়।

শ্লোক ৯

একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

একম্—এক ; **একতর**—অন্য ; **অভাবে**—অনুপস্থিতিতে ; **যদা**—কেননা ; **ন**—করে না ; **উপলভামহে**—উপলব্ধি ; **ত্রিতয়ং**—তিন অবস্থায় ; **তত্র**—সেখানে ; **যঃ**—যিনি ; **বেদ**—জানেন ; **সঃ**—তিনি ; **আত্মা**—পরমাত্মা ; **স্ব**—স্বীয় , **আশ্রয়**—আশ্রয় ; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়ের।

অনুবাদ

জীবাত্মার উপরোক্ত তিনটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সে সব কটি অবস্থাই দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র, এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়।

তাৎপর্য

জীবাত্মাসমূহ অসংখ্য, এবং নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের সম্পর্কে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অনুভূতির মাধ্যম ব্যতীত কেউই বুঝতে পারে না কে নিয়ন্ত্রক এবং কে নিয়ন্ত্রিত। যেমন, সূর্য আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন; আমরা সূর্যকে দেখতে পাই, কেননা সূর্যের শরীর রয়েছে এবং আমাদের চক্ষু রয়েছে বলেই সূর্যের কিরণ আমাদের কাছে কার্যকর। আমাদের চোখ না থাকলে সূর্যের কিরণ অর্থহীন, এবং সূর্যকিরণ ব্যতীত আমাদের চক্ষুও অর্থহীন। এইভাবে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; এবং তাদের কেউই স্বতন্ত্র নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে কে এগুলিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করেছেন। যিনি তা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে,—সমস্ত পরস্পর নির্ভরশীল বস্তুদের পরম উৎস হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তিনি হচ্ছেন পরম সত্য বা পরমাত্মা যিনি অন্য কারোর উপর নির্ভর করেন না। তিনি স্বাশ্রয়াশ্রয়। তিনি কেবল নিজেরই উপর নির্ভর করেন, এবং তাই তিনি সবকিছুরই পরম আশ্রয়। যদিও পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ভগবানের আশ্রিত, কেননা ভগবানই হচ্ছেন পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ, তাই তিনি হচ্ছেন পরমাত্মারও উৎস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং সব কিছুরই উৎস, এবং এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের, এমনকি পরমাত্মা এমনকি পরমব্রহ্মেরও চরম উৎস ও আশ্রয়। যদি স্বীকার করা হয়ও যে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু জীবাত্মাকে জড়া প্রকৃতি বা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পরমাত্মারই উপর নির্ভর করতে হয়। জীবাত্মা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তাই যদিও সে গুণগতভাবে পরমাত্মার সঙ্গে এক, তবুও সে মায়ার প্রভাবে নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে মোহগ্রস্ত হয়। এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জীবাত্মাকে পরমাত্মার উপর নির্ভর করতে হয়, যার ফলে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে তার সঙ্গে গুণগতভাবে এক। সেই সূত্রেও পরমাত্মা হচ্ছেন পরম আশ্রয়, এবং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

জীব সর্বদাই পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, কেননা জীবাত্মা তার চিন্ময় স্বরূপ বিস্মৃত হয়, কিন্তু পরমাত্মার কখনো এইপ্রকার বিস্মৃতি হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে

জীবাত্মারূপ অর্জুন কিভাবে তাঁর পূর্বের বহু বহু জন্মের স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু পরমাত্মা স্বরূপ ভগবানের সব কিছুই স্মরণে রয়েছে। এমনকি কোটি কোটি বছর পূর্বে ভগবান কিভাবে সূর্যদেবকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাও তাঁর মনে আছে। ভগবান এইভাবে অনন্তকোটি বছরের কথাও মনে রাখতে পারেন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৬) বলা হয়েছে—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥

সচ্চিদানন্দরূপ ভগবান পূর্বে কি হয়েছিল, বর্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে সেই সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু পরমাত্মা এবং ব্রহ্মের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও সেই ভগবানকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা জানতে পারে না।

বিশ্বচেতনা এবং জীবাত্মার চেতনা এক বলে যে প্রচার হয় তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কেননা অর্জুনের মতো ব্যক্তি বা জীবাত্মাও তাঁর পূর্ব কর্মের কথা স্মরণ রাখতে পারেননি, যদিও তিনি সর্বদাই ভগবানের সহচর। তা হলে সাধারণ মানুষ বিশ্বচেতনার সঙ্গে এক হয়ে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে জানার দাবী করে কি করে?

শ্লোক ১০

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ।
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ ॥ ১০ ॥

পুরুষঃ—পরমপুরুষ, পরমাত্মা; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **বিনির্ভিদ্য**—তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে স্থাপিত করে; **যদা**—যখন; **অসৌ**—সেই; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **বিনির্গতঃ**—বেরিয়ে আসেন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **অয়নম্**—স্থানে শয়ন করে; **অন্বিচ্ছন্**—ইচ্ছা করে; **অপঃ**—জল; **অস্রাক্ষীৎ**—সৃষ্টি করেছেন; **শুচিঃ**—পরম পবিত্র; **শুচীঃ**—দিব্য।

অনুবাদ

বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সেই বিরাট পুরুষ (মহাবিষ্ণু), কারণ-সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেন এবং শয়ন করার ইচ্ছা করে দিব্য জল (গর্ভোদক) সৃষ্টি করলেন।

তাৎপর্য

জীবাত্মা এবং সমস্ত জীবের স্বতন্ত্র উৎস পরমেশ্বর পরমাত্মার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার পর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন সমস্ত জীবের একমাত্র বৃত্তি, ভগবদ্ভক্তির পরম প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অংশ এবং কলাসমূহ পরস্পর থেকে অভিন্ন, এবং তাই তাঁদের সকলেরই পরম স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

তা প্রমাণ করার জন্য শুকদেব গোস্বামী (পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে) জড় সৃষ্টিতেও ভগবানের পুরুষাবতারের স্বাতন্ত্র্যের কথা বর্ণনা করছেন। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপও দিব্য, এবং তাই সেগুলিও পরমেশ্বর ভগবানের লীলা। ভক্তির ক্ষেত্রে আত্ম-উপলব্ধি আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের পক্ষে এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করা অত্যন্ত অনুকূল।

কেউ তর্ক করতে পারে, মথুরা এবং বৃন্দাবনে ভগবানের যে সমস্ত লীলা, যা এই পৃথিবীর যে কোন বিষয়ের থেকে মধুরতর, সেই সমস্ত লীলার রস আস্বাদন করা হোক না কেন? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার উত্তরে বলেছেন যে, ভগবানের বৃন্দাবন লীলাসমূহ উন্নত ভক্তদের আস্বাদনীয়। নবীন ভক্তরা ভগবানের পরম দিব্য এই সমস্ত লীলা-বিলাসের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তার ভ্রান্ত অর্থ করতে পারে, এবং তাই এই জগতে সৃষ্টি পালন এবং সংহারবিষয়ক ভগবানের লীলাসমূহ প্রাকৃত ভক্তদের কাছে অধিক আস্বাদনীয়। ঠিক যেমন জড় দেহের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ব্যক্তিদের জন্য দৈহিক ব্যায়াম ভিত্তিক যোগাসনের প্রক্রিয়া রয়েছে, তেমনি জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার বিষয়ক ভগবানের লীলাসমূহ জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের জন্য। এই প্রকার জড় বিষয়াসক্ত জীবদের সমস্ত বিধি-বিধানের নির্মাতা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার জন্য তাই ভগবানের আইনের মাধ্যমে দেহের ক্রিয়া এবং জগতের ক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পারিভাষিক শব্দের দ্বারা জড় জগতের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সেই সমস্ত অন্ধ বিজ্ঞানীরা বিধি-বিধানের সৃষ্টিকর্তার কথা ভুলে যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বিধি-বিধানের নির্মাণকর্তাকে ইঙ্গিত করে।

জটিল ইঞ্জিন অথবা ডায়নামোর যান্ত্রিক আয়োজন দেখে মানুষের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু যে ইঞ্জিনিয়ার এরকম অদ্ভুত যন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রশংসা করা উচিত। এইটিই হচ্ছে ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে পার্থক্য। ভক্তরা সর্বদাই ভৌতিক জগতের পরিচালক ভগবানের মহিমা সর্বদা কীর্তন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) জড়া প্রকৃতির উপর ভগবানের অধ্যক্ষতার বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

"ভৌতিক নিয়মে পূর্ণ জড়া প্রকৃতি আমার বিভিন্ন শক্তির একটি ; তাই তা স্বতন্ত্র নয় এবং অন্ধ নয়। যেহেতু আমি সর্বশক্তিমান, জড়া প্রকৃতির প্রতি আমার দৃষ্টিপাতের প্রভাবেই জড়া প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম এরকম বিচিত্রভাবে কার্য করছে। সেই জন্যই ভৌতিক নিয়মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে, এবং এইভাবেই ক্রমে ক্রমে জড় জগতের সৃষ্টি হচ্ছে পালন হচ্ছে এবং লয় হচ্ছে।"

কিন্তু অজ্ঞ মানুষেরা জীব শরীরের রচনা এবং এই জগতের ভৌতিক নিয়মসমূহ অবলোকন করে আশ্চর্যান্বিত হয় এবং মূর্খতাবশত ভৌতিক নিয়মসমূহকে স্বতন্ত্র বলে

মনে করে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। *ভগবদ্গীতার* (৯/১১) মানুষের এই মূর্খতার উত্তরে বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (গীতা ৯/১১)

"মূর্খ মানুষেরা (*মূঢ়াঃ*) পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবগত নয়।" মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে ভগবানের অপ্রাকৃত শরীর তাদের মতো, এবং তাই ভৌতিক নিয়মের অতীত পরমেশ্বর ভগবানের অন্তহীন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার চিন্তা তারা করতে পারে না। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর আপন মায়ার প্রভাবে অবতরণ করেন, তখন তিনি সাধারণ মানুষেরও গোচরীভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে অবতরণ করেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানরূপে অতি অদ্ভুত লীলা-বিলাস করেছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞানই প্রদান করে থাকে। তথাপি মূর্খ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে চায় না। সাধারণত তারা ভগবানের অতি ক্ষুদ্র এবং বিরাট রূপ বিবেচনা করে, কেননা তারা নিজেরা অণু অথবা অনন্ত হতে অক্ষম। কিন্তু মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, ভগবানের অণু এবং অনন্ত আকার ভগবানের সর্বোচ্চ মহিমা নয়। তাঁর শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শন তখনই হয়, যখন অনন্ত ভগবান আমাদের মধ্যে আমাদেরই মতো একজন হয়ে প্রকট হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কার্যকলাপ সসীম জীব দেহ থেকে ভিন্ন। সাত বছর বয়সে একটি পর্বত হাতে ধারণ করা এবং যৌবনে ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করা তাঁর অনন্ত শক্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত; কিন্তু তা সত্ত্বেও মূঢ়রা তা দর্শন করে এবং শ্রবণ করেও সেগুলিকে গল্পকথা বলে অস্বীকার করে এবং ভগবানকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা বুঝতে পারে না যে তাঁর আত্মমায়ার প্রভাবে নররূপ ধারণ করলেও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবস্থাতেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান।

কিন্তু সেই মূঢ়রা যখন পরম্পরার মাধ্যমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত শরণাগত চিত্তে স্মরণ করে, তখন সেই মূঢ় ব্যক্তি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়। তাই এই সমস্ত মূঢ়দের কল্যাণের জন্যই ভগবানের ভৌম-লীলাসমূহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

তাস্ববাৎসীৎ স্ব-সৃষ্টাসু সহস্রংপরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥

তাসু—তাতে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **স্ব**—স্বীয়; **সৃষ্টাসু**—সৃষ্টিকার্যে; **সহস্রং**—এক হাজার; **পরিবৎসরান্**—তাঁর গণনা অনুসারে বৎসর; **তেন**—সেই

কারণে ; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ ; **নাম**—নামক ; **যৎ**—যেহেতু ; **আপঃ**—জল ; **পুরুষোদ্ভবাঃ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ নন এবং তাই স্পষ্টভাবে তিনি নর বা পুরুষ। সেই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত সেই দিব্য জলরাশি তাই নার বলে কথিত। যেহেতু তিনি সেই জলে শয়ন করেন তাই তার নাম নারায়ণ। নিজের সৃষ্ট সেই জলে তিনি হাজার হাজার বছর বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ১২ ॥

দ্রব্যম্—ভৌতিক উপাদানসমূহ ; **কর্ম**—কর্ম ; **চ**—এবং ; **কালঃ**—সময় ; **চ**—ও ; **স্বভাবঃ জীবঃ**—জীবাত্মাসমূহ ; **এব**—নিশ্চয়ই ; **চ**—ও ; **যৎ**—যাঁর ; **অনুগ্রহতঃ**—কৃপার প্রভাবে ; **সন্তি**—বর্তমান ; **ন**—করে না ; **সন্তি**—বর্তমান ; **যৎ-উপেক্ষয়া**—উপেক্ষার ফলে।

অনুবাদ

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এবং এই সবের ভোক্তা জীব কেবল তাঁর কৃপার প্রভাবেই বর্তমান, এবং তিনি উপেক্ষা করলে আর তাদের অস্তিত্ব থাকে না।

তাৎপর্য

জীব জড় উপাদান, কাল, স্বভাব ইত্যাদির ভোক্তা, কেননা তারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, এবং জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের ভোগে সহায়তা করা এবং এইভাবে দিব্য আনন্দে অংশগ্রহণ করা। ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়ই ভোগে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু মায়ার প্রভাবে মোহিত হয়ে জীবেরা ভগবানের মতো ভোক্তা হতে চায়, যদিও সেই প্রচেষ্টাটি তার পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ভগবদ্গীতায় জীবকে ভগবানের পরা-প্রকৃতি সম্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই জীব কখনই পুরুষ বা প্রকৃত ভোক্তা নয়। জড় জগতে জীবের ভোগ করার বাসনা ভ্রান্ত। চিজ্জগতে জীবেরা শুদ্ধ, এবং তাই তারা ভগবানের আনন্দ উপভোগে অংশ গ্রহণ করে।জড় জগতে স্বীয় কর্মের মাধ্যমে জীবের ভোগের প্রচেষ্টা প্রকৃতির নিয়মে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, এবং এইভাবে মায়া ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধ জীবের কানে পরামর্শ দেয়। সেটিই

হচ্ছে মায়ার অন্তিম ফাঁদ। ভগবানের কৃপায় যখন এই শেষ ফাঁদটিকেও অতিক্রম করা যায়, তখন জীব পুনরায় তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। মায়ার এই বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করার জন্য ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, কিছু কালের জন্য (তাঁর গণনায় এক হাজার বছর পর্যন্ত, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে) পালন করেন এবং তারপর পুনরায় তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তার লয় সাধন করেন। তাই জীবেরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তাদের তথাকথিত সুখ উপভোগ ভগবানের ইচ্ছায় ধূলিসাৎ হয়।

শ্লোক ১৩

একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা ॥ ১৩ ॥

একঃ—তিনি, একলা; **নানাত্বম্**—বহুরূপে; **অন্বিচ্ছন্**—ইচ্ছা করে; **যোগতল্পাৎ**—যোগনিদ্রার শয্যা থেকে; **সমুত্থিতঃ**—উত্থিত হলেন; **বীর্যম্**—বীর্য; **হিরণ্ময়ম্**—স্বর্ণাভ; **দেবঃ**—দেবতা; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **ব্যসৃজৎ**—পূর্ণরূপে সৃষ্টি করেছিলেন; **ত্রিধা**—তিনভাবে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বহু রূপে প্রকাশিত হতে ইচ্ছা করে যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হলেন এবং হিরণ্ময় বীর্যকে মায়াশক্তির দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৭-৮) জড় জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥

"কল্পান্তে সম্পূর্ণ সৃষ্টি, যথা জড় জগৎ এবং প্রকৃতিতে ক্লেশ প্রাপ্ত জীব আমার দিব্য দেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং নতুন কল্পের আরম্ভে আমার ইচ্ছার প্রভাবে তারা পুনরায় প্রকাশিত হয়। এইভাবে এই প্রকৃতি আমার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আমার ইচ্ছার প্রভাবে তা পুনঃ পুনঃ প্রকট হয় এবং লয় হয়।"

এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে ভগবান পূর্ণশক্তি (*মহাসমষ্টি*) রূপে বিদ্যমান থাকেন, এবং নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করার ইচ্ছা করে তিনি নিজেকে বহুমুখী শক্তি (*সমষ্টি*)

রূপে বিস্তার করেন। এই সমষ্টি শক্তি থেকে তিনি পুনরায় নিজেকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক শক্তিরূপে বিস্তার করেন, যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (*ব্যষ্টি*)। এইভাবে সমগ্র সৃষ্টি তথা সৃজনী শক্তি যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। যেহেতু সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত (*মহাবিষ্ণু বা মহাসমষ্টি*), তাই জড় সৃষ্টিতে কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন নয়; কিন্তু এই সমস্ত শক্তির বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ এবং প্রকাশ রয়েছে, এবং তাই তারা যুগপৎ ভগবান থেকে ভিন্ন। জীবও ভগবানের এইপ্রকার শক্তি (*তটস্থা শক্তি*); এবং তাই তারা ভগবান থেকে যুগপৎ অভিন্ন এবং ভিন্ন।

অব্যক্ত অবস্থায় জীবশক্তি ভগবানে লীন থাকে, এবং যখন তাদের জড় জগতে প্রকাশ করা হয়, তখন তারা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাসনার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। জীবের এই বিভিন্ন প্রকাশ তার বদ্ধ অবস্থা। কিন্তু মুক্ত জীবেরা তাদের সনাতন স্বরূপে ভগবানের শরণাগত থাকে, এবং তাই তারা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি এবং ধ্বংসের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এইভাবে যোগনিদ্রায় শায়িত ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ প্রকট হয় এবং বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ১৪

অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্যং ত্রিধাভিদ্যত তচ্ছৃণু ॥ ১৪ ॥

অধিদৈবম্—নিয়ন্ত্রণকারী জীব; **অথ**—এখন; **অধ্যাত্মম্**—নিয়ন্ত্রিত জীব; **অধিভূতম্**—জড় শরীর; **ইতি**—এইভাবে; **প্রভুঃ**—ভগবান; **অথ**—এইভাবে; **একম্**—কেবল এক; **পৌরুষম্**—তাঁর প্রভুত্বের; **বীর্যম্**—শক্তি; **ত্রিধা**—তিনভাগে; **অভিদ্যত**—বিভক্ত; **তৎ**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

ভগবানের শক্তি কিভাবে অধিদৈব, অধিআত্ম এবং অধিভূত এই তিনভাগে বিভক্ত হয়, তা আমার কাছে শ্রবণ কর।

শ্লোক ১৫

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্তঃশরীরে—দেহাভ্যন্তরে; **আকাশাৎ**—আকাশ থেকে; **পুরুষস্য**—মহাবিষ্ণু; **বিচেষ্টতঃ**—চেষ্টা করে অথবা ইচ্ছা করে; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **সহঃ**—মনের বল;

বলম্—দেহের বল ; **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছে ; **ততঃ**—তারপর ; **প্রাণঃ**—জীবনীশক্তি ; **মহানসু**—সকলের জীবনের উৎস।

অনুবাদ

মহাবিষ্ণুর দিব্য শরীরের হৃদয়াকাশ থেকে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি উৎপন্ন হল। তারপর সমস্ত জীবনী শক্তির উৎসস্বরূপ প্রাণশক্তি উৎপন্ন হল।

শ্লোক ১৬

অনুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্বজন্তুষু।
অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১৬ ॥

অনুপ্রাণন্তি—জীবনের লক্ষণসমূহ অনুসরণ করে; **যম্**—যাঁকে; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **প্রাণন্তম্**—প্রচেষ্টা করে ; **সর্বজন্তুষু**—সমস্ত জীবে ; **অপানন্তম্**—প্রচেষ্টা করা বন্ধ করে ; **অপানন্তি**—অন্য সব কিছু বন্ধ হয় ; **নরদেবম্**—রাজা ; **ইব**—মতো ; **অনুগাঃ**—অনুচর।

অনুবাদ

রাজার অনুচরেরা যেমন তাদের প্রভুর অনুগমন করে, তেমনই জীবদেহের ব্যষ্টি প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়সমূহ) মুখ্য প্রাণের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মুখ্য প্রাণ নিশ্চেষ্ট হলে সমস্ত জীবদেহের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপও স্তব্ধ হয়।

তাৎপর্য

জীবেরা পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক বাতির যেমন স্বতন্ত্র জ্যোতি নেই, ঠিক তেমনই এই সমস্ত জীবেদের কারোরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, উৎপাদন-কেন্দ্র বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করার জন্য জলাশয়ের উপর নির্ভর করে, জলাশয়গুলি মেঘের উপর নির্ভর করে, মেঘ সূর্যের উপর নির্ভর করে, সূর্য সৃষ্টির উপর নির্ভর করে, এবং সৃষ্টি ভগবানের চেষ্টা বা গতির উপর নির্ভর করে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৭

প্রাণেনাক্ষিপতা ক্ষুৎতৃড়ন্তরা জায়তে বিভোঃ।
পিপাসতো জক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত ॥ ১৭ ॥

প্রাণেন—জীবনী-শক্তির দ্বারা ; **আক্ষিপতা**—ক্ষুব্ধ হয়ে ; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা ; **তৃৎ**—তৃষ্ণা ; **অন্তরা**—অভ্যন্তর থেকে; **জায়তে**—উৎপন্ন হয়; **বিভোঃ**—পরমেশ্বরের ;

পিপাসতঃ—তৃষ্ণা নিবারণের বাসনা ; **জক্ষতঃ**—আহার করার বাসনায় ; **চ**—এবং ; **প্রাক্**—প্রথমে ; **মুখম্**—মুখ ; **নিরভিদ্যত**—প্রকট হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রাণশক্তি কর্তৃক ক্ষোভিত হয়ে বিরাট পুরুষের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, এবং যখন তিনি আহার এবং পান করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মুখ বিকশিত হয়।

তাৎপর্য

যেভাবে মায়ের গর্ভে জীবের অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিকাশ হয়, সমস্ত জীবের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষেরও অনেকটা তাই হয়। তাই সমস্ত সৃষ্টির পরম কারণ নির্বিশেষ নন অথবা বাসনারহিত নন। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির বাসনা পরমেশ্বর ভগবানে রয়েছে এবং তাই প্রত্যেক জীবের মধ্যেও তার প্রকাশ হয়। এই বাসনা হচ্ছে পরম সত্য, পরম পুরুষের প্রকৃতি। যেহেতু সমস্ত মুখের সমষ্টি হচ্ছেন তিনি, তাই জীবেরও মুখ রয়েছে। তেমনই অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর রয়েছে বলেই জীবের মধ্যে প্রকাশ হয়। এখানে মুখ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতীক, কেননা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বেলায়ও এই একই তত্ত্ব প্রযোজ্য।

শ্লোক ১৮

মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে ॥ ১৮ ॥

মুখতঃ—মুখ থেকে; **তালু**—তালু; **নির্ভিন্নম্**—উৎপন্ন হয়ে; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **তত্র**—তারপর ; **উপজায়তে**—প্রকট হয় ; **ততঃ**—তারপর ; **নানারসঃ**—বিভিন্ন প্রকার স্বাদ ; **জজ্ঞে**—প্রকট হয় ; **জিহ্বয়া**—জিহ্বার দ্বারা ; **যঃ**—যা ; **অধিগম্যতে**—আস্বাদিত হয়।

অনুবাদ

মুখ থেকে তালু প্রকট হয় এবং তারপর জিহ্বা উৎপন্ন হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার স্বাদের উৎপত্তি হয় যাতে জিহ্বা তাদের আস্বাদন করতে পারে।

তাৎপর্য

এই ক্রমিক বিকাশের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের (*অধিদৈব*) তত্ত্ববিশ্লেষণ করে, কেননা বরুণ হচ্ছেন সমস্ত আস্বাদ্য রসের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা। তাই মুখ জিহ্বার আশ্রয়স্থল এবং জিহ্বা বিভিন্ন রসের আশ্রয় স্থল, যার নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হচ্ছেন বরুণদেব। তাই বোঝা যায় জিহ্বার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বরুণদেবেরও উৎপত্তি হয়েছিল। জিহ্বা এবং তালু নির্মিত হওয়ার ফলে *অধিভূত* বা পদার্থের রূপ, কিন্তু তার

যে নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা, যিনি হচ্ছেন একজন জীব, তিনি *অধিদৈব*, আর যার উপর কার্য করা হয় তিনি *অধ্যাত্ম*। এইভাবে বিরাট পুরুষের মুখ খোলার পর তিন শ্রেণীর জন্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই শ্লোকে যে চারটি তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে পূর্বে আলোচিত তিনটি মুখ্য তত্ত্ব, অর্থাৎ অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

বিবক্ষোর্মুখতো ভূম্নো বহ্নির্বাগ্ব্যাহৃতং তয়োঃ ।
জলে চৈতস্য সুচিরং নিরোধঃ সমজায়ত ॥ ১৯ ॥

বিবক্ষোঃ—যখন কথা বলার ইচ্ছা হয়েছিল; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **ভূম্নঃ**—পরমেশ্বরের; **বহ্নিঃ**—অগ্নি বা অগ্নিদেব; **বাক্**—শব্দ; **ব্যাহৃতম্**—বাণী; **তয়োঃ**—উভয়ের দ্বারা; **জলে**—জলে; **চ**—ও; **এতস্য**—এই সকলের; **সুচিরম্**—অতি দীর্ঘকাল; **নিরোধঃ**—অবরোধ; **সমজায়ত**—হয়েছিল।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন কথা বলতে ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে বাক্ (*ইন্দ্রিয়*) ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি প্রকাশিত হলেন। পরে তিনি যখন জলে শয়ন করেছিলেন, তখন এই সমস্ত ক্রিয়া নিরুদ্ধ ছিল।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রমিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয়। তাই বুঝতে হবে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি একপ্রকার বদ্ধ জীবকে স্বাধীনভাবে আচরণ করার অনুমতি দেওয়ার মতো, যাদের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের নিয়ন্ত্রণে সেগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। যারা সেই নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদের নিম্নস্তরের জীবনে অধঃপতিত হয়ে দণ্ডভোগ করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জিহ্বা এবং তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণের বিবেচনা করা যায়। জিহ্বা আহারের জন্য, এবং মানুষ, পশু, পক্ষী সকলেরই বিভিন্ন প্রকার আস্বাদন রয়েছে, কেননা তাদের ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মানুষের স্বাদ আর একটি শূকরের স্বাদ এক প্রকার নয়। কিন্তু বিভিন্ন জীবাত্মা যখন প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার স্বাদ আস্বাদনের প্রবণতা বিকশিত করে, তখননিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা বিশেষ প্রকারের শরীর প্রদান করেন। যেমন, কোন মানুষ যদি শূকরের মতো স্বাদ গ্রহণের প্রবণতা অর্জন করে এবং কোন রকম বাছবিচার না করে সব কিছু খেতে শুরু করে, তখন নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা তাকে তার পরবর্তী জীবনে একটি শূকরের শরীর লাভ

করার অনুমতি দেন। শূকর সব কিছু খায়, এমনকি বিষ্ঠা পর্যন্ত, এবং কোন মানুষ যদি এই প্রকার বাছবিচারহীন স্বাদ অর্জন করে তা হলে তাকে পরবর্তী জীবনে শূকরের মতো নিকৃষ্ট জীবন লাভের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রকার জীবনও ভগবানেরই করুণার প্রকাশ, কেননা বদ্ধ জীব সেই প্রকার শরীর কামনা করে যাতে সে পূর্ণরূপে বিশেষ ধরনের খাদ্য আস্বাদন করতে পারে। কোন মানুষ যদি একটি শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়, তা হলে তা অবশ্যই ভগবানের করুণা বলে বিবেচনা করতে হবে, কেননা ভগবান তাকে তার বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দিচ্ছেন। মৃত্যুর পরে পরবর্তী দেহ উন্নততর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়, অন্ধভাবে নয়। মানুষকে তাই পরবর্তী জীবনের শরীর্র লাভের কথা চিন্তা করে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। বিচার-বিবেচনাশূন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবন অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সমস্ত শাস্ত্রে সে কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ ॥ ২০ ॥

নাসিকে—নাসিকায়; **নিরভিদ্যেতাম্**—বিকশিত হয়ে; **দোধূয়তি**—দ্রুত নির্গত হয়; **নভস্বতি**—শ্বাসপ্রশ্বাস, **তত্র**—তারপর; **বায়ুঃ**—বায়ু; **গন্ধবহঃ**—গন্ধ; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **নসি**—নাসিকায়; **জিঘৃক্ষতঃ**—ঘ্রাণ গ্রহণ করার বাসনায়।

অনুবাদ

তারপর পরম পুরুষ যখন ঘ্রাণ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন, তখন নাসিকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন হল, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ প্রকাশিত হল। সেই সঙ্গে গন্ধবহনকারী বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাও প্রকাশিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন ঘ্রাণ গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন, সেই সময় নাসিকা, গন্ধ, বায়ুদেবতা, ঘ্রাণ ইত্যাদি একসাথে প্রকট হয়েছিল। উপনিষদের বেদমন্ত্রে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা কোন কার্য করার পূর্বে প্রথমে ভগবান সেগুলি ইচ্ছা করেছিলেন। জীব তখনই কেবল দর্শন করতে পারে, যখন ভগবান দর্শন করেন; জীব তখনই ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে, যখন ভগবান ঘ্রাণ গ্রহণ করেন; এবং এইভাবে জীবের প্রতিটি কর্মের পিছনে রয়েছে ভগবানের অনুভূতি। অর্থাৎ জীব কখনই স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু করতে পারে না। সে কেবল কোন কিছু স্বতন্ত্রভাবে করার কথা চিন্তা করতে পারে, কিন্তু সে কখনও স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না। ভগবানের কৃপায় স্বতন্ত্রভাবে ইচ্ছা করার বাসনা তার রয়েছে, কিন্তু সেই বাসনা কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে

চরিতার্থ হতে পারে। তাই একটি জনপ্রিয় প্রবাদ রয়েছে—"মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে এবং ভগবান তা অনুমোদন করেন।" এই বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু এই যে জীবাত্মা অধীন তত্ত্ব এবং পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভগবানের সমকক্ষ হবার দাবী করে তাদের সর্বপ্রথমে প্রমাণ করা উচিত যে তারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এইভাবে তাদের ভগবানের সমকক্ষ হওয়ার দাবীর যথার্থতা নিরূপণ করতে হবে।

শ্লোক ২১

যদাত্মনি নিরালোকমাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ।
নির্ভিন্নে হ্যক্ষিণী তস্য জ্যোতিশ্চক্ষুর্গুণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

যদা—যখন ; **আত্মনি**—নিজেকে ; **নিরালোকম্**—আলোক ব্যতীত ; **আত্মানম্**— তার নিজের দিব্যদেহ ; **চ**—এবং অন্যান্য দৈহিক রূপ ; **দিদৃক্ষতঃ**—দেখার ইচ্ছা করেছিলেন ; **নির্ভিন্নে**—প্রকট হওয়ার ফলে ; **হি**—জন্য ; **অক্ষিণী**—চক্ষুর ; **তস্য**— তাঁর ; **জ্যোতিঃ**—সূর্য ; **চক্ষুঃ**—চক্ষু ; **গুণগ্রহঃ**—দেখার শক্তি।

অনুবাদ

এইভাবে সব কিছু যখন অন্ধকারে ছিল, ভগবান তখন নিজেকে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই সব কিছু দর্শন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন চক্ষু, আলোকের দেবতা সূর্য, দৃষ্টিশক্তি এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ সব কিছু প্রকট হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ স্বভাবতই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং তাই সমগ্র জড় সৃষ্টিকে বলা হয় *তমস* বা অন্ধকার। রাত্রি হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তবিক স্বরূপ, কেননা তখন কেউই কিছু দেখতে পায় না, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত দেখতে পায় না। ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে, প্রথমে নিজেকে দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন, এবং তার ফলে সূর্যদেব প্রকট হয়েছেন, সমস্ত জীবের দর্শন শক্তি সম্ভব হয়েছে এবং দর্শনীয় বস্তুসমূহ প্রকট হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের সৃষ্টির পর সমগ্র সৃষ্টি প্রকট হয়েছে।

শ্লোক ২২

বোধ্যমানস্য ঋষিভিরাত্মনস্তজ্জিঘৃক্ষতঃ।
কর্ণৌ চ নিরভিদ্যেতাং দিশঃ শ্রোত্রং গুণগ্রহঃ ॥ ২২ ॥

বোধমানস্য—জানবার ইচ্ছার ফলে ; **ঋষিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা ; **আত্মনঃ**—পরম পুরুষের ; **তৎ**—তা ; **জিঘৃক্ষতঃ**—যখন তিনি গ্রহণ করবার ইচ্ছা করেছিলেন ;

কর্ণৌ—কর্ণ; **চ**—ও; **নিরভিদ্যেতাম্**—প্রকট হয়েছে; **দিশঃ**—দিক অথবা বায়ু দেবতা; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণ শক্তি; **গুণগ্রহঃ**—এবং শ্রবণ করার বস্তুসমূহ।

অনুবাদ

ঋষিদের জানবার ইচ্ছা বিকশিত হবার ফলে কর্ণ, শ্রবণ শক্তি, শ্রবণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং শ্রোতব্য বস্তুসমূহ প্রকট হয়েছে। ঋষিগণ পরমাত্মা সম্বন্ধে জানবার বাসনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়রূপ পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে জানবার প্রচেষ্টা করা উচিত। জ্ঞানের অর্থ কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান অথবা ভৌতিক জ্ঞানই নয়, যা ভগবানের পরিচালনায় পরিচালিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির মাঝে সক্রিয় ভৌতিক নিয়মের বিষয়ে জানতে অতি উৎসুক। তারা বেতার এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে অনেক দূরে অন্যান্য গ্রহে কি হচ্ছে তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে তাদের শ্রবণ শক্তি এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ভগবান দিয়েছেন পরমাত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে শ্রবণ করবার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত জড় বিষয়ের বর্ণনাকারী শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করার মাধ্যমে শ্রবণ শক্তির অসদ্ব্যবহার হচ্ছে। ঋষিরা কেবল বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান সম্বন্ধে শুনতে আগ্রহী ছিলেন; অন্য কোন বিষয়ে তাঁদের কোন রকম উৎসাহ ছিল না। সেটিই হচ্ছে শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞান গ্রহণের সূচনা।

শ্লোক ২৩

বস্তুনো মৃদুকাঠিন্যলঘুগুর্বোষ্ণশীততাম্।
জিঘৃক্ষতস্ত্বঙ্ নির্ভিন্না তস্যাং রোমমহীরুহাঃ।
তত্র চান্তর্বহির্বাতস্ত্বচা লব্ধগুণো বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

বস্তুনঃ—সমস্ত বস্তুর; **মৃদু**—কোমলতা; **কাঠিন্য**—কঠোরতা; **লঘু**—হালকা; **গুরু**—ভারী; **উষ্ণ**—উষ্ণতা; **শীততাম্**—শীতলতা; **জিঘৃক্ষতঃ**—অনুভব করার বাসনায়; **ত্বক্**—স্পর্শ; **নির্ভিন্না**—বিতরিত হয়েছে; **তস্যাম্**—ত্বকে; রোম—দেহের রোম; **মহীরুহাঃ**—বৃক্ষসমূহ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ; **তত্র**—সেখানে; **চ**—ও; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাহিরে; **বাতঃত্বচা**—স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বক; **লব্ধ**—উপলব্ধ হওয়ার পর; **গুণঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **বৃতঃ**—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

যখন কোমলতা, কাঠিন্য, উষ্ণতা, শীতলতা, লঘুতা এবং গুরুত্ব ইত্যাদি ভৌতিক গুণাবলী অনুভব করার বাসনা হয়েছিল, তখন ত্বক, রোমকূপ, দেহের রোম, এবং

তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ (বৃক্ষসমূহ) উৎপন্ন হয়েছে। ত্বকের ভিতরে এবং বাহিরে বায়ুর আবরণ রয়েছে, যার মাধ্যমে স্পর্শানুভূতি প্রকট হয়েছে।

তাৎপর্য

কোমলতা আদি বস্তুর ভৌতিক গুণাবলী ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করে, এবং তাই ভৌতিক জ্ঞান স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়। হাতের দ্বারা স্পর্শ করার মাধ্যমে তাপের মাত্রা অনুভব করা যায়। এবং কোন বস্তুকে হাত দিয়ে তোলার মাধ্যমে অনুভব করা যায় তা ভারী না হাল্কা। ত্বক, রোমকূপ এবং দেহের রোম স্পর্শানুভূতির ভিত্তিতে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ত্বকের ভিতরে এবং বাহিরে যে বায়ু প্রভাবিত হয় তাও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি জ্ঞানেরও উৎস, এবং তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভৌতিক অথবা দৈহিক জ্ঞান আত্মজ্ঞানের অধীন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মজ্ঞান বিস্তারিত হয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পর্যবসিত হতে পারে, কিন্তু ভৌতিক জ্ঞান কখনও আত্মজ্ঞানে পর্যবসিত হতে পারে না।

দেহের রোম এবং পৃথিবীর শরীরে বনস্পতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। তৃতীয় স্কন্ধে যার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে বনস্পতিসমূহ ত্বকের পুষ্টির জন্য ভোজন এবং ঔষধিস্বরূপ— *ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ।*

শ্লোক ২৪

হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্মচিকীর্ষয়া।
তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদানমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥

হস্তৌ—হস্ত; **রুরুহতুঃ**—প্রকাশিত হয়েছে; **তস্য**—তাঁর; **নানা**—বিবিধ; **কর্ম**—কর্ম; **চিকীর্ষয়া**—এইভাবে ইচ্ছা করে; **তয়োঃ**—তাদের; **তু**—কিন্তু; **বলবান্**—বল প্রদান করার জন্য; **ইন্দ্র**—স্বর্গের দেবতা; **আদানম্**—হস্তের কার্যকলাপ; **উভয়াশ্রয়ম্**—দেবতা এবং হস্ত উভয়ের উপরেই নির্ভরশীল।

অনুবাদ

তারপর পরম পুরুষ যখন বিবিধ কর্ম অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এবং স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র প্রকাশিত হন, সেই সঙ্গে হস্ত এবং দেবতা উভয়েরই উপর নির্ভরশীল কার্যও প্রকট হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র নয়। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর (*হৃষীকেশ*)। এইভাবে জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে প্রকট হয়, এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয় বিশেষ বিশেষ দেবতাদের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কেউই তার ইন্দ্রিয়ের মালিকানা দাবী করতে পারে না। জীব ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয়সমূহ দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের ভৃত্য। সৃষ্টির এই ব্যবস্থা। এইভাবে সব কিছুই চরমে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং জড়া প্রকৃতি অথবা জীব উভয়ের কেউই স্বতন্ত্র নয়। যে মায়াচ্ছন্ন জীব তার ইন্দ্রিয়ের প্রভু বলে নিজেকে দাবী করে, সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির কবলিত। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব তার ক্ষুদ্র অস্তিত্বে গর্বিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে হবে সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন। তার পক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তা সে নিজেকে যতই মুক্ত পুরুষ বলে ঘোষণা করুক না কেন।

শ্লোক ২৫

গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেঽভিকামিকাম্।
পদ্ভ্যাং যজ্ঞঃ স্বয়ং হব্যং কর্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ ২৫ ॥

গতিং—গতি ; **জিগীষতঃ**—ইচ্ছা করে ; **পাদৌ**—পদ ; **রুরুহাতে**—প্রকাশিত হয় ; **অভিকামিকাম্**—সার্থক ; **পদ্ভ্যাং**—পা থেকে ; **যজ্ঞঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ; **স্বয়ং**—স্বয়ং ; **হব্যং**—কর্তব্য ; **কর্মভিঃ**—স্বীয় কর্তব্যকর্ম থেকে ; **ক্রিয়তে**—করান ; **নৃভিঃ**—বিভিন্ন মানুষের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর গতি নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছার ফলে তাঁর পা প্রকট হয়, এবং তাঁর পা থেকে পায়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু উৎপন্ন হন। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মানুষেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানরূপ তাদের কর্তব্যকর্মে যুক্ত হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই তার বিশেষ কর্তব্যকর্মে যুক্ত, এবং তা বোঝা যায় যখন মানুষ ইতস্তত চলাফেরা করে। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলিতে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়—শহরের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তারা গভীর উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততা সহকারে ঘুরে বেড়ায়। এই গতিবিধি কেবল শহরেই সীমিত নয়, তা শহরের বাইরেও, অথবা এক শহর থেকে অন্য শহরেও বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের মাধ্যমে মানুষের চলাফেরার মাধ্যমে দৃষ্ট হয়। ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য মানুষ রাস্তায় গাড়িতে এবং রেলে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে এবং আকাশে বিমানের মাধ্যমে গমনাগমন করে। কিন্তু এই সমস্ত গতিবিধির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আরামদায়ক জীবন যাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এই প্রকার আরামদায়ক জীবনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মানবিক কার্যকলাপে

বৈজ্ঞানিকেরা ব্যস্ত, শিল্পীরা ব্যস্ত, ইঞ্জিনিয়ারেরা ব্যস্ত, কারিগরেরা ব্যস্ত। কিন্তু তারা জানে না কিভাবে তাদের কার্যকলাপ সার্থক করে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। যেহেতু তারা সেই রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তাদের সমস্ত কার্যকলাপ অসংযত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, এবং তাই এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা তারা অজ্ঞাতসারে গভীর তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে অধঃপতিত হচ্ছে।

যেহেতু তারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়েছে তাই তারা সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গেছে, এবং তাই তারা মেনে নিয়েছে যে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগ। কিন্তু এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা কখনো মানুষকে তাদের ঈপ্সিত শান্তি প্রদান করতে পারে না,এবং তাই প্রকৃতির সমস্ত সম্পদের ব্যবহার করার মাধ্যমে জ্ঞানের সব রকম প্রগতি সত্ত্বেও এই জড় সভ্যতায় কেউই সুখী নয়। প্রকৃত রহস্য হচ্ছে যে প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষের কর্তব্য বিশ্ব শান্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৪৫-৪৬) সেই একই উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—"মানুষ কিভাবে কেবল তার বিশেষ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে তা তুমি আমার কাছে শ্রবণ কর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি সর্বব্যাপ্ত এবং যাঁর নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি জীব ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুসারে ঈপ্সিত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তাঁর আরাধনা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমেই কেবল সে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে।"

মানুষের বিভিন্ন প্রকার প্রবণতা থাকলে ক্ষতি নেই, কেননা বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করার স্বাতন্ত্র্য মানুষের রয়েছে। তবে কেউই যে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র নয়, সেটি ভালভাবে অবগত হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সকলেরই কর্তব্য, সেই সত্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে মহাজনদের নির্দেশ অনুসারে প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের ফল নিবেদন করা। এই কর্তব্য সম্পাদনে পা হচ্ছে দেহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কেননা পায়ের সাহায্য ব্যতীত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমনাগমন করা যায় না। তাই, সমস্ত মানুষের পায়ের উপর ভগবানের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যা যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৬

নিরভিদ্যত শিশ্নো বৈ প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ ।
উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৬ ॥

নিরভিদ্যত—নির্গত হয়েছে; **শিশ্নঃ**—উপস্থ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রজানন্দ**—মৈথুনসুখ; **অমৃতার্থিনঃ**—অমৃত আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষী; **উপস্থঃ**—পুরুষ অথবা স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়; **আসীৎ**—প্রকাশিত হয়েছে; **কামানাম্**—কামার্তদের; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **তৎ**—তা; **উভয়াশ্রয়ম্**—উভয়েরই আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর মৈথুন সুখের জন্য, সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের জন্য এবং স্বর্গের অমৃত আস্বাদনের জন্য ভগবান জননেন্দ্রিয় প্রকাশ করেছেন। এই জননেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেব হচ্ছেন প্রজাপতি। মৈথুন সুখের বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ভগবানের উপস্থের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের জন্য স্বর্গীয় সুখ হচ্ছে মৈথুন, এবং এই সুখ আস্বাদন হয় উপস্থের মাধ্যমে। স্ত্রী হচ্ছে যৌন সুখের বিষয়, এবং যৌন সুখের ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং স্ত্রী উভয়েই প্রজাপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং প্রজাপতি ভগবানের উপস্থের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই শ্লোক থেকে নির্বিশেষবাদীদের ভালমত জেনে রাখা উচিত যে ভগবান নির্বিশেষ নন, কেননা তাঁর উপস্থও রয়েছে, যার উপর মৈথুনের সমস্ত সুখদায়ক বিষয় আশ্রয় করে রয়েছে। মৈথুনের মাধ্যমে স্বর্গীয় অমৃত আস্বাদনের সুখ যদি না থাকত তা হলে কেউই সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের কষ্ট স্বীকার করত না। বদ্ধ জীবকে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং তাই সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীব-সৃষ্টির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৈথুন সুখের প্রবণতা রয়েছে, এবং এই মৈথুন সুখ উপভোগ করার মাধ্যমেও ভগবানের সেবা করা যায়। সেই সেবাটি হচ্ছে—এই প্রকার মৈথুন সুখ আস্বাদনের মাধ্যমে যে সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়, তাদের যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার শিক্ষা প্রদান করা। সমগ্র জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের সুপ্ত ভগবচ্চেতনা বিকশিত করা। মানুষ ব্যতীত অন্য প্রকার জীবনে ভগবানের সেবা করার উদ্দেশ্যে মৈথুন সুখের উপভোগ হয় না। কিন্তু মনুষ্য জন্ম লাভ করার ফলে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপযুক্ত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করতে পারে। মানুষ মৈথুনের এই দিব্যসুখ আস্বাদন করে শত শত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করতে পারে, যদি সে তাদের ভগবদ্ভক্তিতে শিক্ষিত করতে পারে; তা না হলে সন্তান-সন্ততির উৎপাদন শূকরের প্রজননের মতো। প্রকৃতপক্ষে, সেই ব্যাপারে

শূকরেরা মানুষদের থেকেও অধিক দক্ষ,কেননা তারা এক-একবারে কয়েক গণ্ডা করে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মানুষ কেবল একটিমাত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারে। তাই সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, উপস্থ, মৈথুন সুখ, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি, এরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবার সম্পর্কে সম্পর্কিত, এবং যারা ভগবানের সেবা করার এই সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, তারা প্রকৃতির নিয়মে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে। মৈথুন সুখ উপভোগের অনুভূতি কুকুরেরও রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ভগবচ্চেতনা নেই। মানব জীবন এবং পশু জীবনের পার্থক্য কেবল ভগবচ্চেতনার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ২৭

উৎসিসৃক্ষোর্ধাতুমলং নিরভিদ্যত বৈ গুদম্ ।
ততঃ পায়ুস্ততো মিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

উৎসিসৃক্ষোঃ—ত্যাগ করার ইচ্ছায়; **ধাতুমলম্**—খাদ্যের অসার অংশ; **নিরভিদ্যত**—প্রকট হয়েছে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **গুদম্**—মলদ্বার; **ততঃ**—তারপর; **পায়ুঃ**—মলত্যাগের ইন্দ্রিয়; **ততঃ**—তারপর; **মিত্র**—দেবতা; **উৎসর্গ**—পরিত্যক্ত বস্তু; **উভয়**—উভয়; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর ভুক্ত অন্নাদির অসারাংশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে মলদ্বার স্বরূপ অধিষ্ঠান উৎপন্ন হল এবং তারপর পায়ু-ইন্দ্রিয় ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মিত্র প্রকাশিত হলেন। পায়ু ইন্দ্রিয় এবং ত্যক্ত বস্তু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছেন মিত্র দেবতা।

তাৎপর্য

মলত্যাগ করার ব্যাপারেও পরিত্যক্ত বস্তু যখন নিয়ন্ত্রিত, তখন জীব কিভাবে তার স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে?

শ্লোক ২৮

আসিসৃপ্সোঃ পুরঃ পুর্যা নাভিদ্বারমপানতঃ ।
তত্রাপানস্ততো মৃত্যুঃ পৃথকত্বমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥

আসিসৃপ্সোঃ—সর্বত্র গমন করার ইচ্ছায়; **পুরঃ**—ভিন্ন ভিন্ন দেহে; **পুর্যাঃ**—এক দেহ থেকে; **নাভিদ্বারম্**—নাভি বা উদরের ছিদ্র; **অপানতঃ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **তত্র**—তারপর; **অপানঃ**—প্রাণ শক্তির নিরোধ; **ততঃ**—তারপর; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **পৃথকত্বম্**—পৃথকরূপে; **উভয়**—উভয়; **আশ্রয়ম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর যখন তিনি এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন নাভি, অপান বায়ু এবং মৃত্যু একসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। মৃত্যু এবং অপান বায়ু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছে নাভি।

তাৎপর্য

প্রাণ বায়ু জীবনকে ধারণ করে, এবং অপান বায়ু জীবনীশক্তিকে রোধ করে। এই উভয়ই নাভি থেকে উৎপন্ন হয়। এই নাভি এক দেহের সঙ্গে আরেক দেহের যোগসূত্র। ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে ভিন্ন শরীর রূপে প্রকট হয়েছিলেন, এবং অন্যান্য দেহের জন্মের ব্যাপারেও এই নিয়মই পালন হয়ে থাকে। একটি শিশুর শরীর তার মায়ের শরীর থেকে উৎপন্ন হয়, এবং শিশুটি যখন তার মায়ের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তা হয়ে থাকে নাভিগ্রন্থি ছিন্ন করার মাধ্যমে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাই জীবেরা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং সেই সূত্রে তাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

শ্লোক ২৯

আদিৎসোরন্নপানানামাসন্ কুক্ষ্যন্ত্রনাড়য়ঃ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ তয়োস্তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তদাশ্রয়ে ॥ ২৯ ॥

আদিৎসোঃ—প্রাপ্ত হওয়ার বাসনায়; **অন্ন-পানানাম্**—আহার এবং পানীয়; **আসন্**— হয়েছিল; **কুক্ষি**—উদর; **অন্ত্র**—অন্ত্র; **নাড়য়ঃ**—ধমনী; **নদ্যঃ**—নদীসমূহ; **সমুদ্রাঃ**—সমুদ্রসমূহ; **চ**—ও; **তয়োঃ**—তাদের; **তুষ্টিঃ**—পালন পোষণ; **পুষ্টিঃ**—পুষ্টি; **তৎ**—তাদের; **আশ্রয়ে**—উৎস।

অনুবাদ

যখন তাঁর আহার এবং পান করার ইচ্ছা হয়েছিল তখন কুক্ষি, অন্ত্র, ও নাড়ীসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল; নদী এবং সমুদ্রসমূহ তুষ্টি এবং পুষ্টির উৎস।

তাৎপর্য

নদীসমূহ নাড়ী-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং সমুদ্রসমূহ অন্ত্র-ইন্দ্রিয়ের দেবতা। আহার এবং পানীয়ের দ্বারা উদর পূর্তির ফলে পুষ্টি হয় এবং আহার ও পানের ফলে দেহের শক্তির পুনঃযোজন হয় পুষ্টির মাধ্যমে। তাই শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে অন্ত্র এবং নাড়ীর সুস্থ কার্যকলাপের উপর। নদী এবং সমুদ্র তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হওয়ার ফলে নাড়ী এবং অন্ত্রকে সুস্থ রাখে।

শ্লোক ৩০

নিদিধ্যাসোরাত্মমায়াং হৃদয়ং নিরভিদ্যত।
ততো মনশ্চন্দ্র ইতি সংকল্পঃ কাম এব চ ॥ ৩০ ॥

নিদিধ্যাসোঃ—জানবার ইচ্ছায় ; **আত্মমায়াম্**—স্বীয় শক্তি ; **হৃদয়ম্**—মনের অধিষ্ঠান ; **নিরভিদ্যত**—প্রকাশিত হয়েছিল ; **ততঃ**—তারপর ; **মনঃ**—মন ; **চন্দ্রঃ**— মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র ; **ইতি**—এইভাবে ; **সংকল্পঃ**—সংকল্প ; **কাম**—অভিলাষ ; **এব**—যতখানি ; **চ**—ও।

অনুবাদ

যখন তাঁর স্বীয় মায়ার কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন হৃদয় (মনের অধিষ্ঠান), মন, চন্দ্র, সংকল্প এবং অভিলাষ উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবের হৃদয় পরমেশ্বর ভগবানের অংশ পরমাত্মার আসন। তাঁর উপস্থিতি ব্যতীত জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কার্য করার শক্তি লাভ করতে পারে না। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবেরা তাদের স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে এই সৃষ্টিতে প্রকট হয়, এবং পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাদের সকলকে উপযুক্ত জড় শরীর দান করে। সেকথা ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই, পরমাত্মা যখন বদ্ধ জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন বদ্ধ জীবের মন প্রকাশিত হয় এবং সে তার বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, ঠিক যেমন ঘুম থেকে ওঠার পর মানুষ তার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়। তাই পরমাত্মা যখন জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন জীবের মনের বিকাশ হয় এবং তারপর মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (চন্দ্র) এবং মনের কার্যকলাপ (যথা চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা) প্রকাশিত হয়। হৃদয়ের প্রকাশ না হলে মনের কার্যকলাপ শুরু হতে পারে না, এবং হৃদয়ের প্রকাশ হয় যখন ভগবান জড় সৃষ্টির কার্যকলাপ দর্শন করতে ইচ্ছে করেন।

শ্লোক ৩১

ত্বক্চর্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্থিধাতবঃ।
ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ ॥ ৩১ ॥

ত্বক্—চামড়ার পাতলা আবরণ ; **চর্ম**—চামড়া ; **মাংস**—মাংস ; **রুধির**—রক্ত ; **মেদঃ**—মেদ ; **মজ্জা**—মজ্জা ; **অস্থি**—হাড় ; **ধাতবঃ**—ধাতু ; **ভূমি**—মাটি ; **অপ**—জল ; **তেজঃ**—অগ্নি ; **ময়াঃ**—প্রাধান্য ; **সপ্ত**—সাত ; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু ; **ব্যোম্**—আকাশ ; **অম্বু**—জল ; **বায়ুভিঃ**—বায়ুর দ্বারা।

অনুবাদ

দেহের সপ্তধাতু, যথা ত্বক, চর্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা এবং অস্থি উৎপন্ন হয়েছে মাটি, জল এবং অগ্নি থেকে। আর আকাশ, জল, এবং বায়ু থেকে প্রাণবায়ু প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগৎ গঠিত হয়েছে প্রধানত মাটি, জল এবং আগুন এই তিনটি উপাদানের দ্বারা। কিন্তু প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়েছে আকাশ, বায়ু ও জল থেকে। তাই জল সমস্ত জড় সৃষ্টির স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় উপাদানেই বর্তমান। তাই জড় সৃষ্টিতে জল পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে মুখ্য উপাদান। এই জড় দেহ পঞ্চ মহাভূত কর্তৃক গঠিত, এবং স্থূল সৃষ্টি মাটি, জল, আগুন এই তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত। স্পর্শের অনুভব হয় ত্বকের সূক্ষ্ম আবরণের ফলে, আর অস্থি পাথরের মতো শক্ত। প্রাণবায়ু আকাশ, বায়ু এবং জল থেকে উৎপন্ন, এবং তাই উন্মুক্ত বায়ু, নিয়মিত স্নান এবং বাসের জন্য প্রশস্ত জায়গা সুস্থ জীবনের জন্য আবশ্যক। স্থূল শরীরের রক্ষার জন্য পৃথিবী থেকে উৎপন্ন অন্ন, শাকসব্জী, বিশুদ্ধ জল এবং উষ্ণতা লাভপ্রদ।

শ্লোক ৩২

গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি ভূতাদিপ্রভবা গুণাঃ।
মনঃ সর্ববিকারাত্মা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপিণী ॥ ৩২ ॥

গুণাত্মকানী—গুণসমূহে লিপ্ত; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ভূতাদি**—অহংকার; **প্রভবাঃ**—প্রভাবিত; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **মনঃ**—মন; **সর্ব**—সমস্ত; **বিকার**—আসক্তি (সুখ এবং দুঃখ); **আত্মা**—রূপ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বিজ্ঞান**—বিশেষ বিবেচনাপ্রসূত জ্ঞান; **রূপিণী**—রূপ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়সমূহ জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যুক্ত, এবং গুণসমূহ অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন। মন সর্ব প্রকার জড় অভিজ্ঞতার (সুখ এবং দুঃখ) দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং বুদ্ধি মনের বিবেচনা করার ক্ষমতাস্বরূপ।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব তার অহঙ্কারকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, জীব যখন জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আত্মারূপে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এই অহঙ্কার জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গ করে এবং তার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি জড়া

প্রকৃতির গুণে লিপ্ত হয়। মন বিভিন্ন জড় অভিজ্ঞতা অনুভব করার যন্ত্র, কিন্তু বুদ্ধি হচ্ছে বিবেকসম্পন্ন এবং তা সব কিছুকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে পারে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যথাযথভাবে তার বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসার জীবনের জটিল পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি অনুসন্ধান করতে শুরু করেন তিনি কে, তিনি কেন বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছেন এবং এই সব দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে তিনি কিভাবে নিস্তার পেতে পারেন। তার ফলে সৎসঙ্গের প্রভাবে উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ আত্ম উপলব্ধির শ্রেষ্ঠতর জীবনের প্রতি উন্মুখ হন। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যেন মুক্তিপথগামী সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ করেন। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে জড় বিষয়ের প্রতি বদ্ধ জীবাত্মার আসক্তি উপশমের উপদেশ লাভ করা যায়, এবং তার ফলে বুদ্ধিমান মানুষ ধীরে ধীরে মায়া এবং অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবনে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তেব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **স্থূলম্**—স্থূল; **তে**—আপনাকে; **ব্যাহৃতম্**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মহী**—লোকসমূহ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **চ**—অন্তহীনভাবে; **আবরণৈঃ**—আবরণসমূহের দ্বারা; **অষ্টভিঃ**—আটটি; **বহিঃ**—বাহ্য; **আবৃতম্**—আবৃত।

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা রূপ পৃথিবী আদি অষ্ট আবরণের দ্বারা আবৃত, যা আমি পূর্বে আপনার কাছে বিশ্লেষণ করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতি মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট আবরণের দ্বারা আবৃত। এই সব আবরণ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি থেকে উদ্ভূত। এই আবরণ অনেকটা মেঘের দ্বারা সূর্যের আবৃত হওয়ার মতো। মেঘ সূর্যের সৃষ্টি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা চক্ষুকে আবৃত করে যার ফলে সূর্যকে দেখা যায় না। সূর্য কখনো মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না। মেঘ বড় জোর আকাশে কয়েকশো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, কিন্তু সূর্য কোটি কোটি মাইল থেকেও বড়। তাই কয়েকশো মাইল দীর্ঘ আবরণ কখনো কোটি কোটি মাইলকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের

বিবিধ শক্তির একটি মাত্র শক্তি কখনই ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত আবরণ জড় জগতের উপর আধিপত্য করার অভিলাষী বদ্ধ জীবদের চক্ষুকে আবৃত করার জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের মোহময়ী সৃজনী শক্তি রূপ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ভগবান তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার রাখেন। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারে না, তাই তারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং ভগবানের চিন্ময় রূপ অস্বীকার করে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বিরাট রূপের আবরণ স্বীকার করে, এবং তা কিভাবে হয়, তার ব্যাখ্যা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্বিশেষণম্ ।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥

অতঃ—অতএব ; **পরম্**—চিন্ময় ; **সূক্ষ্মতম্**—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত ; **নির্বিশেষণম্**—জড় রূপবিহীন ; **অনাদি**—আদিরহিত ; **মধ্য**—মধ্যবর্তী অবস্থারহিত ; **নিধনম্**—অন্ত রহিত ; **নিত্যম্**—নিত্য ; **বাক্**—বাণী ; **মনসঃ**—মনের ; **পরম্**—চিন্ময়।

অনুবাদ

অতএব এর (জড় জগতের) অতীত এক দিব্য জগৎ রয়েছে যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। সেই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত নেই ; তাই তা বাণী অথবা চিন্তার অতীত এবং তা জড় ধারণা থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের স্থূল বাহ্য রূপ সাময়িক বিরতির পর প্রকাশ হয়, তাই পরমেশ্বর ভগবানের এই বহিরঙ্গা রূপ তাঁর নিত্য রূপ নয়, যা আদি, মধ্য এবং অন্তহীন। যার আদি, মধ্য এবং অন্ত রয়েছে তাকে বলা হয় জড়। এই জড় জগতের শুরু হয়েছে ভগবান থেকে এবং তাই জগতের সৃষ্টির অতীত ভগবানের যে রূপ তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা সবচাইতে সূক্ষ্ম জড় ধারণারও অতীত। জড় জগতে আকাশ সূক্ষ্মতম বলে মনে করা হয়। তার থেকেও সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। কিন্তু এই আটটি বাহ্য আবরণকে পরম সত্যের বহিরাবরণ বলে বর্ণনা করা হয়, তাই পরম সত্য জড় ধারণার অনুমান এবং অভিব্যক্তির অতীত। তিনি অবশ্যই সমস্ত জড় ধারণার অতীত, তাই তাঁকে বলা হয় *নির্বিশেষণম্*। কিন্তু তা বলে এটা কখনও মনে করা উচিত নয় যে তিনি চিন্ময় গুণাবলীরহিত। *বিশেষণম্* মানে হচ্ছে গুণাবলী। তাই *নিঃ* যোগ করার ফলে তার অর্থ হচ্ছে যে তার কোন জড় গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই। এই নিষেধাত্মক পদে চারটি দিব্য গুণ রয়েছে, যথা অব্যক্ত, পরম, নিত্য এবং মন ও বাক্যের অতীত। বাক্যের অতীত

মানে জড় ধারণাশূন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না চিন্ময় স্তরে স্তরে অধিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ তার পক্ষে ভগবানের দিব্যরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৫

অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৫ ॥

অমুনী—এই সমস্ত; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **রূপে**—রূপসমূহে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **হি**—নিশ্চয়ই; **অনুবর্ণিতে**—ক্রমশ বর্ণিত; **উভে**—উভয়; **অপি**—ও; **ন**—না; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করে; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **সৃষ্টে**—এইভাবে সৃষ্ট হয়ে; **বিপশ্চিতঃ**—জ্ঞানী।

অনুবাদ

জড় দৃষ্টিকোণ থেকে ভগবানের যে উপরোক্ত বর্ণনা আপনার কাছে করলাম, তা ভগবানের সম্বন্ধে অবগত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা পূর্ববর্ণিত দুটি রূপে পরমেশ্বর ভগবানকে চিন্তা করে। একদিকে তারা ভগবানের সর্বব্যাপ্ত বিশ্বরূপের আরাধনা করে, আবার অ[illegible]পক্ষে তারা ভগবানের অব্যক্ত, অবর্ণনীয় সূক্ষ্মরূপের চিন্তা করে। সর্বেশ্বরবাদ এবং [illegible]কেশ্বরবাদ যথাক্রমে ভগবানের স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপের ধারণায় প্রযোজ্য [illegible]গবদ্ভক্ত এই দুটি সিদ্ধান্তকেই উপেক্ষা করেন, কেননা তাঁরা যথা[illegible]ক [illegible]নেন। সেকথা ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে অতি স্পষ্টভাবে [illegible]ছে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন প্রসঙ্গে অর্জুনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ (ভগবদ্গীতা ১১/৪৫)

ভগবানের শুদ্ধভক্ত অর্জুন পূর্বে কখনো ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেননি, কিন্তু যখন তিনি তা দর্শন করলেন, তখন তাঁর কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে ভগবানের সেই রূপ দর্শন করে তিনি প্রসন্ন হননি। ভগবানের সেই বিরাট রূপ দেখে তিনি ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ অথবা কৃষ্ণরূপ ধারণ করতে, যা কেবল অর্জুনের প্রসন্নতা বিধান করতে পারত। নিঃসন্দেহে ভগবানের নিজেকে অনেক রূপে প্রকাশ

করার পরম শক্তি রয়েছে, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা *ত্রিপাদ-বিভূতি* নামক ভগবদ্ধামে ভগবান যে নিত্যরূপ প্রকাশ করেন তাই দর্শন করতে আগ্রহী। *ত্রিপাদ-বিভূতি* সমন্বিত তাঁর ধামে ভগবান চতুর্ভুজ রূপে অথবা দ্বিভুজরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। জড় জগতে ভগবান যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন তার অসংখ্য হাত এবং সর্বতোভাবে অন্তহীন রূপে তিনি তাঁর অসীম বিস্তার প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁকে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ অথবা কৃষ্ণরূপে আরাধনা করেন। কখনও কখনও ভগবান কৃপাপূর্বক শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনৃসিংহদেব আদি তাঁর বৈকুণ্ঠের রূপ সমূহ জড় জগতে প্রকাশ করেন, এবং তখন ভগবানের শুদ্ধভক্তেরা তাঁদের আরাধনা করেন। সাধারণত ভগবান জড় জগতে যে সমস্ত বাহ্য ও স্থূল রূপে প্রকাশিত হন, বৈকুণ্ঠলোকে তাদের অস্তিত্ব নেই, এবং তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাও সেই প্রকাশসমূহকে স্বীকার করেন না। প্রথম থেকেই ভক্তেরা বৈকুণ্ঠলোকে স্থিত ভগবানের শাশ্বত রূপসমূহের আরাধনা করেন। নির্বিশেষবাদী অভক্তেরা ভগবানের জড় রূপসমূহ কল্পনা করে এবং চরমে ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা প্রাথমিক অবস্থা তথা সিদ্ধিলাভের মুক্ত অবস্থা, উভয় অবস্থাতেই চিরকাল ভগবানের আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তের আরাধনা কখনও শেষ হয় না, কিন্তু মুক্তি লাভের পর নির্বিশেষবাদী যখন ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের নির্বিশেষ রূপে লীন হয়ে যায়, তখন তার আরাধনা বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের এখানে *বিপশ্চিত*, বা পূর্ণরূপে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞানী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্ ।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্মাকর্মকঃ পরঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি ; **বাচ্য**—তাঁর রূপসমূহ এবং কার্যকলাপের দ্বারা ; **বাচকতয়া**—তাঁর চিন্ময় গুণাবলী এবং পরিকর দ্বারা ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ব্রহ্ম**—পরম ; **রূপধৃক্**—গোচরীভূত রূপ ধারণ করে ; **নাম**—নাম ; **রূপ**—রূপ ; **ক্রিয়া**—লীলাসমূহ ; **ধত্তে**—স্বীকার করেন ; **সকর্ম**—কর্মে লিপ্ত ; **অকর্মকঃ**—প্রভাবিত না হয়ে ; **পরঃ**—চিন্ময়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় নাম, রূপ, লীলা, পরিকর এবং বৈচিত্র্যের বিষয় হয়ে নিজেকে এক অপ্রাকৃত রূপে প্রকাশ করেন। যদিও তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, তথাপি মনে হয় যেন তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত।

তাৎপর্য

যখনই জড় সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান এই জড়জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন। মানুষের উচিত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে যথাযথভাবে তাঁর লীলাসমূহ জানা। তাদের কখনো মনে করা উচিত নয় যে তিনি জড় রূপ ধারণ করে এই জগতে অবতীর্ণ হন। জড়া প্রকৃতি থেকে গৃহীত যে কোন রূপ এই সংসারের প্রত্যেক বস্তুর প্রতি অনুরক্ত। যে বদ্ধ জীব কোন কার্যের প্রয়োজনে জড় রূপ গ্রহণ করে, সে জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও ভগবানের বিবিধ রূপ এবং কার্যকলাপ বদ্ধ জীবের মতোই প্রতীত হয়, তথাপি সেই রূপ এবং কার্যকলাপ অপ্রাকৃত এবং বদ্ধ জীবের পক্ষে তা সম্পাদন করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবান কখনো এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবদ্গীতায় (৪/১৪) ভগবান বলেছেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥

বিভিন্ন অবতারে ভগবান আপাতদৃষ্টিতে যে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন, তার দ্বারা তিনি কখনো প্রভাবিত হননা, এবং সকাম কর্মের দ্বারা সাফল্য অর্জন করার কোন বাসনাও তাঁর নেই। ভগবান ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আদি বিভিন্ন শক্তির দ্বারা পূর্ণ, এবং তাই তাঁকে বদ্ধ জীবের মতো দৈহিক পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন হয় না। যে বুদ্ধিমান মানুষ ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ এবং বদ্ধ জীবের কার্যকলাপের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, তিনিও কখনো তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব রূপে ভগবান জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণকে সঞ্চালন করেন। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, এবং ব্রহ্মা থেকে শিবের জন্ম হয়। কখনো কখনো ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ এবং কখনো কখনো ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বয়ং। এইভাবে ব্রহ্মা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টি করেন, যার অর্থ হচ্ছে ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর অধিকৃত সহকারীদের মাধ্যমে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ৩৭-৪০

প্রজাপতীন্মনূন্ দেবানৃষীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্ ॥ ৩৭ ॥
কিন্নরাঽপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষান্নরান্।
মাতৃ রক্ষঃপিশাচাংশ্চ প্রেতভূতবিনায়কান্ ॥ ৩৮ ॥
কুষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি।
খগান্মৃগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্নৃপ সরীসৃপান্ ॥ ৩৯ ॥

**দ্বিবিধাশ্চতুর্বিধা যেঽন্যে জলস্থলনভৌকসঃ ।
কুশলাকুশলা মিশ্রাঃ কর্মণাং গতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪০ ॥**

প্রজাপতীন্—ব্রহ্মা এবং দক্ষ আদি তাঁর পুত্রগণ ; **মনূন্**—বৈবস্বত মনু প্রমুখ মনুগণ ; **দেবান্**—ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাগণ ; **ঋষীন্**—ভৃগু এবং বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ ; **পিতৃগণান্**—পিতৃলোকের অধিবাসীগণ ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে ; **সিদ্ধ**— সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ ; **চারণ**—চারণলোকের অধিবাসীগণ ; **গন্ধর্বান্**—গন্ধর্বলোকের অধিবাসীগণ ; **বিদ্যাধ্র**—বিদ্যাধর লোকের অধিবাসীগণ ; **অসুর**—নাস্তিকগণ ; **গুহ্যকান্**—যক্ষলোকের অধিবাসীগণ ; **কিন্নর**—কিন্নরলোকের অধিবাসীগণ ; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরালোকের সুন্দর দেবদূতীগণ ; **নাগান্**—নাগলোকের নাগতুল্য অধিবাসীগণ ; **সর্পান্**—সর্পলোকের অধিবাসীগণ ; **কিম্পুরুষান্**—কিম্পুরুষ লোকের বানরাকৃতি অধিবাসীগণ ; **নরান্**—পৃথিবীর অধিবাসীগণ ; **মাতৃ**—মাতৃলোকের অধিবাসীগণ ; **রক্ষঃ**—রাক্ষসলোকের অধিবাসীগণ ; **পিশাচান্**—পিশাচলোকের অধিবাসীগণ ; **চ**—ও ; **প্রেত**—প্রেতলোকের অধিবাসীগণ ; **ভূত**—ভূত ; **বিনায়কান্**—বিনায়ক নামক প্রেতাত্মাগণ ; **কূষ্মাণ্ড**—কূষ্মাণ্ড ; **উন্মাদ**—উন্মাদ ; **বেতালান্**—বেতাল ; **যাতুধানান্**—এক প্রকার প্রেতাত্মা ; **গ্রহান্**—শুভ এবং অশুভ নক্ষত্রগণ ; **অপি**—ও ; **খগান্**—পক্ষীগণ ; **মৃগান্**—বন্যজন্তুগণ ; **পশূন্**—গৃহপালিত পশুগণ ; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষসমূহ ; **গিরীন্**—পর্বতসমূহ ; **নৃপ**—হে রাজন্ ; **সরীসৃপান্**— সরীসৃপগণ ; **দ্বিবিধাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ ; **চতুর্বিধাঃ**—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জাদি চার প্রকার জীব ; **যে**—অন্যান্যরা ; **অন্যে**—অন্য সমস্ত ; **জল**—জল ; **স্থল**—স্থল ; **নভ-ওকসঃ**—পক্ষীগণ ; **কুশল**—প্রসন্নতা ; **অকুশলাঃ**—দুঃখী ; **মিশ্রাঃ**—সুখ এবং দুঃখ মিশ্রিত ; **কর্মণাম্**—পূর্বকৃত স্বীয় কর্ম অনুসারে ; **গতয়ঃ**—ফলস্বরূপ ; **তু**—কিন্তু ; **ইমাঃ**—তারা সকলে।

অনুবাদ

হে রাজন্ ! জেনে রাখুন যে, সমস্ত জীবই তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা এবং দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ, বৈবস্বত মনু প্রমুখ মনুগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাগণ, ভৃগু, ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ, পিতৃলোক এবং সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর, মাতৃ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কূষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, পশু, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পর্বত, স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ, আদি চতুর্বিধ প্রাণী, জলচর, ভূচর ও খেচরসমূহ সুখী, অসুখী অথবা সুখ-দুঃখের মিশ্র অবস্থায় সমস্ত জীব তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে।

তাৎপর্য

এই তালিকায় যে সমস্ত বিভিন্ন জীবের উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক থেকে সর্বনিম্নলোক পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে সমস্ত জীবই সর্বশক্তিমান পিতা বিষ্ণু কর্তৃক সৃষ্ট। তাই কেউই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/৪) ভগবান তাই সমস্ত জীবদের তাঁর সন্তান-সন্ততি বলে ঘোষণা করে বলেছেনঃ

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

জড়া প্রকৃতিকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যদিও দেখা যায়, প্রতিটি জীব মায়ের শরীর থেকে উৎপন্ন হচ্ছে, তথাপি মা সেই জন্মের পরম কারণ নন। পিতা হচ্ছেন জন্মের পরম কারণ। পিতার বীজ ব্যতীত কোন মাতাই সন্তানের জন্ম দান করতে পারেন না। তাই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন স্থিতিতে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের বীজ থেকে, এবং অল্পজ্ঞ মানুষেরাই কেবল মনে করে যে তাদের জন্ম হয়েছে জড়া প্রকৃতি থেকে। পরমেশ্বর ভগবানের জড়া প্রকৃতির অধীন হওয়ার ফলে ব্রহ্মা থেকে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন শরীরে প্রকট হয়েছে।

জড়া-প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের একটি শক্তি (ভগবদ্গীতা ৭/৪)। জীবাত্মার তুলনায় জড়া প্রকৃতি নিকৃষ্ট, কেননা জীবাত্মা ভগবানের পরা প্রকৃতি সম্ভূত। ভগবানের পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতির সমন্বয়ে সমগ্র জাগতিক বিষয়সমূহ প্রকট হয়।

কিছু জীব তুলনামূলকভাবে সুখী জীবনে অবস্থিত এবং অন্যেরা দুঃখময় জীবনে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবনে কেউই সুখী নয়। কারাগারে কেউই সুখী হতে পারে না, যদিও কেউ প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হতে পারে এবং অন্য কেউ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হতে পারে। তাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী জীবন থেকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী জীবনে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা না করে সর্বতোভাবে কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। কেউ প্রথম শ্রেণীর কয়েদীতে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরও আবার তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীতে অধঃপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা। সেটিই হচ্ছে সমস্ত জীবের প্রকৃত গন্তব্যস্থল।

শ্লোক ৪১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ সুরনৃনারকাঃ।
তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা।
যদৈকৈকতরোঽন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যতে ॥ ৪১ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ ; **রজঃ**—রজোগুণ ; **তমঃ**—তমোগুণ ; **ইতি**—এই প্রকার ; **তিস্রঃ**—তিন ; **সুর**—দেবতা ; **নৃ**—মানুষ ; **নারকাঃ**—নারকীয় অবস্থায় যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে ; **তত্র অপি**—এখানেও ; **একৈকশঃ**—আরেকটি ; **রাজন্**—হে রাজন ; **ভিদ্যন্তে**—বিভক্ত ; **গতয়ঃ**—গতিবিধি ; **ত্রিধা**—তিন ; **যদা**—সেই সময় ; **একৈকতরাঃ**—একে অপরের সম্পর্ক ; **অন্যাভ্যাম্**—অন্য থেকে ; **স্বভাবঃ**—অভ্যাস ; **উপহন্যতে**—উদ্ভূত হয়।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজো এবং তমো, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অনুসারে দেব, নর এবং নারকী, এই তিন প্রকার জীব রয়েছে। হে রাজন্! এমনকি একটি গুণ প্রকৃতির অপর দুটি গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পুনরায় তিনটি গুণে বিভক্ত হয়, এইভাবে প্রতিটি জীব অন্য গুণ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের অভ্যাস অর্জন করে।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব পৃথক পৃথকভাবে প্রকৃতির কোন বিশেষ গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, আবার সেই সঙ্গে তার ওপর অন্য দুটি গুণের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাও থাকে। সাধারণত জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ সমস্ত জীবেরা রজো গুণের দ্বারা প্রভাবিত, কেননা তারা সকলেই তাদের ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রজো গুণের প্রভাব সত্ত্বেও সঙ্গ প্রভাবে অন্য দুটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাও সব সময় থাকে। কেউ যদি সৎসঙ্গ করে তা হলে তার মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর কেউ যদি অসৎ সঙ্গ করে, তা হলে তার মধ্যে তমোগুণের বিকাশ হবার সম্ভাবনা থাকে। কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। সৎ অথবা অসৎ সঙ্গের প্রভাবে মানুষ তার অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারে, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে ভাল এবং মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করা। সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সেবা করা, এবং সেই সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হওয়া যায়, যা আমরা ইতিপূর্বে শ্রীল নারদমুনির জীবনে দর্শন করেছি। কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করার ফলে তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। জন্ম অনুসারে তিনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, এবং তাঁর পিতা যে কে তা তাঁর জানা ছিল না ; এমনকি তাঁর কোন রকম বিদ্যা শিক্ষাও ছিল না। কিন্তু কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং তাঁদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করার ফলে তিনি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। এই প্রকার সঙ্গ করার ফলে তাঁর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার বাসনা প্রকট হয়েছিল। আর ভগবানের মহিমা যেহেতু ভগবান থেকে অভিন্ন, ভগবানের সেই শব্দরূপী প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করেছিলেন।

তেমনই (ষষ্ঠ স্কন্ধে) অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে। অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান, এবং ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বারবনিতার অসৎ সঙ্গ প্রভাবে তিনি চণ্ডালের মতো বা সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তির দ্বার খোলার জন্য সর্বদা মহাত্মাদের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চেষ্টায় ব্যস্ত, তাদের সঙ্গ করার অর্থ হচ্ছে নরকের ঘোর অন্ধকারপূর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করা। মহাত্মাদের সঙ্গ করার মাধ্যমে সকলেরই উন্নত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। জীবনকে সার্থক করার এটিই হচ্ছে পরম উপায়।

শ্লোক ৪২

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্মরূপধৃক্ ।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্‌নরসুরাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি ; **এব**—নিশ্চয়ই ; **ইদম্**—এই ; **জগদ্ধাতা**—সমগ্র জগতের পালনকর্তা ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ধর্ম-রূপধৃক্**—ধর্মের রূপ ধারণ করে ; **পুষ্ণাতি**—পালন করেন ; **স্থাপয়ন্**—স্থাপন করার পর ; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **তির্য্যক্**— মনুষ্যেতর জীব ; **নর**—মানুষ ; **সুরাদিভিঃ**—দেবতা আদি অবতারদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রী পরমেশ্বর ভগবান সমগ্র জগতের পালনকর্তা রূপে, সৃষ্টির পর বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্য, মনুষ্যেতর জীবসমূহ এবং দেবতাদের মধ্যে সব রকম বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিভিন্ন জীব সমাজে অবতীর্ণ হন মায়ার বন্ধন থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ কেবল মানব সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি মৎস্য, বরাহ, বৃক্ষ ইত্যাদি রূপেও অবতরণ করেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নেই, সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনুষ্য সমাজে তাঁর নররূপে অবতরণকালে তাঁকে অবজ্ঞা করে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১) ভগবান বলেছেনঃ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছি যে ভগবান জড় সৃষ্টির থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁর চিন্ময় স্থিতি সর্বদাই অপরিবর্তনীয়। তাঁর নিত্য রূপ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এবং তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তাঁর সর্বশক্তিমান

ইচ্ছাকে পূরণ করেন। তাঁকে কখনও তাঁর কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। তিনি কার্য-কারণের বিচারের অতীত। জড় জগতে তাঁর প্রকাশও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন, কেননা তিনি এই জড় জগতের সমস্ত ভাল মন্দ বিচারের ঊর্ধ্বে। জড় জগতে মাছ অথবা শূকরকে মানুষের থেকে নিম্নস্তরের জীব বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবান যখন মৎস্যরূপে অথবা বরাহরূপে আবির্ভূত হন, তখন তাদের সম্বন্ধে জড় জগতের ধারণার কোনটিই তিনি নন। তিনি যে প্রত্যেক সমাজ ও যোনিতে প্রকট হন, তা তাঁর অহৈতুকী কৃপা, কিন্তু তা বলে তাঁকে কখনও নিম্ন যোনিসম্ভূত বলে মনে করা উচিত নয়। জড় জগতে যে ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট ইত্যাদির বিচার রয়েছে তা জড়জাগতিক, এবং পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত ধারণার অতীত। *পরংভাবম্* বা দিব্য প্রকৃতি, শব্দটির তুলনা কখনো জড়জাগতিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সর্বদাই একই রকম থাকে ও নিম্নস্তরের পশুর রূপ ধারণ করলেও তাঁর শক্তি কমে যায় না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং মীন, শূকররূপী তাঁর বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি সর্বব্যাপ্ত, আবার যুগপৎভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। কিন্তু অল্পজ্ঞ মূর্খ মানুষেরা, ভগবানের *পরং ভাবম্* সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে বুঝতে পারে না পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে মানুষরূপ অথবা মীন রূপ ধারণ করতে পারেন। প্রতিটি মানুষই তার নিজের জ্ঞানের মানদণ্ড অনুসারে প্রত্যেক বস্তুর তুলনা করে, যেমন একটি কূপমণ্ডুক মনে করে যে সমুদ্র হচ্ছে তার কূপের মতো। কূপমণ্ডুক সমুদ্রের কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না, এবং তাকে যখন সমুদ্রের বিশালতার কথা বলা হয়, তখন সে মনে করে যে সমুদ্র হয় তো তার কূপটি থেকে আরেকটু বড়। এইভাবে যারা ভগবানের দিব্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নয়, তাদের পক্ষে ভগবান বিষ্ণু যে কিভাবে সমস্ত জীব সমাজে নিজেকে সমভাবে প্রকাশ করতে পারেন তা বোঝা কষ্টকর।

শ্লোক ৪৩

ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সংনিয়চ্ছতি তৎকালে ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ—তারপর,শেষে; **কাল**—সংহার; **অগ্নি**—আগুন; **রুদ্রাত্মা**—রুদ্ররূপে; **যৎ**—যা কিছু; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইদম্**—এই সমস্ত; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **সম্**—সম্পূর্ণরূপে; **নিয়চ্ছতি**—সংহার করেন; **তৎকালে**—যুগান্তে; **ঘনানীকম্**—পুঞ্জীভূত মেঘ; **ইব**—সদৃশ; **অনিলঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

তারপর কল্পান্তে ভগবান রুদ্ররূপে সমগ্র সৃষ্টিকে সংহার করবেন, ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

মেঘের সঙ্গে সৃষ্টির এই তুলনা খুবই উপযুক্ত। মেঘের সৃষ্টি হয় আকাশে অথবা আকাশেই তাদের স্থিতি, এবং যখন তারা স্থানান্তরিত হয় তখন তারা আকাশেই অব্যক্ত রূপে থাকে। তেমনই, ব্রহ্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে তিনি তা পালন করেন এবং রুদ্র বা শিব রূপে তার সংহার করেন। এ সবই সংঘটিত হয় যথাসময়ে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৯-২০) এই সৃজন, পালন এবং সংহার সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

এই জড় জগতের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে প্রথমে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সৃষ্টি হয়, তারপর খুব সুন্দরভাবে তার বৃদ্ধি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে তার অস্তিত্ব থাকে (কখনো কখনো তা সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞেরও গণনার অতীত), কিন্তু তারপর আবার ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তার বিনাশ হয়। কারোরই তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে না, এবং ব্রহ্মার রাত্রি শেষ হলে পুনরায় তার সৃষ্টি হয় পালন এবং ধ্বংসের চক্র অনুসরণ করার জন্য। যে মূর্খ বদ্ধ জীব এই অনিত্য জগতকে তার নিত্য অবস্থানের স্থান বলে গ্রহণ করেছে, তাকে বুদ্ধিমত্তা সহকারে জানতে হবে যে, এই প্রকার সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয় কেন। জড় জগতের সকাম কর্মীরা পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত জড় পদার্থের দ্বারা বিশাল উদ্যোগ, বড় বড় বাড়ি, বড় বড় সাম্রাজ্য, বড় বড় কলকারখানা এবং বড় বড় কত কিছু করতে উৎসাহী। এই সমস্ত সম্ভাবনা এবং তার মূল্যবান শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবেরা কত কিছু তৈরি করে তাদের বাসনা চরিতার্থ করে, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সমস্ত সৃষ্টি থেকে বিদায় নিয়ে পুনরায় আরেকটি জীবনে বার বার সৃষ্টি করার জন্য প্রবেশ করতে হয়। যে সমস্ত মূর্খ বদ্ধ জীব এই জড় জগতে তাদের শক্তির অপচয় করে, তাদের আশা দান করার জন্য ভগবান তাদের জানান যে, আরেকটি প্রকৃতি রয়েছে যা সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ঊর্ধ্বে নিত্য বিরাজমান, এবং বদ্ধ জীবাত্মা তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার মূল্যবান শক্তির যথার্থ সদ্ব্যবহার করে তার কি করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে যথাসময়ে ধ্বংস হতে বাধ্য এই জড় জগতে জড় বিষয়ে লিপ্ত হয়ে তার সময়ের অপচয় করার পরিবর্তে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় তার শক্তির সদ্ব্যবহার করা উচিত, যাতে সে সনাতন ধামে স্থানান্তরিত হতে পারে, যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই, পক্ষান্তরে রয়েছে কেবল নিত্য জীবন। সেই জগৎ পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। এই অনিত্য সৃষ্টি এইভাবে প্রকাশ হয় এবং ধ্বংস হয় কেবল সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের শিক্ষাপ্রদান করার জন্য, যারা অস্থায়ী বিষয়ের প্রতি

আসক্ত। তাদের আত্ম-উপলব্ধির একটি সুযোগ দান করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য, সকাম কর্মীদের পরম লক্ষ্য ইন্দ্রিয়-সুখ প্রদান করা নয়।

শ্লোক ৪৪

ইত্থংভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ।
নেত্থংভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্থম্—এইরূপে; **ভাবেন**—সৃষ্টি এবং ধ্বংসের বিষয়ে; **কথিতঃ**—বর্ণনা করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভগবত্তমঃ**—মহান তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা; **ন**—না; **ইত্থম্**—এতে; **ভাবেন**—রূপ; **হি**—কেবল; **পরম্**—সবচাইতে মহিমান্বিত; **দ্রষ্টুম্**—দেখার জন্য; **অর্হন্তি**—যোগ্য; **সূরয়ঃ**—পরম ভক্ত।

অনুবাদ

মহান্ তত্ত্বজ্ঞানীরা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত রূপের অতীত ভগবানের অধিক মহিমামণ্ডিত দিব্য কার্যকলাপ দর্শন করার উপযুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে এই জড় জগতের কেবল স্রষ্টা এবং সংহারকই নন, তিনি একজন সাধারণ স্রষ্টা এবং সংহারকের থেকেও অধিক আরো কিছু, কেননা তাঁর আনন্দময় রূপ রয়েছে। ভগবানের এই আনন্দময় রূপ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য আর কেউ পারে না। নির্বিশেষবাদীরা কেবল ভগবানের সর্বব্যাপী প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করেই সন্তুষ্ট। তাকে বলা হয় ব্রহ্ম-উপলব্ধি। নির্বিশেষবাদীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যোগী, যারা হৃদয়ে পরমাত্মারূপ ভগবানের অংশ প্রকাশ দর্শন করেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা প্রেমময়ী সেবার দ্বারা বাস্তবিকভাবে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিতে সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

বৈকুণ্ঠলোক নামক ভগবানের নিত্যধামে সর্বদা ভগবান তাঁর পার্ষদসহ বিরাজ করেন এবং বিভিন্ন চিন্ময় রসে সেবারত শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা আস্বাদন করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা এই জড় সৃষ্টির প্রকটকালে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ করার মাধ্যমে যথাযথভাবে ভগবানকে জানা যায় এবং তার ফলে তাঁর সেবা করার শিক্ষা লাভ করে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ভগবানের সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ সঙ্গ লাভ করা যায় গোলোক বৃন্দাবনে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের সঙ্গে এবং তাঁর প্রিয় সুরভী গাভীদের সঙ্গে পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত ধামের বর্ণনা ব্রহ্ম-সংহিতাতে রয়েছে, সেটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবিষয়ে সবচাইতে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে বিবেচনা করেছেন।

শ্লোক ৪৫

নাস্য কর্মনি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ ॥ ৪৫ ॥

ন—কখনই নয় ; **অস্য**—এই সৃষ্টির ; **কর্মণি**—বিষয়ে ; **জন্মাদৌ**—সৃষ্টি এবং সংহার ; **পরস্য**—পরমেশ্বরের ; **অনুবিধীয়তে**—এইভাবে বর্ণিত হয়েছে ; **কর্তৃত্ব**— কর্তৃত্ব ; **প্রতিষেধার্থং**—প্রতিরোধ করার জন্য ; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা ; **আরোপিতম্**—প্রকাশিত ; **হি**—জন্য ; **তৎ**—স্রষ্টা।

অনুবাদ

এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার কার্যে ভগবান সরাসরিভাবে যুক্ত হন না। বেদে তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের যে বর্ণনা রয়েছে, তা কেবল জড়া প্রকৃতি যে স্রষ্টা নয়, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের বিষয়ে বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি*, অর্থাৎ সব কিছু ব্রহ্মর দ্বারা সৃষ্ট হয়, সৃষ্টির পর সব কিছু ব্রহ্মর দ্বারা পালিত হয় এবং সংহারের পর সব কিছু ব্রহ্মে সংরক্ষিত হয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ জড়বাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে জড়া প্রকৃতি হচ্ছে জড় জগতের পরম কারণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরও এই মত। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এই মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। বেদান্ত-দর্শনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্ম হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের মূল উৎস, এবং বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্* ইত্যাদি।

জড় পদার্থে নিঃসন্দেহে কার্য করার শক্তি নিহিত রয়েছে, কিন্তু তাতে নিজে কার্য করার উপযোগী উদ্যম নেই। শ্রীমদ্ভাগবত তাই *জন্মাদ্যস্য* সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন, *অভিজ্ঞ* এবং *স্বরাট্*, অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম জড় নয়, তিনি হচ্ছেন পরম চেতন এবং সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। তাই জড় পদার্থ কখনই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের পরম কারণ হতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কারণ বলে মনে হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হয়। সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের তিনিই হচ্ছেন পরম আশ্রয় এবং তা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥

জড়া প্রকৃতি ভগবানের একটি শক্তি, এবং তিনি ভগবানের পরিচালনায় কার্য করেন (*অধ্যক্ষেণ*)। ভগবান যখন জড়া প্রকৃতির প্রতি তাঁর দিব্য দৃষ্টিপাত করেন, তখনই কেবল জড়া প্রকৃতি সক্রিয় হতে পারেন, ঠিক যেমন পিতা মাতার সঙ্গে সঙ্গ করার ফলেই মাতা গর্ভধারণ করতে সক্ষম হন। যদিও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মনে হতে পারে যে মাতা সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পিতাই হচ্ছে সন্তানের জন্মদাতা। তাই জড়া প্রকৃতি পরম পিতার সংসর্গে আসার পরেই কেবল জড় জগতের স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুসমূহ উৎপাদন করেন ; স্বতন্ত্রভাবে তার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি, স্থিতি ইত্যাদির কারণ বলে মনে করাকে বলা হয় *অজাগলস্তন-ন্যায়*। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে 'অজাগলস্তন-ন্যায়ের'* ব্যাখ্যা করে বলেছেন (সেই ব্যাখ্যা করেছেন প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও)—"জড়া প্রকৃতি উপাদান কারণরূপে *প্রধান* নামে পরিচিত, এবং নিমিত্ত কারণরূপে *মায়া* নামে পরিচিত। কিন্তু যেহেতু তা জড় পদার্থ তা কখনো জগতের মূল কারণ হতে পারে না।" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি-কারণ যৈছে অজাগলস্তন॥

(*চৈঃ চঃ আদি ৫/৬১*)

যেহেতু কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই তিনি জড়া প্রকৃতিকে সক্রিয় করেন। এই সূত্রে বৈদ্যুতিকরণের দৃষ্টান্তটি যথাযথ। লোহা অবশ্যই আগুন নয়, কিন্তু যখন লোহাকে গরম করে লোহিত-তপ্ত করা হয়, তখন অবশ্যই তার মধ্যে আগুনের দাহিকা শক্তি থাকে। জড় পদার্থকে একখণ্ড লোহার সঙ্গে তুলনা করা হয়, এবং তা বিদ্যুৎময় অথবা উত্তপ্ত হয় শ্রীবিষ্ণুর পরম চেতনা বা দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। এই প্রকার শক্তি সঞ্চারের ফলেই কেবল জড়া শক্তি বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। তাই জড় বস্তু কখনো নিমিত্ত অথবা উপাদান কারণ হতে পারে না। শ্রী কপিলদেব বলেছেন—

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্‌যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥

[*শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৮/৪০*]

মূল অগ্নি, তার শিখা, স্ফুলিঙ্গ এবং ধূম এক। কিন্তু অগ্নি অগ্নি হওয়া সত্ত্বেও শিখা থেকে ভিন্ন, শিখা স্ফুলিঙ্গ থেকে ভিন্ন এবং স্ফুলিঙ্গ ধূম থেকে ভিন্ন। তাদের সকলের মধ্যে, অর্থাৎ শিখায়, স্ফুলিঙ্গে এবং ধূমে আগুনের সত্তা বর্তমান, তথাপি তারা ভিন্ন। জড় জগতকে ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; ধূম যখন আকাশের উপর দিয়ে যায়, তখন তাতে আমাদের পরিচিত এবং অপরিচিত নানারকম রূপের আকৃতি দেখা যায়। জীবের সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের তুলনা করা হয়েছে এবং অগ্নি শিখাকে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে (প্রধান) তুলনা করা হয়েছে। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, তাদের প্রকৃতি সক্রিয় হয় অগ্নির গুণের দ্বারা আবিষ্ট হওয়ার ফলে। তাই তাদের সব কটি, যথা, জড়া প্রকৃতি, জগৎ এবং জীব ভগবানের (অগ্নির) বিভিন্ন শক্তি। তাই যারা জড়া প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ (সাংখ্য দর্শন অনুসারে জড় জগতের কারণ হচ্ছে প্রকৃতি) বলে বিবেচনা করে, তাদের সেই সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত। ভগবান থেকে পৃথক জড়া প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব নেই। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে স্বীকার না করা '*অজাগলস্তন-ন্যায়ের*' মতো বা ছাগলের গলার স্তন থেকে দুধ দোহন করার চেষ্টা করার মতো। ছাগলের গলার স্তন দুধের উৎস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার থেকে দুধ দোহন করার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র।

শ্লোক ৪৬

অয়ংতু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ।
বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃতাঃ ॥ ৪৬ ॥

অয়ম্—সৃষ্টি এবং সংহারের এই প্রক্রিয়া ; **তু**—কিন্তু ; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার ; **কল্পঃ**— তাঁর একদিন ; **সবিকল্পঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের অবধি সমেত ; **উদাহৃতঃ**— উদাহরণরূপে ; **বিধিঃ**—বিধি-বিধান ; **সাধারণঃ**—সংক্ষেপে ; **যত্র**—যেখানে ; **সর্গাঃ**—সৃষ্টি ; **প্রাকৃত**—জড়া প্রকৃতির বিষয়ে ; **বৈকৃতাঃ**—বিনিয়োগ।

অনুবাদ

এখানে সংক্ষেপে সৃষ্টি এবং সংহারের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, তা ব্রহ্মার একদিনের বিধির বিধান। এটি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিরও বিধি, যাতে প্রকৃতি নিহিত থাকে।

তাৎপর্য

সৃষ্টি তিন প্রকার—মহাকল্প, বিকল্প এবং কল্প। মহাকল্পে ভগবান কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে মহত্তত্ত্ব এবং সৃষ্টির ষোলটি তত্ত্ব সহ প্রথম পুরুষাবতার রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। সৃষ্টির যন্ত্র এগারটি, উপাদান পাঁচটি এবং সেগুলি সবই মহৎ বা অহঙ্কার থেকে জাত। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবানের এই সৃষ্টিকে বলা হয় মহাকল্প। ব্রহ্মার সৃষ্টি

এবং জড় উপাদানগুলি বিতরণকে বলা হয় বিকল্প, এবং ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁর জীবনের প্রতিদিনের সৃষ্টিকে বলা হয় কল্প। তাই ব্রহ্মার একদিনকে বলা হয় কল্প, এবং এইভাবে ব্রহ্মার দিন অনুসারে ত্রিশটি কল্প রয়েছে। সেকথা ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥

উচ্চতর স্বর্গলোকে একদিন এবং রাত্রি পৃথিবীর এক বছরের সমান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও সেকথা স্বীকার করেন এবং মহাকাশচারীরাও তা অনুমোদন করেন। তেমনি আরও উচ্চতর লোকে দিন-রাত্রির অবধি দীর্ঘতর। চার যুগের গণনা স্বর্গের গণনা অনুসারে বারো হাজার বছর। একে বলা হয় দিব্য যুগ, এবং এক হাজার দিব্য যুগ ব্রহ্মার এক দিনের সমান। ব্রহ্মার এক দিনের সৃষ্টিকে বলা হয় কল্প, এবং ব্রহ্মার আয়ুষ্কালকে বলা হয় বিকল্প। যে মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের ফলে একেকটি বিকল্প সম্ভব হয়, তাকে বলা হয় মহাকল্প। এইভাবে মহাকল্প, বিকল্প এবং কল্পের এক নিয়মিত এবং ধারাবাহিক চক্র রয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী স্কন্দ পুরাণের প্রভাস-খণ্ডে তা বর্ণনা করেছেন—

প্রথমঃ শ্বেতকল্পশ্চ দ্বিতীয় নীল-লোহিতঃ।
বামদেবস্তৃতীয়স্তু ততো গাথান্তরোঽপরঃ॥
রৌরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতিস্মৃতঃ।
সপ্তমোঽথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোঽষ্টম উচ্যতে॥
সদ্যোথ নবমঃ কল্প ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ।
ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোঽপরঃ॥
ত্রয়োদশ উদানস্তু গরুড়োঽথ চতুর্দশঃ।
কৌর্মঃ পঞ্চদশো জ্ঞেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ॥
ষোড়শো নারসিংহস্তু সমাধিস্তু ততোঽপরঃ।
আগ্নেয়ো বিষ্ণুজঃ সৌরঃ সোমকল্পস্ততোঽপরঃ॥
দ্বাবিংশো ভাবনঃ প্রোক্তঃ সুপুমানিতি চাপরঃ।
বৈকুণ্ঠশ্চার্ষ্টিষস্তদ্বদ্ বলীকল্পস্ততোঽপরঃ॥
সপ্তবিংশোঽথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথাপরঃ।
মহেশ্বরস্তথাপ্রোক্তস্ত্রিপুরো যত্রঃ ঘাতিতঃ।
পিতৃকল্পস্তথা চান্তে যঃ কুহূরব্রহ্মণঃ স্মৃতা॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার ত্রিশটি কল্প হচ্ছে—(১) শ্বেতকল্প, (২) নীললোহিত, (৩) বামদেব, (৪) গাথান্তর, (৫) রৌরব, (৬) প্রাণ, (৭) বৃহৎকল্প, (৮) কন্দর্প, (৯) সদ্যোথ (১০) ঈশান, (১১) ধ্যান, (১২) সারস্বত, (১৩) উদান, (১৪) গরুড়, (১৫) কৌর্ম, (১৬) নারসিংহ,

(১৭) সমাধি, (১৮) আগ্নেয়, (১৯) বিষ্ণুজ, (২০) সৌর, (২১) সোমকল্প, (২২) ভাবন, (২৩) সুপুম, (২৪) বৈকুণ্ঠ, (২৫) অর্চিষ, (২৬) বলীকল্প, (২৭) বৈরাজ, (২৮) গৌরীকল্প, (২৯) মাহেশ্বর, (৩০) পৈতৃকল্প।

এগুলি কেবল ব্রহ্মার দিন, এবং সেই অনুসারে মাস এবং বছরের গণনায় তাঁর আয়ু একশ বছর। অতএব আমরা অনুমান করতে পারি একটি মাত্র কল্পেই কেবল কত সৃষ্টি রয়েছে। তারপর পুনরায় বিকল্প, যার উৎপত্তি মহাবিষ্ণুর শ্বাস থেকে হয়। যে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।

ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসের সমান, সুতরাং মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে মহাকল্প, এবং এই সবই সম্ভব হয় পরমেশ্বর ভগবানের জন্য, কেননা তিনি ছাড়া অন্য আর কেউই সমগ্র সৃষ্টির প্রভু নন।

শ্লোক ৪৭

পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্ ।
যথা পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাস্যে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু ॥ ৪৭ ॥

পরিমাণম্—মাপ; **চ**—ও; **কালস্য**—সময়ের; **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন; **লক্ষণ**—লক্ষণ; **বিগ্রহম্**—রূপ; **যথা**—যে প্রকার; **পুরস্তাৎ**—এরপর; **ব্যাখ্যাস্যে**—বিশ্লেষণ করা হবে; **পাদ্মম্**—পাদ্মনামক; **কল্পম্**—একদিনের অবধি; **অথঃ**—এইভাবে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

হে রাজন্, যথাসময়ে আমি স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপে সময়ের মাপ এবং তাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বর্ণনা করব। কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে পাদ্মকল্পের বিষয়ে বলবো, শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার বর্তমান কল্পের নাম বরাহ-কল্প বা শ্বেতবরাহ-কল্প, কেননা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মার সৃষ্টির সময়ে বরাহরূপে ভগবান অবতরণ করেছিলেন। তাই এই বরাহ-কল্পকে পাদ্মকল্পও বলা হয়, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করে জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরাও সেই তথ্য অনুমোদন করেছেন। অতএব ব্রহ্মার বরাহ-কল্প এবং পাদ্মকল্পের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

শ্লোক ৪৮

শৌনক উবাচ

যদাহ নো ভবান্ সূত ক্ষত্তা ভাগবতোত্তমঃ।
চচার তীর্থানি ভুবস্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুদুস্ত্যজান্ ॥ ৪৮ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক ঋষি বললেন; **যৎ**—যেমন; **আহ**—বলেছেন; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—আপনি; **সূত**—হে সূত; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **ভাগবতোত্তমঃ**—ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের অন্যতম; **চচার**—আচরণ করেছিলেন; **তীর্থানি**—তীর্থ সমূহ; **ভুবঃ**—পৃথিবী; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বন্ধূন্**—আত্মীয়-স্বজন; **সদুস্ত্যজান্**—ত্যাগ করা কঠিন।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি সৃষ্টি সম্বন্ধে সব কিছু শ্রবণ করার পর সূত গোস্বামীর কাছে বিদুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, কেননা সূত গোস্বামী তাঁকে পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, কিভাবে বিদুর তাঁর অতি অপরিহার্য আত্মীয়-স্বজনদের বর্জন করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শৌনক আদি ঋষিগণ বিদুর সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, যে বিদুর তীর্থ পর্যটন করার সময় মৈত্রেয় ঋষির সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯-৫০

ক্ষত্তুঃ কৌশারবেস্তস্য সংবাদোঽধ্যাত্মসংশ্রিতঃ।
যদ্বা স ভগবাংস্তস্মৈ পৃষ্টস্তত্ত্বমুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥
ব্রূহি নস্তদিদং সৌম্য বিদুরস্য বিচেষ্টিতম্।
বন্ধুত্যাগনিমিত্তংচ যথৈবাগতবান্ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

ক্ষত্তুঃ—বিদুরের; **কৌশারবেঃ**—মৈত্রেয়ের মতো; **তস্য**—তাদের; **সংবাদঃ**—সংবাদ; **অধ্যাত্ম**—দিব্যজ্ঞান বিষয়ক; **সংশ্রিতঃ**—পূর্ণ; **যৎ**—যা; **বা**—অন্য কিছু; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **পৃষ্টঃ**—প্রশ্ন করেছিলেন; **তত্ত্বম্**—সত্য; **উবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **হ**—অতীতে; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—সেই সমস্ত বিষয়; **ইদম্**—এখানে; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **বিদুরস্য**—বিদুরের; **বিচেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **বন্ধুত্যাগ**—বন্ধুকে পরিত্যাগ করে; **নিমিত্তম্**—কারণ; **চ**—ও; **যথা**—যেমন; **এব**—ও; **আগতবান্**—এসেছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায় (গৃহে)।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি বললেন—দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছিল। বিদুর কি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার উত্তরে মৈত্রেয় কি বলেছিলেন। দয়া করে আপনি আমাদের এও বলুন বিদুর কেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, এবং কেন তিনি পুনরায় গৃহে ফিরে এসেছিলেন। তীর্থ পর্যটন করার সময় বিদুর কি করেছিলেন তাও আপনি আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

সূত গোস্বামী জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহারের বিষয়ে বর্ণনা করছিলেন, কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে যেন শৌনক আদি ঋষিরা অধ্যাত্ম বিষয়ে শ্রবণ করার জন্য অধিক আগ্রহী ছিলেন। মানুষ দুই প্রকার, যথা—স্থূলদেহ এবং জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত মানুষ, আর অন্য শ্রেণীর মানুষেরা উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভের বিষয়ে অধিক উন্মুখ। শ্রীমদ্ভাগবত জড়বাদী এবং অধ্যাত্মবাদী উভয়েরই মঙ্গল সাধন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত জড় জগতে এবং চিজ্জগতে সম্পাদিত ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মানুষ সমানভাবে লাভবান হতে পারে। জড়বাদীরা ভৌতিক নিয়ম এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। ভৌতিক জগতের চাকচিক্য দর্শন করে তারা বিস্ময়ান্বিত হয়। কখনো কখনো জড় জগতের চাকচিক্য দর্শন করে তারা ভগবানের মহিমা বিস্মৃত হয়। তাদের স্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে সমস্ত ভৌতিক কার্যকলাপ এবং আশ্চর্যসমূহ ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে।

বাগানের একটি গোলাপ বিকশিত হয়ে তার গঠন এবং রঙের যে সৌন্দর্য প্রকাশ করে এবং মধুর সৌরভ বিতরণ করে, তা কোন অন্ধ জড় নিয়মের ফলে নয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সে রকমই মনে হয়। সেই জড় নিয়মের পিছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ এবং পূর্ণ চেতনা, তা না হলে এত সুসংবদ্ধভাবে কোন কিছু সম্পন্ন হতে পারে না।

শিল্পী অত্যন্ত মনোযোগ এবং কলানৈপুণ্য সহকারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি গোলাপের ছবি আঁকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা প্রকৃত গোলাপের মতো সুন্দর হতে পারে না। এটি যদি সত্য হয়, তা হলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে কোন বুদ্ধিমান পুরুষের পরিচালনা ব্যতীত গোলাপটি এত সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়েছে? অজ্ঞতার ফলেই মানুষ এই ধরনের সিদ্ধান্ত করে।

পূর্বোক্ত সৃষ্টি এবং সংহারের বর্ণনা থেকে সকলেরই জেনে রাখা অবশ্য কর্তব্য যে পরম চেতনা সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে পূর্ণরূপে সকলেরই তত্ত্বাবধান করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের সর্বব্যাপকতার এইটিই হচ্ছে প্রমাণ। স্থূল জড়বাদীদের থেকেও

অধিক মূর্খ মানুষেরা নিজেদের পরমার্থবাদী বলে ঘোষণা করে দাবি করে যে, তারা সর্বব্যাপ্ত পরম চেতনা লাভ করেছে, কিন্তু তার কোন প্রমাণ তারা উপস্থাপন করতে পারে না। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা জানতে পারে না তাদের সামনে দেয়ালের ওপারে কি হচ্ছে, কিন্তু তবুও তারা পরমেশ্বর ভগবানের সর্বব্যাপী চেতনা লাভ করেছে বলে দাবী করে মিথ্যা গর্ব প্রকাশ করে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ তাদেরও গভীরভাবে সাহায্য করবে। তা তাদের চক্ষু উন্মীলিত করে দেখাবে যে কেবল পরম চেতনার দাবী করার মাধ্যমেই পরম চেতনা লাভ করা যায় না। কেউ যদি সেরকম দাবী করে তবে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা কিন্তু স্থূল জড়বাদী এবং কপট পরমার্থবাদীদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন, এবং তাই তাঁরা চিন্ময় বিষয়ে বাস্তব সত্যকে মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে জানবার জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

শ্লোক ৫১

সূত উবাচ

রাজ্ঞ পরীক্ষিতা পৃষ্টো যদবোচন্মহামুনিঃ।
তদ্বোঽভিধাস্যে শৃণুত রাজ্ঞঃ প্রশ্নানুসারতঃ ॥ ৫১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রী সূত গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **পরীক্ষিতা**—পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **যৎ**—যা; **অবোচৎ**—বলেছিলেন; **মহামুনিঃ**—মহান ঋষি; **তৎ**—সেই বিষয়ে; **বঃ**—আপনাকে; **অভিধাস্যে**—আমি বিশ্লেষণ করব; **শৃণুত**—দয়া করে শ্রবণ করুন; **রাজ্ঞঃ**—রাজার দ্বারা; **প্রশ্ন**—প্রশ্ন; **অনুসারতঃ**—অনুসারে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী উত্তর দিলেন—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি যা বলেছিলেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে এখন বলব। দয়া করে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

যে কোন প্রশ্নের উত্তর যখন মহাজনদের উদ্ধৃতি দিয়ে উত্তর দেওয়া হয়, তখন তা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করে। আদালতেও এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়। ভাল উকিল অধিক কষ্ট না করে তাঁর মামলা রুজু করার জন্য পূর্ববর্তী বিচারের প্রমাণ দিয়ে তাঁর সাক্ষ্য প্রস্তুত করেন। একে বলা হয় পরম্পরা প্রণালী, এবং বিচক্ষণ মহাজনেরা তাঁদের মনগড়া কদর্থ তৈরী না করে এই পন্থার অনুসরণ করেন:

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

[ব্রহ্মসংহিতা ৫/১]

আমাদের সকলের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা, যিনি সর্বকারণের পরম কারণ এবং নিঃসন্দেহে সব কিছুই যাঁর অধীন।

ইতি—"শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য। দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।